ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস

১৭৫৭-১৮৩৭

ডঃ রমেশচন্দ্র দত্ত

ভূমিকা

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন
উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়



সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী :: কলিকাতা ৬

প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ
পৌষ ১৩৭৯
দ্বিতীয় সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৮৯

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
চারু খান

মুদ্রাকর
সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

ভারত সরকার প্রদত্ত সুলভ মূল্যের কাগজে মুদ্রিত

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগ ১৭৫৭-১৮৩৭

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রমেশচন্দ্র দত্তের "বৃটিশ ভারতের অর্থ নৈতিক ইতিহাস" দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের আলোচ্য বিষয় ছিল প্রাক-ভিক্টোরিয়া যুগের অর্থাৎ ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৩৭ সালের ইতিহাস—প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল ভিক্টোরিয়া যুগের (১৮৩৭—১৯০১) অর্থ নৈতিক ইতিহাস। এরপর সত্তর বছর কেটে গেছে। এই সময়ে বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, অনেক প্রামাণ্য বইও লেখা হয়েছে। কিন্তু অর্থ নৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে একথা বলা যায় না— রমেশ দত্তের বই দুখানি বাদ দিলে। হয়ত অর্থ নৈতিক ইতিহাস নিয়ে এখানে ওখানে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে, দুচারটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক গ্যাড্‌গিল এর অর্ধেক সময় নিয়ে আর একখানি বইও লিখেছেন। কিন্তু যে পটভূমিকায় রমেশ দত্তের বই লেখা, এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করে দ্বিতীয় আর কোন ঐতিহাসিক গবেষণা বা পুস্তক প্রকাশের চেষ্টা করেন নাই। সেই দিক থেকে এই বই দুটি অনন্য এবং ভবিষ্যতে এই বিষয় নিয়ে যাঁরা গবেষণা করবেন তাঁদের হাতেখড়ি হবে এই বই নিয়ে। এই বই দুটি আজ সত্তর বৎসর ধরে অর্থ নৈতিক ইতিহাসের পাঠ্যতালিকায় শুধু কেবল প্রথম স্থান নয়, অধিকাংশ স্থানই অধিকার করে আছে। বহুদিন পূর্বেই এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। অনেক দেরী হলেও আজ আমার স্নেহভাজন ছাত্র অধ্যাপক তরুণ সান্যাল ও তাঁর সহকর্মীদের এই শুভ প্রচেষ্টার প্রশংসা না করে থাকা যায় না। দিনে দিনে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি হচ্ছে, বঙ্গভাষাভাষীদের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে এ খুবই আনন্দের কথা।

অ্যাডাম স্মীথ-এর বিখ্যাত পুস্তকের নাম সকলেই জানেন,—"জাতিপুঞ্জের সম্পদের কারণ অনুসন্ধান"। রমেশ দত্তের বইদুটির নামও এইভাবে বলা উচিত হবে—"বৃটিশ ভারতের দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান"। রমেশ দত্তের মূল প্রতিপাদ্য ছিল : বৃটিশ শাসনের প্রায় দেড়শত বৎসরে ভারতবর্ষের সম্পদ বাড়ে নাই, দারিদ্র্য বৃদ্ধি ঘটেছে। এর সর্বপ্রথম ও প্রধান পরিচয় হচ্ছে দেশের সর্বাঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব। তিনি প্রথমভাগের

মুখবন্ধে বলে গেছেন যে বৃটিশ শাসনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ হচ্ছে দেশের সর্বত্র শান্তিস্থাপন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার, দক্ষ প্রশাসনযন্ত্র গঠন ও ন্যায়নিষ্ঠ বিচারব্যবস্থার প্রচলন। অন্যান্য অনেক দিক থেকেও এ দেশের অনেক উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। এ হল বৃটিশশাসন ব্যবস্থার জমার দিকের হিসেব। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতবাসীর দারিদ্র্যের তুলনা নাই। তাঁর মতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে এত বেশী দারিদ্র্য ছিল না—কারণ তখনও এদেশে শিল্প এবং কৃষি উভয়ই যথেষ্ট ফলপ্রসূ ছিল। তারপরের শতাব্দীতে ইউরোপের অনেক দেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে গড়ে উঠেছে—তাদের দারিদ্র্য দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে হয়েছে তার বিপরীত। শিল্প সঙ্কোচন ঘটেছে, কৃষির উন্নতি হয় নাই। ফলে ভারতবর্ষের জাতীয় আয় বৃদ্ধি না পেয়ে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সমস্ত বইটিতে তিনি এই দারিদ্র্য বৃদ্ধির কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করেছেন এবং প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন সরকারী রিপোর্টের তথ্য ও বৃটিশ পার্লামেণ্টের প্রকাশিত নানা বিষয়ের কাগজপত্র। এই কারণানুসন্ধানের পশ্চাতে আছে তাঁর অগাধ পরিশ্রম,—বিচক্ষণ গবেষণা ও বিরাট পাণ্ডিত্য।

ভারতবাসীর দারিদ্র্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে এদেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার বেশী বলে দারিদ্র্য—একথা ঠিক নয়। কারণ এই সময়ে ইউরোপে বহু দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার আরো বেশী ছিল। এদেশের সামাজিক রীতিনীতি কিংবা সমাজব্যবস্থাকে এর জন্য দায়ী করা ঠিক হবে না। প্রধান কারণ দুইটি—এদেশের সমৃদ্ধিশালী কুটীর এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলি একে একে নষ্ট বা দুর্বল হয়ে গেছে বৃটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চাপে। ফলে সম্পদহানি ত ঘটেছেই। তাছাড়া বহু লোক জীবিকানির্বাহের জন্য চাষের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে। অথচ রমেশ দত্তের মতে বৃটিশ আমলে ভূমিরাজস্ব নীতির জন্য চাষের উন্নতি করা সম্ভব হয় নাই। তাঁর মতে ভূমিরাজস্বের হার এত বেশী যে চাষের উন্নতি করার দিকে চাষীদের কোন উৎসাহ থাকছে না। কারণ চাষের উন্নতির ফলে কৃষিজাত আয়বৃদ্ধি হলে ভূমিরাজস্বের হারও তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। জমি থেকে উৎপাদনবৃদ্ধি না হওয়ার ফলে দেশের লোক যাদের অধিকাংশই চাষের উপর নির্ভরশীল তারা ক্রমে গরীব হয়ে পড়ছে এবং ঠিকমত বর্ষা না হলেই দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে। রমেশ দত্তের মতে বৃটিশ সরকারের উচিত হবে দেশের সর্বত্র ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করা। তাহলে জমি থেকে সরকারী রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকবে ও চাষী নিশ্চিন্ত

মনে ফসলবৃদ্ধির কাজে লিপ্ত হবে। সেই সঙ্গে রেলওয়ে প্রসারের জন্য অর্থবিনিয়োগ না করে সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে যা কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধির সহায়তা করবে। এ ছাড়াও তিনি বলেছেন যে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট কমাতে হবে। এ দেশের লোকের আয়ের তুলনায় বিদেশী প্রশাসনযন্ত্রের পেছনে অনেক বেশী অর্থব্যয় করতে হচ্ছে। সরকারী ব্যয় কমান সম্ভব হলে করভারও কমবে—যার ফলে কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির উৎসাহ বেড়ে যাবে।

একথা ঠিক যে রমেশ দত্ত মহাশয়ের পূর্বে আরো কয়েকজন লেখক এই ধরনের মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে সে সমস্তই রমেশ দত্ত মহাশয়ের নিজস্ব মত। এ মত তিনি এর পূর্বে ১৯০০ সালে তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড কার্জনকে লেখা "খোলা চিঠি"তে প্রকাশ করেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিনি বহু সরকারী নথিপত্র রিপোর্ট থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, বহু বিষয়ের পরিসংখ্যান দিয়ে বিষয়গুলির যথার্থতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এ দিক দিয়ে তাঁর কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ।

এ যুগের অর্থনীতিবিদ তাঁর লেখার সঙ্গে অনেক স্থলেই একমত হবেন না। বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে তিনি যা মত প্রকাশ করেছেন পরের যুগে অনেকেই তা সমর্থন করেন নাই। একথা ঠিক যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকারকে দেয় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে জমিদার এবং চাষীদের মাঝে এত বেশী সংখ্যায় মধ্যসত্বভোগীর দলের সৃষ্টি হয় যে চাষীর উপর ভূমিরাজস্বের চাপ নির্দিষ্ট থাকে নাই,—বরং অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারের দেয় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু মধ্যসত্বভোগীদের চাপে চাষী সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে—যার ফলে পরে সরকারকে চাষীদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রজাসত্ব আইন পাস করতে হয়েছিল। রমেশ দত্ত মহাশয়ের জীবন কালে এই বই লেখার বেশ কয়েক বৎসর পূর্বেই এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রেগুলেসনের এই দিকটাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। রেলওয়ের বিস্তার সাধনের জন্য অর্থব্যয় বনাম সেচব্যবস্থার উন্নতিকল্পে অর্থব্যয়—এই বিষয় নিয়ে তিনি অনেক আলোচনা করেছেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ সুস্পষ্ট। একথা ঠিক যে সেচব্যবস্থায় প্রসার ও উন্নতি হলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা কমে যাবে। কিন্তু সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির দিক দিয়ে রেলওয়ে প্রসারের প্রয়োজন কিছু মাত্র কম নয় এবং কোন অঞ্চলে ফসলের অজন্মা

হলে অন্য অঞ্চল থেকে দ্রুত খাদ্যশস্য আনার সহজ ব্যবস্থা রেলওয়ের মাধ্যমে হতে পারে। সুতরাং রেলওয়ে বনাম সেচব্যবস্থা নিয়ে এত চুলচেরা বিচারের মূল্য খুব বেশী নাই, এমনকি শুধু দুর্ভিক্ষের কথা ভাবলেও এই তর্ক অকারণ বলেই মনে হবে।

এই রকম ও আরো দুএকটি বিষয়ের কথা ধরলেও বৃটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের মূল্য কিছু মাত্র কমে না। এই অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বইখানি এই বিষয়ে যাঁরা কৌতূহলী তাঁদের সকলেরই বিশেষভাবে পাঠ করা উচিত। আজ যখন এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে তখন আশা করা যায় যে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি বইখানি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করবেন, এর মতবাদ নিয়ে আলোচনা করবেন এবং পরে এই বিষয়ে যে নূতন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তার কষ্টিপাথরে এর বিচার করবেন। এ দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখার কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। ফলে নানা দিক থেকে আমাদের জ্ঞানও অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। বৃটিশ রাজত্বের আমলে ও সে রাজত্ব অবসানের অব্যবহিত পরে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হয়ত ততটা নিরপেক্ষ হোত না যতটা সত্যিকারের গবেষকের থাকা উচিত। আজ যখন সে রাজত্ব দূরে চলে গেছে এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখার উপযোগী মালমসল্লা ক্রমেই বেশী পাওয়া যাচ্ছে তখন আশা করা যায় এ দেশের পণ্ডিতসমাজ রমেশ দত্ত মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে সত্যানুসন্ধানে এগিয়ে যাবেন। এ দেশের বিভিন্ন কালের প্রামাণ্য অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার কাজ আজও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। বিরাট প্রতিভার অধিকারী রমেশ দত্ত মহাশয় তাঁর বহু সার্থক কর্মের মধ্যে এই বই দুটি লিখে যে পথ দেখিয়ে গেছেন আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর সেই পথে এগিয়ে যাবার জন্য আজকের তরুণ-পণ্ডিত সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছি।

দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন

সম্পাদকের ভূমিকা

রমেশচন্দ্র দত্ত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, ভাষা চর্চা, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগেই তাঁর ভূমিকা ও অবদান ছিল অসামান্য।

১৮৪৮ সালের ১৩ই আগস্ট রামবাগান দত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ঈশানচন্দ্র দত্ত ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। রামবাগান দত্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নীলমণি দত্ত। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের যুগে তিনি বিশিষ্ট ইংরেজী-নবীশ বলে পরিচিত ছিলেন। নীলমণির জ্যেষ্ঠপুত্র সংস্কৃত কলেজের প্রথম কর্মাধ্যক্ষ। নীলমণির পৌত্র ছিলেন ঈশানচন্দ্রের মধ্যমপুত্র রমেশচন্দ্র।

রমেশচন্দ্রের বাল্যকালে ভারত-ইতিহাসের কয়েকটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। যেমন, ভারতের পূর্বাঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহ, রেলপথ বিস্তার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৮৫৭) এবং বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শাসন পরিচালনা গ্রহণ, নীলবিদ্রোহ ইত্যাদি। পিতার সঙ্গে নানাস্থানে ঘুরতে হতো বলে প্রথমে তিনি কুমারখালী এবং পরে বহরমপুরে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল অর্থাৎ বর্তমান হেয়ার স্কুল থেকে ১৮৬৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষায় প্রথম হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি এফ. এ. ও বি. এ. পড়েন। ১৮৬৮ সালে শ্রীবিহারীলাল গুপ্ত ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই জাহাজে ইংলণ্ড যান। ১৮৬৯-এ ভারতীয় সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন এবং ১৮৭১ সনে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফেরেন। সে বছরই তিনি প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এমন কি প্রশাসক হিসাবে তাঁর সহানুভূতি কোন দিকে ছিল তার প্রমাণ মিলবে পাবনার কৃষক বিদ্রোহের সময়। এই তরুণ সিভিলিয়ান পাবনার কৃষক বিদ্রোহে (১৮৭৩) বিদ্রোহী চাষীদের পক্ষেই সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। তিনি ঐ বিদ্রোহে রায়তের অধিকার বোধের উজ্জীবন লক্ষ্য করেছিলেন। অবশ্য তিনি এ উজ্জীবন বৃটিশ শাসনের গুণেই সংঘটিত হয়েছিল বলে ধরে নিয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য প্রশাসক হিসেবে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মব্যপদেশে অবস্থানের ফলে প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশের সামাজিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন দেখার তাঁর সুযোগ ঘটে যায়। ছাব্বিশ বছর এক নাগাড়ে সরকারী কাজ করে স্বেচ্ছায় যখন তিনি অবসর নিলেন, তখন তাঁর পঠন-পাঠন ও অভিজ্ঞতার দিগন্ত বিপুলভাবে প্রসারিত হয়ে গেছে।

ভারত-ইতিহাসে গোটা উনিশ শতক জুড়ে যে গুরুত্বপূর্ণ পালাবদল ঘটছিল, তার মূল্যায়ন করার ব্যাপারে রমেশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করার মতো। এশিয়া-মহাদেশে ইংরেজ যে বিশাল সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করেছিল, তাতে ধ্বংসমূলক দিকগুলি যতটা প্রত্যক্ষ ছিল, উজ্জীবনমূলক দিকগুলি ততখানি প্রথমে নজরে আসেনি। তবু সেই বিপ্লব সংঘটনে ইতিহাসের 'অচেতন যন্ত্র' ইংলণ্ড এ দেশে জন্ম দিয়েছিল ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য, স্বাধীন সংবাদ পত্র, ব্যক্তিগত মালিকানা ও সরকার। পরিচালনার যোগ্যতা সম্পন্ন ও ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব এই উজ্জীবনের সর্ত হিসেবে লক্ষ্য করার মতো ছিল। তাছাড়া বাষ্পীয় রেলযানের পথ ধরে আগন্তুক শ্রম-শিল্পোৎপাদন গোটা দেশটাকে আধুনিকীকরণের পথে নিয়ে যাবে—এমন সম্ভাবনার দিকটাও উজ্জীবনের ক্ষেত্রে উৎপাদনশক্তি বিকাশের বিশিষ্ট দিক বলে চিহ্নিত হবার যোগ্য। রমেশচন্দ্র মার্কস-কথিত এই উজ্জীবনের অনেকগুলি লক্ষণই ধরতে পেরেছিলেন। অবশ্য রেলপথকে তিনি সেচ বিস্তারের প্রতিবন্ধক মনে করেছিলেন। কৃষি-উজ্জীবনই তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারই সঙ্গে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন রাষ্ট্রশাসনে দেশবাসীদের কথঞ্চিৎ অধিকার। জাতীয় উজ্জীবনের প্রয়োজনবোধে তিনি মর্যাদা দিয়েছিলেন ইংরেজী শিক্ষাকে। কৃষি উজ্জীবনের প্রয়োজনে তাঁর কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আশীর্বাদ স্বরূপ মনে হয়েছিল। তাই রায়তের অধিকার নিয়ে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে তিনি এত বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

রমেশচন্দ্র প্রসঙ্গান্তরে ইংরেজ শাসনের বিস্তারের যুগে, বিশেষ ভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাব বিষয়ে মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন। যেমন "পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবল তরঙ্গ দেশে বহিতে লাগিল, তাহাতে সুফলও ফলিল, কুফলও ফলিল। সমাজে কতকটা বিশৃঙ্খলা হইল। বিদেশীয় আচারের অনুকরণেচ্ছা প্রবল হইল, আবার তাহার সঙ্গে স্বদেশহিতৈষণা হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। বিদেশীয় শাস্ত্রে শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল, এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গে স্বদেশী কথা জানিবার ইচ্ছাও ফলবতী হইল।...কিন্তু এই পরস্পর প্রতিঘাতী

উর্মিরাশির মধ্যে জাতীয় চিন্তা ও জাতীয় বল জাতীয় হৃদয় ও জাতীয় উত্তম গঠিত ও স্থিরীকৃত হইল।" 'রমেশচন্দ্র দত্ত পাশ্চাত্ত্য ভাব পরিমণ্ডলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি পরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন ভারতে নব জীবনবোধের উজ্জীবনপ্রার্থী। ভারত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত, ভারতীয় জনগণের আত্মবোধ জন্মানো কঠিন বিবেচনা করে সব্যসাচীর মতো তিনি প্রাচীন ধর্ম-সাহিত্য, ইতিহাস সব কিছুরই চর্চা শুরু করেন। অবশ্য রিভাইভালিস্টের মন নিয়ে নয়, আধুনিকতার স্বকীয়তায় সেই ইতিবৃত্তের মধ্যে শিকড় অন্বেষণই ছিল তাঁর মহৎ সাধনা। অতীতের ভস্ম-অবশেষ নয়, বরং যে অগ্নি তখনও জ্বলছিল, তারই সঙ্গে তিনি স্বদেশবাসী ও বিশ্ববাসীকে পরিচিত করাতে চেয়েছিলেন। এই উপমহাদেশের মহান ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। যেমন ১৮৭৩ সালে পাবনার কৃষক বিদ্রোহ তাঁকে The Peasantry of Bengal (১৮৭৪) রচনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং তাতে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক হয়েও লিখেছিলেন "জমিদাররা এখনও এক অনির্দিষ্ট পরিসীমা পর্যন্ত তাদের প্রজাদের উৎপীড়ন, অত্যাচার এবং পথের ভিখারী করার ক্ষমতা রাখে যার প্রতিকারে আইনের কোনো বিধান নেই", তেমনি ঐ একই বছরে লিখেছিলেন রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মহামতি আকবরের রাজস্ব-সচিব টোডরমল কর্তৃক বঙ্গদেশে ভূস্বামীদের হৃদয় জয়ের কাহিনী 'বঙ্গবিজেতা'। পরপর প্রকাশিত হলো মাধবী-কঙ্কন (১৮৭৭), The Literature of Bengal, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত (১৮৭৮), রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৮৯), সংসার (১৮৮৬) ও সমাজ (১৮৯৪)। তাছাড়া তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ এবং ঋগ্বেদের বাংলা অনুবাদের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। আমাদের বক্ষ্যমান গ্রন্থ ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) (১৭৫৭-১৮৩৭) লণ্ডনে ১৯০২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

এক

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতে ইংরেজ শক্তির অভ্যুদয় (১৭৫৭) থেকে রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের বছর (১৮৩৭) পর্যন্ত নানা ঘটনা বিবৃত করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি নিম্নরূপ।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬১ পর্যন্ত বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উইলিয়ম পিট। এই পাঁচ বছরের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের সূচনা হয়। ভারতের অর্থনৈতিক

ইতিহাসের প্রথম খণ্ড এই ১৭৫৭ সাল থেকে শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে ১৮৩৭ সালে। ঐ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া বৃটিশ যুক্তরাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই আশি বছরে (১৭৫৭-১৮৩৭) তিন প্রজন্মের বৃটিশ শাসকেরা ভারত শাসন করেছেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। প্রথম যুগ ছিল ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের যুগ—অর্থাৎ একটি সওদাগরী কোম্পানির রাজতক্তে বসবার যুগ। দ্বিতীয় যুগ ছিল মহীশূর ও মারাঠা শক্তিকে পর্যুদস্ত করে ভারতে বৃটিশ-শাসন নিষ্কণ্টক করার যুগ। অর্থাৎ কর্ণওয়ালিস, ওয়েলেসলী ও লর্ড হেস্টিংসের যুগ। তৃতীয় যুগ হলো বৃটিশ সাম্রাজ্য শক্ত ভিতের উপরে গড়ে তোলবার যুগ। অর্থাৎ মুনরো, এলফিনস্টোন ও বেণ্টিঙ্কের যুগ। (প্রথম অধ্যায়)

অষ্টাদশ শতকে ভারতে স্থল বা নদীপথে বাণিজ্য শুল্ক স্থল-শুল্কের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৃটিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাদশাহের সনদ বলে নিঃশুল্ক ব্যবসায় করতো। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পরে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তো বটেই, ব্যক্তিগত ভাবে কোম্পানির কর্মচারীরাও সে সুযোগ গ্রহণ করেন। কোম্পানির কর্মচারীরা নবাবের শাসন অগ্রাহ্য করতো। মীরকাশিম দেশী ব্যবসায়ীদের স্থল-শুল্কও রদ করে দেন। বৃটিশ কর্মচারীদের জবরদস্তি, শোষণ ও লুণ্ঠনের মৃগয়া রক্ষার জন্য মীরকাশিমের বিরুদ্ধে কোম্পানি যুদ্ধে নেমে পড়ে। এবং মীরকাশিমকে পরাস্ত করে পুনরায় মীরজাফরকে তারা নবাবী মসনদে বসায়। মীরজাফর, মীরকাশিম, পুনরায় মীরজাফরকে গদিতে বসানোর জন্য কোম্পানি তো বটেই কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মচারীরাও প্রতিদানে প্রচুর অর্থ উপঢৌকন পায়। (১৭৫৭-৬৫, দ্বিতীয় অধ্যায়)

১৭৬৫ সালে কোম্পানি বঙ্গদেশের রাজস্ব সংগ্রহের জন্য পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের বাদশাহের কাছ থেকে দেওয়ানী পদটি লাভ করলেন। শুরু হলো দ্বৈত শাসন। কোম্পানি ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের অধিকারী, নবাব প্রশাসনের। তার উপরে যুক্ত হল ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির কর্মচারীদের নিঃশুল্ক ব্যবসায়—যে ব্যবসা আসলে জোর করে কারিগরদের দিয়ে নামমাত্র মজুরিতে কাজ করিয়ে নিয়ে একচেটিয়াভাবে বিপণনের অধিকার মাত্র। ফলে দেশে উৎপীড়ন বেড়ে চলল। ইংরেজ কোম্পানির দেশী-বিদেশী কর্মচারীদের রাজস্ব সংগ্রহের অত্যাচার, এবং হঠাৎ বড়লোক হবার ঝোঁক দেশবাসীদের উপর প্রবল উৎপীড়ন চাপিয়ে দেয়। এ-সবের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ১৭৬৯-এ দেখা দিল। বৃটিশ কোম্পানি এ-ভাবে উপার্জিত অর্থে এ-দেশে মাল কিনে ইয়োরোপে বিক্রী

করতো, চীনে বাণিজ্য করতো। এইভাবে মাল কেনার নাম ছিল 'লগ্নী'। শুরু হলো সম্পদের নিকাশ। (১৭৬৫-৭২, তৃতীয় অধ্যায়)

বৃটিশ আধিপত্যের আগে "রাষ্ট্র ছিল রাজস্ব পাবার অধিকারী: জমিদাররা ছিলেন প্রথাগত খাজনা পাবার অধিকারী, রাষ্ট্রকে তাঁরা একটা রাজস্ব দিতেন, জমিদারদের প্রথাগত খাজনাপ্রদান সাপেক্ষে রায়তদের ছিল তাদের জোতের উপর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার"। কিন্তু দ্রুত ভূমি রাজস্ব লুণ্ঠন করে ফুলে ফেঁপে ওঠার তাগিদে কোম্পানি প্রথমে ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য এক জমি বন্দোবস্ত করে (১৭৭২)। নিলামে তুলে দেওয়া হলো জমিদারী। যে যত বেশী দর দিতো সেই হতো চাষীর কাছে খাজনা পাবার ইজারাদার। ফলে "প্রাচীন ভূস্বামী পরিবারগুলি ধ্বংস হয়ে যায়, চাষীরা মর্মান্তিকভাবে নিপীড়িত হতে থাকে।" এরপর এলো বার্ষিক বন্দোবস্ত। দেশ আর্থনীতিক নিপীড়নে আর্তনাদ করতে থাকে।

এ সময়েই জেলায় জেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত বসানো হয়। কলকাতায় গঠিত হয় উচ্চতর আদালত। পুলিশি ব্যবস্থার রদবদল করা হয়। ১৮৮১ সালে দেওয়ানী জজদের ও কালেক্টরদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হল। ছলচাতুরি ও জবরদস্তির সহায়তা নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস অযোধ্যা ও বারাণসী গ্রাস করলেন। দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অবশ্য তিনি কিছু কিছু প্রশাসনিক উন্নতি সাধন করেছিলেন। (১৭৭৫-৮৫, চতুর্থ অধ্যায়)

কর্ণওয়ালিসের সময় নবাবের হাত থেকে ফৌজদারী বিভাগ কোম্পানি নিয়ে নেয়। ১৭৭৬ সালেই ফিলিপ ফ্রান্সিস চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের সুপারিশ করেন। তা কার্যকরী করলেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। এবং 'অনিশ্চিত ও ক্রমবর্ধমান এক রাষ্ট্রীয় চাহিদার দ্বারা জনগণকে পঙ্গু করার পরিবর্তে জনগণকে তাঁদের নিজেদের শ্রমের দ্বারা লাভবান হতে দেওয়ার জন্য…এই কাজটি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। অবশ্য ভূমিকর যথাসম্ভব কঠোর করা হয়েছিল"। এই ভূমিকর নির্ধারিত হয়েছিল খাজনার ৯০ শতাংশ হারে। (১৭৮৫-৯৩, পঞ্চম অধ্যায়)

ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে বিশ বৎসর যাবৎ যুদ্ধের ১৭৬৩ সালে পরিসমাপ্তির পর দেখা গেল দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের অধিকারই পুরো দস্তুর বজায় আছে ও শক্তিশালী হয়েছে। ইংরেজরা মহম্মদ আলীকে কর্ণাটকের নবাব বানালো। এই অপদার্থ নবাবের সামরিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইংরেজরা বেশ মোটা টাকা পেত। কর্ণাটকের চাষীর সম্পদ একে একে চলে গেল ইংরেজ পাওনাদারদের হাতে। ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন ইংরেজ বিপুল সম্পত্তির কার্যত মালিক হয়ে

বসে। তাঞ্জোর রাজ্য ঐ নবাবের অধীনে চলে যাবার পর, সেখানেও চললো নবাবের লুণ্ঠন ইংরেজ পাওনাদারদের তুষ্ট করার জন্য। সমৃদ্ধিশালী তাঞ্জোর হয়ে গেল ঊষর। এর সঙ্গে যুক্ত হলো হায়দার আলীর আক্রমণ। ১৭৮৩ সালে এ-সবের ফলে মাদ্রাজে দেখা দিল চরম দুর্ভিক্ষ। এ-দেশে লুণ্ঠনের টাকায় বৃটিশ পার্লামেন্টে একটি প্রভাবশালী অংশ সৃষ্টি হল। অবৈধ ও জাল ঋণের দায়ে দেশ সম্পদ শূন্য হল। (১৭৬৩-৮৫, ষষ্ঠ অধ্যায়)

'উত্তর সরকার' অঞ্চলে ছিল জমিদারী ও খাস (হাবেলি) জমি। গ্রাম পরিচালনায় এতদিন ছিল 'গ্রামসমাজ'। প্রথমে ১৭৭৮-এর আগে এ অঞ্চলে বাৎসরিক বন্দোবস্তে জমি জমিদারদের দেওয়া হতো। তারপর ১৭৭৮ থেকে পাঁচ বছরের মেয়াদে। ১৭৮৮ থেকে গুণ্টুরেও একই নিয়ম চালু হলো। ১৮০২ থেকে ১৮০৪ এ এতদঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হয়। ১৭৯২ সালে শ্রীরঙ্গপত্তনমের সন্ধি মারফত বড়মহলের অন্তর্গত সালেম ও কৃষ্ণগিরি কোম্পানির অধিকারে আসে। ১৭৯৯ সালে এলো কানাড়া, কোয়েম্বাটুর, বালাঘাট ও আরও কয়েকটি অঞ্চল।

১৭৯৯-এ তাঞ্জোর এবং ১৮০০ সালে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্তী অঞ্চল ইংরেজের অধিকারে আসে। আর্কটও দখল হয়। এ-ভাবে ১৭৯২ থেকে ১৮০২-এর মধ্যে বিপুল অঞ্চল কোম্পানির শাসনের আওতায় আসে। এই সব অঞ্চল নিয়েই গড়ে ওঠে মাদ্রাজ প্রদেশ। মাদ্রাজ অঞ্চলে রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত চালু করেন লর্ড টমাস মুনরো। "রায়তোয়ারি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল খাজনার আকারে জমি যতটা উৎপাদন করতে পারে সরকারের জন্য তা আদায় করা"। (১৭৮৫-১৮০৭, সপ্তম অধ্যায়)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বনাম রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত নিয়ে মাদ্রাজে বিতর্ক দেখা দেয়। মুনরোও ১৮০৭ সালে দেশে ফেরার সময় স্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষেই মত দিয়ে যান। ১৮১৪-এ তিনি ভারতে আসেন। ১৮১৯-এ আবার দেশে ফিরে যান। তৃতীয়বার তিনি যখন ফিরে আসেন, তখন গ্রাম-সমাজ ভিত্তিক বন্দোবস্তও চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। তবে রায়তোয়ারি বন্দোবস্তে রাজস্ব স্থায়ী করার জন্য সুপারিশ করা সত্ত্বেও ১৮৬২ পর্যন্ত এই স্থায়িত্বের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া হয়। (১৮০৭-২০, অষ্টম অধ্যায়)

স্যর টমাস মুনরো শেষবারের মতো ভারতে আসেন ১৮২০ সালে, মাদ্রাজের গভর্নর হয়ে। তখন 'বকেয়া উপলক্ষে, বা ক্রয়ের সাহায্যে জমিদারী ও মুটাগুলি, এবং অন্য যে সমস্ত দখলী স্বত্বে রায়তোয়ারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে সেগুলিকে

ফিরে পাওয়ার সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করা হয় এবং গ্রামের ইজারা দ্রুত পরিত্যাগ করা হয়'। কালেক্টরদের প্রজাদের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে চুক্তিবদ্ধ হতে উৎসাহ দেওয়া হয়। করের পরিমাণ কিছুটা লাঘবও করা হয়। নেলোর, ত্রিচিনোপল্লী, কোয়েম্বাটুর, তাঞ্জোর, আরকট প্রভৃতিস্থানের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় মুনরোর কর-হ্রাসের নীতির আগে সে অঞ্চলে ছিল অতিমাত্রায় ভূমিরাজস্বের কায়দায় শোষণ। মুনরোর মতে, খাস জমি বাদে জমির প্রকৃত মালিক রায়তই। প্রশাসনিক কাজে ভারতীয়দের নিয়োগ তিনি নীতিগত কারণে ও রাজনীতিগত কারণে সুপারিশ করেন। কর আরোপ ও আইন প্রণয়নের ব্যাপারেও 'দেশীয় কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠানের' উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এমন-কি তিনি এ-দেশে ভূমিস্বত্বভোগী একটি অবস্থাপন্ন শ্রেণী উদ্ভবের পক্ষে যুক্তি দেখান (১৮২০-২৭ নবম অধ্যায়)

১৭৯৩ সালে বঙ্গদেশে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছিল, কর্ণওয়ালিস ও শোর বারাণসী পর্যন্ত তার বিস্তার চেয়েছিলেন। ১৭৯৪ সালে বারাণসীর রাজা বিরাট অঞ্চল ইংরেজ কোম্পানির কাছে হস্তান্তরিত করেন। ১৭৯৫ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর ছ বছরের পরে অযোধ্যার নবাব এলাহাবাদসহ অন্য জেলাগুলিকে ইংরেজের হাতে তুলে দেন। ভয় দেখিয়ে ওয়েলেসলী এ-সব জেলা গ্রাস করলেন। ১৮০৩ সালে লাসওয়ারীর যুদ্ধে মারাঠাদের হারিয়ে ইংরেজরা গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল দখল করে। অযোধ্যার নবাবের কাছে ছিনিয়ে নেওয়া হস্তান্তরিত জেলাগুলি এবং এই বিজিত প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হলো ১৮০৩-এ বুন্দেলখণ্ড ও কটক। ভূমি-রাজস্ব তুলে নেওয়া হলো বিপুল পরিমাণ বাৎসরিক, ত্রৈবার্ষিক ও চতুর্বার্ষিক বন্দোবস্তের কায়দায়। ঐ সব অঞ্চলে রায়তদের সামনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের টোপ ফেলেও শেষ পর্যন্ত কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তা স্থায়ী করল না। (১৭৯৫-১৮১৫, দশম অধ্যায়)

গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস কোর্ট অব ডিরেক্টর্স-এর কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার জন্য চূড়ান্ত আবেদন করেন। তা নাকচ করে দেওয়া হয়। বোর্ডের তৎকালীন সেক্রেটারি হোল্ট ম্যাকেঞ্জি ১৮১৯ সালের বিখ্যাত মিনিটে উত্তর-ভারতে গ্রামসমাজের অস্তিত্বের কথা বলেন। ১৮২১ সালে ম্যাকেঞ্জির মিনিটকে ভিত্তি করে ভাবা হয় যে, যেখানে জমিদার আছে সেখানে তার সঙ্গে, আর যেখানে গ্রামসমাজ আছে সেখানে গ্রামের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হবে। "একটি একটি করে বিভিন্নগ্রামে ও ভূ-সম্পত্তির এলাকায় এবং ভারতীয় ভাষায়

ভূ-সম্পত্তির এলাকাকে যেহেতু 'মহল' বলে, সেই জন্য উত্তর ভারতে যে-বন্দোবস্ত হয়, তা মহলওয়ারি বন্দোবস্ত নামে পরিচিত।" এ বন্দোবস্তও চিরস্থায়ী হল না। ১৮৩৩-এ বেন্টিঙ্ক এ ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ রদ বদল ঘটান। (১৮১৫-২২, একাদশ অধ্যায়)

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮০০ সালে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী জনসাধারণের অবস্থা এবং তাদের কৃষি ও পণ্য উৎপাদন সম্পর্কে অর্থনৈতিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে দক্ষিণভারত ভ্রমণের জন্য মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ ফ্রান্সিস বুকানানকে নির্দেশ দেন। ডাঃ বুকানান মাদ্রাজ অঞ্চল থেকে ভ্রমণ শুরু করে কর্ণাটক, মহীশূর, কোয়েম্বাটুর, মালাবার ও কানাড়া পর্যন্ত যান। তাঁর রোজনামচাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সমস্ত জায়গায় চরম দারিদ্র্য দেখেছিলেন। ভূমি-রাজস্বের অত্যধিক চাপ, স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজ থেকে সরকারের সরে আসা এবং ঘনঘন যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে প্রবল দারিদ্র্য বিরাজ করছিল একদা সম্পদশালিনী দক্ষিণভারতের ঐ অঞ্চলগুলিতে। (১৮০০, দ্বাদশ অধ্যায়)

ডাঃ বুকানান সাত বছর (১৮০৮-১৮১৫) ধরে বঙ্গদেশ ও উত্তর ভারতের জেলাগুলি ভ্রমণ করেন। পাটনা শহর ও বিহার জেলা ভ্রমণ করার সময় তিনি ধানকেই উল্লেখযোগ্য ফসল হিসেবে দেখেছিলেন। গম-যব ছাড়া সমস্ত প্রকার ডাল ও অন্যান্য শাকসব্জি উৎপন্ন হতো। আলু-আখ-তামাক-পান-নীল ও কুসুমের চাষ ছিল। জমির মালিক খাজনা পেত খরচ-খরচার উপরে উদ্বৃত্তের অর্ধেক। কিন্তু জমির সেচব্যবস্থা জমিদারদেরই দেখতে হতো। সুতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন ছিল গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় শিল্প। তাছাড়া ছিল কাগজ উৎপাদন, চামড়ার কাজ, লৌহদ্রব্য, সোনা ও রূপার কাজ, পাথর, মৃৎ পাত্র, রাজমিস্ত্রীর কাজ, চুন উৎপাদন, কাপড় রাঙানো, কম্বল তৈরী, সোনা ও রূপার জরির কাজ ইত্যাদি। বাণিজ্য চালাতো বলদিয়া ব্যাপারিরা। পাটনা থেকে মাল চালান যেত কলকাতায় নৌকায়। সাহাবাদ জেলায় ধান উৎপাদন হতো বেশী। তাছাড়া ছিল তাঁতের কাজ। জমিদারদের ঘাড়ে রাজস্বের চাপ ছিল অত্যন্ত বেশী রকম। কাগজ, গন্ধদ্রব্য, তেল, লবণ, মদ তৈরী হতো সাহাবাদে। আতিথেয়তা লক্ষণীয়ভাবে ছিল। ভাগলপুর জেলায় শস্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য ছিল ধান। অন্যান্য চাষও ছিল। তাছাড়া হতো তুলোর চাষ। সেচব্যবস্থা পরিচালনা করতো জমিদারেরা, খাজনা ছিল প্রায় ৫০ শতাংশ। সুতো কাটা ছিল ব্যাপকভাবে। সুতোকাটুনির সংখ্যাও ছিল অনেক। বেলোয়ারি চুড়ি, চামড়া পাকা করার কাজ, লোহার কাজ প্রভৃতি নানা ধরনের শিল্পকর্ম ছিল। এখানেও বলদিয়া

ব্যাপারিরাই মুখ্যত সওদাগর ছিল। গোরক্ষপুর জেলায় গম ছিল উল্লেখযোগ্য শস্য। তা ছাড়া ছিল নানা শুঁটিজাতীয় কৃষি উৎপাদন। সেচের ব্যবস্থা ছিল। বুকানানের মতে সুজা-উদ-দৌলার শাসন কালে এ-জেলার অবস্থা আরো ভালো ছিল। সুতোর কাজ এ অঞ্চলে ছিল বেশী পরিমাণে। অন্যান্য আবশ্যিক শিল্পকর্মও ছিল। টাকার ব্যবহারও চালু ছিল। দিনাজপুর জেলায় ধানই ছিল মুখ্য শস্য। গ্রীষ্মকালীন ফলের বাগিচা ছিল। পাট, তুলো, আখ উৎপন্ন হতো। নীল ও লোধ্রের চাষ ছিল। রেশমকীটের চাষও ছিল। সেচের ব্যবস্থা ছিল না। সুতোকাটাই ছিল প্রধানতম শিল্পোৎপাদন। মালদাই বস্ত্র ও পাটের বস্ত্র তৈরী হতো। চিকনের কাজ করতো মালদহের মুসলিম মহিলারা। রং-এর ব্যাপক রপ্তানি ছিল। ইংরেজ প্লান্টারদের অত্যাচার ছিল অপরিসীম। বাণিজ্যের অধিকাংশটাই চলে গিয়েছিল বিদেশীদের হাতে। পূর্ণিয়ায় ধান, পাট প্রভৃতির চাষ ছিল। নীলের কারখানা ছিল অনেকগুলি। রেশমের বস্ত্রও তৈরী হতো। সতরঞ্জি ও ফিতাও বোনা হতো। হিসেব নিকেশ করে দেখা যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাক্ষিণ্যে এতদঞ্চলে দক্ষিণের অঞ্চলগুলির মতো উৎপীড়ন-মূলক চাপ এসে পড়েনি। ফলে পতিত জমির উন্নতি ও পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। তবে খারাপ অবস্থার দিকে চলে যায় এ-সব অঞ্চলের শিল্প ও কারবার। (১৮০৮-১৫, ত্রয়োদশ অধ্যায়)

ইংরেজকুঠি রেশমের একচেটিয়া উৎপাদনের অধিকারী হয়ে পড়ে বলে দেশী কারবার গুটিয়ে যেতে থাকে। ফলে রপ্তানিকারী দেশ ভারত হয়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে আমদানিকারী। আসলে লক্ষ্য ছিল কিভাবে ইয়োরোপীয় শিল্প সামগ্রী ভারতীয় শিল্প সামগ্রীর স্থানে প্রতিস্থাপন করা যায়, এবং কি ভাবেই বা ভারতীয় শিল্পের বিরুদ্ধাচরণ করে বৃটিশ শিল্পসমূহের উন্নতিবিধান করা যায়। (১৭৯৩-১৮১৩, চতুর্দশ অধ্যায়)

ভারতীয় শিল্পবিকাশের জন্য কোনো প্রচেষ্টা হয়নি। একদিকে অসম প্রতিযোগিতা, অন্য দিকে নানা ধরনের চাপ শিল্পগুলিকে গুঁড়িয়ে দিতে থাকে। ক্রমশ প্রশ্ন উঠতে থাকে ভারতে বাণিজ্যের অধিকার কেবল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরই একচেটিয়া থাকবে কিনা। এক কথায় ভারতীয় শিল্পগুলির বিলুপ্তিই তখন বৃটিশ পুঁজিপতিদের আকাঙ্ক্ষিত হয়ে পড়েছে। আর এ-দেশে গড়েও উঠছিল একটি শ্রেণী যাদের "ইংরেজী বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত হবার একটা লক্ষণীয় প্রবণতা দেখা গেছে; তাদের সুসজ্জিত গৃহ আছে, অনেকেই ঘড়ি পরে, তারা গাড়ি চড়তে ভালবাসে এবং শোনা যায় মদ্যপানও করে থাকে।" (১৮১৩-৩৫, পঞ্চদশ অধ্যায়)

১৮১৩ সালে একটি আইনে বলা হয় কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যগত হিসাব থেকে আঞ্চলিক হিসাব পৃথক করতে হবে। অর্থাৎ আঞ্চলিক হিসাবে থাকবে রাজস্ব প্রয়োগের জন্য। সামরিক ব্যয়, অসামরিক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ব্যয় এবং ভারতীয় ঋণবাবদ সুদ পরিশোধের কাজে। আর ব্যবসা-বাণিজ্যগত মুনাফা ব্যবহার হবে হুণ্ডি পরিশোধ ও অন্যান্য চলতি ঋণের পরিশোধে, ডিভিডেণ্ড প্রদানে, এবং ভারতীয় ঋণ হ্রাসের কাজে; এই আঞ্চলিক রাজস্ব ব্যয়ের নামে মোটা টাকা হোমচার্জ বাবদ চলে যেত ইংলণ্ডে। তাতেও ঘাটতি হতো বলে আঞ্চলিক হিসাব বেড়ে যেতে থাকে। যুদ্ধ চালাবার হিসাবের খাতে আরও অনেক ঋণের দরকার হয়ে পড়ে। হোম বণ্ড শোধ করার নামে উদ্বৃত্ত বাণিজ্যিক মুনাফা চলে যেত ইংলণ্ডে। সাম্রাজ্যের বিস্তার আর কোম্পানির পতনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত বাণিজ্যিক মুনাফা হ্রাস পেতে থাকে। কোম্পানি সামরিক সামগ্রী ছাড়া ভারতের জন্য ইংলণ্ড থেকে অন্য দ্রব্য রপ্তানি বন্ধ করল। ভারত থেকে ইংলণ্ডে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মারফত আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেই এমনটি ঘটল। ইংলণ্ডে ভারতীয় দ্রব্যের উপর মারাত্মক হারে শুল্ক বসানো হয়। অন্যদিকে বৃটিশ শিল্প-পতিদের শ্রমশিল্পজাত পণ্য ভারতের বাজার ছেয়ে গেল বৃটেন থেকেই শুরু হলো ভারতে আমদানি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী মারফত। এলো সুতো, পশমী দ্রব্য, তামা, সীসা, লৌহ, কাচ ও মৃৎ পাত্র। 'বৃটিশ পণ্য কলকাতায় আমদানি হত সামান্য ২৫ শতাংশ শুল্ক দিয়ে, আর ইংল্যাণ্ড ভারতের পণ্যের আমদানির উপরে চাপিয়ে দেয় ৪০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক'। শুরু হলো আমদানি আর আমদানি। রপ্তানি হতো খাদ্যশস্য। ইংলণ্ডের শিল্প সংরক্ষণ করে, ভারতের শিল্প চূর্ণ করে, বৃটিশ ব্যবসায়ীরা পরবর্তী কালে ভোল বদল করেন অবাধ বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করে। তখন ভারতীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। (১৮১৩-৩৫, ষোড়শ অধ্যায়)

বৃটিশপূর্ব যুগ থেকেই ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে আপত্তিকর শুল্কচাপ ছিল। ইংরেজ কোম্পানি এর হাত থেকে অব্যাহতি পায়। কিন্তু ব্যক্তিগত ইংরেজ ব্যবসায়ীরাও এর সুযোগ অবৈধভাবে গ্রহণ করে। মীরকাশিম এই শুল্ক-ব্যবস্থা দেশী বিদেশী সব ব্যবসায়ীদের উপর থেকেই তুলে দেন। এ উদারতার মূল্য দিতে হল তাঁর সিংহাসনের বিনিময়ে। ১৭৬৫ সালে দেশের রাজস্বপ্রভু হয়ে বসে ইংরেজ কোম্পানি। মীরকাশিমকে অনুসরণ করা তো দূরের কথা, রাজস্বের যে কোন ছিটেফোঁটার প্রতিও ছিল তাদের লোভ। ফলে মালচলাচলের উপরে চেপে বসলো দুর্বহ শুল্ক ও তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক হয়রানি। এই অনিষ্টকর ব্যবস্থা অব্যাহত ভাবে বেড়ে চলে ৬০ বছর ধরে। ১৮২৪ সালে হোল্ট ম্যাকেঞ্জি কঠোর

ভাষায় এই ব্যবস্থার নিন্দা করেন। তিনি আভ্যন্তরিক শুল্ক তুলে দিয়ে, পশ্চিমাঞ্চলের আমদানিকৃত লবণের উপরে শুল্ক বসিয়ে ও সমুদ্রপথে মালচলাচলের উপর শুল্ক বসিয়ে লোকসান পুরণের সুপারিশ করেন। যেহেতু অন্তঃশুল্ক রদ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিস্তারের সহায়ক এবং অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানগত ও তত্ত্বাবধানগত ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থাবাহী, সেজন্য আখেরে ভালো হবে বলেই তিনি মত দিয়েছিলেন। হোল্ট ম্যাকেঞ্জির কথায় কোম্পানি অবশ্য কর্ণপাত করেন নি। ইংরেজ কোম্পানি "মুখে ভারতের জনগণের বৈষয়িক সুখসমৃদ্ধির জন্য পরম উদ্বেগ প্রকাশ করলেও, সেই সুখসমৃদ্ধির জন্য তাঁরা এক শিলিংও বিসর্জন দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।"

১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভারতে আসেন গভর্ণর জেনারেল হয়ে। তিনি স্যার চার্লস ট্রেভলিয়নকে মালচলাচলের শুল্ক সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করতে বলেন। ট্রেভলিয়ন এই নিপীড়নমূলক শুল্কব্যবস্থা তুলে দেবার পক্ষে মত দেন। ১৮৩৫ সালে ইংলণ্ডে লর্ড এলেনবারো এই রিপোর্ট উদ্ধৃত করে অন্তঃ-শুল্কের খারাপ দিকগুলি তুলে ধরেন কোম্পানির সামনে। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। ১৮৩৬ সালে সমস্ত কাস্টমস হাউস ও নগর শুল্ক তুলে দেন লর্ড বেন্টিঙ্কের পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড। এ ব্যবস্থা অবশ্য কোম্পানির ডিরেক্টরদের মনঃপুত হয়নি। ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে অন্তঃশুল্ক উঠে যেতে থাকে।

সারা ভারতে একই মানের মুদ্রা চালু ছিল না। রৌপ্যমুদ্রা চালু করার প্রস্তাব হয়।

আভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে বাষ্পীয় পোতের আবির্ভাব দাঁড়ি-মাঝিদের বেকার করে দেয়। পশুতে টানা গাড়ির রেলপথ বসালে দেশের টাকা দেশেই থাকতো অনেকখানি। খালপথ ভারতীয় কৃষির উপকার করতে পারতো, কিন্তু তাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে, ভারতের রাজস্ব থেকে সুদের একটা নির্দিষ্ট হারের নিশ্চিতি দিয়ে বাষ্পীয় যানের জন্য রেলপথের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (১৮১৩-৩৫, সপ্তদশ অধ্যায়)

এ-দেশে প্রশাসনিক কাজে অনেক গাফিলতি ধরা পড়ছিল। এই দেশের ভাষা ইয়োরোপীয় বিচারপতিরা কমই বুঝতেন। ভারতীয় পরামর্শদাতাদের দুর্নীতির ফলে বিচার প্রায় নিলামের পর্যায়ে পৌছায়। অর্থাৎ যে টাকা ফেলতো, মামলার রায় তার পক্ষেই যেতো। আর ছিল মামলার নামে নানা হয়রানি। আসলে দরকার ছিল দেশী যোগ্য লোকদের যোগ্য বেতনের মারফত প্রশাসনে যোগ্য স্থান দেওয়া। স্যার হেনরি স্ট্রাচি হিন্দু-মুসলমান স্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়ে

গঠিত বিচারশালার সুপারিশ করেন। তাঁর হিসাবে বঙ্গদেশে বিচারকর্মের জন্য ভারতীয়দের নিযুক্ত করলে ব্যয়িত হবে ইয়োরোপীয় বিচারকদের তুলনায় মাত্র দশভাগের এক ভাগ। ইতিপূর্বে ইয়োরোপীয়রা ভারতীয়দের উপরে জঘন্য আচরণমাত্র করলেও যোগ্য দণ্ড লাভ করতো না। কালেক্টরদের কাছে বিচারের ব্যাপারটা ততো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, যতটা ছিল রাজস্ব আদায়। ১৭৯৩ সালের পর থেকে কালেক্টর, বিচারপতি ও ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার পৃথকীকরণ করা হয়। জমিদারী ব্যবস্থায় অত্যাচারিত কৃষকের কথা যেমন হেনরি স্ট্রাচি বলেছেন, তেমনি তিনি রায়তোয়ারি প্রথায় মাদ্রাজে কৃষকের উপরে অত্যাচারের ঘটনাও লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মাদ্রাজ সরকার কালেক্টরের রাজস্ব আদায়কে প্রশাসনিক অন্যান্য কাজের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব দেবার ফলেই আসে এই বিপত্তি। রায়তোয়ারি ব্যবস্থায় কালেক্টররা যে আসলে এস্টেটের ম্যানেজার মাত্র—বিচারের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা যে পীড়নমূলক হতে বাধ্য, এটা স্যার হেনরির নজর এড়িয়ে যায়নি। তিনি বরং তদারকের কাজের জন্যও ভারতীয়দের নিয়োগই সুপারিশ করেছিলেন। টমাস মুনরোও ভারতে ন্যায়বিচারের জন্য এ-দেশীয় যোগ্য ব্যক্তিদের যোগ্যকাজে ইয়োরোপীয়দের সমকক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করার জন্য সুপারিশ করে-ছিলেন। পঞ্চায়েতী বিচারের তিনি অনুরাগী ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে বৃটিশ প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার ফলে মামলার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। বোম্বাই-এর কর্ণেল ওয়াকার বৃটিশ বিচার ব্যবস্থার ন্যায়পরায়ণতার পক্ষে যুক্তি দেখালেও ভারতীয় বিচারকের হাতেই বিচারবিভাগ ছেড়ে দেবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কোনো পদানত দেশকে যোগ্য ভাবে পরাধীন রাখতে গেলেও ঐদেশী লোকজনের হাতে প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেছিলেন। ভারতীয় কার্যকুশলতা সম্পর্কে ইংরেজদের বিরূপ মনোভাবের জন্য দায়া যে ইংরেজদের নিজেদের স্বার্থভাবনা, তা চমৎকার ভাবে ওয়াকার দেখিয়ে দেন। (১৮১৫-৩৫ অষ্টাদশ অধ্যায়)

স্যার হেনরি স্ট্রাচি, কর্ণেল মুনরো এবং কর্ণেল ওয়াকারের মন্তব্য ইত্যাদি থেকে, ১৮১২ সালে সিলেক্ট কমিটি প্রদত্ত পঞ্চম রিপোর্ট এবং পরিশেষে মুনরো ও ম্যালকমের হাউস অব কমন্সের সম্মুখে সাক্ষ্যদান ইত্যাদি ইংলণ্ডের জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা নেয়। তার ফলে কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্স কর্ণেল মুনরোর সভাপতিত্বে ভারতে প্রশাসনিক উন্নতির জন্য একটি বিশেষ কমিশন গঠন করেন। মাদ্রাজে পৌঁছে দ্রুত কাজ করে তিনি কয়েকটি সুপারিশ করেন : (১) কালেক্টরের হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা থাকবে, গ্রামীণ

শান্তিরক্ষার দায়িত্ব থাকবে গ্রামের প্রধানদের উপরে; (২) গ্রামীণ পঞ্চায়েতের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে; (৩) এ দেশী জেলা জজ অথবা কমিশনারদের নিযুক্ত করতে হবে; (৪) কালেক্টরের হাতে পাট্টাদানের সুযোগ থাকবে; (৫) জমিদারদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হবে; (৬) সীমানা বিরোধ কালেক্টররাই মিটিয়ে দেবেন।

মুনরো মূলত দুটি ঝোঁক দেখিয়েছিলেন। প্রথমত, ভারতীয়দের যথাসম্ভব বিচার-বিভাগে দায়িত্বশীল পদের অধিকারী করা এবং দ্বিতীয়ত তিনি সমস্ত রাজস্বমূলক, শাসনমূলক এবং শান্তিরক্ষামূলক কাজকর্ম, জেলার কালেক্টরের উপরে ন্যস্ত করেন। তাঁর এই দ্বিতীয় ঝোঁক হয়তো ঐ যুগের বিশৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিকই ছিল, কিন্তু কার্যগতিকে তা অপ্রয়োজনীয় ও নিপীড়নমূলক হয়ে ওঠে। মুনরোর গ্রাম-পুলিশের সুপারিশ শেষ পর্যন্ত আর গ্রহণ করা হয়নি। বরং দেশে একটি আলাদা পুলিশ বিভাগ গড়ে ওঠে। গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনও ব্যর্থ হয়। মুনরোর ক্ষমতাকেন্দ্রিকরণ নীতি রাজস্ব কর্মচারীদের পীড়নমূলক যন্ত্রে পর্যবসিত করে। বঙ্গদেশ ও মাদ্রাজ দখলের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ইংরেজদের বোম্বাই অঞ্চল করতলগত হয়। ১৮১৭ সালে শেষ পেশোয়া ইংরেজদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন, এবং তাঁর রাজ্য বৃটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। বোম্বাইতে বৃটিশ প্রশাসন গড়ে তোলার দায়িত্ব পড়ে মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের উপর।

মারাঠাদের সম্পর্কে কার্যব্যপদেশে এলফিনস্টোনের নানা অভিজ্ঞতা হয়। ১৮১৮ সালে তিনি দক্ষিণাপথের কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৮১৯ সালে তিনি বোম্বাইয়ের গভর্ণর হন এবং আট বছর ব্যাপী তাঁর গভর্ণরের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে পশ্চিমভারতে তিনি বৃটিশ শাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। এলফিনস্টোনের উদার শাসনের সাফল্যের ছিল তিনটি চাবিকাঠি, (ক) আইন-কানুন গ্রন্থভুক্তিকরণ, (খ) প্রশাসনমূলক কাজকর্মে ব্যাপকভাবে ভারতীযদের নিয়োগ, এবং (গ) শিক্ষাবিস্তার। এলফিনস্টোন জেরেমি বেন্থামের অনুরাগী ছিলেন। ভারতীয় ইতিহাস ধারার স্বকীয় প্রভাব নয়, বরং ক্রমশই ভারত ইতিহাসে ইয়োরোপীয় ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছিল।

ভারতে স্ব-শাসনের অনুপস্থিতি ভারতকে ইংলণ্ডের উপরে অতিমাত্রায় নির্ভরশীল করে তুলেছিল। অবশ্য মুনরো, এলফিনস্টোন ও বেণ্টিঙ্কের প্রশাসনে এ-দেশী জনগণ অনেকখানি দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়। এলফিনস্টোনের উচ্চশিক্ষার প্রসারমূলক কাজকর্ম কোর্ট অব ডিরেক্টরস পছন্দ করেন নি। এ-দেশী প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনেরও তাঁরা বিরোধিতা করেন। নিম্নশ্রেণীর জনগণের জন্যও এলফিনস্টোন শিক্ষা বিস্তার চান।

ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান-শিক্ষা, নীতি-শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-শিক্ষা তাঁর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতীয় ভাষায় স্বাস্থ্য ও নীতিশিক্ষার গ্রন্থপ্রকাশ এবং ইংরেজী শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে তিনি উদ্যোগী ছিলেন। ১৮২৭ সালে মুনরোর মৃত্যু হয়। এলফিনস্টোনও ঐ বছর ভারত ত্যাগ করেন। তবে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ঐ বছর গভর্ণর জেনারেল হয়ে কার্যভার গ্রহণ করেন। প্রশাসন ও নানা ধরনের রাজকার্যে পূর্ব থেকেই লর্ড বেন্টিঙ্কের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল।

প্রশাসন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বেন্টিঙ্ক মুনরো ও এলফিনস্টোনের পথাবলম্বী ছিলেন। তিনি বিচার বিভাগে সদর-আমিন নামে ভারতীয়দের জন্য পদ সৃষ্টি করেন। ডেপুটি কালেক্টর নামেও ভারতীয়দের জন্য পদসৃষ্টি হয়। উত্তর ভারতে খাজনার তিন-চতুর্থাংশ ছিল ভূমি-রাজস্ব। তিনি তা হ্রাস করে দুই-তৃতীয়াংশ করেন। ১৮৩৩ সালে আর এম বার্ডের কর্তৃত্বাধীনে উত্তর ভারতে নতুন ভূমি-বন্দোবস্ত চালু করা হয়। রাজা রামমোহন রায় বেন্টিঙ্কের সমর্থন লাভ করেন সতীদাহ প্রথা রদ করার কাজে। স্লীম্যান তাঁর আমলেই ঠগদের দমন করেন।

১৮৩৩ সালে কোম্পানির সনদ নবীকরণের সময়, বাণিজ্যকরার কাজ থেকে কোম্পানিকে দায়মুক্ত করা হল। এরপর থেকে তারা কেবলমাত্র এ-দেশ শাসনের দায়বদ্ধ হয়ে রইলেন। গভর্ণর জেনারেলের আইন উপদেষ্টা পদ সৃষ্টি হল। নিযুক্ত হলেন মেকলে। তিনি পেনাল কোড-এর প্রথম খসড়া রচনা করেন। মেটকাফ বেন্টিঙ্কের প্রশাসনধারা অনুসরণ করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেন। ট্রেভলিয়ন অন্তঃশুল্ক রদের ব্যবস্থা করেন। ঘাটতি থেকে সরকারী আয়-ব্যয় বেন্টিঙ্ক উদ্বৃত্তে রূপান্তরিত করেন। মেকলে এদেশে ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করেন। বেন্টিঙ্ক ২০শে মার্চ ১৮৩৫ ভারত ত্যাগ করেন। তাঁর স্বদেশবাসীদের মধ্যে তাঁর নিন্দুকের অভাব ছিল না। বেন্টিঙ্ক নিজ কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে ভারতে ভারতীয়দেরই প্রশাসনে অধিকতর দায়িত্ব দিয়ে দেশশাসনে ভারতবাসীর ভূমিকাকে কার্যকর করার চেষ্টা করেছিলেন। (১৮১৫-৩৫, ঊনবিংশ অধ্যায়)

টমাস মুনরোর থেকে প্রায় বিশ বছর বয়ঃকনিষ্ঠ এলফিনস্টোনের রাজস্ব সংক্রান্ত কাজের ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জনদরদী মন, সাহিত্যরুচি ও সাম্রাজ্যবৃদ্ধিকল্পে উদার রাষ্ট্রনীতিবিদসুলভ ঈপ্সা। পেশোয়ার নিকট থেকে অধিকৃত অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে তাঁর প্রতিবেদনটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিবেদনে তিনি ঐ অঞ্চলের গ্রাম-সমাজের বিশিষ্টতার উপরে যথেষ্ট আলোকপাত

করেন। বিভিন্ন গ্রাম বা উপনগরীতে বিভক্ত দাক্ষিণাত্যের গ্রাম-সমাজগুলিতে রাষ্ট্রের সবগুলি উপাদানই বিরাজিত ছিল। যে-কোন নিকৃষ্ট সরকারের ত্রুটিগুলির ক্ষেত্রে সেগুলি ছিল যেন প্রতিকার-স্বরূপ। গ্রামসমাজের আয়ত্তাধীন সীমানা-চিহ্নিত গ্রামগুলির সংলগ্ন যে জমি ছিল, তাও সীমানাবিভক্ত হয়ে অনেকগুলি ক্ষেতে বিভক্ত হতো। চাষীরা ঐ জমি চাষ করতো। গ্রামে ছিল ব্যবসায়ী ও কারিগর—যারা ঐ চাষীদের চাহিদার যোগান দিত। গ্রামের প্রধানের নাম ছিল পাতিল, পাতিলের অধীনে থাকতো চৌগুল্লা, কুলকার্নি। তাছাড়া ছিল নানা পেশার বারো বলেতি এবং চৌকিদার। পাতিলই হলেন গ্রামের প্রধান। তিনি প্রশাসন, শান্তিরক্ষা ও বিচারের জন্য ছিলেন ভারপ্রাপ্ত। তাছাড়া তিনি রাজস্ব সংগ্রাহক। তিনি সরকার এবং রায়ত—উভয়েরই প্রতিনিধিবিশেষ। রায়তদের বেশ বড় অংশই ছিল পুরুষানুক্রমে জমির মালিক। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব যেমন ছিল তেমন তা ছিল বিক্রয়যোগ্য। জমির মালিক মিরাসদাররা নানা ধরনের খাজনার চাপে দরিদ্র হয়ে পড়ায় নতুন 'উপরি' প্রথার উদ্ভব ঘটে। এলফিনস্টোন রাজস্ব-ইজারা ব্যবস্থার পক্ষাবলম্বী ছিলেন না, তিনি প্রকৃত চাষের উপরে ভিত্তি করে রাজস্ব ধার্যের পক্ষপাতী ছিলেন।

জেলাগুলি মামলাতদারের অধীনে রাখা হতো। বৃটিশ শাসনের ফলে আগেকার অভিজাত ও উচ্চবর্গের মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হলেও এলফিনস্টোন তাদের অবস্থা সুরক্ষার চেষ্টা করেন। মামলাতদার ব্যবস্থা পরিচালিত হলেও তিনি পাতিলদের ক্ষমতা চূর্ণ করতে চাননি। এলফিনস্টোন ধর্মীয় শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজের দোষগুলি দূর করতে চেয়েছিলেন। মারাঠা রাজ্য-শাসন ব্যবস্থায় যে ত্রুটিগুলি ছিল পঞ্চায়েতী স্ব-শাসনে তার অনেকখানিই বিদূরিত হতো। পঞ্চায়েতী বিচার-ব্যবস্থার সুপারিশ করে এলফিনস্টোন বলেছিলেন যে, এ-ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে আদালত-ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেই চলবে। অবশ্য এলফিনস্টোনের পরবর্তী শাসকদের দূরদৃষ্টিহীনতার ফলে পঞ্চায়েতী শাসন বা গ্রামসমাজের শাসন অন্তর্হিত হয়ে যায়।

এলফিনস্টোনের আট বছরের শাসনে ব্রোচ, আহমেদাবাদ, সুরাট, কোঙ্কন, দাক্ষিণাত্য, খান্দেশ, পুণা, আহমেদনগর, ধারওয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে নানা ধরনের ভূমি-বন্দোবস্ত চালু হয়। ব্রোচ অঞ্চলে সাধারণ নীতি ছিল গ্রাম ধরে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ। ফসল বিক্রী করে যে অর্থ পাওয়া যেত তার অর্ধেক নিয়ে বাকিটা রায়তের হাতে ছেড়ে দেওয়াটাই ছিল নীতি। আহমেদাবাদে গ্রাম ইজারা দেওয়া হতো। সুরাটে ভূমি-রাজস্ব অত্যন্ত গুরুভার হয়। কোঙ্কনে

এলফিনস্টোনের ইচ্ছা ছিল "সরকারের দাবী মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশে নির্দিষ্ট করা হোক, এবং নিকৃষ্ট ধরনের জমিতে তা নির্দিষ্ট করা হোক কম আনুপাতিক হারে। নির্ধারণের হার চিরস্থায়ী না করে বারো বছরের জন্য বন্দোবস্ত করা হোক।" দক্ষিণ কোঙ্কনে ছিল কুলারগি (খাজনা স্থিরীকৃত) এবং খোটেগি (গ্রামপ্রধান কর্তৃক খাজনার হার পরিবর্তনসাপেক্ষ) গ্রাম। দু-রকম প্রথাও ছিল। ধারেকরী ও আরধেলি। ধারেকরী-প্রজা জমি বন্ধক রাখতে পারতো, খাজনা নিয়মিত দিলে তাকে উচ্ছেদ করা যেত না। আরধেলি-রায়ত তেমন নয়। সে জমি বন্ধক-কবালা করতে পারতো না। সে চষে অন্য মালিকের জমি। এ জমিতে বার্ষিক দায় দেখা যায়। পুণা, আহমেদনগর, খান্দেশ, ধারওয়ার, সাতারা ও দক্ষিণাঞ্চলের জায়গীরগুলিতে মোটামুটি এক ধরনের রায়তোয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

এ-স্থানগুলিতে মিরাসী ব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। অনেকেই ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক মিরাসীব্যবস্থায় অস্তিত্বকে মানতে উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে কার্যত সে অধিকার হরণ করা হয়। এলফিনস্টোন গ্রাম-ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করে রায়তোয়ারি ব্যবস্থা সহনীয় করে তোলার ব্যাপারে অধিক মনস্ক ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি আলাদা রায়তের সঙ্গে ভূমি-বন্দোবস্ত করলে, পাতিলের আর বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকে না। মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ এই দুর্বল অংশটির সুযোগ নিয়ে গ্রাম ব্যবস্থার বিলোপসাধন করে দেন (১৮১৭-২৭, বিংশ অধ্যায়)।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর কাছে লেখা একটি পত্রে উত্তর ভারতে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। সরকার-যে ঐ অঞ্চলে মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব অর্থাৎ খাজনার আশি শতাংশ দাবী করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে তিনি মত দেন। তাছাড়া উত্তর ভারতে গ্রামসমাজগুলির সংরক্ষণের পক্ষেও তিনি মত দিয়েছিলেন। স্যর চার্লস মেটকাফ গ্রাম-সমাজগুলিকে স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্র বলে অভিহিত করেছিলেন—যা কেন্দ্রীয় রাজত্বের পরিবর্তন বা রাষ্ট্রবিপ্লবের দোলাচলের মধ্যেও নিজস্ব বিশিষ্টতার ফলে টিকে ছিল। তিনি গ্রাম-সমাজ সংরক্ষণের পক্ষাবলম্বী হয়ে রায়তোয়ারি বন্দোবস্তের বিরোধিতা করেন। ১৮৩৩-এর ৯নং রেগুলেসনের মধ্য দিয়ে লর্ড বেন্টিঙ্ক উত্তর ভারতের "ভূমিব্যবস্থার নতুন ভিত্তি গড়ে নেন।" এই রেগুলেসন অনুযায়ী বিচার-বিভাগীয় অধিকাংশ মামলাই সেটেলমেণ্ট অফিসারদের আদালত থেকে স্থানান্তরিত করা হয়, উৎপন্ন ফসল ও খাজনার হিসাব সরল করা হয় এবং বিভিন্ন

শ্রেণীর জমির জন্য গড় খাজনার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ক্ষেতের মানচিত্র ও ক্ষেতের রেজিস্টারের সঠিক ব্যবহার এই সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট করা হয়। সরকারের দাবী মোট খাজনার দুই-তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনা হয় এবং বন্দোবস্ত করা হয় ত্রিশ বছরের জন্য। এই বন্দোবস্ত পরিচালনা করার দায়িত্ব পড়েছিল রবার্ট মের্টিনস বার্ড-এর উপর। তাঁর ঝোঁক ছিল 'একটা ন্যায়সঙ্গত ও সহনীয় রাজস্ব নির্ধারণ'। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত অধিকারকে গ্রাম-সমাজগুলির চাষের সঙ্গে সম্পর্কিত করার তিনি প্রচেষ্টা করেন। এই নীতিগুলি মনে রেখে তিনি গোরক্ষপুরে কাজ শুরু করেন। এ ব্যবস্থার স্বপক্ষে বেন্টিঙ্ক-কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় তিনি মানচিত্র রচনা, ভূমিকর নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে তার পদ্ধতির বিশদ বর্ণনা করেন। ভূমি রাজস্ব তার মতে ফসলের এক-দশমাংশের বেশী ছিলনা। মাদ্রাজের ভূমিরাজস্ব অত্যন্ত বেশী বলে তিনি মনে করেছিলেন। বার্ড-এর পর তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করেন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির গভর্ণর জেমস টমাসন। তিনিও রাজস্ব অফিসারদের জন্য নির্দেশাবলী প্রণয়ন করেন। এই নির্দেশাবলী অনুযায়ী অঞ্চলের বসতি সম্পন্ন সমস্ত অংশটাই নির্দিষ্ট সীমানাসহ খণ্ড খণ্ড মহালে ভাগ করা হয়। মহালগুলি বিশ বা ত্রিশ বছরের মেয়াদে বিলি করা হয়। লক্ষ্য থাকে নীট উৎপন্নের উপরে একটা উদ্বৃত্ত রাখা। এই উদ্বৃত্তের লাভের অধিকার পুরুষানুক্রমিক ও হস্তান্তরযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়। তৃতীয়ত একটি মহালের সব মালিকই পৃথক পৃথক ভাবে অথবা একত্রে মহালের উপর সরকার নির্ধারিত বার্ষিক অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী।

মাদ্রাজের ভূমিকর কৃষি-ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছিল; শেষপর্যন্ত লর্ড মুনরো মোট উৎপাদনের অর্ধাংশ থেকে ভূমি-রাজস্ব হ্রাস করেন এক তৃতীয়াংশে। বোম্বাই অঞ্চলেও ভূমি-রাজস্ব অনুরূপভাবে মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশে স্থির করার সুপারিশ করেন চ্যাপলিন। কিন্তু ডিরেক্টররা ভূমি-রাজস্ব হ্রাস নামঞ্জুর করলেন। এ-সময় বিশপ হেবার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন, ১৮২৪, ১৮২৫ ও ১৮২৬ সাল জুড়ে। ভূমিকরের চাপে গোটা ভারত যে পীড়িত হচ্ছিল, তা চমৎকারভাবে তিনি দেখিয়ে দেন। তিনি দেখিয়েছেন, ইংরেজ শাসনাধীনে ভারতীয়দের আর্থনীতিক অবস্থা খারাপ হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ভূমিকরের উচ্চহার সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে গেছেন। লেফটেনান্ট ব্রিগস-এর মতে পুরো ভারতকেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাদের মহাল বলে ধরে নিয়েছিলেন। তিনি দেখালেন, ভারতে আগে ভূমির উপরে রাষ্ট্রের কোন অধিকার ছিল না। জমিতে

ছিল ব্যক্তিগত অধিকার। ভূমিকর আসলে অন্য বিধি; তা যে-কোনো ব্যক্তিগত মালিকানার উপরে কর আরোপেরই মতো। অথচ জমি থেকে উৎপাদনের ব্যাপক পরিমাণটা লুঠ করে নেবার ব্যবস্থা করে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি।

কি হিন্দু, কি মুসলিম—পূর্বতন কোনো শাসন-ব্যবস্থাতেই জনগণের সম্পদ-বৃদ্ধির প্রতিরোধে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সরকার নিজেকে জমির একমাত্র মালিক মনে করে। রাজস্ব আদায়ের জন্য এমন সব কর্মচারীবাহিনী রাখা হয়েছে যারা চাষীর সামান্য উদ্বৃত্তও লুঠ করে নিয়ে যায়। ব্রিগস-এর এই সমালোচনা বোম্বাই-এর রাজস্বনীতি প্রবর্তকদের মনে কোনো রেখাপাত করলো না। ১৮২৪-২৮-এর মধ্যে প্রিঙ্গলে মিথ্যা উৎপাদনের হিসাবের উপরে ভিত্তি করেই মোটা হারে রাজস্ব তোলার ব্যবস্থা করেন। তার ফল হল ভয়াবহ।

শেষ পর্যন্ত এ ব্যবস্থা ত্যাগ করা হল। নতুন করে জমি-জরিপের ব্যবস্থা হয়। এ দায়িত্বে প্রথমে ছিলেন গোল্ডস্মিড। পরে ছিলেন স্যার জর্জ উইনগেট। এই নীতি অনুযায়ী প্রতিটি মাঠের হিসাব আলাদা করে করা হল। জমি ত্রিশ বছরের জন্য লীজ দেওয়া শুরু হয়। ভূমি-রাজস্ব জমির মূল্যের উপরে ঠিক করা হল, জমির তথাকথিত উৎপাদনের উপরে নয় (১৮২৭-৩৫, একবিংশ অধ্যায়)।

খাজনার দুই-তৃতীয়াংশে বেণ্টিঙ্ক রাজস্ব নামিয়ে আনেন। তাতে আশাতীত ফললাভ হয়। লর্ড ডালহৌসী পরবর্তীকালে (১৮৫৫) এই রাজস্ব খাজনার অর্ধেক করে দেন। "এইভাবে অর্ধশতাব্দীব্যাপী ক্রমাগত ভুলভ্রান্তির পর সরকার শেষ পর্যন্ত তার দাবী খাজনার অর্ধেকে সীমাবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।" কিন্তু কাগজে-কলমে ভূমিকর খাজনার অর্ধেক হলেও, শিক্ষা, ডাকঘর প্রভৃতির জন্য অনেকগুলি নতুন কর ধার্য করা হয়। ফলে সরকার নানা কায়দায় খাজনার অর্ধেকের বেশী আত্মসাৎ করতে থাকে (১৮২২-৩৫, দ্বাবিংশ অধ্যায়)।

এ বার আসে এ-দেশ থেকে আর্থিক নিকাশের হিসাব। ১৮৩৩-এ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ বিশ বৎসরের জন্য নবীকরণ করা হল। এই নবীকরণের মধ্য দিয়ে যে অর্থগত বন্দোবস্ত করা হয়—এখন সেগুলির ব্যাপারই বলা হবে। ঐ ১৮৩৩-এর নবীকৃত সনদে বলা হয় যে, সমস্ত সওদাগরী ব্যবসা কোম্পানি বন্ধ করে দেবে। কিন্তু এতদিন ধরে কোম্পানি যে সব ঋণ করেছে তা শোধ দেওয়া হবে কোন উৎস থেকে? ঠিক হল বিভিন্ন "অঞ্চলের রাজস্ব থেকে তা পরিশোধ করা হবে। তা ছাড়া কোম্পানির মালিকদের বৎসরে ১০ পাউণ্ড ১০ শিলিং হারে লভ্যাংশ দেওয়া হবে। মোট ১০০ পাউণ্ড মূলধনের পরিশোধে ২০০

পাউণ্ডের ব্যবস্থা হলেই, পার্লামেণ্ট দায়মুক্ত হয়ে যাবে। এমন কি পুনর্বার নবীকরণের সময় (১৮৫৪) যদি কোম্পানির অস্তিত্ব নাও থাকে তবুও পূর্বোক্ত হার অনুযায়ী উক্ত লভ্যাংশ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হবে।

পৃথিবীর বহু অংশে ইংরেজরা ঘরের টাকা এনে ব্যয় করেছে সেই দেশ দখল করার জন্য। কিন্তু ভারত-অধিকার ও প্রশাসন-পরিচালনা উভয়ই সম্ভব হয়েছিল ভারতীয়দেরই টাকায়। কোম্পানি দেশ দখল করে ভূমি-রাজস্ব থেকে নিয়েছে লভ্যাংশ ও মুনাফা। কোম্পানি যখন ব্যবসায়ের অধিকারী রইল না, তখনও তাদের লভ্যাংশ দিতে হল ভূমি-রাজস্ব থেকে। আবার ১৮৫৮ সালে যখন তাদের অস্তিত্বই আর রইল না, তাদের ঋণকে 'ভারতীয় ঋণ' বলে সাব্যস্ত করা হল। ইংরেজ পার্লামেণ্ট ভারত শাসনের ভার নিলেন বটে কিন্তু তাঁরা কোম্পানির দায় কিনে নিলেন। সে দায় পরিশোধ করা হল ভারতীয়দের রাজস্ব যোগান দিয়ে।

১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিস দেশে ফেরার আগে অর্থব্যবস্থাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে দিয়ে যান যাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ সত্তর লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং ১৫ লক্ষ পাউণ্ড যাতে উদ্বৃত্ত দেখানো যায়। মারকুইস অব ওয়েলেসলীর নীতি ব্যয় পরিমাণকে এককোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ডে তুলে নিয়ে যায়। ঘাটতি দাঁড়ায় বিশ লক্ষ পাউণ্ড। এতে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স বিরক্ত হন। কেননা তাঁরা ভারতে শাসন বা সাম্রাজ্য বিস্তার ইত্যাদিতে উদাসীন ছিলেন। তাদের কাছে সাফল্যের মাপকাঠি ছিল একটাই। আর তা হল অধিকৃত অঞ্চল থেকে সম্পদ আহরণ। ওয়েলেসলীকে তাঁরা অমর্যাদার সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

১৭৯৫ থেকে ১৮১০ পর্যন্ত বঙ্গদেশ কোম্পানির হিসেবে সব সময়েই উদ্বৃত্ত দেখিয়েছে। ঐ একই সময়ে ঘাটতি হয়েছে মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমি থেকে একটা স্থির ও নির্দিষ্ট আয় জুগিয়ে বঙ্গদেশ বৃটিশজাতিকে ভারতীয় সাম্রাজ্য গঠনে সাহায্য করেছিল। সমস্ত উচ্চাশাপূর্ণ যুদ্ধ এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অন্তর্ভুক্তির ব্যয়ভার বঙ্গদেশ বহন করেছে। এই বৎসরগুলিতে মাদ্রাজ ও বোম্বাই নিজেদের প্রশাসনের মোট ব্যয়ের অর্থও দেয়নি। ভারতবর্ষ অধিকারের জন্য গ্রেট বৃটেন কোনো খরচ করেনি"।

১৮১০ থেকে ১৮১৪-এর মধ্যে কোম্পানির উদ্বৃত্ত হয় বার্ষিক বিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড। আবার মার্কুইস অব হেস্টিংস-এর রণং দেহি প্রশাসনে এ উদ্বৃত্ত লুপ্ত হয়। ১৮১৮-এ মারাঠা যুদ্ধ সমাপ্তির পর আবার ঘাটতি দেখা দেয়। ১৮২২-এ অবশ্য বিশ লক্ষ পাউণ্ড আবার উদ্বৃত্ত হয়। বঙ্গদেশের উদ্বৃত্ত, মহারাষ্ট্রের ঘাটতি পূরণ করেও এই উদ্বৃত্ত দেখায়। লর্ড আমহার্স্টের ব্রহ্মযুদ্ধ

এবং ১৮২৪ থেকে ১৮২৭ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার ফলে ক্রমাগত ঘাটতি দেখা যায়। এ-সময়ের ভূমিকরের কড়াকড়ি এবং সাম্রাজ্যবিস্তার ভারতের রাজস্ব বাড়িয়ে তোলে দু-কোটি বিশ লক্ষ পাউণ্ডে। অবশ্য ব্যয় ছিল দু কোটি ত্রিশ-চল্লিশ লাখের মতো। বেণ্টিঙ্কের ব্যয় সঙ্কোচের নীতি, এবং ভূমিকর হ্রাসের নীতি যুক্ত হয়ে উদ্বৃত্তের সৃজন ঘটায়। কেননা "যাঁরা কর দিয়ে থাকেন তাঁদের হাতে যদি কিছুটা কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে ব্যয় স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়।" সে যাই হোক, এই সমস্ত খরচ-খরচা যুগিয়েও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত ছে-চল্লিশ বৎসরে ভারতে একটি মোটা উদ্বৃত্ত গড়ে ওঠে। সব মিলিয়ে নানা সময় ঘাটতি ছিল এককোটি সত্তর লক্ষ। উদ্বৃত্ত ছিল চার কোটি নব্বই লক্ষ! নীট উদ্বৃত্ত হল তিন কোটি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড। এই টাকা অবিরাম প্রবাহ হিসেবে কোম্পানির শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশরূপে বৃটেনে চলে যেতে থাকে। এ-টাকাতেও যখন শেয়ার হোল্ডারদের খাঁই মিটলো না, তখন গড়ে উঠতে লাগলো ভারতের সরকারী ঋণ। করদাতাদের উপরে চেপে বসলো সুদের বোঝা। ১৭৯২-এ সুদ সমেত ভারতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল সত্তর লক্ষ পাউণ্ড। ১৭৯৯-এ তা দাঁড়ালো এক কোটি পাউণ্ডে। ওয়েলেসলীর আমলে এ-ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল দু কোটি দশ লক্ষ থেকে বেড়ে দু-কোটি সত্তর লক্ষে। পরে এ ঋণ দাঁড়ায় তিন কোটি পাউণ্ডে। বেণ্টিঙ্কের সময় তা সামান্য কমে আসে। ভারত যদি নিজ প্রশাসনের ব্যয় গ্রহণ করতো এবং ইংলণ্ড ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য টাকা যোগাতো, তা হলে দুটি জাতিই লাভবান হতো। কিন্তু ভারতে বৃটিশ শাসনের সূচনা থেকেই ভিন্ন নীতি গ্রহণ করা হয়। মণ্টগোমারি মার্টিনের মতে প্রতি বছর ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ডের আর্থিক নিকাশ, ১২ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে ত্রিশ বছরে যা ইংলণ্ডে পাঠিয়েছে তা ভারতকে দরিদ্র করার পক্ষে যথেষ্ট। যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসন লাভ করেন তখন হোমচার্জ ছিল ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড। তাঁর মৃত্যুর সময় তা দাঁড়ায় এক কোটি ষাট লক্ষ পাউণ্ডে। হোমচার্জ বলতে বোঝাতো, ঈস্ট ইণ্ডিয়া স্টকের বার্ষিক লভ্যাংশ, হোম ডেটের উপর সুদ, কর্মচারীদের বেতন, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি চালু রাখার খরচ, স্বদেশে থাকাকালীন ভারতের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের সভ্যদের ছুটি ও অবসরকালীন বেতন, ভারতে চাকুরিরত বৃটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে জড়িত সমস্ত রকমের চার্জ এবং ভারতে ও ভারত থেকে বৃটিশ সেনাবাহিনী নিয়ে আসা ও নিয়ে যাওয়া বাবদ খরচের অংশবিশেষ (১৭৯৩-১৮৩৭, ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়)।

১৮৩৩-এর কোম্পানির সনদ নবীকরণের আইনে বঙ্গদেশের গভর্ণর জেনারেল ভারতের গভর্ণর জেনারেলরূপে স্বীকৃত হলেন। গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের চারজন সদস্যর সঙ্গে যুক্ত হলেন 'লিগ্যাল মেম্বার' নামে পঞ্চম সদস্য। মেকলে ছিলেন প্রথম লিগ্যাল মেম্বার। ভারতের জন্য আইনের খসড়া প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গভর্ণর জেনারেলকে আইন কমিশনার নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। আইন কমিশনারের সভাপতি হিসেবে মেকলে ভারতের বিখ্যাত পিনাল কোড-এর খসড়া রচনা করেন।

ভারতে বসবাসের জন্য ইয়োরোপীয়দের উপরে নিষেধাজ্ঞা দূর হয়। কলকাতায় তো আগে থেকেই ছিল, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে বিশপের পদ সৃষ্টি হল। কোম্পানির ডিরেক্টরদের মনোনীত ভারতীয় সিবিল সার্ভিস পদ-প্রার্থীদের জন্য হেইলিব্যেরি কলেজে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত হয়। পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনাররা কোম্পানির শাসন-কার্য নিয়ন্ত্রণের অধিকারী থেকে যান। এ নবীকৃত সনদে বলা হয় "এবং এটা বিধিবদ্ধ হোক যে উক্ত অঞ্চলের কোনো দেশীয় ব্যক্তি কিংবা সেখানে বসবাসকারী ও ঐ দেশে জাত হিজ ম্যাজেস্টির কোনো প্রজা কেবলমাত্র তার ধর্ম, জন্মভূমি, বংশ, গাত্রবর্ণ বা এর যে-কোনো একটির জন্য কোম্পানির অধীনস্থ কোনো স্থান, পদ বা চাকুরি গ্রহণে অযোগ্য হবেন না"। মেকলে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় পার্লামেণ্টে বলেছিলেন যে, ভারতবাসীকে নতুন জীবনে উজ্জীবিত করাই ইংরেজ শাসনের ব্রত হওয়া উচিত! অবশ্য প্রাচীন ভারত সম্পর্কে তাঁর অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। মেকলে ভারতীয় প্রশাসনে যোগ্য ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি চেয়েছিলেন। কিন্তু "এই অ্যাক্ট পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার প্রকৃতপক্ষে ধারাটির কার্যকারিতা এড়িয়ে যাবার জন্য পন্থা নির্ণয় করতে আরম্ভ করেছিলেন।" ১৮৩৭ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসন আরোহণ করেন। এ সময় ইংরেজ শাসন ভারতে অনেকখানি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ শাসনও শ্রদ্ধার্হ হয়ে ওঠে। ওয়েলেসলী, হেস্টিংস ও আমহার্স্ট-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ তখন শেষ হয়ে গেছে। বেসামরিক প্রশাসনের ভুলভ্রান্তি অনেকখানি শোধরানো হয়েছে। ভারতীয়দের প্রশাসনে অংশ গ্রহণে কথঞ্চিৎ স্বাগতও জানানো হয়েছে। দেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ঘটছিল, অন্যায় খরচ কমছিল, সরকারের উদ্বৃত্ত দেখা দিচ্ছিল। ভূমি-রাজস্বের নিষ্ঠুর চাপও হ্রাস পেয়েছিল। কোম্পানি সওদাগরীর কাজ ছেড়ে প্রশাসকের কাজ নিলেন। এ সময় ভারতে ইংরেজ বিদ্বানদের সাহিত্যকর্মেরও বিশেষ বিকাশ ঘটে।

এ দেশের জনগণের উপরে আস্থাপ্রকাশ করা হচ্ছিল। এদেশের মানুষের

প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করছিলেন ইংরেজ প্রশাসকরা। এ দেশী ছাত্ররা হিন্দু কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। ধর্ম সংস্কারের জন্য আন্দোলন গড়ে উঠছিল। রাজা রামমোহনের মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তি সতীদাহর মতো অমানুষিক প্রথার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

মহারাণীর সিংহাসন আরোহণের অব্যবহিত পরেই ভারতে শাসনব্যবস্থা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। মূল সমস্যাটি দুর্ভিক্ষের। ওয়েলেসলীর বোম্বাই ও উত্তর ভারত অভিযানের ফলে ১৮০৩ ও ১৮০৪ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ১৮১৩ সালে বোম্বাইয়ে আবার দুর্ভিক্ষ ঘটে। মাদ্রাজে পীড়নমূলক ভূমি-রাজস্বের চাপে ১৮০৭, ১৮২৩, ১৮৩৩-এ নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মহারাণীর শাসনের প্রথম বৎসরে পীড়নমূলক ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে উত্তর ভারতব্যাপী ব্যাপক দুর্ভিক্ষের ঘটনা ঘটে। বার্ড-এর কাজ তখনও শেষ হয়নি। দরিদ্র ও অসহায় ভারতবাসীর সামনে দুর্ভিক্ষ হয়ে উঠেছিল একটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা। শবাকীর্ণ উত্তর ভারতে মৃতদেহ সরাবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটেছিল। ইংরেজী শিক্ষা ও রেলপথের বিস্তার হয়। এসব সত্য হলেও, দুটি মূল সংস্কার তাঁর শাসনকালেও যে এ-দেশে হয়নি এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথমটি হল, এ দেশের প্রশাসনে নিয়ন্ত্রণমূলক এবং নির্দেশনামূলক কাজে ভারতীয়দের নেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত, ভারতবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো করার কোন ব্যবস্থা হয়নি। ব্যবস্থা হয়নি দুর্ভিক্ষের হাত থেকে ভারতবাসীদের নিস্তার দেবার (১৮৩৭, চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়)।

দুই

ইতিহাস সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের মত যথার্থই লক্ষণীয়। তাঁর মতে "কেবল যুদ্ধ-বর্ণনা ও সম্রাটদিগের নামাবলী প্রকৃত ইতিহাস নহে।" এমন কি ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা বিষয়েও তাঁর মতামত যথেষ্ট আধুনিক। তাঁর মতে নিরবলম্ব ব্যক্তি ইতিহাসের স্রষ্টা নয়। বরং একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে যুগ-বৈশিষ্ট্যের যথার্থতা রূপদান করার মধ্য দিয়েই ইতিহাস-ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। "সক্রেটিস কেবল নিজজ্ঞানে জ্ঞানী নহেন,—গ্রীকদিগের তৎকালিক অসামান্য চিন্তা-ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ মাত্র।" "...সময়ের চিন্তা, কল্পনা ও উদ্যম নেতাকে বাছিয়া লয়,—ব্যক্তিগত প্রতিভাকে অবলম্বন করে, এবং ক্ষণজন্মা মহারথীদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পূর্ণ বিকাশ পায়।" অবশ্য এই ইতিহাস-ব্যক্তিত্ব ঐ ব্যক্তির

যোগ্যভাবে সামাজিক অন্তঃসার গ্রহণ এবং তার প্রয়োগের তাৎপর্যে গড়ে ওঠে বলে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন। রমেশচন্দ্রের ব্যক্তিত্বও তাঁর যুগোপযোগী মধ্যবিত্ত বাঙালীর সমাজ-আর্থনীতিক অন্তঃসার শোষণ করে নিয়েই গড়ে উঠেছিল। তিনি একদিকে ইংরেজের সহযোগী—যে ইংরেজ আধুনিক জীবনের সঙ্গে ভারতকে সম্পর্কিত করেছে। অন্যদিকে তিনি ইংরেজের বিরোধী, কেননা ঐ ইংরেজই—ভূমি-রাজস্ব লুণ্ঠন, শিল্প চূর্ণিকরণ, প্রশাসন গ্রাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এ দ্বৈত-চরিত্র বলাবাহুল্য উনিশ শতকের ভূমি-খাজনাভোগী বিত্তবান বুদ্ধিজীবী বাঙালীর পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল। 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস' লিখতে বসে তাই তিনি রাজা-রাজড়ার যুদ্ধ-বিগ্রহকেই মুখ্য স্থান দেন নি। যদিও ১৭৫৭ থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস বলতে বিভিন্ন গভর্ণর জেনারেল এবং ভাইসরয়দের শাসন পরম্পরা এবং ইয়োরোপে ও ভারতে বৃটিশ শক্তির যুদ্ধফলাফল ইত্যাদির চিত্র আগে দিয়ে, তারপর আর্থনীতিক ঘটনা-পরম্পরা লিপিবদ্ধ করেছেন। বৃটিশ শাসন বিস্তার—ভারতের দীর্ঘ ইতিহাসের একটি বিশেষ কালপর্যায় মাত্র। তা যে দুনিয়া জোড়া বিপণন ও সওদাগরী পুঁজির যুগে, তৎকালীন ইয়োরোপীয় জাতিগুলির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বুঝতে হবে—রমেশচন্দ্র চমৎকারভাবে সেটা দেখিয়েছেন। আমাদের দেশের জাতীয় ইতিহাস যে আন্তজাতিক প্রেক্ষিতবিহীন নয় তাও তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন।

রমেশচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষফল হিসেবে গণ্য করেছিলেন "পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালাভ করিয়া দেশীয় ভাষা ও বিদ্যার অনুশীলন, পাশ্চাত্ত্য উৎসাহের সহিত স্বদেশের উন্নতি ও ঐক্যসাধন, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানলাভ করিয়া কায়মনঃপ্রাণ দেশের জন্য সমর্পণ করা"—। আর ঐ পরিপ্রেক্ষিত রচনার কাজে ভারতের মধ্যযুগীয় অর্থনীতি-রাজনীতি থেকে ভারতকে বের করে এনে বৃটেন যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে, তার প্রতি সশ্রদ্ধ থেকে তাঁর স্বশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বৃটিশ প্রভাবাধীন নতুন ভারতের কাম্য আর্থনীতিক-রাজনীতিক রূপরেখাটি কেমন হওয়া উচিত তার দিকে পাঠকের চোখ ফেরাবার প্রচেষ্টা করেছেন।

বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগের কোনো সমমাত্রিক কালবিভাগ তিনি করেন নি। বিশেষ কয়েকটি দিকে অর্থাৎ ঐ শাসনের কার্যকলাপ, প্রশাসনিক দিক এবং কোনো আঞ্চলিক ভূমি বন্দোবস্ত এ সব সম্পর্কেই তিনি মুখ্যত আলোচনা করেছেন। তারপর কোনো বিশেষ কালবিন্দুকে ঘিরে প্রচুর তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ

উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন। এবং ভূমি-বন্দোবস্ত বিষয়ে • বিস্তৃত আলোচনা তাঁর আর্থনীতিক ইতিহাসের দুটি খণ্ডেই অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। তাঁর মতে ভোগের উপরে উদ্বৃত্তই পুঁজি সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মূল উপকরণ। তাই বিপুল পরিমাণ ভূমি-রাজস্ব পাওয়ার অর্থ ভারতীয়দের ভোগকে সর্ব-নিম্নস্তরে নিয়ে গিয়ে ভূমি ব্যবস্থার বদল ঘটিয়ে আয়বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন এনে, এ-দেশ থেকে সঞ্চয় তুলে নিয়ে যাওয়া। তাই দিয়েই এ দেশে দ্রব্যাদি কিনে বৃটেনে তা বিক্রয়, হোমচার্জ এবং চীনে লগ্নি—সবকিছুই ব্যাপক হারে প্রতিদান-বিহীন ভাবে সম্পদ বিদেশে নিকাশ করে নিয়ে যাওয়া মাত্র। তাঁর মতে ভারতের আভ্যন্তরিক নিরঙ্কুশ অত্যাচারী শাসকরাও যখন প্রচুর কর আরোপ করতেন, যার ফলে উৎপাদকেরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হতো, তখনও কিন্তু অভিজাত গোষ্ঠী ও রাজসভার মধ্য দিয়ে আবার তা দেশবাসীর কাছেই ফিরে আসতো। কিন্তু এ নিয়মের ক্ষেত্রে "ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালের শাসনে ভারতে পরিবর্তন আসে। ভারতবর্ষ থেকে উপার্জিত মুনাফার পরিমাণ তুলে নিয়ে গিয়ে তারা ইয়োরোপে জমা করতেন। প্রাচ্যদেশে লাভজনক কাজে উচ্চাভিলাষী নিজেদের মনোনীত ব্যক্তির জন্য সমস্ত উচ্চপদই তাঁরা সংরক্ষিত রাখতেন। ভারতবর্ষে সমাহৃত রাজস্ব থেকেই পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে নিজেদের মুনাফার জন্য তাঁরা ইয়োরোপে তা বিক্রয় করতেন। কোম্পানির ঋণদাতাদের জন্য একটি চড়া সুদ তাঁরা ভারত থেকে জবরদস্তি করে আহরণ করতেন। কোনো না কোনো উপায়ে অতিরিক্ত করবাবদ প্রাপ্ত সমস্ত কিছুই অর্থাভাব পীড়িত প্রশাসনে যতটুকু না দিলেই নয় সেটুকু বাদে ইয়োরোপে চালান যেত (পৃঃ ৭ মু, ব.)।" ধ্রুপদী অর্থ-নীতিজ্ঞদের মতোই তিনি মনে করেছেন, সরকারী আয়ও যেমন কম হওয়া উচিত, ব্যয় তদনুসারেই হওয়া কর্তব্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মারফৎ ভূমি-রাজস্ব বেঁধে দিলে, ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধি করে লুণ্ঠন করা যেমন বন্ধ হবে, তেমনি যদি তার উপরে উপকরসমূহও রদ হয়, তাহলে চাষীর হাতে যে উদ্বৃত্ত থাকবে চাষী তা ব্যবহার করতে পারবে জমির উন্নতির জন্য। কিন্তু রমেশচন্দ্র চাষী বলতে রায়ত বুঝেছেন, গ্রামীণ ভূমিহীনচাষী, ভাগচাষী বা বর্গাদারদের বোঝেন নি। উচ্চ ভূমি-রাজস্ব বলতে তিনি রায়তদের উপরে চাপই বুঝেছিলেন। কিন্তু একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাক্ষিণ্যে গড়ে ওঠা নানা স্তরের বিপুল মধ্যসত্বভোগীর দল, অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রায়ত-ভূস্বামী জোতদার বর্গাচাষীর নিকটে উচ্চতর হারে খাজনা আদায় করছে—এ তিনি দেখতে পাননি। ইংরেজ শাসন-পূর্ব নবাবী ব্যবস্থাতেও মহাজন জগৎশেঠের কাছে রাজস্ব ইজারাদাররাও ঋণী হতো। অথচ

তাঁর মনে হয়েছিল উচ্চ ভূমিকরের চাপে পিষ্ট রায়তই মহাজনের কাছে খাতক হয়। অবশ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মধ্যসত্ত্বভোগীদের যে-স্তর-পরম্পরা তৈরী হয়েছিল, যাদের খাঁই মেটাতে দরিদ্র চাষী কেবলমাত্র চাষ ও টিঁকে থাকার জন্য মহাজনের খাতক হতে বাধ্য হতো—এটাও তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে।

তবু বলা চলে তাঁর মনে কৃষিতে বুর্জোয়া বিকাশের একটি নক্সা যেন অস্পষ্ট হলেও ধরা পড়েছিল। তাঁর কাছে তাই রায়ত বা উৎপাদনে নিযুক্ত চাষীই মুখ্য ছিল। হয়তো মুখ্য ছিল উৎপাদনে নতুন কৃৎকৌশলের প্রয়োগগত উচ্চাশাও। জমিদার বলতে স্থির রাজস্বদাতা এক মধ্যশ্রেণীকে বোঝাতো—যাদের উৎপাদনে বস্তুত কোনো ভূমিকাই নেই, কিন্তু সরকারের ক্রমবর্ধমান করচাপের হাত থেকে রায়তকে নিস্তার দেবার জন্য যারা সরকার ও রায়তের মধ্যে অন্তর্বর্তী এক পরগাছা শ্রেণী মাত্র। সুতরাং রায়ত যদি সত্যিই কৃষির উন্নতি ঘটাতে পারে এবং জমিদারের দেয় ভূমি-রাজস্ব যদি স্থির থাকে, তাহলে, কৃষকের অবস্থা ক্রমেই উত্তরোত্তর উন্নতির পথে যাবে। তা হলে রায়ত জোতে নিজ শ্রম ও শ্রমিক লাগিয়ে উৎপাদন করবে, এবং বিপণনের জন্য এই উৎপাদন পণ্যে পর্যবসিত হয়ে কৃষিতে ধনতন্ত্রের উৎসার ঘটাবে। বোধহয় এমনি একটা চিন্তা রমেশচন্দ্রের মাথায় ছিল। তা নইলে ডাঃ বুকাননের ভ্রমণবৃত্তান্তের উপর এতখানি জোর দিতেন না (দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়) তিনি। অর্থাৎ ঐ ভ্রমণবিবরণ উদ্ধৃত করার কারণ ছিল এই যে, দক্ষিণভারতে রায়তোয়ারি অ-চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নেমে এসেছে দারিদ্র্য, এবং রমেশচন্দ্রের ব্যাখ্যামত উত্তর-ভারতে, বিশেষত বঙ্গদেশে, চিরস্থায়ী ভূমি-বন্দোবস্তের কল্যাণে এসেছে শান্তি-নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য। পূর্বোত্তর-ভারতে এমন কি জমিদাররা নাকি সেচ ব্যবস্থাও স্বচ্ছন্দে বিকশিত করে তুলছে। অর্থাৎ তাঁর মতে "বঙ্গদেশে এই বন্দোবস্ত উপকৃত করেছে সমগ্র কৃষিজীবী সম্প্রদায়কে।...বঙ্গদেশের কৃষিকে তা রক্ষণ-ব্যবস্থা যুগিয়েছে—যে কৃষি কার্যত জাতির জীবনধারণের একমাত্র উপায়" (পৃষ্ঠা ৮৪)। বলাবাহুল্য, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর ভিত্তি করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভবকে তিনি মূল্যবান বলে মনে করেছিলেন। কর্ণাটের পলিগারদের উচ্ছেদকে তিনি যেমন খুবই অন্যায় বলে মনে করেছিলেন, তেমনি বলেছেন "লর্ড কর্ণওয়ালিস একটি প্রাচীনপ্রথার প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন এবং এই ভাবে (অর্থাৎ 'জমিদারী প্রথাকে শক্তিশালী ও চিরস্থায়ী' করে তুলে) বঙ্গদেশে এক বিরাট উন্নতিশীল ও সুখী মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি করেছিলেন (পৃষ্ঠা ১১৭)।" তাঁর মতে "বিদেশী সরকার ও কৃষকদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসেবে জোরালো

প্রভাবশালী ও উন্নত মধ্যবিত্ত সমাজ"-এর অস্তিত্বের প্রয়োজন ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল।

এমন কি গ্রাম-সমাজ ভেঙে দেবার ব্যাপারেও তাঁর মনে বেদনা ছিল। এখানে তাঁর এক স্ব বৈপরীত্য ধরা পড়েছে। গ্রামসমাজে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি'র অনস্তিত্ব এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তার অস্তিত্ব তিনি একই সূত্রে ধরেছিলেন। তাঁর কাছে মহলওয়ারি বন্দোবস্তও সমান বেদনাদায়ক ছিল। তাঁর মনে হয়েছিল যদি স্থায়ী বন্দোবস্ত না হয়, এ-সবগুলি বন্দোবস্তে চাষের পুরো খাজনাটাই ভূমি-রাজস্ব হিসেবে বৃটিশ সরকারের কব্জায় চলে যাবে। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ অঞ্চলগুলিতেও বন্দোবস্তের কথঞ্চিৎ স্থায়িত্বের পরও, দেশের দারিদ্র্য বেড়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে মূল প্রবণতা, অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকের হাতে খাজনা বিলির জন্য জমি কেন্দ্রীভূত হওয়া, রায়তোয়ারি, মহলওয়ারি, যে ব্যবস্থাই চালু থাকুক না কেন, ঐ বিলি ব্যবস্থাই কার্যত পুরো ভারত জুড়েই ঘটে যায়। নামে-বেনামে ইংরেজ শাসনে জমিদারী ব্যবস্থাই সারা-ভারতে নানা স্তর পরম্পরায় সর্বগ্রাসী রূপে দেখা দেয়। এখনো পর্যন্ত তার নানা কায়দায় বেনামা অস্তিত্ব থেকে আমাদের অব্যাহতি পাওয়া কঠিন হয়ে আছে।

তিন

কেউ অবশ্য বলতে পারেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জন্ম নেওয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভারত শাসনে বৃটিশের অংশীদার হবার আকাঙ্ক্ষাগত শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রকাশ রমেশচন্দ্রের এই বিশ্লেষণ ভঙ্গির মধ্যে প্রকট। রচনার মধ্যে তাই তাঁর অভিমানী কণ্ঠস্বর আছে। অর্থাৎ ইংরেজ শাসনে অনেক কিছু অন্যায় ঘটেছে একথা ঠিকই, তবে ন্যায়ের পথে তাদের নিয়ে যাবার দায়িত্ব যে প্রজাবৃন্দের নেই তাও নয়। তবে সে দায়িত্ব তারা পালন করতে পারে বৃটিশ সরকারের দপ্তরে যোগ্য কাজের মধ্য দিয়ে। তাঁর সমর্থনে মুনরোকে উদ্ধৃত করছেন তিনি। "যে-বিরাট সংখ্যক সরকারী দপ্তরে দেশীয় ব্যক্তিরা কর্মে নিযুক্ত আছেন সেটাই আমাদের সরকারের আনুগত্যের অন্যতম শক্তিশালী কারণ (পৃঃ ১৪৫)।" দেশের আইন প্রচলনের ব্যাপারেও "সক্রিয় ও বুদ্ধিমান সেই সমস্ত স্থানীয় কর্মকর্তাদের··· সঠিক তথ্য" পাওয়া দরকার। এবং "এই সমস্ত কর্মকর্তারাও এই তথ্য পেতে পারেন একমাত্র অভিজ্ঞ দেশীয় কর্মচারীদের এক প্রতিষ্ঠান মারফৎ।" অর্থাৎ মুনরোর বক্তব্যকে সমর্থন করতে গিয়ে এক বিপুল ভারতীয় আমলাতন্ত্রী শক্তিকে বৃটিশ শক্তির সহযোগী করে গড়ে তোলার পক্ষে তিনি ছিলেন। ফলে তিনি

এলফিনস্টোনের সমর্থনসূচক উক্তিকে সাক্ষী মেনেছেন। এবং এই আমলাতন্ত্রী সমাজের ভাষা যে ইংরেজী হবে, তার জন্য মেকলেকে উদ্ধৃত করেছেন। "ভারতে ইংরেজী ভাষা শাসকশ্রেণীর ভাষা। সরকারী প্রশাসনের এ-দেশী উচ্চশ্রেণীর লোকজনও এ ভাষায় কথা বলে থাকেন। প্রাচ্যের সমুদ্র বাণিজ্যের ভাষা হয়ে দাঁড়াবার সম্ভাবনা আছে এ ভাষার···আমরা দেখতে পাবো ইংরেজী ভাষা আমাদের এ-দেশী প্রজাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠার যথেষ্ট শক্তিশালী কারণ রয়েছে"। এক কথায় কি ভূমি বন্দোবস্ত, কি সরকারী পদে কাজকর্ম, কি আমলাতন্ত্র গড়ে তোলার ব্যাপারে—রমেশচন্দ্র মুখ্যত মধ্যবিত্তের কল্যাণই ভেবেছেন। রমেশচন্দ্র এই গ্রন্থের ভূমিকাতেই বলেছেন সেই ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার হবার ফলে হয়ে উঠেছে "শিক্ষিত সমাজ একটি উদীয়মান শক্তি ভারতবর্ষে। নিজেদের দেশের উচ্চতর চাকুরীতে তারা একটি ভালো অংশ দাবী করে। এই দাবী নাকচ করা, ভারতবর্ষের শিক্ষিত এবং প্রভাবশালী সমাজকে বিরোধী করে তোলা, দেশে অসন্তোষ ও ক্ষোভ বৃদ্ধি করা এবং একচেটিয়া শাসনের দ্বারা সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে তোলা অতি সহজ কাজ। অপরপক্ষে, উদীয়মান শক্তিগুলিকে সরকারের স্বপক্ষে টেনে আনা, শাসন ব্যবস্থায় শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অংশীদার করে তোলা, নিজেদের মঙ্গলামঙ্গল, শিল্প ও কৃষির ব্যাপারে তাদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া এবং স্বদেশবাসীর বৈষয়িক উন্নতিবিধানে ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে তাদের দায়িত্ববান করে তোলা বরং বিচক্ষণতার কাজ হতো (পৃ ১১-১২ মু. ব.)।" বলাবাহুল্য ভূমিকাটির রচনাকাল ১৯০১। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কালপর্যায়ে বাঙালী 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণীর মধ্যে যখন স্পষ্ট ইংরেজ বিরোধিতা ও স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছে, তার বিপ্রতীপে রমেশচন্দ্রের এবম্বিধ বক্তব্য তাঁর রক্ষণশীল ও নিয়মানুগ আন্দোলনের পক্ষাবলম্বী মনোভাবকেই প্রকাশিত করে।

রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে "যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোক মিলে ভারতের গদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটিক্‌স্‌। সেই পলিটিকসে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিশান্তি উভয় ব্যাপারই বক্তৃতা মঞ্চে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষা—কখনো অমুনয়ের করুণ কাকলি, কখনো বা কৃত্রিম কোপের উত্তাপ উদ্দীপনা" ('রায়তের কথা'র ভূমিকা)। "ভদ্রলোক বলতে কাকে বুঝব? বিলেতে যেমন মিডল ক্লাস প্রবল, এদেশে তেমনি মিডলম্যান প্রবল, শুধু কৃষিকর্ম নয় শিল্পবাণিজ্যেও। যে ধন সৃষ্টি করে ও যে তা ভোগ করে, সেই দুই ব্যক্তির

ভিতর অসংখ্য মিডলম্যান আছে। কথায় বলে, যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই। এই বিরাট নেপোর দলের নাম ভদ্রলোক" (প্রমথ চৌধুরী : রায়তের কথা)।

রমেশচন্দ্র অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন যে ভারতে বৃটিশ শাসন এ-দেশে শিল্পের বিকাশ পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। উপরন্তু, এ-দেশ হয়ে পড়েছে তাদেরই পণ্য বিপণনের বাজার। অথচ তাঁর মুখ্য ঝোঁকটাই ভূমি ব্যবস্থার দিকে। অর্থাৎ স্বদেশী পুরনো সামন্ততন্ত্রকেও নতুন ঘেরাটোপে সাজাতে তিনি একেবারে বিরোধী ছিলেন না। তিনি এশীয় নিরঙ্কুশতন্ত্রের ভিত্তি-স্বরূপ গ্রাম-সমাজের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে একটুও পিছপা হননি। আবার শিল্পবিপ্লবের মাহাত্ম্য তিনি যে না বুঝেছিলেন এমন নয়। অথচ তাঁর স্ব-শ্রেণীর লভ্য আর্থনীতিক উদ্বৃত্ত ভূমিতে লগ্নি করার প্রাক্‌সর্ত স্বরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে ওকালতি তাঁর রচনায় বিধৃত হয়ে আছে। জমিদারী এঁরা নির্দিষ্ট রাজস্বের অঙ্গীকারে গ্রহণ করবেন। কিন্তু কৃষকের খাজনা কতোটা হতে পারে তার মূল্যায়ন রমেশচন্দ্র করেন নি। এমন কি ভূমি-রাজস্ব খাজনার অর্ধাংশে স্থিরীকৃত হওয়াও তিনি খুবই কল্যাণকর ভেবেছিলেন, কিন্তু বহুবিধ মধ্যসত্ত্বভোগী-পরম্পরার শৃঙ্খলটির বিষয়ে কোনো মতামত দেননি। দেখছি, বরং বুকাননের উত্তর ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে উৎপাদনের অর্ধেকও খাজনা বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এবং রমেশচন্দ্রের কাছে তা ন্যায়সঙ্গতও মনে হয়েছে। আবার টাকায় খাজনা থেকে ফসলে খাজনায় পশ্চাদপসরণকে দেশের প্রগতির চিহ্ন বলে রমেশচন্দ্র মনে করেছেন। এমন কি রায়তের কথঞ্চিৎ অধিকার সংরক্ষণের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে যে প্রজাসত্ব আইনগুলি পাশ হয়েছিল, রমেশচন্দ্র বস্তুত তাদের উপরে কোনো গুরুত্বই দেননি।

বৃটিশ উদারনৈতিক পলিটিক্যাল ইকনমি রমেশ দত্তের অনায়ত্ত ছিল না। শিল্পই যে দেশের সম্পদ—এবং শিল্প বিকাশের মধ্য দিয়েই যে দেশে সত্যিকারের লক্ষ্মীলাভ সম্ভব—এটা তাঁর কাছে যেন তবু সুদূর হয়ে পড়েছিল। সে কী শিল্পোৎপাদনের কোনো পথ খোলা ছিল না বলে? তিনি কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ও ভূমি বন্দোবস্তের ভালোমন্দ দিক এবং তারই সঙ্গে ভারতের প্রাচীন অর্থনীতি তাঁর নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ ব্যাখ্যা করলেন না শিল্পগত বিকাশের স্তরটি। ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের ঠিক আগের বিকশিত ঋণ সঞ্চালন ব্যবস্থা, এমন কি অর্থব্যবস্থাও তাঁর আলোচনার অংশীভূত হল না। অথচ আমাদের কাছে অজানা নয়, বৃটিশ অধিকারের প্রাক্কালে এ-দেশে অর্থব্যবস্থা

তৎকালীন বৃটেনের চেয়ে অনগ্রসর ছিল না। আড়ং ভিত্তিক শ্রম-শিল্পও জন্ম নিচ্ছিল। বৃটেনের শিল্পবিপ্লবের পর, ভারতীয় উপনিবেশকে যে কৃষিজাত কাঁচা মালের উৎস করে তোলা হচ্ছিল, রমেশচন্দ্র তাকে স্বাভাবিকতার মূল্যে অভিষিক্ত করেছেন। ভূমি থেকে খাদ্য ও কাঁচামালের যোগানদার হিসেবেই তৎকালীন 'ভদ্রলোকের' স্বাচ্ছন্দ্য অন্বেষণ সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর 'নব জাগরণের'ও অর্থনৈতিক ভিত্তি। এক অর্থে এই অর্থনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থটি অনেকাংশে তাঁর স্বশ্রেণীর জন্য apologetic এবং বৃটেনের নিকট বদান্যতার প্রত্যাশী।

চার

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ভারতের প্রথম অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনাকার রমেশচন্দ্র দত্তের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। কোনো ইতিহাসকারই তাঁর শ্রেণী দর্শনের বাইরে যেতে পারেন না। রমেশচন্দ্রও পারেন নি। কিন্তু যে-বিপুল বিদ্যাচর্চায় এবং পরিশ্রমে তাঁর বক্তব্য বিদেশী পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন তা বিস্ময়কর। কখনো কখনো পুনরাবৃত্তি বিরক্তির কারণ বলে মনে হলেও বুঝতে হবে, রমেশচন্দ্র বিশেষভাবে বৃটিশ উদারনৈতিক পাঠকদের কাছে কিছু কিছু বিষয়ের বিশেষ গুরুত্ব পৌছে দেবার জন্য একই কথার পুনরুক্তি করেছেন। তাঁর মতে ভারতীয় প্রশাসনে ভারতবাসীর অন্তর্ভুক্তি ভারতে দুর্ভিক্ষ নিরাকরণের প্রয়োজনেও কথঞ্চিৎ ব্যবস্থাগ্রহণমাত্র বলে গণ্য হবার যোগ্য। ভারত শাসনের জন্য ইংরেজ ও ভারতীয়দের যুগ্মভূমিকার প্রতি মনস্ক হবার জন্য আবেদন—এ গ্রন্থের তাই অন্যতম আকর লক্ষ্য। বস্তুত পুরো বইখানিতে কয়েকটি বিষয়কেই তুলে ধরা হয়েছে যেমন: ১। ভূমি রাজস্বের মাধ্যমে লুণ্ঠন; ২। লুণ্ঠনের পক্ষেই ছিলেন কোম্পানির কর্তৃপক্ষ; ৩। কয়েকজন অতি যোগ্য প্রশাসক ছিলেন—কর্ণওয়ালিস, মুনরো, এলফিনস্টোন, বেণ্টিঙ্ক ইত্যাদি; ৪। তাঁরা সবাই চেয়েছিলেন কোনো না কোনো ধরনের স্থায়ী বন্দোবস্ত, কর্ণওয়ালিস চালু করলেন চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত, মুনরো এলফিনস্টোন রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত —তবে উত্তর ভারতে দৈবাৎ চেপে বসে মহলওয়ারি বন্দোবস্ত, ৫। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাক্ষিণ্যে উদ্ভূত ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী সরকার ও রায়তের মধ্যে 'কুশনের' কাজ করবে; ৬। বৃটিশ-ভারতের সরকারী প্রশাসনে মধ্যবিত্তদের যোগদান প্রয়োজন; ৭। নানা কায়দায় লুঠ করে নেওয়া বৃটেনে যে সম্পদ চলে যাচ্ছে তা বন্ধ হওয়া খুবই জরুরী। অর্থাৎ "ভারতীয় কবির মতে, রাজা যে কর আদায় করেন তা হল পৃথিবীকে উর্বরকারী বৃষ্টিরূপে ফিরিয়ে দেবার

জন্য সূর্য যেমন পৃথিবী থেকে রস আহরণ করে, তদনুরূপ।···সমস্ত জাতিই ন্যায়সঙ্গতভাবে আশা করে যে দেশ থেকে যে কর আদায় করা হয় তা যেন মূলত সে দেশেই ব্যয় করা হয়" (পৃ ৬ মু. ব.)। সুতরাং সরকারী ব্যয় কমাতে হবে, আর সে ব্যয় কমলে করের চাপও কমবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাক্ষিণ্যে স্থায়ী ভূমি-রাজস্ব প্রদান একদিকে যেমন স্বদেশে সঞ্চয় বাড়াবে, ক্রমহ্রাসমান কর ব্যবস্থা দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থাও উন্নততর করবে। অপর দিকে সরকারী প্রশাসনে ভারতীয়দের যোগদান স্বদেশের কল্যাণে দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করবে—বিচার বিভাগে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি ন্যায়বিচার ও শান্তির সম্ভাবনাকে স্পষ্ট করে তুলবে। বৃটিশ শাসনের ফলে এ-দেশে নিয়মতান্ত্রিকতা ও আইনশৃঙ্খলার বিকাশ—রমেশচন্দ্র মহার্ঘ সম্পদ বলে মনে করেছেন।

তিনি মেনে নিচ্ছেন "অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ এক বিরাট শিল্পোৎপাদনকারী ও বিশাল কৃষিসামগ্রী উৎপাদনশীল দেশ ছিল" (পৃ. ৩ মুখবন্ধ)। কোম্পানি শাসনের প্রথম দিকে জবরদস্তি করে কোম্পানির কর্মচারীরা শিল্পোৎপাদন অলাভজনক করে তোলে। দ্বিতীয় যুগে লক্ষ্য ছিল "ভারতবর্ষকে গ্রেট বৃটেনের শিল্পগুলির গোলাম করে রাখা এবং গ্রেট বৃটেনের কারখানা ও তাঁতশিল্পে সরবরাহের জন্য ভারতীয়দের কেবলমাত্র কাঁচামাল উৎপাদনে বাধ্য করা। নিষেধমূলক মাসুলের দাপট ভারতীয় রেশম ও তুলাজাত দ্রব্য ইংলণ্ডের বাজার ছাড়া করল। ইংলণ্ডের মাল বিনাশুল্কে কিংবা নামমাত্র শুল্কেই ভারতে প্রবেশাধিকার পেত।"···এ ভাবে এ-দেশের শিল্প বিনষ্ট হল। পরবর্তীকালে ভারতে যখন "শক্তিচালিত তাঁত বসানো হল তখন···ভারতে তুলাজাত কাপড়ের উৎপাদনের উপর" বিপুল "এক উৎপাদন শুল্ক ধার্য করা" হল। আর কোনো উপজীবিকা বাকি রইল না বলেই "কৃষিই একমাত্র শেষ আশ্রয়স্থল হয়ে পড়ল।" রমেশচন্দ্র তাই ভূমিকরের ওঠা নামার বিরোধী হলেন। কেন না "ভূমিকরের এই অনিশ্চয়তা কৃষিকে পঙ্গু করে, সঞ্চয়ের পথে বাধা দেয় এবং জমির কর্ষককে দারিদ্র্য ও ঋণে আবদ্ধ করে রাখে।" অর্থাৎ ভূমিকর নির্দিষ্ট পরিমাণ হলে, কথঞ্চিৎ সঞ্চয়ও হতে পারবে। তা হলে লগ্নির মাধ্যমে তা কৃষিকে একটি যোগ্য শিল্পে রূপান্তরিত করতে পারে। কিন্তু রমেশচন্দ্রের কাছে শ্রমজীবী মানুষের অস্তিত্ব অস্পষ্ট ছিল না। কেন না, গুঁড়িয়ে যাওয়া হস্তশিল্পের ও কুটীর শিল্পের কারিগরেরা, বংশানুক্রমিক চাষীরা বিত্তহীন গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। তারা কি করবে? রায়ত-ভিত্তিক কৃষি-উৎপাদন যখন তাঁর লক্ষ্য ছিল, নিশ্চয়ই সে উৎপাদনে ভূমিহীন কৃষকের শ্রমশক্তি বিক্রয় আবশ্যিক হয়ে ওঠা

অস্বাভাবিক নয়। তাহলে কি কৃষিতে তিনি ধনতান্ত্রিক বিকাশ চেয়েছিলেন? অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের অব্যবহিত পরবর্তী ঐতিহাসিক ধাপ হিসেবে পুঁজিবাদ ভারতে আকাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু সে পুঁজিবাদ কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদ। যেন বৃটিশ সাম্রাজ্যে ভারতের কৃষি হবে বৃটেনের শিল্প উৎপাদনের কাঁচামাল ও খাদ্য যোগানদার হিসেবে সম্পূরক। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল বিত্তহীন গ্রামীণ মজুর ও ভূমিহীন কৃষক জোতদারের আধাসামন্ততান্ত্রিক খাজনা বাড়িয়ে দেবার কাজে আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধা শিকার হয়ে পড়লো। জোতদার, মহাজন ও আড়তদারের গ্রাস থেকে মুক্তির পথ হাজার বাধায় বিড়ম্বিত হয়ে গেল। তার জের এখনো চলছে।

পাঁচ

যে-কোনো উৎপাদন পদ্ধতি আলোচনা করতে গেলে, তা সে দাস প্রথা, ফিউডাল বা পুঁজিবাদ যাই হোক না কেন, কার্ল মার্কস-এর এই বক্তব্যটি সে প্রসঙ্গে খুবই জরুরী: "যে উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্য দেওয়া হয়নি তা প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের কাছ থেকে পাম্প করে তুলে নেওয়ার মধ্যেই কোনো বিশেষ আর্থনীতিক আঙ্গিকের শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। যেমন তা উৎপাদন থেকে প্রত্যক্ষই গড়ে ওঠে এবং তা আবার তার নিজের বেলায় নিয়ামক উপকরণ হয়ে উঠে উৎপাদনের উপরে প্রত্যাঘাত করে। এরই উপরে, পুরো আর্থনীতিক সমাজের ভিত্তি—যা উৎপাদন সম্পর্কগুলি থেকে গড়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে যা একই সময়ে তার নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আঙ্গিকও বটে" (মস্কো সংস্করণ, ক্যাপিটাল, ৩নং খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৭২)। ফলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই হোক বা রায়তোয়ারি বন্দোবস্তই হোক কৃষি উৎপাদনের মূল্য না দেওয়া উদ্বৃত্ত কার কাছে যাচ্ছে, কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে বণ্টিত হচ্ছে তার উপরে দেশের আর্থনীতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক আকারও নির্ভর করছে। আমরা বরং দেখছি যে ঔপনিবেশিক শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ইংরেজ প্রবর্তিত এই ভূমি ব্যবস্থাগুলি এ-দেশে নতুন ঘরানার সামন্ততন্ত্রের আমদানী ঘটায়।

যে ভূম্যধিকারী শ্রেণী অর্থাৎ রায়ত ও রাষ্ট্রশক্তির মধ্যবর্তী 'কুশন' রমেশচন্দ্রের অন্বিষ্ট, তারা এবং সরকারী প্রশাসনের ভারতীয় কর্মচারিগণ, উভয়েই দেশের উদ্বৃত্তের দু-ধরনের অংশভাগী। প্রত্যক্ষত রায়তের কাছ থেকে খাজনা পায় জমিদার। আর ভূমি-রাজস্ব—যা খাজনার উদ্বৃত্তের একটি অংশমাত্র—তা দিয়ে সরকারী কর্মচারীদের জীবিকার পথ প্রশস্ত হয়। এক কথায় রমেশচন্দ্র এ-দেশে

কৃষির উপরে ভিত্তি করে যে জমিদার বা কর্মচারীদের অস্তিত্বের কথা বলেছেন, এঁরা ফিউডাল উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত, যে ফিউডাল প্রথা ইংরেজ চাপিয়ে দিয়েছে। ফিউডাল উৎপাদনে (১) উদ্বৃত্ত অ-অর্থ নৈতিক কায়দায় তুলে নেওয়া হয়, যদিও (২) উৎপাদন যন্ত্রের প্রত্যক্ষ অধিকার থাকে উৎপাদকেরই—তা সে কোদালই হোক, বলদ বা লাঙলই হোক। (৩) কৃষক স্বাধীন নয়, অর্থাৎ চাইলেই সে চলে যেতে পারে না জমি ছেড়ে, বিশেষভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যুগে যখন দেশী শিল্প ভেঙে গেছে তখন। (৪) জমির অধিকার রাষ্ট্রের কাছে বিনা প্রতিদানে নয়, কোনো প্রকার দায় নয়তো বা ভূমি-রাজস্বের বিনিময়েই জমির অধিকার পায় ভূম্যধিকারী। ভূম্যধিকারী খাজনা তুলে নেয় প্রজা-চাষীর কাছ থেকে। জমির উপর অধিকারের জন্যই অর্থাৎ প্রজার দেয় খাজনার উপরে নির্ভর করেই ভূস্বামী রাষ্ট্রকে ভূমি-রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকে। মার্কস তাই বিচার করে ভারতে বৃটিশ প্রবর্তিত এই জমিদারী ব্যবস্থাকে বলেছিলেন বৃটিশ সামন্ততন্ত্রের ব্যঙ্গমূর্তি। আর রায়তোয়ারি প্রথাকে বলেছিলেন ফরাসী বিপ্লবোত্তর প্রজাতন্ত্রের ক্যারিকেচার।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম যুগে (১৬০০) ইংলণ্ডে জমিদারী প্রথা ছিল ফিউডালতন্ত্র ভিত্তিক। জমির মালিক ছিল জমিদার। আর ভূমিদাস-চাষীকে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে কিছুটা জমি দেওয়া হতো। তার চেয়ে যা বেশী—তা জমিদারের পাওনা। চাষীকে যেমন জমিদারের জমিতে বেগার দিতে হতো, তেমনি খাজনা হিসেবে উৎপাদনের উদ্বৃত্ত ফসলে বা টাকাতেও দিতে হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) ভূমিদাস উৎখাত হওয়া জমিতে মজুর-লাগিয়ে পুঁজি ব্যবহার করে যে পুঁজিপতি উৎপাদন করতো, তাকে জমিদার খাজনার বিনিময়ে জমি লীজ দিত। জমিদারের লীজ-অঙ্গীকার অনুযায়ী খাজনা মিটিয়ে দিয়ে, পুঁজিপতির থাকতো মুনাফা (এবং মূলধনের সুদ)। খাজনা, সুদ ও মুনাফার এই অস্তিত্ব ভূমিহীন চাষী শ্রমিক হিসেবে পর্যবসিত হবার পর তারই উদ্বৃত্ত শ্রম থেকেই উদ্ভূত। জমিদারও যেহেতু পুঁজিপতি হয়ে উঠছিল—ফলে জমিদার উচ্চ মুনাফার জন্য জমিতে উন্নত ধরনের চাষেরও সূত্রপাত ঘটাচ্ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় প্রবর্তিত জমিদারী প্রথায় জমিদারের উৎপাদন বাড়াবার কোন ঝোঁকই থাকবার কথা নয়। জমিতে উচ্চ খাজনার ব্যবস্থা করেই তার কাজ ফুরালো। রায়তোয়ারি ব্যবস্থায় সরকারই হল সেই বিপুল খাজনা লুণ্ঠনের মালিক। ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে রাষ্ট্র ও চাষীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। এ-দেশে চাষীকে

লুঠ করার জন্য আনা হল রায়তোয়ারি। যাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত আছেন—তাঁরা জানেন এই নানা ঘরানার সামন্তপ্রথার প্রতিবাদে সারা ভারত জুড়ে কতগুলি কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। পশ্চিম ভারতের তাঁতী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে—রমেশচন্দ্রের প্রশংসাধন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের লীলাক্ষেত্র বঙ্গদেশে সন্ন্যাসী, মালঙ্গী, চোয়ার, ফারিজী-ওয়াহাবি, সাঁওতাল, নীল, পাবনার চাষী বিদ্রোহ প্রভৃতি নানা বিদ্রোহ তো আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারি!

অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখার্জি তাঁর 'ইণ্ডিয়ান ল্যাণ্ড সিস্টেম' গ্রন্থে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে এক বিশেষ ধরনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলেছেন (পৃ. ৪৩)। তাঁর মতে আকবরের জাবতি প্রথায় ছিল এক ধরনের রাষ্ট্রীয় ভূস্বামিত্ব। অর্থাৎ কর্ষকের সঙ্গে রাষ্ট্র সোজাসুজিভাবে বন্দোবস্ত করতো। আকবরের উত্তরাধিকারীরা মধ্যসত্বভোগী ব্যবস্থার উপরে নির্ভরশীল হতে বেশী আগ্রহী হন। ফলে গ্রামের প্রধান সে প্রথায় ব্যক্তিকৃষকের চেয়ে বেশী মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায়ঃ আওরঙ্গজেবের কালে ভূমি ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায় বার্ষিক বা অস্থায়ী বন্দোবস্ত-রহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত ভিত্তিক। এর ফলে গ্রাম-প্রধান, জোত-অধিকারী, জায়গীরদার অথবা অন্যবিধ পাট্টানানদের সাধারণ নাম জমিদার বলে উল্লেখ করা হতে থাকে। অর্থাৎ ইংরেজের দেওয়ানী দখলের কালে (১৭৬৫) এ দেশে এক ধরনের মধ্যসত্ব-ভোগীর উদ্ভব ঘটেছিল। অবশ্য সে ব্যবস্থায় চাষীর অধিকার বরবাদ হয়ে যায়নি।

রাধাকুমুদবাবুও বৃটিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেননি যে বৃটিশ-পূর্ব এই 'জমিদারী' প্রথায়, (১) জমি ছিল চাষীরই অর্থাৎ সে উত্তরাধিকারসূত্রে জমি ভোগদখলের অধিকারী ছিল, সে যদি ঐ গ্রামের অধিবাসী (খোদকস্ত বা মিরাসী) হতো। তাই দেখা যায়, আবওয়াব ও অন্যবিধ উপকরের চাপ বাড়লেও এমন কি তার খাজনা প্রচলিত হারের (নিরিখ) বেশী বাড়ানো চলতো না। (২) জমি ক্রয় বা বিক্রয়যোগ্য ছিল না। খোদকস্ত বা মিরাসী প্রজাদের অধিকার পাইকস্ত বা 'উপরি' প্রজাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল। সাধারণত চাষী উচ্ছেদ হতো না, হলেও জমি জমিদারের খাস হয়ে যেত না। এক কথায় জমি কখনই কৃষকের হাত ছাড়া হতো না। খোদকস্ত ও মিরাসীদের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য অবশ্যই প্রযোজ্য। (৩) জমিদারদের দেয় রাজস্ব স্থির ছিল এবং তাঁরা নিজ এলাকায় ছোটখাট শাসনকর্তা ছিলেন বলে—প্রথা-

পরম্পরায় তাঁরা তাঁদের আঞ্চলিক সুখ সুবিধা ও উৎপাদন বৃদ্ধির এবং সে বিচারে বিশেষভাবে সেচ ব্যবস্থার প্রতি নজর দিতেন। অর্থাৎ এ ব্যবস্থা অনেকখানি ছিল এশীয় ব্যবস্থার [ভারতে বর্ণাশ্রমধর্মভিত্তিক শ্রমবিভাজন, গ্রাম সমাজ, এশীয় স্বৈর-তন্ত্রের অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতি] কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত এক ধরনের 'আধুনিকী-করণে'র রূপ।

মার্কস বলেছিলেন, "প্রাচ্য সরকারের কখনো এই তিনটির বেশী বিভাগ ছিলনা, কোষাগার (স্বদেশ লুণ্ঠন), যুদ্ধ (স্বদেশ ও বহির্দেশ লুণ্ঠন) এবং পাবলিক ওয়ার্কস (পুনরুৎপাদনের ব্যবস্থা)। বৃটিশ সরকার ১নং ও ২নং চালিয়েছে বেশ সঙ্কীর্ণ প্রেরণায় এবং ৩নং-কে একেবারেই বাদ দিয়েছে, ফলে ধ্বংস পাচ্ছে ভারতের কৃষি" (মার্কস সমীপে এঙ্গেলস ৬.,৬.,১৮৫৩)। ১৯০১-সালে রমেশচন্দ্রের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখতে বসে বুকাননের বিবরণকে (১৮০৮-১৮১৫) তুলে ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকায় জমিদাররাই নিজ ব্যয়ে সেচ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখছে, অথচ রায়তোয়ারি ব্যবস্থায় তা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে বলে যে যুক্তি দেখাচ্ছেন—ইংরেজ শাসনকালে পাবলিক ওয়ার্কস বাদ দেবার ব্যাপারটি মনে রাখলে এ ধরনের যুক্তির সারবত্তা থাকেনা। বিশেষভাবে যখন দেখি দ্রুত স্তরপরম্পরায় মধ্যসত্ত্বভোগী তৈরী হয়ে যাচ্ছে, বুকাননের উদ্ধৃতি তখন কি আর কাজে আসে ? অথচ রমেশচন্দ্র ঠিকই ধরেছিলেন যে ভারতে কেন্দ্র পরিচালিত সেচ ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী। ইংরেজপূর্ব প্রতিটি যুগেই কেন্দ্রীয় রাজশক্তি সেচ-ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ সচেষ্ট থাকতেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত সেচ ব্যবস্থার অত্যন্ত সমর্থক ছিলেন। যখন তিনি 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ড লিখছিলেন তখনই কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় বিস্তৃত এলাকাতেও সেচব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে—পুকুর ও সেচখালগুলি মজে গেছে। অথচ তাঁর কাছে 'নতুন' জমিদাররা এই সেচ অব্যাহত রাখার জন্য প্রশংসিত হচ্ছে—অন্তত বুকাননের উদ্ধৃতি সেই ইঙ্গিতই দেয়। প্রসঙ্গান্তরে, রমেশচন্দ্র বাষ্পীয় রেলপথ প্রবর্তনের বিরোধিতা করেছেন। বলদটানা রেলপথ বরং তাঁর কাছে জরুরী। জরুরী দাঁড়ি মাঝিদের রুজিরোজগার। সে প্রসঙ্গে ইংরেজ-যে সেচ ব্যবস্থা বাড়াবার সমর্থক নয়—এ ব্যাপারটা তাঁরও নজরে এসেছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সেচ ব্যবস্থা রক্ষা করতে পারে, এমন এক অদ্ভুত স্ববিরোধিতাও তাঁর রয়ে যায়। ১৮৫৩-এ মার্কস চমৎকারভাবে বলেছেন, "জমিদারী প্রথার এক খোঁচায় ভূমিতে বাংলা প্রেসিডেন্সীর লোকেদের বংশানুক্রমিক স্বত্ব ঘুচে গিয়ে তা বর্তায় জমিদার নামক দেশীয় খাজনা আদায়কারীর

ওপর। মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ প্রবর্তিত রায়তোয়ারি প্রথায় ভূম্যধিকারী, মৌরশী, জায়গীর ইত্যাদির দাবিদার দেশীয় অভিজাতবর্গ সাধারণ জনগণের সঙ্গে নেমে আসে একত্রে স্ব-কর্ষিত ছোটো ছোটো জমির মালিকানায়, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মালিকানার অনুকূলে।...ভূতপূর্ব বংশানুক্রমিক উচ্ছন্ন ভূমিমালিকগণের উপর অপ্রশমিত ও অসংযত লুণ্ঠন চালানো সত্ত্বেও আদি জমিদাররা কোম্পানির চাপে অচিরেই অন্তর্হিত হয় ও তার জায়গা নেয় ব্যবসায়ী দাঁওবাজেরা, সরকারের খাস তত্ত্বাবধানে দেওয়া মহাল ছাড়া বাংলার সমস্ত জমিই এখন এদের হাতে। এই দাঁওবাজেরা পত্তনি নামক বিভিন্ন জমিদারী প্রজাবিলির প্রবর্তন করেছে। বৃটিশ সরকারের প্রসঙ্গে নিজেদের মধ্যস্বত্বভোগী অবস্থায় সন্তুষ্ট না থেকে তারাও আবার পত্তনিদার নামক 'বংশানুক্রমিক' মধ্যস্বত্বভোগীর একটা শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে, এরা আবার তৈরী করেছে দর-পত্তনিদার ইত্যাদি—ফলে গড়ে উঠেছে মধ্যস্বত্বভোগীদের একটা নিখুঁত বহু ধাপবিশিষ্ট ব্যবস্থা, যা তার গোটা ভার চাপাচ্ছে হতভাগ্য কর্ষকের উপর। আর মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রায়তন্ত্রের ক্ষেত্রে, এ প্রথা অচিরেই বাধ্যতামূলক চাষের প্রথায় অধঃপতিত হয়। জমির সমস্ত মূল্য অন্তর্ধান করে...। অর্থাৎ বাংলায় পাচ্ছি ইংরেজী ল্যাণ্ডলর্ডইজম, আইরিশ মধ্যস্বত্ব প্রথা, জমিদারকে কর সংগ্রাহকরূপে অষ্ট্রীয় প্রথা এবং রাষ্ট্রকে ভূস্বামী করার এশীয় প্রথার সমাহার। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে পাচ্ছি এক ফরাসী চাষীমালিক যে সেই সঙ্গেই আবার এক ভূমিদাস এবং রাষ্ট্রের এক ভাগচাষী" (ভারত, নিউ ইঅর্ক ডেইলি ট্রিবিউনে প্রকাশিত প্রবন্ধ, ১৯শে জুলাই, ১৮৫৩)। দাঁওবাজদের এবং মধ্যসত্বভোগী ধাপ পরম্পরার খাজনা লুণ্ঠনের ফলেও ভারতে সেচব্যবস্থার বিকাশ হতে পারে এমন কথা রমেশচন্দ্র কিভাবে ভেবেছিলেন, মনে হলেও বিস্ময়বোধ হয়!

নানা কায়দায় পাওয়া উদ্বৃত্ত ব্যবহার করতো ইংরেজরা কেমন ভাবে? এদেশে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মুখ্যত বিনিময় হতো দু-ভাবে। এক, প্রথম দিকে তারা ভূমি-রাজস্ব ইত্যাদি থেকে অর্জিত টাকায় এদেশে জোর করে কারিগরকে কম দাম দিয়ে, ব্যবসায়গত এবং পুঁজিগত বিপুল উদ্বৃত্তের অধিকারী হতো। এর নাম লগ্নি। শিল্পপুঁজিবাদের মূলধন সঞ্চয়ের আদি উপকরণের মধ্যে থাকছে এই মার্কেনটাইল দস্যু নীতির কার্যকারিতা। তবু এ-ব্যবস্থায় এ-দেশী পণ্য একেবারে অচ্ছুৎ হয়ে যাচ্ছে না। দ্বিতীয় ধাপে ঋণ পরিশোধের নামে এবং এদেশে বিলাতি পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে অর্থ চলে যেতো বিলাতে। এর এক বিপুল অংশই অর্থাৎ কোম্পানির মালিকানার লভ্যাংশ, সুদ এবং

বিলাতে দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের মূল্য বাবদ বৃটেনে প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। এর নাম হোমচার্জ।

এ সবের সঙ্গে যুক্ত ছিল ভারতের বিরুদ্ধে অসম বাণিজ্য-হার। আমাদের দেশের গ্রামসমাজ ভেঙে যাবার ফলে, এবং কারিগরভিত্তিক শিল্প উৎপাদন গুঁড়িয়ে যাবার ফলে, ভূমি থেকে উৎপাদিত জমিদারের খাজনা এবং কৃষকের শিল্পপণ্য কেনার ব্যয়—সবই মিছিল করে চলে যাচ্ছিল মুনাফা, সুদ, নানা চার্জ এবং বিলাতী জিনিসের মূল্য বাবদ। এদেশে উৎপাদিত কাঁচামাল প্রথমত অধিক উদ্বৃত্ত মূল্য [দ্রব্যমূল্য থেকে শ্রমিকের টিঁকে থাকার উপকরণভোগের মূল্য বাদ দিলে যা পাওয়া যায়] যেমন যোগান দিয়েছে, তেমনি আবার বাণিজ্যখাতে অসম বাণিজ্যহারের দাক্ষিণ্যে অধিকমূল্যের জিনিস কমদামে বৃটিশ পুঁজিপতি পেয়ে গেছে। এ-ভাবে ভারতে লুণ্ঠন বেড়েছে। জমিদারী প্রথা বা পলিগার প্রথা, অথবা গ্রামসমাজ ভিত্তিক প্যাটেল প্রথা, যাই হোক না কেন, দেশে স্বাভাবিক অর্থনীতিভিত্তিক (natural economy) বিনিময়ের ফলে সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ডের অধিবাসী আত্মপরায়ণ আবৃতচৈতন্য গ্রামসমাজের যে মানুষ ছিল, তার সামাজিক-আর্থনীতিক অবস্থান চূর্ণ হয়ে গেল এই দারুণ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আঘাতে। মার্কস একে বলেছিলেন 'এশিয়ায় জ্ঞাত ইতিহাসে সম্ভবত সর্ববৃহৎ সমাজবিপ্লব'।

ছয়

'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস'-এর এই বিশেষ খণ্ডটি প্রকাশের অন্য গুরুত্ব রয়েছে। এ-বইখানিতে তিনযুগের বৃটিশ পুঁজিবাদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম যুগ, প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের যুগ। যে সময়ের প্রায় অব্যবহিত পূর্ব ও সমসাময়িক ছিল "আমেরিকায় সোনা ও রূপা আবিষ্কার ও আদিম অধিবাসীদের নির্মূল করে দাসত্বে ও খনিতে সমাধিস্থকরণ। পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে জয় ও লুণ্ঠন, আফ্রিকাকে কালোচামড়ার বাণিজ্যিক শিকারের জন্য বাথানে পরিণত করে পুঁজিবাদী উৎপাদনের যুগের গোলাপী উষার ইঙ্গিত বহে আনার যুগ। এইসব সরল ঘটনাবলীই প্রাথমিক সঞ্চয়ের মূল গতিবেগমূলক বিষয়। এদের পেছন পেছন আসে ইয়োরোপীয় জাতিগুলির বাণিজ্য যুদ্ধ। পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত তার রণাঙ্গন" (ক্যাপিটাল ১ম খণ্ড, পৃ ৭৫১)। আর এরই পরে এসেছে দ্বিতীয় যুগ অর্থাৎ যখন "জাগ দিয়ে পাকানো বাণিজ্য ও নৌচালনার ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায়…উপনিবেশগুলি সদ্য গড়ে ওঠা শ্রমশিল্পের বাজারের জন্ম দিল এবং বাজারে একচেটিয়ার ফলে গড়ে তুলল বর্ধিত পুঁজি সঞ্চয়। ইয়োরোপের

বাইরে অশেষ লুঠতরাজ, দাসবানানো এবং খুনের মধ্য দিয়ে যে সম্পদ দখল করা হয়, তা ঐ সব লুণ্ঠনকারী দেশে ফিরে এসে পুঁজিতে রূপান্তরিত হল" (ঐ, পৃ ৭৫২)। আর তৃতীয় যুগ, বৃটেনে শিল্প বিপ্লবের—এ দেশে শিল্পচুর্ণিকরণের। চতুর্থ যুগ, ফিনান্স পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী যুগ এই খণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে পড়ে না।

ভারতের আর্থনীতিক সম্পদের উৎসগুলিকে বিশুষ্ককরণের পথেই এসেছে বৃটেনে শিল্পবিপ্লব ও আধুনিক ইংলণ্ডের অভ্যুদয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের আর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সমাজ জীবন যে ভারতের পূর্বাঞ্চল, বিশেষভাবে বঙ্গদেশের তুলনায় এগিয়ে ছিল, এমন কথা বোধ করি জোর গলায় বলা যায় না। ১৭৫০-এ পশম শিল্পই ছিল বৃটেনে মুখ্য শিল্প। বেইনস তাঁর তুলা শ্রমশিল্পের ইতিহাস (পৃ ১১৫)-এ বলেছেন "তুলাজাত উৎপাদনে ১৭৬০ পর্যন্ত যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হতো, ভারতের মতই ছিল তা অত্যন্ত সরল ধরনের"। অবশ্য বৃটেনে শ্রেণীবিভাগ, প্রলেটারিয়েট-এর সৃষ্টি এবং বুর্জোয়া শাসনের নিশ্চিত অবস্থা সৃজনের মধ্য দিয়ে শিল্পমূলক পুঁজিবাদের অগ্রগতির পথ প্রশস্তই ছিল। বাণিজ্যমূলক পুঁজির ভিত্তি গড়া হয়ে গেছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে যে প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয় ছিল শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদের অগ্রগতির জন্য তার চেয়ে ঢের বেশী প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের প্রয়োজন ছিল। রজনী পাম দত্ত তাঁর 'ইণ্ডিয়া টু-ডে' (মনীষা সংস্করণ, পৃ ১০৯) গ্রন্থে চমৎকার-ভাবে দেখিয়েছেন যে "তারপরই এলো ১৭৫৭-এর পলাশীর যুদ্ধ, আর ভারতের সম্পদ ক্রমাগত বর্ধমান স্রোতে ইংলণ্ড প্লাবিত করে দিতে থাকলো।......তার অব্যবহিত পরেই সেই যন্ত্র আবিষ্কারের মহাপ্রবাহ শুরু হল যা শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটায়। ঐ আবিষ্কারগুলি কাজে লাগাবার জন্য যে সামাজিক ব্যবস্থা দরকার ছিল, তেমন ব্যবস্থা তখন জন্ম নিয়েছে সে দেশে"। অর্থাৎ সে সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটেছে, জন্ম নিয়েছে উৎপাদন যন্ত্রের উপরে মালিকানাহীন নির্বিত্ত মজুরী-শ্রমিক, প্রোলেটারিয়েট। ১৬৮৮-এর তথাকথিত গৌরবময় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ বৃটিশ রাষ্ট্রশক্তিতে আধিপত্য বিস্তার করে। সুতরাং কি রাষ্ট্রশক্তি কি সামাজিক পরিবেশ সবই পুঁজিবাদ বিকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। প্রয়োজন ছিল যে প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের—ভারত পলাশী যুদ্ধের ফলে এক ধাক্কায় ইংলণ্ডে তার বিপুল প্রবাহ ঘটিয়ে দিল। "সবাই জানেন ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে রাজনৈতিক শাসন ছাড়াও, চা-ব্যবসার নিরঙ্কুশ একচেটিয়া মালিকানা ও তার সঙ্গে সাধারণভাবে চীনে বাণিজ্যের এবং ইয়োরোপে ও ইয়োরোপ থেকে পণ্য সামগ্রীর আমদানি রপ্তানির মালিক হয়ে বসে। কিন্তু

ভারতের উপকূল বাণিজ্যে ও দ্বীপপুঞ্জগুলির সঙ্গে বাণিজ্যে এবং তারই সঙ্গে ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে, কোম্পানির উচ্চবর্গের কর্মচারীদের বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ছিল। লবণ, আফিম, সুপারি এবং অন্যান্য পণ্যগুলি ছিল সম্পদ অর্জনের অশেষ খনি বিশেষ। কর্মচারীরা নিজেরাই দাম ঠিক করতো এবং যেমন ইচ্ছা ভারতীয়দের লুঠ করতো। গভর্ণর জেনারেল ব্যক্তিগত লুঠতরাজে অংশ নিতেন, তাঁর অনুগৃহীতরা ঠিকাদারী পেত। এমন অবস্থায় সোনা বানানেওয়ালা কল্পিত রাসায়নিকদের চেয়ে তারা শূন্য থেকে সোনা বানাতে পারতো। বিপুল সম্পদ একদিনের মধ্যে যেন ব্যাঙের ছাতার মতো জন্ম নিল। প্রাথমিক সঞ্চয় এক শিলিং অগ্রিম না দিয়েই বর্ধিত হতে শুরু করলো" (ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, পৃ ৭৫২-৭৫৩)। আর "ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, সরকারী ঋন, বিপুল ট্যাক্সের বোঝা, শিল্প সংরক্ষণ, বাণিজ্যযুদ্ধ, এবং ইত্যাদি, সত্যিকারের শ্রমশিল্প উৎপাদনের যুগের এই সংহতিবৃন্দ, আধুনিক শিল্পের সূত্রপাতে বিপুলভাবে দৈত্যাকার রূপ ধারণ করতে শুরু করে" (ঐ, পৃ ৭৫৭)।

রমেশচন্দ্র দত্তের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি চমৎকার ভাবে এই লুণ্ঠনের ইতিবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছেন। এবং তার সঙ্গে ভূমি-রাজস্ব লুণ্ঠনের দিকটি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

একটু প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক্। ভারতেও কি শিল্প বিপ্লবের মতো অবস্থা জন্ম নিতে পারতো না? বর্তমানে ভারতের অর্থনৈতিক-ইতিহাস লেখকদের মধ্যে অনেকের মনে এমন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ইংরেজদের ভারতে ক্ষমতাদখলের যুগে এদেশে সামাজিক ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়, শ্রেণীবিভাজন এসব কি পুঁজিবাদী বিকাশের পক্ষে, মুদ্রা-পণ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কি একেবারেই পরিপন্থী ছিল?

পুঁজিবাদ বিকাশের অন্যতম প্রাথমিক ভিত্তিই হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মূলধনের সহায়তায় কি কৃষি কি শ্রমশিল্পে উৎপাদন। এ ব্যবস্থায় সব উৎপাদনই মুনাফার প্রয়োজনেই করা হয়ে থাকে। শ্রমশক্তি এ ব্যবস্থায় নিজেই পণ্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজি দ্বারা শোষিত হবার মতো 'স্বাধীন' অথচ নির্বিত্ত শ্রমিকশ্রেণী থাকতে হবে। এ ব্যবস্থার জন্য "অর্থনৈতিক পূর্বসর্ত হল উৎপাদনের উপায়গুলির একটি শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভবন, যারা সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্রাংশমাত্র। এবং ফলস্বরূপ একটি নির্বিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, যাদের পক্ষে শ্রমশক্তি বিক্রয়ই কেবলমাত্র জীবিকা উপার্জনের উপায়। উৎপাদন মূলক কাজকর্ম এই নির্বিত্ত শ্রেণীর কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতার ফলেই সংঘটিত হয়না, এবং মজুরি-কনট্রাক্ট-এর উপরেই তার ভিত্তি। এধরনের সংজ্ঞায় স্বাধীন

হস্তশিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা বাদ পড়ছে। হস্তশিল্পে উৎপাদকদের নিজেদেরই আছে অতি সাধারণ উৎপাদনের উপকরণগুলি, আবার তারাই তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রেতা…" (মরিস ডব, স্টাডিজ ইন দ্য ডেভেলপমেণ্ট অব ক্যাপিটালিজম্, পৃ. ৭)।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দিকে রাজস্ব-ইজারাদার জমিদারী ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে গেছে। কেন্দ্রীয় রাজশক্তি বনাম চাষী—অর্থাৎ এশীয় ব্যবস্থার এই যে বিশেষ প্রকাশ, যেখানে শেষ বিচারে কেন্দ্রীয় রাজশক্তিই ভূস্বামী এবং চাষী (গ্রাম হিসেবে নিত্য নতুন হিসেব নিকাশের মধ্য দিয়ে) খাজনা দেয় রাষ্ট্র-ভূস্বামীকে, সে ব্যবস্থাও বদলাতে শুরু করেছিল। ভারতের পূর্বাঞ্চলে সম্রাট ও চাষীর মধ্যবর্তী সামাজিক স্তর হিসেবে জমিদারের সূত্রপাত ঘটেছিল। বৃটিশ শাসনের সূত্রপাতের যুগে "বঙ্গদেশে ভূমি-রাজস্ব বংশ পরম্পরায় নগদ টাকায় শোধ করা হতো। ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ কোনো জানা নীতি দ্বারা নির্দিষ্ট ছিল না। উৎপাদনের অংশ হিসেবে সমস্ত কিছু এবং সেই অংশের আর্থিক মূল্যায়ন দীর্ঘকাল আগেই অন্তর্হিত হয়ে গেছে। যে পরিমাণ সাত্যকারে তোষাখানায় জমা দেওয়া হতো, যা মোট সংগ্রহের যে পরিমাণ জমিদার না দিয়ে পারতো না, সেটুকুই দিত। ছোট এস্টেটের মালিক বা গ্রামের মোড়লের সাহায্যে চাষীদের কাছ থেকে যা পাওয়া যেত, তা 'পরগণা হার' বলে এক হারে আরোপ করা হত।…কিন্তু এ হার বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন হত। এর উপরে কিছু যোগ করে, কিছু আরোপ করে জমিদার যেমন চাইতো বা যেমন আরোপ করতে পারতো - তেমনি আদায় করতো" (ল্যাণ্ড রেভিন্যু এ্যাণ্ড টেনিওর ইন বৃটিশ-ইণ্ডিয়া : বি. এইচ. ব্যাডেন-পাওয়েল, ১৯১৩ সংস্করণ, পৃ. ৪৩)। অর্থাৎ পুরনো এশীয় সামন্ততন্ত্রের রাষ্ট্রভিত্তিক চাপ ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। বৃটিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অন্তর্বর্তী এক রাজস্ব-ইজারা ব্যবস্থার পরে—'জমিদারের' ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপ পরিগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই প্রথার বিলোপ সাধন ঘটালো বটে, কিন্তু এই চিরস্থায়িত্বের বীজ মোগলশাসনের শেষ দিকেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। অর্থাৎ জমিদারের ব্যক্তিগত মালিকানার আবির্ভাব ঘটছিল। অথচ কৃষকের অধিকারও সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষেই—যাকে বৃটিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাকচ করে দেয়।

গ্রামসমাজগুলি এ-সময় ক্রমশই ভেঙে পড়ছিল। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় কৃষি যে পুঁজিবাদ-বিকাশের দিকে যেতে পারতো না, এমন কথা বলা যায় না। যে-মুহূর্তে কৃষিজমির মালিকানা ব্যক্তিগত মালিকানায় রূপান্তরিত হয়, অথচ সঙ্গে

সঙ্গে শ্রমশিল্পের ব্যাপকতা জন্ম লাভ করে,—তখন পণ্য-মুদ্রা সম্পর্ক (Commodity-Money Relations) গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কৃষিতে শিল্পের কাঁচামাল তৈরীর দিকেই জমিদার ও স্বাধীন চাষীদের ঝুঁকেপড়া স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বৃটেনে 'এনক্লোজার আন্দোলন' জমিদারদের ব্যক্তিসাপেক্ষ স্বার্থবিকাশেরই নীতি ছিল। ভারতের পূর্ব'ঞ্চলে, শিল্প উৎপাদনের যোগ্য পরিবেশের বিস্তার গ্রামজীবনেও পুঁজিবাদের প্রসার ঘটাতে পারতো। কিন্তু সম্ভব হল না কেন? প্রথমত, শিল্পবিকাশের ব্যাপারটাই চূর্ণ করে দিল বৃটিশ শাসন। ফলে শিল্প ও কৃষিবিপ্লব হাতে হাত মিলিয়ে এগোতে পারলো না। এমনকি এ-দেশে যে বিপুল প্রাথমিক সঞ্চয় জন্ম নিয়েছিল, গড়ে উঠেছিল যে ঋণ-সঞ্চালন ব্যবস্থা তাদের ভরাডুবি হল বৃটিশ কোম্পানির নিরঙ্কুশ অর্থলোলুপতায়। এ-দেশের সম্ভাব্য শিল্পবিপ্লবকে কার্যকরী করার জন্য যোগ্য, ইতিপূর্বে সৃষ্ট মূলধনও জাহাজ-বন্দী হয়ে চলে গেল বৃটেনে শিল্প বিপ্লব ঘটাতে।

ভারতে গ্রামসমাজগুলি ভেঙে পড়ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে থেকেই। সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের ভারত তত্ত্ববিদেরা চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামসমাজের বিকাশ সম্পর্কে গবেষণাভিত্তিক নানা তথ্য দিয়েছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে এই গ্রামসমাজগুলিতে নানা কায়দায় সমাজগত ও ব্যক্তিগত জমি ভোগদখলের অধিকার ছিলই। গ্রামসমাজের অধিকার মুখ্যত পতিত জমি, গোচারণ, উত্তরাধিকারহীন জমিতেই বর্তাতো। একই সমাজের বাইরের ব্যক্তির কাছে জমি বিক্রয়ের অধিকারে কিছু বাধা নিষেধ ছিল। জমিতে ব্যক্তিগত ভোগদখলের অধিকার ছিল বটে, কিন্তু তা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার নয়। অনেক সময়ই জমির অধিকারীরা নিম্নবর্ণের মানুষদের দিয়ে জমি চাষ করিয়ে নিতে পারতো, এবং কর ইত্যাদি দেবার পর ফসলের অধিকার তার নিজেরই থাকতো। রমেশচন্দ্রও অবশ্য ইংরেজ অধিকারে গ্রামসমাজের আর্থনীতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পতনের দিকটি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বিবৃত করেছেন।

গ্রামসমাজের পূর্ণসদস্য—সাধারণত উচ্চবর্ণের ব্যক্তিই হতেন। তাঁদের যেমন জমিতে ছিল পূর্ণ কর্তৃত্ব, তেমনি ছিল গ্রামের কুটীর শিল্পী, কারিগর ও ভৃত্যদের কাছে সেবা পাবার পূর্ণ অধিকার। গ্রামসমাজের জমির স্থায়ী বা খোদকস্ত ও অস্থায়ী বা পাইকস্ত প্রজাদের কাছ থেকে তারা খাজনা তোলবারও অধিকারী ছিল। তারা নিজেরা সামন্তবাদী খাজনা দিত বটে, আবার নিজেরাও গ্রামসমাজের যারা পূর্ণ সদস্য নয়, তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে নিত।

এ-ধরনের সমাজে অনেকখানি প্রশাসনমূলক স্বনির্ভরতা ছিল। সমাজের ক্ষমতা সামান্য সংখ্যক কেষ্টবিষ্টুর হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল।

এ-ধরনের গ্রামসমাজ ১৬ থেকে ১৮ শতক জুড়ে আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছিল। সমাজে ব্যক্তিগত ও সমাজগত দু-ধরনের জমি ভোগদখলের অধিকারের বৈপরীত্য থেকেই এ পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল—অর্থাৎ সম্পত্তির তথা সম্পদ মালিকানার অসমতা ক্রমশ গভীরতর ও ব্যাপকতর হচ্ছিল। এই সম্পত্তির অসমতা পণ্য-মুদ্রা সম্পর্কের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যেতে থাকে। গ্রামে টাকার বিচারে জনসংখ্যার অবস্থান নিরূপণ শুরু হয়ে যায়। এ সমস্ত উপাদানগুলি কৃষকের উপরে ক্রমাগত শোষণের চাপ বাড়িয়ে দিতে থাকে। এ-ভাবে একদিকে ভূমি অধিকারের যেমন কেন্দ্রীভবন ঘটে, অন্যদিকে 'ধনীকৃষকেরা ভাড়া করা শ্রমিক দিয়ে জমি চাষ করতে শুরু করে।' (এ. আই. চিচেরভ : ইণ্ডিয়া : ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য ১৬—১৮ সেঞ্চুরিজ, পৃ. ১৮)। চিচেরভ লক্ষ্য করেছেন যে অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং ঊনাবংশ শতকের শুরুতে এই গ্রামসমাজের বিচূর্ণিকরণ এমন অবস্থায় এসে পৌছায় যে "বঙ্গদেশের এবং মালাবারের অনেকগুলি জেলায়···গ্রামসমাজগুলি সম্পূর্ণভাবে বা অনেকখানি ভেঙে পড়ে। অন্ধ্রর কোনো কোনো জেলায় এবং মহীশূরে গ্রামসমাজ নতুন রূপে বদলে গেছে যেখানে চাষীর উৎপাদন ক্ষমতার উপরে ভিত্তি করে জমির পুনর্বণ্টন ঘটে গেছে। কিন্তু পূর্ব তামিলনাদের কোনো কোনো জেলায়, মহারাষ্ট্রে এবং বিশেষভাবে যমুনা ও গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এ পরিবর্তন খুব একটা এগোতে পারেনি" (ঐ পৃঃ ১৯)।

হস্তশিল্প মুখ্যত কৃষিজীবী ব্যক্তিরই অন্যবিধ উপজীবিকা ছিল। বর্ণভিত্তিক উৎপাদন সমাজে এক ধরনের শ্রমগত স্থিতিশীলতা এনেছিল। গ্রামীণ সমাজই ঐ হস্তশিল্পগুলিকে আভ্যন্তরীণ বার্টারের মধ্য দিয়ে রক্ষা করে চলতো। কিন্তু গ্রামসমাজের ভেঙে পড়ার যুগে "ব্যক্তিগত ভূমি ভোগদখলের উপরে একটি বিশেষ ভূমিকা এসে পড়ে এবং পণ্য-মুদ্রা সম্পর্ক গভীরভাবে গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করে"। আর এ সবের ফলে গ্রাম-সমাজভিত্তিক হস্তশিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক সংগঠন ভেঙে পড়তে থাকে এবং বাজার ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। ফলে গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের উৎপাদন মুদ্রায় বিনিময় হতে শুরু করে এবং ন্যাচারাল ইকনমির মৃত্যুঘণ্টা বাজতে থাকে। একদিকে কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের চোখে পড়ছে। যেমন ক্রেতার বরাত অনুযায়ী হস্তশিল্পী সামগ্রী তৈরী করছে, কাঁচামাল হয় ক্রেতাই যোগান দিচ্ছে অথবা হস্তশিল্পী

নিজেই যোগান দিচ্ছে। অথচ অন্য সূত্রপাতও দেখা দিয়েছে, যেমন জিনিসের দাম টাকায় বা জিনিসে মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ-সব কিছুই পণ্য উৎপাদনের পূর্বসূরি। যে-অবস্থায় হস্তশিল্পী টাকায় দাম পাবে, এবং যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি বাজার থেকে সে কিনতে শুরু করবে তখনই এসে পড়বে পণ্য উৎপাদনের ব্যাপার। ইংরেজ অধিকারপূর্ব বঙ্গদেশে অন্তত এ ব্যবস্থারও সূত্রপাত ঘটে যায়।

যাঁরা জগৎশেঠ পরিবারের অর্থপরিচালনা ব্যবস্থার কথা অথবা কোম্পানির ক্ষমতা দখল করার আগে 'দাদনি' ব্যবস্থার কথা জানেন [ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, এন. সিংহ, পৃঃ ১১৮] তাঁদের নিকটে রাজস্ব আদায়ের বাহন হিসেবে সিক্কা টাকার উদ্ভব, এবং সেই টাকা পুরনো টাকার বদলে জমিদারদের কাছে পৌছে দেবার ব্যাপারে জগৎশেঠ পরিবারের ভূমিকা, ভূমি-রাজস্বও কৌশলে ব্যবহার করে কেমনভাবে বিপুল মূলধন সঞ্চয়ের পথ দেখায় এসব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ার কথা। জগৎশেঠ পরিবারের মুদ্রা নিয়ে ব্যবসা, 'হুণ্ডি'র কায়দায় অর্থবহন যে ব্যাঙ্ক ব্যবসার চমৎকার পূর্বশর্ত দেখিয়ে দেয় তাও লক্ষণীয়। ঢাকা-মুর্শিদাবাদ-শান্তিপুর-মালদা ইত্যাদি অঞ্চলে বস্ত্র বয়নের মধ্যদিয়ে কারখানা ব্যবস্থার উদ্ভবও ঘটে। অথচ এক ধাক্কায় সবই বিলয়ে চলে গেল। ভারতে যে শিল্প-বিপ্লব প্রত্যাশিত ছিল তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। (ইরফান হাবিব, পোটেন-শিয়ালিটিজ অব ক্যাপিটালিস্ট ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য ইকনমি অব মোগল ইণ্ডিয়া, জার্নাল অব ইকনমিক হিস্ট্রি, ২৯ তম খণ্ড, ১৯৬৯, পৃঃ ৩৯-৭৮)

শিল্পবিকাশের এই সম্ভাবনার দিকে রমেশচন্দ্র দত্তের নজর পড়েনি। অবশ্য স্বদেশী শিল্প যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেল এটা তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। কিন্তু গ্রামসমাজের প্রাচীন ব্যবস্থাপনার প্রতি তাঁর ঐতিহ্যবাদী ঝোঁক, গ্রামসমাজের অস্তিত্বের প্রতি তাঁর মমতা, অন্যদিকে গ্রামসমাজ ভেঙে গিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা উদ্ভবের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁকে স্ববিরোধী করে তুলেছে। এ তাঁর শ্রেণীগত স্ববিরোধিতা। তিনি মনে করেছিলেন, গ্রামাঞ্চলে বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থার জন্য গ্রামীণ উচ্চপদস্থরাই যথেষ্ট যোগ্য, কিন্তু লক্ষ্য করেছিলেন গ্রামসমাজের অর্থনীতির ভিত্তিই ইংরেজ ভেঙে দিয়েছে।

ইংরেজ-পূর্ব ভারতে যা কিছু ছিল, তার সব কিছুই মহৎ ছিলনা। বরং গ্রামসমাজ ভেঙে দিয়ে ইংরেজরা ঐতিহাসিক দায়িত্বই পালন করেছিল। মানুষকে সামনে এনে প্রথাকে পরাজিত হতে বাধ্য করা এটা ইংরেজদের একটি বড় কৃতিত্ব। কিন্তু এ কৃতিত্ব এ দেশে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গী হতে পারলো না—তার মূল কারণও রমেশচন্দ্রই দেখিয়েছেন—তা হল শিল্পচূর্ণিকরণ ও সম্পদ নিকাশ। এবং এই

সম্পদ নিকাশের উপরেই ইংরেজের সাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল, একথা আমরা আগেই বলেছি।

সাত

আজকের দিনের চোখে বহু কিছু বিতর্কমূলক মনে হলেও ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের এই বিশেষ আকর গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা আজও ফুরোয় নি। রমেশচন্দ্রের ঝোঁক ছিল মুখ্যত কৃষিবিকাশ ও দুর্ভিক্ষ নিরাকরণের দিকে। তিনি জোরালো ভাবে তাঁর মনোভাব ব্যক্তও করেছেন। যদিও তাঁর বহু মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গী আজ আমাদের কাছে বিতর্কের ব্যাপার হয়ে পড়েছে। বিতর্ক আবার উঠে পড়বে এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে যেখানে তিনি রেলপথ বনাম সেচের প্রসঙ্গটি তুলেছেন। সেখানেও তিনি কৃষিকেই মুখ্য করে, সেচ ব্যবস্থার দাবীতে রেলপথ বিকাশকে বরবাদ করতে চেয়েছেন। রেলপথকে বাহন করে শিল্পবিকাশের পথ-যে অর্গলমুক্ত হতে পারে এটা তাঁর মনে আসেনি। তিনি সব সময় ভাবছিলেন দুর্ভিক্ষের সমস্যা ও খাদ্য উৎপাদনের দিক। বৃটিশ শাসকেরা ভারতে ঘনঘন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবের জন্য দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দায়ী করেছিলেন। বলা যেতে পারে দেশের সমাজ-অর্থনীতির দিকে চোখ না ফিরিয়ে, দেশের ধন উৎপাদনের কাম্য ব্যবস্থাকে কার্যকরী না করে, ভূমিসংস্কার না ঘটিয়ে —জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘাড়ে সব দায়িত্ব দিয়ে অসহায়তা দেখানো আমাদের দেশের শাসকদের বেশ পুরনো ব্যাধি। রমেশচন্দ্র দেখিয়েছেন, ইয়োরোপের বহু দেশে ভারতের চেয়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার বেশী হলেও উনবিংশ শতকে তাদের সম্পদ বৃদ্ধিই ঘটেছিল। রমেশচন্দ্র তাঁর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সমাজ-আর্থনীতিক প্রশ্নটি তুলে ধরেছিলেন। বলেছিলেন, ভারতে প্রযুক্ত আর্থনীতিক নিয়ম অন্যদেশে প্রযুক্ত আর্থনীতিক নিয়ম থেকে ভিন্ন—এমন কথা ভাববার কোনো কারণ নেই। আসলে শিল্পবিপ্লব ছাড়া যে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে দিয়ে আর কিছু করানো সম্ভব ছিল না এবং ভূমিবিপ্লব ছাড়া কৃষি-বিপ্লবও যে সুদূর পরাহত ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক হিসেবে সে কথা অবশ্য তাঁর একবারও মনে হয়নি।

প্রথমত, একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই বিশেষভাবে। তা হল বর্তমান ভারতে ভূমি-সমস্যার দিকটি। বৃটিশই তৈরী করেছিল এই ভূমি ব্যবস্থা—এবং কোন কোন ভাবে এই বন্দোবস্তগুলি তারা চালু করেছিল এ বইখানিতে তার পুংখানুপুংখ বিবরণ পাওয়া যাবে। কোন ভারতীয় সমাজ-আর্থনীতিক পরিবেশের ফলে সেগুলি চেপে বসেছিল সেটাও বোঝা সম্ভব হবে। আসলে এক দেশের

সমাজ-অর্থনীতির বৃক্ষের গায়ে অন্য দেশী কলম বসানো হয়েছিল। মাঝের বিকৃত সমাজ-অর্থনীতির স্তরের পর স্বাভাবিক আর্থনীতিক বিকাশের দিকে পা বাড়ালে আগেকার এবং ইংরেজ সৃষ্ট বিকৃতির স্বরূপ জানা খুবই দরকার। আমরা দেখব ঈস্ট ইণ্ডিয়া বণিক কোম্পানির কর্মচারীরাও কি নিদারুণ নিষ্ঠায় তথ্যসংগ্রহের উদাহরণ রেখেছেন, দেখব তাঁদের অনুসন্ধিৎসা ও বিদ্যাবত্তা। আমাদের বর্তমান ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে সপ্রশ্ন ব্যক্তিদের এঁদের কাছে বিশদ শিক্ষা নেবার আছে। আর এ-প্রসঙ্গেই চোখে পড়বে রমেশচন্দ্রের আকাশছোঁয়া বিদ্যাবত্তা এবং ব্যাপক ও গভীর গবেষণার দিক। তাঁর তত্ত্বের কাঠামোকে বিপুল উদ্ধৃত তথ্যপুঞ্জ দিয়ে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা, তাঁর নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতার প্রমাণ দেয়। তিনি তাঁর আরব্ধ লক্ষ্যে বহুলাংশে সফলও হয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, যে কোনো ইতিহাসকারেরই মতো রমেশচন্দ্রও নিরপেক্ষ নন। তিনি ভারতীয়, বিশেষভাবে মধ্যসত্ত্বভোগী বাঙালীর দৃষ্টি দিয়ে ভারত-ইতিহাস দেখেছেন। তাঁর কাছেই শিক্ষা নিতে হবে শ্রমিক-কৃষকের দৃষ্টি দিয়ে ভারতের অর্থনীতির ইতিহাস দেখতে গেলে কেমন ভাবে দেখব।

তৃতীয়ত, এই বইখানিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী-বিকাশের বিশিষ্ট স্তরগুলি অত্যন্ত চমৎকার ভাবে ধরা পড়ে। যে ভারত বৃটেনের "অভিজাতশ্রেণী চেয়েছিল জয় করতে, ধনপতিরা চেয়েছিল লুণ্ঠন এবং মিলতন্ত্রীরা চেয়েছিল শস্তায় বেচে বাজার দখল" এবং শেষপর্যন্ত মিলতন্ত্রীরা আবিষ্কার করেছিল "যে উৎপাদনশীল দেশরূপে ভারতের রূপান্তর তাদের কাছে একান্ত জরুরী এবং সেইজন্যে সর্বাগ্রে সেচ ও আভ্যন্তরীণ পরিবহন-ব্যবস্থা তাকে দিতে হবে" (মার্কস) এ সব-কিছুর ইতিবৃত্ত পাবো বইখানিতে।

চতুর্থত, লক্ষ্য করা যাবে, রমেশচন্দ্রের ইতিহাস রচনার পরিপ্রেক্ষিত পুরো ভারতভূমি। দেখব বিদেশী শাসকের পীড়নের মধ্য দিয়েও এ সময়েই গড়ে উঠছিল ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য। এবং "যত ঘৃণ্যই হোক জমিদারী ও রায়তোয়ারি—তবু এ দুটি জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিশেষরূপ—এশীয় সমাজের অবলুপ্তির এ দুটি হল উল্লেখযোগ্য সূত্র। ইংরেজের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণীর জন্ম হয়েছে যারা আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় যোগ্যতাসম্পন্ন ও ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানে মনস্ক"। অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তি থেকে পুঁজিবাদের আধুনিকতায় মনস্কতা দ্রুত যে পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য লড়াই শুরু করবে, "যে লড়াই পর্যবসিত হবে জাতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্যে" তার ইঙ্গিত আছে গ্রন্থখানিতে।

পঞ্চমত, কোন কোন উৎস থেকে বিদেশে সম্পদ নির্গমন হয়েছিল যদি সেই উৎসগুলি সম্পর্কে আমরা সচেতন হই, তা হলে ভারতের আর্থনীতিক বিকাশের প্রয়োজনে আজকেও সঞ্চয় সংগ্রহের উৎসগুলি সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিতে তাকাতে পারি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এ-গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। তিনি আমার শিক্ষক। তাঁর নিকটে আমি ব্যক্তিগতভাবেও কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে সারস্বত লাইব্রেরী আমাকে সম্মানিত করেছেন। অনুবাদকদের প্রতিটি অনূদিত পঙ্‌ক্তি ও শব্দ আমি আমার সাধ্যানুসারে লক্ষ্য করেছি, দরকার হলে পরিবর্তন বা পরিমার্জন করেছি। নিখুঁত মুদ্রণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সত্ত্বেও মুদ্রণপ্রমাদ একেবারে এড়ানো সম্ভব হয়নি। সাল, তারিখ, সংখ্যা, পঞ্জী, ব্যক্তির নাম, উদ্ধৃতি—ইত্যাদি যথাসম্ভব সঠিক মুদ্রণের আপ্রাণ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন নথি, সাক্ষ্যপ্রমাণ, উদ্ধৃতি প্রভৃতির অত্যন্ত জটিল বাক্যাংশও অনুবাদের ব্যাপারে বিশেষ স্বাধীনতা নেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও আমার অনবধানতা অথবা অপারগতার ফলে ভুলত্রুটি থেকে যেতেই পারে। সেজন্য পাঠকের কাছে বিনীতভাবে পূর্বাহ্নেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি। যে বিপুল অধ্যবসায় ও নিষ্ঠায় অধ্যাপক অমিতাভ ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রফুল্ল রায় বইখানি অনুবাদ করেছেন, এজন্য সাম্প্রতিক বাংলা ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ রচনাকারের মতই তাঁরা উল্লেখ্য হবেন। ডঃ অশোক ভট্টাচার্য ও শ্রীবিভাস ভট্টাচার্যের প্রতি-মুহূর্তের তাড়না ও সহায়তা ছাড়া এই দীর্ঘ গ্রন্থের পাঠ আমার পক্ষে সম্পাদনা করা সম্ভব ছিল না।

বইখানি যে-কোনো পাঠকের কাছে উপন্যাসের মতো চমকপ্রদ মনে হবে। পড়ার মধ্য দিয়ে হবে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বইখানির ইংরেজী-পাঠ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের অর্থনীতির পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। সেই ইংরেজী পাঠের বঙ্গানুবাদ এ বইখানি। বঙ্গভাষাভাষী তরুণ গবেষক, দেশকর্মী-ছাত্র-শিক্ষক-রাজনীতিকর্মী সকলের প্রয়োজনে বইখানি কাজে লাগলে কৃতার্থ হব। শ্রমকে সার্থক মনে করব।

বিশেষভাবে মাতৃভাষা যখন শিক্ষার বাহন হিসেবে উচ্চশিক্ষার স্তরে

কল্যাণবাণী নিয়ে আসছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে এ বইখানির প্রয়োজন আবশ্যিকভাবেই স্বীকৃত হবে।

অর্থনীতি বিভাগ
স্কটিশ চার্চ কলেজ
৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭২

তরুণ সান্যাল

মুখবন্ধ

বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণ ভারতে বৃটিশদের সামরিক এবং রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্পর্কে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু বৃটিশ শাসনাধীনে ভারতীয় জনসাধারণের বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন ইতিহাস এখনও সংকলিত হয় নি।

সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে একটা সাধারণ এবং ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা আছে। তাদের সম্পদের উৎস কোথায়, দারিদ্র্যের কারণই বা কি! এইজন্যই বর্তমানে বৃটিশ ভারতের একটি সংক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রয়োজন।

অবিমিশ্র তুষ্টির সঙ্গে না হলেও, অন্তত কিছুটা ন্যায্য শ্লাঘার সঙ্গেই ইংরেজরা ভারতে তাঁদের কার্যাবলীর পর্যালোচনা করতে পারেন! তাঁরা ভারতবাসীকে যা অর্পণ করেছেন তা হল শ্রেষ্ঠ মানবীয় আশীর্বাদ—অর্থাৎ শান্তি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করে তাঁরা একটি প্রাচীন সুসভ্য জাতিকে আধুনিক চিন্তা, বিজ্ঞান, প্রতিষ্ঠান এবং আধুনিক জীবনের সংস্পর্শে এনেছেন। তাঁরা এমন এক প্রশাসন গড়ে তুলেছেন, যদিও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ঢের সংস্কার প্রয়োজন হবে, তবু তা এখন পর্যন্ত বেশ মজবুত ও ফলপ্রদ। তাঁরা বিচক্ষণ আইন রচনা করেছেন, বিচারালয় স্থাপন করেছেন যার পবিত্রতা পৃথিবীর যে কোন দেশের বিচারালয়ের মতই পরিশুদ্ধ। ভারতে বৃটিশ কার্যাবলীর কোন সৎ সমালোচকই এই ফলাফলগুলির প্রতি সপ্রশংস না হয়ে পারেন না।

অপর পক্ষে কোন মুক্তমনা ইংরেজই সমান তুষ্টির সঙ্গে বৃটিশ শাসনে ভারতীয়দের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করেন না। অধুনা ভারতীয়দের দারিদ্র্যের তুলনা কোন সভ্যদেশেই মেলে না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরের মধ্যে যে দুর্ভিক্ষগুলি ভারতবর্ষকে জনশূন্য করে তুলেছে ব্যাপকতা এবং প্রচণ্ডতার দিক থেকে তারও উদাহরণ প্রাচীন বা আধুনিক কালের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মাঝামাঝি হিসেব অনুসারে ১৮৭৭, ১৮৭৮, ১৮৮৯, ১৮৯২, ১৮৯৭ এবং ১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোকের জীবনহানি ঘটেছে। পঁচিশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে মোটামুটি প্রশস্ত একটি ইউরোপীয় দেশের জনসংখ্যা মুছে গেছে। ইংলণ্ডের জনসংখ্যার অর্ধেক জনসংখ্যা ভারতবর্ষে এমন একটা সময়ের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে যা মধ্যবয়সী নারীপুরুষ এখনও স্মরণ করতে পারেন।

ভারতবর্ষে এই প্রচণ্ড দারিদ্র্য এবং ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবের কারণ কি? একের পর এক ভাসা ভাসা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলি সূক্ষ্ম বিচারের পর প্রত্যাখ্যাতও হয়েছে। বলা হতো যে ভারতবর্ষে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছিল এবং এ ধরনের জনসংখ্যাবৃদ্ধি অপরিহার্যভাবে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে। অনুসন্ধানের পর দেখা যায় যে ইংলণ্ডে যে হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছিল ভারতবর্ষে সে হারে কখনোই বাড়েনি এবং গত দশ বছরে জনসংখ্যাবৃদ্ধি থেমে আছে। বলা হয়েছিল যে ভারতীয় কৃষকেরা অসতর্ক এবং অদূরদর্শী। প্রাচুর্যের সময় যারা সঞ্চয় করতে জানে না অভাবের সময় তাদের ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু যাঁরা এইসব কৃষকদের সঙ্গে সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন তাঁরা জানেন যে এদের থেকে সংযমী, মিতব্যয়ী এবং সঞ্চয়ী কৃষকসমাজ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বলা হয়েছিল যে ভারতীয় কুসীদজীবীরাই ভারতের সর্বনাশের কারণ। অত্যাচারের ফলে ও নিংড়িয়ে নেওয়ার দরুন তারা চাষীদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণের দায়ে আবদ্ধ করে রাখত। কিন্তু সর্বশেষ দুর্ভিক্ষ কমিশনের অনুসন্ধানে দেখা যায় যে ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত সরকারী কড়াকড়ির ফলেই ভারতবর্ষের কৃষকেরা কুসীদজীবীদের দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য হয়। আরও বলা হয়েছিল, যে দেশে লোকেরা উৎপন্ন শস্যের উপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল অনাবৃষ্টির বছর শস্যের অভাবে তারা নিশ্চিত অনাহারে থাকতে বাধ্য। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে ভারতবর্ষে কখনোই শস্যহানি ঘটেনি। এমন একটি বছরও যায় নি যখন দেশে খাদ্যের সরবরাহ জনসাধারণের নিকট অপ্রচুর ছিল। তবে একটিমাত্র প্রদেশের শস্যহানিই যখন দুর্ভিক্ষ নিয়ে আসে এবং শস্যসম্পদশালী প্রতিবেশী প্রদেশগুলি থেকে যেখানে জনগণ পরিমাণমত খাদ্য ক্রয় করতে পারেন না, সেখানে নিশ্চয়ই কোন গলদ আছে।

এইসব ভাসা ভাসা ধরনের ব্যাখ্যার অনেক গভীরে ভারতের দারিদ্র্য এবং দুর্ভিক্ষের কারণগুলি আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। যে অর্থ নৈতিক বিধিগুলি ভারতবর্ষে কার্যকর সেগুলি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নিয়মগুলি থেকে অভিন্ন। অন্যান্য দেশের সম্পদসৃষ্টির জন্য যে যে কারণ দেখা যায় ভারতেও সেগুলি ঐশ্বর্য সৃষ্টির কারণ। যে যে কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ দরিদ্র হয়ে পড়ে ভারতবর্ষকেও সেগুলিই দরিদ্র করে তুলেছে। সুতরাং অন্যান্য জাতির সম্পদ বা দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধানের জন্য কোনো অর্থনীতিবিদ যে পথ অনুসরণ করবেন ভারতবর্ষ সম্পর্কেও অনুসন্ধানের জন্য তিনি সেই পথই অনুসরণ করবেন। কৃষির কি উন্নতি ঘটছে? শিল্প এবং উৎপাদনের কর্তারা কি সম্পন্ন অবস্থায় আছে? সরকারী

আয়ব্যয়ের কি যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা হয় যাতে প্রদত্ত করের যথেষ্ট প্রতিদান জনসাধারণকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়? জনসাধারণের কল্যাণে আগ্রহী হয়ে সরকার কি জাতীয় সম্পদের উৎসগুলি সম্প্রসারিত করেছেন? পৃথিবীর যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য যে কোন ইংরেজই এই প্রশ্নগুলিই নিজের সামনে রাখবেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কেও প্রকৃত সত্য উপলব্ধির জন্য তিনি এই প্রশ্নগুলিই নিজেকে জিজ্ঞাসা করবেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ যে ঘটনা কোন তথ্যাভিজ্ঞ ভারতীয় কর্মচারীই অস্বীকার করবেন না তা হল বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদের উৎসগুলি সংকুচিত হয়ে পড়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ এক বিরাট শিল্পোৎপাদনকারী ও বিশাল কৃষিসামগ্রী-উৎপাদনশীল দেশ ছিল। ভারতীয় তাঁতশিল্পের উৎপাদিত সামগ্রী এশিয়া এবং ইউরোপের বাজারের চাহিদা মেটাতো। দুর্ভাগ্যক্রমে একথা সত্য যে, একশ বৎসর পূর্বের স্বার্থান্বেষী বাণিজ্যিক নীতির অনুসরণ করে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং ইংলণ্ডের উঠতি শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করবার জন্যই বৃটিশ পার্লামেণ্ট বৃটিশ শাসনের আদি যুগে ভারতীয় উৎপাদকদের নিরুৎসাহিত করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে তাঁরা যে স্থির নীতি অনুসরণ করেছিলেন তা হল ভারতবর্ষকে গ্রেট বৃটেনের শিল্পগুলির গোলাম করে রাখা এবং গ্রেট বৃটেনের কারখানা ও তাঁতশিল্পে সরবরাহের জন্য ভারতীয়দের কেবলমাত্র কাঁচা মাল উৎপাদনে বাধ্য করা। অবিচল সংকল্প এবং মারাত্মক ফলপ্রসূ সাফল্যের সঙ্গে এই নীতি অনুসৃত হয়েছিল। কোম্পানির কারখানায় ভারতীয় কারিগরদের কাজ করতে বাধ্য করে আদেশনামা জারী করা হয়েছিল। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আবাসিকগণকে ভারতীয় তন্তুবায়গোষ্ঠী এবং গ্রামগুলির উপর বিস্তৃত ক্ষমতা আইনগত ভাবে অর্পণ করা হল। নিষেধমূলক মাশুলের দাপট ভারতীয় রেশম এবং তুলাজাত দ্রব্য ইংলণ্ডের বাজারছাড়া করল। ইংলণ্ডের মাল বিনাশুল্কে কিংবা নামমাত্র শুল্কেই ভারতে প্রবেশাধিকার পেত।

ঐতিহাসিক এইচ. এইচ. উইলসনের-ভাষায় বৃটিশ উৎপাদকেরা "যে প্রতিযোগীর সঙ্গে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে উঠতে পারত না তাকে দাবিয়ে রাখা এবং শেষ পর্যন্ত তাকে গলাটিপে মারার জন্য রাজনৈতিক অবিচারের শক্তি প্রয়োগ করত।" লক্ষ লক্ষ ভারতীয় কারিগর জীবিকাচ্যুত হল। ভারতীয়গণ তাদের সম্পদের একটি বড় উৎস হারাল। ভারতে বৃটিশ শাসনের এ হল এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। কিন্তু ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং

কৃষির উপর তাদের বর্তমান অসহায় নির্ভরতা পর্যালোচনার জন্য এ এমন এক কাহিনী, যা বলা প্রয়োজন। ইউরোপে শক্তিচালিত তাঁতের আবিষ্কার ভারতীয় শিল্পের অবলুপ্তি ঘটিয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে যখন ভারতবর্ষেও শক্তিচালিত তাঁত বসানো হল তখন ইংলণ্ড আর একবার ভারতের প্রতি অশোভন ঈর্ষা প্রকাশ করে। ভারতে তুলাজাত কাপড়ের উৎপাদনের উপর এমন এক উৎপাদন-শুল্ক ধার্য করা হয়েছে যার ফলে ভারতীয় উৎপাদকেরা চীন এবং জাপানের উৎপাদকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসমর্থ হয়ে পড়েছেন এবং ভারতের নতুন বাষ্পচালিত কলগুলির শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে।

প্রকৃতপক্ষে কৃষিই হল বর্তমানে ভারতের জাতীয় সম্পদের একমাত্র অবশিষ্ট উৎস। ভারতের মোট জনসংখ্যার চতুর্-পঞ্চমাংশই কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বৃটিশ সরকার আরোপিত ভূমি-কর কেবল গুরুভারই নয়, যা আরও মন্দ তা হল অনেক প্রদেশেই ভূমি-কর ওঠানামা করে এবং অনিশ্চিত। ইংলণ্ডে ভূমি-কর ছিল পাউণ্ড প্রতি এক থেকে চার শিলিং-এর মধ্যে। অর্থাৎ বিলি করা জমির খাজনার বাৎসরিক পাঁচ থেকে বিশ শতাংশ। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম পিট কর্তৃক চিরস্থায়ী এবং আদায়ের বিনিময়ে খাসজমি প্রত্যর্পণযোগ্য করে তুলবার পূর্বে একশত বৎসর এই ভূমি-কর চালু ছিল। ১৭৯৩ থেকে ১৮২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিলি করা জমির খাজনা বাবদ বাৎসরিক আয়ের শতকরা ৯০ ভাগ ভূমি-কর ধার্য ছিল এবং উত্তর ভারতে ছিল শতকরা আশি ভাগের উপরে। এটা সত্য যে বৃটিশ সরকার কেবলমাত্র পূর্বের মুসলমান শাসকদের নজিরই অনুসরণ করেছিলেন। মুসলমান শাসকেরাও প্রভূত পরিমাণে জমির কর দাবি করতেন। কিন্তু পার্থক্যটা হল যে মুসলমান শাসকেরা যতটা দাবি করতেন ততটা কখনোই আদায় করতে পারতেন না। বৃটিশ শাসকরা যা দাবি করতেন কঠোরভাবে তা তাঁরা আদায় করতেন। বাংলার শেষ মুসলমান শাসক তাঁর রাজত্বের শেষ বৎসরে (১৭৬৪) ভূমি-রাজস্ব বাবদ ৮১৭,৫৫৩ পাউণ্ড আদায় করেছিলেন। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সেই প্রদেশ থেকেই বৃটিশ শাসকেরা ২,৬৮০,০০০ পাউণ্ড খাজনা আদায় করেছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব এলাহাবাদ এবং উত্তর ভারতে আরও কয়েকটি সম্পদশালী জেলা বৃটিশ সরকারকে ছেড়ে দেন। এই জেলাগুলি থেকে নবাব ভূমিরাজস্ব দাবি করেছিলেন ১,৩৫২,৩৪৭ পাউণ্ড। ছেড়ে দেবার তিন বৎসরের মধ্যেই বৃটিশ শাসকরা এই জেলাগুলি থেকে ১,৬৮২,৩০৬ পাউণ্ড ভূমিরাজস্ব দাবি করেছিলেন। মাদ্রাজে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক আরোপিত ভূমি-করের পরিমাণ ছিল প্রদেশের মোট

উৎপাদনের অর্ধেক। বোম্বাইয়ে যে অঞ্চল ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মারাঠাদের নিকট থেকে জয় করা হয়েছিল সেই বৎসর সেই এলাকার ভূমিরাজস্ব ছিল ৮০০,০০০ পাউণ্ড। বৃটিশ রাজত্বের কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভূমিরাজস্ব বর্ধিত হয়ে ১,৫৮০,০০০ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছিল। এবং সেই থেকে তা বেড়েই চলেছে। সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে এবং বৃটিশ ও দেশীয় রাজ্য দেখে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বিশপ হেবার লিখেছিলেন, "আমরা যতটা দাবি করি কোন দেশীয় রাজাই ততটা খাজনা দাবি করেন না।" ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কর্নেল ব্রিগ্‌স্ লিখেছিলেন, "বর্তমানে ভারতবর্ষে যে ভূমি-কর চালু আছে যা জমিদারের পুরো খাজনাকেই অন্তর্ভুক্ত করতে চায়; তেমনটি এশিয়া বা ইয়োরোপে কোন শাসনেই ইতিপূর্বে জানা ছিল না।"

বাংলা এবং উত্তর ভারতের লোকেরা বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকের গুরুভার ভূমিরাজস্ব থেকে ক্রমশ কিছুটা রেহাই পেয়েছিল। বাংলা দেশে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ চিরস্থায়ী করা হয়। কৃষির বিস্তারের সঙ্গে যেহেতু এটা আর বর্ধিত হয় নি, বর্তমানে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে বাৎসরিক খাজনার (পথ ও পূর্তকার্যের জন্য অতিরিক্ত ধার্য উপকর সহ) শতকরা ৩৫ ভাগ। উত্তর ভারতে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ চিরস্থায়ী ছিল না। কিন্তু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সমস্ত অতিরিক্ত দেয় উপকর যোগ করে শতকরা ৫০ ভাগে তা নামিয়ে আনা হয়। তথাপি নতুন উপকর বসানো হচ্ছিল। চলতি বাৎসরিক খাজনার পরিবর্তে, বাৎসরিক খাজনা ভবিষ্যতে কতটা হতে পারে তার উপরেই দেয় ধার্য করা হয়েছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত ভূমিরাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল বাৎসরিক খাজনার শতকরা ৬০ ভাগ।

মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। সেখানে কৃষকেরাই জমির খাজনা বহন করেন, কারণ এই প্রদেশ দুটির বেশীর ভাগ অঞ্চলেই কোন মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকারী নেই। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার আর্থিক খাজনার অর্ধেক ভূমিরাজস্ব হিসাবে আদায় করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার বর্তমানে জমির রাজস্ব বাবদ যা আদায় করেন তার পরিমাণ প্রায় সমগ্র আর্থিক খাজনারই সমান। ফলে কৃষকেরা পরিশ্রমের মজুরি এবং সঞ্চিত শস্যের মুনাফা ব্যতীত প্রায় কিছুই পায় না। প্রতি ত্রিশ বৎসর অন্তর জমির রাজস্বের পরিমাণ সংশোধন করা হয়। কৃষক কিন্তু জানে না কোন্ নীতির উপর এটা বাড়ানো হয়। তাকে প্রতিটি নতুন নতুন কর জমা দিতে হয় নতুবা পূর্বপুরুষের জমি ত্যাগ করে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যেতে হয়। ভূমি-করের এই অনিশ্চয়তা কৃষিকে পঙ্গু করে, সঞ্চয়ের পথে বাধা দেয় এবং জমির কর্ষককে দারিদ্র্য ও ঋণে আবদ্ধ করে রাখে।

উপরে যা বলা হল তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভূমি-কর ভারতবর্ষে কেবল গুরুভার এবং অনিশ্চিতই নয়, যে নীতির উপর কর আদায় করা হয় তাও সমস্ত সুশাসিত দেশের রাজস্বনীতি থেকে ভিন্ন। ঐ-সমস্ত দেশে সরকার সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন, সাধারণ মানুষের উপার্জনে সাহায্য করেন, তাদের সম্পদশালী এবং ধনী হিসেবে দেখতে চান এবং তারপর রাষ্ট্রের ব্যয়ভার বহনের জন্য তাদের আয়ের একটি সামান্য পরিমাণ মাত্র দাবি করেন! ভারতবর্ষে ধরতে গেলে জমি থেকে সম্পদ্ সঞ্চয়ে সরকার হস্তক্ষেপই করেন, কৃষকের আয় ও লাভের ক্ষেত্রে বাধা দেন; সাধারণত প্রতিটি জমিতেই পর পর নতুন বন্দোবস্ত ভূমিরাজস্বের নতুন নতুন আদায় চাপানো হয় যার ফলে কৃষকগণ চিরস্থায়ীরূপে দরিদ্র। ইংলণ্ডে, জার্মানিতে, যুক্তরাষ্ট্রে, ফ্রান্সে এবং অন্যান্য দেশে রাষ্ট্র সাধারণ লোকের আয়ের পথ প্রশস্ত করে তোলেন, বাজার বিস্তৃত করে দেন, সম্পদ আহরণের নতুন উৎস রচনা করেন, জাতির সঙ্গে নিজেদের অভিন্ন ক'রে তোলেন এবং জাতির সঙ্গেই সম্পদ-শালী হয়ে ওঠেন। ভারতবর্ষে সরকার কোন নতুন শিল্পের উন্নতি করেন নি, পুরানো শিল্পেরও পুনরুন্মেষে সাহায্য করেন নি। অপরপক্ষে, জমির উৎপাদনের পরিমাণ থেকে যা প্রাপ্য মনে করেন তা আদায় করবার জন্য প্রতিটি নতুন নতুন ভূমিবন্দোবস্তের দেয় নির্ধারণে প্রতিটি অঞ্চলেই হস্তক্ষেপ করেন। বোম্বাই এবং মাদ্রাজের প্রতিটি নতুন বন্দোবস্তে করনির্ধারণের সময়কে সাধারণ লোক তাদের এবং সরকারের মধ্যে বিবাদের সময় বলে মনে করে, বিবাদ বাধে—কে কতটা রাখবে এবং কে কতটা নেবে। এই কলহের নিষ্পত্তি আইনের নির্ধারিত সীমার পথ ধরে চলে না। এ বিবাদে রাজস্ব কর্মচারীদের মতামতই হল শেষ কথা। বিচারক বা ভূমি আদালতে কোন আপীলও করা যায় না। ভূমিরাজস্ব বেড়েই চলে। লোকেরাও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে থাকে।

ভারতীয় কবির মতে, রাজা যে কর আদায় করেন তা হল পৃথিবীকে উর্বরকারী বৃষ্টিরূপে ফিরিয়ে দেবার জন্যই সূর্য যেমন পৃথিবী থেকে রস আহরণ করে, তদনু-রূপ। কিন্তু ভারতবর্ষের জমি থেকে যে রস আজ আহরণ করা হয় তা উর্বরকারী বৃষ্টিরূপে ভারতবর্ষে না পড়ে অন্য অন্য দেশে পতিত হয়। সমস্ত জাতিই ন্যায়সঙ্গত-রূপেই আশা করেন যে দেশ থেকে যে কর আদায় করা হয় তা যেন মূলত সে দেশেই ব্যয় করা হয়। অতীতে ভারতে নিকৃষ্টতম শাসনেও এ ব্যবস্থাই ছিল। আফগান এবং মুঘল সম্রাটগণ তাঁদের সৈন্যবাহিনীর পেছনে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করতেন তাতে বড় বড় রাজন্যবর্গের পরিবার এবং শতসহস্র সেনা ও তাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণেরও সঙ্কুলান হত। তারা যে জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ

এবং স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন 'এবং যে বিলাসব্যসনে নিজেদের আবদ্ধ করে-ছিলেন, তা ভারতীয় কারিগরদের উৎসাহিত, ক্ষুধা নিবারণ এবং পরিপোষণ করত। অভিজাত ব্যক্তি, সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষগণ, সুবাদার, দেওয়ান, কাজী এবং প্রতিটি প্রদেশ ও জেলার অসংখ্য অধস্তন কর্মচারিবৃন্দ রাজপরিবারের আদর্শই অনুসরণ করে চলতেন। মসজিদ, মন্দির, রাজপথ, খাল ও জলাধার নির্মাণ তাঁদের প্রশস্ত উদারতা কিংবা হয়ত গর্বেরই দ্যোতনা করে। বিচক্ষণ এবং নির্বোধ নির্বি-শেষে সমস্ত শাসকের অধীনেই আদায়ীকৃত কর জনসাধারণের নিকট ফিরে যেত এবং তাদের বাণিজ্য ও শিল্পকে সফল করে তুলত।

কিন্তু ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে ভারতে পরিবর্তন আসে। ভারতবর্ষকে তাঁরা একটি জমিদারী বা বাগিচা হিসেবে দেখতেন এবং ভারতবর্ষ থেকে উপার্জিত মুনাফার পরিমাণ তুলে নিয়ে তাঁরা ইউরোপে জমা করতেন। প্রাচ্যদেশে লাভজনক কাজে উচ্চাভিলাষী নিজেদের মনোনীত ব্যক্তির জন্য সমস্ত উচ্চপদই তাঁরা সংরক্ষিত রাখতেন। ভারতবর্ষে সমাহৃত রাজস্ব থেকেই পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে নিজেদের মুনাফার জন্য তাঁরা ইয়োরোপে তা বিক্রয় করতেন। মজুত পণ্যদ্রব্যের জন্য একটি চড়া সুদ তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে জবরদস্তি করে আহরণ করতেন। কোন না কোন উপায়ে অতিরিক্ত কর বাবদ প্রাপ্ত সমস্ত কিছুই অর্থা-ভাবপীড়িত প্রশাসনে যতটুকু না দিলেই নয় সেটুকু বাদে ইয়োরোপে চালান যেত।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা উঠে যায়। এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু তাঁদের নীতিটি এখনও বজায় আছে। তাঁদের মূলধন ঋণের মারফত শোধ হয়। এই ঋণকে ভারতীয় সরকারী ঋণ হিসেবেই রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং তার সুদ ভারতবর্ষ থেকে সংগৃহীত করের দ্বারাই শোধ করা হয়। সাম্রাজ্যকে কোম্পানির হাত থেকে সম্রাজ্ঞীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু তার ক্রয়ভার ভারতীয়দেরই বহন করতে হয়েছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যে ভারতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল পাঁচকোটি দশলক্ষ পাউণ্ড, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় নয়কোটি সত্তর লক্ষ পাউণ্ডে। পরবর্তী চল্লিশ বৎসরের শান্তির সময়ে ভারতীয় ঋণের পরিমাণ ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং বর্তমানে (১৯০১) এর পরিমাণ হল বিশকোটি পাউণ্ড! হোম চার্জ[1] বাবদ ভারতবর্ষ থেকে সমাহৃত

১। *ভারতে বৃটিশ কর্মচারীদের জন্য বেতন, ভূমধ্যসাগরে রক্ষিত ভারত সাম্রাজ্যে শান্তিরক্ষার জন্য বৃটিশ রণতরীর জন্য ব্যয় এবং ভারত সাম্রাজ্য শাসনের জন্য বৃটেনে প্রেরিত অর্থ, ইত্যাদি—সম্পাদক।*

রাজস্ব এক কোটি ষাট লক্ষ পাউণ্ডে বর্ধিত হয়েছে। ভারতস্থ ইয়োরোপীয় কর্মচারীরাই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত উচ্চপদ একচেটিয়াভাবে অধিকার করে আছেন। ভারতের নীট রাজস্ব—যার পরিমাণ বর্তমানে চারকোটি চল্লিশ লক্ষ স্টার্লিং—তার অর্ধেকটাই ভারতবর্ষের বাইরে চলে যায়। ভারতবর্ষের আর্দ্রতা ঠিকই অন্যান্য দেশকে আশীর্বাদ জানাচ্ছে, উর্বর করছে।

যে ব্যক্তি জীবনের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা সুখের সময় ভারতীয় শাসনকার্যে অতিবাহিত করেছেন তাঁর পক্ষে সেই শাসনের দুর্বল অংশ অর্থাৎ ভারত সরকারের আয়-ব্যয় নীতি ও অর্থনৈতিক কর্মপন্থার আলোচনা করা এক অশিষ্ট এবং বেদনাদায়ক কার্য। আমি এই কাজ হাতে নিয়েছি, কারণ, বর্তমানে বৃটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস বলা প্রয়োজন এবং ভারতীয়দের দারিদ্র্যের নিগূঢ় কারণগুলির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যার শিল্প পঙ্গু, যার প্রচুর অনিশ্চিত করভার-সাপেক্ষ কৃষি, যে আর্থিক ব্যবস্থায় রাজস্বের মোট পরিমাণের অর্ধেক প্রতি বৎসর বাইরে পাঠানো হয়, যে কোন দেশকে এমন এক অবস্থার সামনে দাঁড় করান—তা হলে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী জাতিও দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা জানতে পারবে। একটি জাতি তখনই উন্নত হয়ে ওঠে যখন তার সম্পদের উৎসগুলি বিস্তৃত হয় এবং যদি কর বাবদ আদায়ীকৃত অর্থ সাধারণের মধ্যে এবং সাধারণের জন্যেই ব্যয়িত হয়। একটি জাতি তখনই দরিদ্র হয়ে পড়ে যখন সম্পদের উৎসগুলি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং করবাবদ আদায়ীকৃত অর্থ বহুলাংশেই দেশের বাইরে পাঠানো হয়। এগুলিই হল সরল, স্বতঃসিদ্ধ অর্থনৈতিক বিধান যা প্রতিটি দেশের মত ভারতেও কার্যকরী। ভারতের রাজনীতিবিদ এবং শাসকবর্গের অনুধাবন করা উচিত যে যতদিন পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন না ঘটছে, যতদিন ভূমি-করের একটা স্থির এবং স্পষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়া না হচ্ছে, এবং যতদিন রাজস্বের পরিমাণ বিস্তৃতভাবে ভারতেই ব্যয় না করা হচ্ছে, ততদিন ভারতের দারিদ্র্য দূর করা যাবে না।

ভারতের রাজনীতিবিদ এবং শাসককে কতগুলি অদ্ভুত অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়। পরপর তিনজন গভর্ণরজেনারেল—লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড মিণ্টো এবং লর্ড হেস্টিংস ভারতে ভূমি-করের একটি চিরস্থায়ী সীমা বেঁধে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সেগুলি খারিজ করে দেন। তাঁদের দাবির কোন নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দিতে তাঁরা রাজী ছিলেন না। লর্ড ক্যানিং, লর্ড লরেন্স এবং লর্ড রিপন—সাম্রাজ্যের এই তিনজন ভাইসরয় পুনরায় ভূমি-করের নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য নিযুক্ত

রাষ্ট্রসচিব তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে এবং কখনো বা ভাইসরয় পরিষদের সংখ্যাধিক্যের মতের বিরুদ্ধেই বৃটিশ শিল্পপতিদের নির্দেশে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যেই তিনবার ভারতীয় আমদানি-শুল্কের তালিকা পরিবর্তিত করা হয়েছে। আসামের চা-বাগিচার জন্য সংগৃহীত ভারতীয় শ্রমিকদের যথেষ্ট নিরাপত্তা দেবার জন্য এই সময়ের মধ্যে তিনবার প্রচেষ্টা চলেছে। এই শ্রমিকেরা ভুল বুঝে বা প্রতারণার ফাঁদে পড়ে একবার তাদের চুক্তিপত্রে সহি করবার পর আর স্বাধীন নারীপুরুষ থাকে না। যে শাস্তিমূলক আইন তাদের বাগিচায় শৃঙ্খলিত করে রাখে স্ট্যাট্যুট্ বুকে এখনও তা রয়ে গেছে। সম্প্রতি আসামের চীফ কমিশনার মাননীয় শ্রীযুক্ত কটন তাদের উপযুক্ত বেতন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ভাইসিরয় পরিষদ তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। প্রস্তাবগুলির প্রয়োগও লর্ড কার্জন দু বৎসর রদ করে রাখেন। কারণ চা ব্যবসায়ের বৃটিশ শেয়ারমালিকগণ তাতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ভারতের প্রশাসকগণ অসহায়। ভারতে করভারের একটা ন্যায়সংগত সীমা বেঁধে দেবার জন্য যে প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবার কথা ছিল, ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভারতীয়দের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ যখন দেখা গেছে যে পার্লামেণ্টে ভোটের অধিকারী পুঁজিপতি বা শিল্পপতিদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে উঠেছে তখনই তা বিসর্জিত হয়েছে।

ভারতীয় জনগণের সমর্থনেও ভারতীয় প্রশাসকবর্গ সবল নন। ভারতীয় সরকার বলতে বোঝায় ভাইসরয় এবং কার্যকরী পরিষদের সভ্যগণ অর্থাৎ সৈন্যাধ্যক্ষ, সামরিক সদস্য, পূর্তবিভাগের সদস্য ও আইন বিভাগের সদস্য। এই পরিষদে জনসাধারণের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই। তাদের কৃষি, জমির স্বার্থ, বাণিজ্য এবং শিল্প সংস্থার কোন প্রতিনিধিত্ব নেই। পরিষদে কোন ভারতীয় সভ্য নেই, কোনদিন ছিলও না। ভারতীয় খরচনির্বাহ সংক্রান্ত রয়্যাল কমিশনের সামনে স্যার অকল্যাণ্ড কোলভিন যেরূপ বলেছিলেন, এসব পরিষদের সমস্ত সভ্যই হলেন ব্যয়মূলক বিভাগগুলির কর্তাব্যক্তিরা। সভ্যগণ হলেন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারিবৃন্দ। জনসাধারণের কল্যাণে তাঁদের ইচ্ছা থাকলেও তাঁরা বিভাগের কার্যপরিচালনার জন্য আরও অধিক অর্থ সংগ্রহ করবার কাজে নিয়োজিত। জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য কোন ভারতীয় সভ্য নেই। ব্যয়ের দিকেই সমস্ত বাহিনী সজ্জিত। ব্যয় কমানোর দিকে কেউই নেই। স্যার ডেভিড বারবুর বলেছিলেন, “সাধারণভাবে প্রবণতা হল ব্যয় বৃদ্ধি করবার জন্য অর্থদপ্তরের ওপর

চাপ সৃষ্টি করা। এটা একটা চাপ ছাড়া কিছুই নয়। অন্যান্য দপ্তরগুলিও আরও অর্থ ব্যয় করার জন্য চাপ দিচ্ছে। তাদের দাবি অটল এবং অবিচ্ছিন্ন।" ব্যয়ভার হ্রাস করবার জন্য, করভার লাঘবের জন্য, লোকেদের কৃষি সংক্রান্ত স্বার্থ রক্ষার জন্য, শিল্প ও কলকারখানা উৎসাহিত করবার জন্য কোন বিপরীত চাপ নেই। এরই ফলে ভারত সরকারের কাঠামো এই বিদেশী শাসনকে আরও বিচ্ছিন্ন এবং দুর্বল করেছে। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নই প্রায় একতরফাভাবে নির্ধারিত হয়। পরিষদের সভ্যগণ সকলেই যোগ্য, বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ এবং বিবেকবান পুরুষ। কিন্তু এক পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করে সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ বিচারকবৃন্দও মামলার সঠিক রায়দানে বিফল হবেন। কাজ করবার সমস্ত সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার জনসাধারণের বাস্তব কল্যাণ রক্ষায় অক্ষম, কারণ জনসাধারণের সঙ্গে এর কোন সংযোগ নেই, জনসাধারণের স্বার্থে কাজও করতে পারে না।

জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছিলেন, "একটি জাতির দ্বারা গঠিত সরকারের নিজস্ব তাৎপর্যেই একটি অর্থ এবং অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু অপর জাতি গঠিত অন্য একটি জাতির সরকার বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই এবং থাকতে পারে না। একটি জাতি অন্য একটি জাতিকে নিজের ব্যবহারের জন্য পদানত রাখতে পারে। লাভের উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের দেশবাসীদের মুনাফার প্রয়োজনে তারা সেই জাতিকে গবাদিপশুর মতো মানুষের খামার হিসেবেই ব্যবহার করে থাকে।"

এই কঠোর মন্তব্যের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় তার চেয়েও ঢের বেশি সত্য নিহিত আছে। কোনো জাতি অন্যজাতিকে প্রজাবৃন্দের স্বার্থে শাসন করছে এমন একটি নজীরও ইতিহাসে নেই। তাদের নিজেদের বিষয়ে প্রশাসন পরিচালনার ব্যাপারে কথঞ্চিৎ অধিকার না দিয়ে জাতির স্বার্থ রক্ষার কোনরকম উপায় মানবজাতি আবিষ্কার করতে পারে নি। আরও কথা হল, এরকম একটা একচেটিয়া নিরংকুশ শাসনে প্রশাসক জাতি লাভবান হয় না। ইংলণ্ডের বাণিজ্য, ভারতবর্ষে যেটা তার সবচেয়ে বড় স্বার্থ, তা আজ দশ বৎসর যাবৎ স্থবির হয়ে আছে। ভারতবর্ষে আমদানিকৃত গড়পড়তা বাৎসরিক পণ্যদ্রব্যের (পুরোপুরি না হলেও বেশিরভাগই বৃটিশ) পরিমাণ গত দশ বা বার বৎসর যাবৎ পাঁচ কোটি স্টার্লিং-এর কিছু নীচেই স্থিতাবস্থায় রয়েছে। এর অর্থ হল ভারতবর্ষে লোক-সংখ্যার মাথাপিছু তিন শিলিং ভোগব্যয়। ভারতবর্ষ যদি উন্নত হত তবে এটা পাঁচ বা ছয় শিলিং-এ দাঁড়াতো। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য এবং দুর্ভিক্ষের সঙ্গে এর অবনতি হতে পারে। এইরূপে বৃটিশ বাণিজ্য যা ভারতবর্ষ এবং গ্রেট বৃটেনের পক্ষে সম্পদের এক বৈধ এবং বলকারক উৎস, তা ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে

ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষের থেকে রাজস্ববাবদ উদ্বৃত্ত অর্থই, লর্ড স্তলসবেরির ভাষায় "যার প্রত্যক্ষ কোন প্রতিদান নেই", ভারতবর্ষকে দরিদ্র করে তুলেছে। এবং এজন্যে ইংলণ্ডের শক্তিবৃদ্ধি বা তার প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা বৃদ্ধি হয় নি। "প্রত্যক্ষ তুল্যমূল্য প্রতিদান ব্যতীত" অন্যদেশ থেকে আহৃত অর্থে কোন দেশের উৎপাদনশীল, ক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় না। এই তথ্যটি যেমন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রযোজ্য তেমনি প্রত্যেকটি জাতি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। পরিশ্রমের বিনিময়ে যে অন্ন সংগ্রহ করি তা আমাদের পরিপুষ্ট ও বলশালী করে তোলে, কিন্তু বিনা পরিশ্রমেই যে খাদ্য সংগ্রহ করা হয় তা আমাদের শরীরের পক্ষে বিষস্বরূপ। প্রাচীন এবং আধুনিক কালেও অধীনস্থ সাম্রাজ্য থেকে সমাহৃত অর্থে বিলাস এবং অধঃপতন ঘটেছে। এই সত্যটি যদি আমরা না শিখে থাকি তা হলে প্রাচীন এবং আধুনিক কালের ইতিহাস বৃথাই লিখিত হয়েছে।

বর্তমান উপনিবেশসমূহ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠবার পূর্বেই ইংলণ্ড ভারতীয় সাম্রাজ্য জয় করেছিল। যদিও আজকের দিনে এমন কথা বলা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধাচরণ হবে, তবুও অনুমান করা যেতে পারে যে বৃটিশ উপনিবেশগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনতা ত্যাগ করবার পরেও ভারতীয় সাম্রাজ্য টিকে থাকবে। উপনিবেশ-গুলিকে গাছের ফল বলে বর্ণনা করা হয়। গাছ থেকে পড়বার জন্যই তা পক্ক হয়। বর্তমান লোকসংখ্যা, শক্তি এবং সম্পদের কিছুটা বৃদ্ধির পর অস্ট্রেলেশিয়া এবং কানাডা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গ্রেট বৃটেনের সার্বভৌমত্বের অধীনে থাকবে এ কথাটি যিনি ঘোষণা করবেন, বলতেই হবে সত্যই একজন ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে তাঁর সাহস আছে বটে। ভারতবর্ষের জনসাধারণ গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে সদর্থেই দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কে অভিলাষী। এই সম্পর্ক কোন ভাবপ্রবণ আনুগত্যের মাধ্যমে নয়, বরং, লর্ড ডাফরিন একসময় যেমন বলেছিলেন, একটা স্বার্থবোধের মাধ্যমে তারা সম্পর্ক রাখতে চায়। তারা এখনও বিশ্বাস করে যে একটা পাশ্চাত্য শক্তির অধীনতার মাধ্যমে প্রতীচ্যের সঙ্গে নিকট সম্পর্কের দ্বারা তারা প্রভূত লাভবান হবে। গ্রেট বৃটেনের সঙ্গেই তারা নিজেদের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলেছে, বৃটিশ শাসনের সঙ্গে নিজেদের অভিন্ন করে তুলেছে। তারা একান্তভাবেই বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্ব চায়। কিন্তু বর্তমান নিরংকুশ এবং একচেটিয়া আকারে তারা সেই শাসনের স্থায়িত্বে অভিলাষী নয়। ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিস্ কর্তৃক প্রবর্তিত এবং মুনরো, এলফিনস্টোন ও বেন্টিংক কর্তৃক পরিমার্জিত এই শাসনব্যবস্থা সত্তর বৎসর পরে কিছুটা পরিবর্তনসাপেক্ষ। এই সত্তর বৎসরের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। শিক্ষিত সমাজ ভারতবর্ষে একটি উদীয়মান

শক্তি। নিজেদের দেশের উচ্চতর চাকুরিতে তাঁরা একটি ভাল অংশ দাবি করেন। সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পরিষদে তাঁরা নিজেদের প্রতিনিধিত্বে ইচ্ছুক। এই দাবি নাকচ করা, ভারতবর্ষের শিক্ষিত এবং প্রভাবশালী সমাজকে বিরোধী করে তোলা, দেশে অসন্তোষ ও ক্ষোভ বৃদ্ধি করা এবং একচেটিয়া শাসনের দ্বারা সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে তোলা অতি সহজ কাজ। অপরপক্ষে, উদীয়মান শক্তি-গুলিকে সরকারের সপক্ষে টেনে আনা, শাসনব্যবস্থায় শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অংশীদার করে তোলা, নিজেদের মঙ্গলামঙ্গল, শিল্প ও কৃষির ব্যাপারে তাদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া এবং স্বদেশবাসীর বৈষয়িক উন্নতি বিধানে ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে তাদের দায়িত্ববান করে তোলা বরং বিচক্ষণতার কাজ হত। আর একবার জন স্ট্যুয়ার্ট মিলের উদ্ধৃতি দেওয়া যাক। "মানবজগতের একটা সহজাত ব্যাপার হল যে অন্যের স্বার্থরক্ষার কোন সদিচ্ছা, তা যতই একান্ত হোক না কেন, অপরের হাত বেঁধে রাখলে, তা নিরাপদ বা নিরাপত্তাবর্ধক হতে পারে না। একমাত্র তাদের নিজেদের হাতেই তাদের জীবনের সম্যক্ এবং স্থায়ী উন্নতিবিধান করা যেতে পারে।"

ভারতের জনসাধারণ হঠাৎ পরিবর্তন বা বিপ্লব চায় না। আইনপ্রণয়ন-কারী জুপিটারদের মাথা থেকে সশস্ত্র মিনার্ভার উৎপত্তির মতন তারা নতুন শাসনতন্ত্র চায় না। যে পথ তৈরী হয়েছে সে পথেই তারা কাজ করতে ইচ্ছুক। তারা বর্তমান সরকারকে শক্তিশালী করে তুলতে এবং তাকে জনসাধারণের সংস্পর্শে আনতে ইচ্ছুক। ভারতীয় কৃষি এবং শিল্পের প্রতিনিধিস্বরূপ তারা রাষ্ট্রসচিব পরিষদে ও ভাইসরয়ের কার্যকরী সমিতিতে কয়েকজন ভারতীয় সভ্যকে দেখতে চায়। প্রত্যেকটি প্রদেশের কার্যকরী সমিতিতে তারা ভারতীয় সদস্যদের উপস্থিতি কামনা করেন। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক প্রশ্নে তারা জন-সাধারণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব দাবী করে। তারা চায় জনসাধারণের সহযোগিতায় সাম্রাজ্য এবং বড় প্রদেশগুলির শাসনকার্য পরিচালিত হোক।

প্রত্যেকটি বড় প্রদেশেই একটি করে বিধান পরিষদ আছে। এই পরিষদ-গুলির কিছু সদস্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের এ্যাক্ট্ অনুযায়ী নির্বাচিত হন। এই পরীক্ষা সাফল্যজনক প্রমাণিত হয়েছে এবং বিধান পরিষদগুলির কিছুটা বিস্তার প্রশাসনকে শক্তিশালী করে তুলবে এবং জনসাধারণের সংস্পর্শে নিয়ে আসবে। প্রত্যেকটি ভারতীয় প্রদেশ ইংলণ্ডের কাউন্টির মত বিশ অথবা ত্রিশটি অথবা আরও বেশী জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেকটি জেলার লোকসংখ্যা দশ লক্ষ বা আরও বেশী। এমন একটা সময় এসেছে যখন প্রত্যেকটি জেলাই প্রদেশের বিধান

পরিষদে নিজেদের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারে। ত্রিশটি জেলা এবং তিন কোটি লোক নিয়ে একটি প্রদেশ অনায়াসেই বিধান পরিষদে ত্রিশজন সভ্য নির্বাচিত করতে পারে। প্রত্যেকটি জেলারই বোঝা উচিত যে প্রাদেশিক শাসনে তাদের কিছুটা বক্তব্য আছে।

১৮৩৩ ও ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিখ্যাত ঘোষণা অনুযায়ী ভারতবর্ষের উচ্চতর পদগুলি কাগজে-কলমে মাত্র সাধারণের জন্য খোলা ছিল। কার্যক্ষেত্রেও এগুলি সাধারণের জন্যই খোলা রাখা উচিত এবং প্রাচ্যে জীবনে উন্নতি-অভিলাষী ইংরেজ ছেলেদের জন্য সংরক্ষিত রাখা উচিত নয়। ভারতীয় সিবিল সার্ভিস সহ, শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক, তার, পুলিশ এবং চিকিৎসা বিভাগেও ভারতীয়দের উচ্চপদ লাভের সুযোগ থাকা উচিত। এই বিভাগগুলিতে ইংরেজদেরও আমরা চাই। আমাদের সাহায্যের জন্য তাদের আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু আমরা চাইনা দেশের ছেলেদের একেবারেই বাদ দিয়ে সমস্ত উচ্চপদ তারা একচেটিয়াভাবে অধিকার করে থাকুক।

ভারতের প্রত্যেকটি জেলাতেই একজন করে জেলা অফিসার আছেন যিনি সর্বোচ্চ শাসনপরিচালক, একদিকে তিনি পুলিশ অফিসার অন্যদিকে জেলা সমাহর্তা। এই কাজগুলি এখন আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত। এতে শাসন আরও সুষ্ঠু এবং জনপ্রিয় হবে যদি প্রধান শাসক এবং পুলিশ অফিসার জেলা সমাহর্তার কাজ থেকে বিরত হন।

ভারতের প্রত্যেকটি জেলাতেই একটি করে জেলা পর্ষৎ আছে। গ্রামীন ইউনিয়ন গড়ে তোলা হচ্ছে। এই ইউনিয়নগুলি হল প্রাচীন গ্রামীন গোষ্ঠীর বা ভিলেজ কমিউনিটির আধুনিক প্রতিরূপ মাত্র। গ্রামীন গোষ্ঠীর কথা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে বারবার বলা হয়েছে। স্বশাসিত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণরাজ্যসমূহ হিন্দু এবং মুসলমান শাসনে সমগ্র ভারতেই ছড়িয়ে ছিল। বৃটিশ শাসনে দ্রুত এবং অবিবেচকভাবে তাদের অস্তিত্বের বিলোপ সাধিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা সতর্কতা এবং দূরদৃষ্টির দ্বারা তাদের পুনরুজ্জীবন সম্ভব। তাদের উপর কিছুটা বিশ্বাস এবং আস্থা স্থাপন করা উচিত। এবং কিছু ব্যবহারিক ও প্রয়োজনীয় কাজের ভারও তাদের উপর ন্যস্ত করা উচিত. সর্বোপরি গ্রামের সমস্ত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলাগুলি তাদের কাছে পাঠানো যেতে পারে—রায়দানের জন্য নয়, একটা আপোষমূলক নিষ্পত্তির জন্য। বিশ বা ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত আদালত অপেক্ষা সরেজমিনে থেকে তারা এ ধরনের মামলা আরও ভালভাবে নিষ্পত্তি করতে পারে। লক্ষ লক্ষ সাক্ষী দূরে অবস্থিত

বিচারালয়ে হাজিরা দেবার খরচ এবং পরিশ্রম থেকে রেহাই পাবে। বিচারালয়ে প্রাপ্ত সর্বনাশা মকদ্দমা এবং মিথ্যা হলফের শিক্ষা থেকেও লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী রক্ষা পাবে। আরও কথা হল, গ্রামীন ইউনিয়ন এবং তার সভ্যরা শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটা যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে, যার অস্তিত্ব বর্তমানে নেই।

যে সমস্ত উপায় বিবেচনার সঙ্গে গ্রহণ করলে ভারত সরকার জনসাধারণের নিকট-সংস্পর্শে আসবেন, অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন এবং জনকল্যাণে আরও ফলপ্রদ হয়ে উঠবেন, উপরোক্তগুলি তারই কয়েকটি। বিচ্ছিন্নতা সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করে না, বরং আইন প্রণয়নে অবিবেচনাপ্রসূত হঠকারী পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যায়। জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভের বিস্তার করে। গ্রেট বৃটেনে রাজনৈতিক দলের শাসনের ফলস্বরূপ ভারতীয় সরকারের নীতির কতগুলি হঠাৎ এবং হতবুদ্ধিকর পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে, ব্যয়সংকোচ নয়। অন্যান্য দেশে যেমন দেখা যায়, একমাত্র করদাতাগণের সতর্কতার ফলেই ব্যয়সংকোচ লাভ করা যায়, বিচ্ছিন্নতা জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বৃদ্ধিতে সরকারকে অসমর্থ করে তোলে; অর্থনৈতিক উন্নতি কেবলমাত্র জনগণের সহযোগিতায়ই ঘটে থাকে। এর ফলে সর্বোচ্চ শিক্ষিত, সবচেয়ে নরম বা মধ্যপন্থী এবং ভারতীয় জনগণের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী অংশ ভারতের সমাজ প্রশাসনে সহযোগী এবং দেশবাসীর কল্যাণে দায়িত্বশীল হবার পরিবর্তে বিরোধী হয়ে পড়েছেন। জাতি এতে দরিদ্র হয়ে পড়েছে। সাম্রাজ্য দুর্বলতর হয়ে পডছে।

মুনরো, এলফিনস্টোন এবং বেন্টিংকের মত অতীতের বিচক্ষণ শাসকবৃন্দ, যাঁদের কার্যাবলীর বিবরণ পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের যুগে যতটা সম্ভব জনসাধারণের সহযোগিতা গ্রহণ করেই জনকল্যাণ সাধনে তাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন। বর্তমানে যা প্রয়োজন তা হল সেই নীতিরই অনুবৃত্তি এবং প্রসার, বিচ্ছিন্নতা বা অবিশ্বাসের নীতি নয়। বর্তমানে যা প্রয়োজন তা হ'ল যে বৃটিশ শাসকবর্গ, যাঁরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাঁদের পূর্বসূরিগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা জানতেন তার অপেক্ষাও কম জানেন, তাঁরা হতবুদ্ধিকর বিচ্ছিন্নতা ত্যাগ করে জনসাধারণের মধ্যে নেমে আসুন, তাদের সংগে কাজ করুন, তাদের সহযাত্রী ও সহযোগী করে গড়ে তুলুন এবং সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য তাদের দায়িত্বশীল করে তুলুন। প্রত্যেকটি সভ্য দেশেই সফল প্রশাসনের জন্য জনগণের সহযোগিতা অপরিহার্য। পৃথিবীর যে কোন দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষেই জনসাধারণের সহযোগিতা অধিকতর প্রয়োজনীয়।

ইতিহাসের সমস্ত পূর্ববর্তী অধ্যায় অপেক্ষা নতুন শতাব্দীর অভ্যুদয় ভারতবর্ষকে অধিকতর দুর্দশা এবং অসন্তোষের মধ্যে দেখছে। সমস্ত পূর্ববর্তী দুর্ভিক্ষ থেকে, বর্তমান দুর্ভিক্ষে দেশে আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চল আক্রান্ত হয়েছে এবং ভারতবর্ষ জনশূন্য হয়ে পড়েছে। যে সমস্ত অঞ্চল দুর্ভিক্ষপীড়িত নয়, সেখানেও একটা বিরাট জনসংখ্যা তাদের শীর্ণ শরীরের দ্বারা অর্ধাশনের প্রমাণ দিয়েছে। তাদের অনেকেই প্রাত্যহিক খাদ্যের অপ্রাচুর্যতায় পীড়িত। পরিপুষ্টির জন্য যতটা খাদ্যের প্রয়োজন তার চেয়েও কম খাদ্য গ্রহণ করে কিভাবে উপবাসে জীবনধারণ করা যায় দরিদ্রতর শ্রেণী তারই চর্চা করে। এই সমস্ত ঘটনায় বর্তমানে দলীয় মতবিরোধ নির্বাক হয়ে পড়েছে। প্রশাসনে অভিজ্ঞ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত সমস্ত ভারতীয় এবং ইংরেজ ভারতীয় সাম্রাজ্যকে যা এতদিন আঘাত করেনি সেই চরম বিভীষিকা দূর করবার উপায়ের কথা চিন্তা করা তাদের কর্তব্য মনে করছেন।

লণ্ডন, ডিসেম্বর
১৯০১ — রমেশ দত্ত

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণটিতে কয়েকটি পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করা হয়েছে। 'ইণ্ডিয়া ইন দি ভিক্টোরিয়ান এজ্' গ্রন্থে যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে তা বাদ দেওয়া হ'ল। একত্র দুটি গ্রন্থে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধ থেকে বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভ এবং বর্তমান রাজত্ব পর্যন্ত বৃটিশ শাসনে ভারতের সমগ্র ইতিহাস বিধৃত হয়েছে।

লণ্ডন, আগষ্ট
১৯০৬ — রমেশ দত্ত

প্রথম অধ্যায়

"আমি নিশ্চিত যে আমিই দেশকে রক্ষা করতে পারি এবং আর কেউই তা পারবেন না।" এই কথা বলেছিলেন পরবর্তীকালের লর্ড চ্যাথাম, মহান উইলিয়ম পিট। নিছক আত্মম্ভরিতায় তিনি একথা বলেন নি। বলেছিলেন শক্তির সচেতনতায় এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী বিচারের স্বচ্ছ দূরদৃষ্টিতে, যা কখনো কখনো আদর্শগত উচ্চ কার্যে উজ্জীবিত মানুষের কাছে ধরা পড়ে। উইলিয়ম পিট তাঁর অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তাঁর দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা হ'ল, এই পাঁচটি বৎসর আধুনিক বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় সূচিত করে। ইংলণ্ডের মিত্র ফ্রেডেরিক দি গ্রেট ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে রোশবাখের যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রুশিয়ার সৃষ্টি এবং ফ্রান্সকে অবদমিত করেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে উলফ কুইবেক অধিকার করেন এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র কানাডাই ফরাসীদের নিকট থেকে অর্জিত হয়। ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করেন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এবং আয়ার কুট্ ভারতে ফরাসী শক্তিকে বিধ্বস্ত করেন ১৭৬১তে। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই বিশ্বের বৃহৎ শক্তি হিসেবে ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হয়। ফ্রান্স ইয়োরোপে হৃতমান হয়ে পড়ে, এশিয়া এবং আমেরিকায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আমাদের এই ইতিকথা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়, অথবা বলতে গেলে সেই সাম্রাজ্যের অধীনে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধ এবং ১৮৩৭-এ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণ, এই আশি বৎসরের মধ্যে বৃটিশ শক্তির দৃঢ় উত্থান ও বিস্তার। যে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ঘটনাগুলির ফলে বৃটিশ শক্তির উত্থান ও বিস্তার ঘটেছিল আমরা যদি এই প্রারম্ভিক অধ্যায়ে তার একটা সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষা করি তবে আরও পরিষ্কারভাবে জাতির অর্থনৈতিক ইতিহাস অন্বেষণে সমর্থ হব।

এই আশি বৎসরের মধ্যে বৃটিশ রাজনীতিবিদ ও শাসকবর্গের তিন প্রজন্ম ভারতীয় সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং সুদৃঢ়করণের জন্য চেষ্টা করে গেছেন। প্রত্যেকটি প্রজন্মেরই স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিজস্ব নীতি ছিল। প্রথম হ'ল ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের যুগ। সেযুগ দুঃসাহসিক অভিযান এবং দুঃসাধ্য

ভা অ ১০

সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে একটি বণিক সংঘকে ভারতে এক বিশাল স্থলশক্তিতে পরিণত করেছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট এবং পরবর্তী বৎসরে ওয়ারেন হেষ্টিংসের অবসরগ্রহণের সঙ্গে সে যুগের অবসান ঘটে। দ্বিতীয় হল কর্ণওয়ালিস, ওয়েলেসলি এবং লর্ড হেষ্টিংসের যুগ। এই যুগে মহীশূর এবং মারাঠাদের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধের ফলে কোম্পানী ভারতে একচ্ছত্র শক্তিতে পরিণত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই-এর এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি এবং পরবর্তী বৎসর শেষ পেশোয়ার বন্দীকরণের সঙ্গে সে যুগের অবলুপ্তি ঘটে। তৃতীয় যুগটি হ'ল শান্তি, সঞ্চয়, এবং প্রশাসনিক সংস্কারের যুগ। এযুগে মুনরো, এলফিনস্টোন এবং বেন্টিংকের যুগ, যাঁদের নাম যোদ্ধা এবং বিজেতাদের নামের চেয়েও ঢের বেশি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অদ্যাবধি স্মরণ করা হয়। ১৮৩৬-এ লর্ড অকল্যাণ্ডের ভারতে আগমন এবং পরবর্তী বৎসর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে এ যুগের অবসান চিহ্নিত হয়।

(১) ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের যুগ-- অবসান ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ।

৭০,০০০ পাউণ্ড মূলধন নিয়ে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হয় ১৬০০ খৃষ্টাব্দে। ১৬৩৯-এ কোম্পানি মাদ্রাজে সেণ্ট জর্জ দুর্গ নির্মাণ করে। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের কাছ থেকে বোম্বাই দ্বীপটি তারা ক্রয় করে এবং ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে সমস্ত কুঠি সেখানে স্থানান্তরিত করে। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে তারা বাংলার সদর দফ্‌তর কলকাতায় স্থাপন করে। মাদ্রাজের দক্ষিণে পণ্ডিচেরীতে ফরাসীদের বসতি ছিল, আর একটি বসতি ছিল কলকাতার উত্তরে চন্দননগরে।

ফ্রেডেরিক দি গ্রেটের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ১৭৪৪ থেকে ১৭৬৩ প্রায় এই বিশ বৎসর ধরে ইয়োরোপ, এশিয়া এবং আমেরিকার বিভিন্ন রণাঙ্গনে ইংরেজ ও ফরাসীরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়। ইংরেজ এবং ফরাসী কোম্পানিগুলির কর্মচারীরা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে তাঁরা মিত্রতা স্থাপন করেন। একে অপরের বাণিজ্যিক উপনিবেশগুলি অবরোধ করেন এবং যে তিক্ত বিদ্বেষ পাশ্চাত্যে তাদের দ্বিধা বিভক্ত করেছিল প্রাচ্যেও সেটা প্রকট করে তোলেন। এই বিশ বৎসরের মধ্যে ভারতে ইংরেজ এবং ফরাসীদের মধ্যে যে তিনটি যুদ্ধ হয়েছিল সেগুলি কর্ণাটক যুদ্ধ বলে পরিচিত।

প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধে ফরাসীদের সন্দেহাতীত প্রাধান্য ছিল। ইংরেজদের কাছ থেকে তারা মাদ্রাজ অধিকার করে এবং কর্ণাটের নবাব পুনরধিকার করতে এলে তারা নবাবের সৈন্যদের পরাস্ত করে হটিয়ে দেয়। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে আয়লা স্যপ্‌লের সন্ধির ফলে মাদ্রাজে ইংরেজরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ফরাসী কোম্পানির ডিরেক্টার জেনারেল ডুপ্লে কিন্তু ভারতে আপন দেশ-বাসীদের সর্বেসর্বা করে তুলবার উচ্চাভিলাষে উদ্দীপ্ত ছিলেন। এবং একটা সময়ে তাঁর পরিপূর্ণ সাফল্যও ছিল। একজন ভারতীয় মিত্রকে তিনি দাক্ষিণাত্যের নিজাম হতে সাহায্য করেছিলেন এবং আর একজন মিত্রকে কর্ণাটের নবাব হতে সমর্থ করে তুলেছিলেন। এইভাবে তিনি ছিলেন দাক্ষিণাত্যের 'রাজপদের স্রষ্টা', ফলে বৃটিশ প্রভাব সম্পূর্ণ নির্মূল বলে মনে হয়েছিল। রবার্ট ক্লাইভের প্রতিভাই চাকা ঘুরিয়ে দিল। বৃটিশদের মিত্র এক প্রতিদ্বন্দ্বী নবাবের জন্য আর্কট অধিকার ও দখল করে তিনি প্রথম নিজেকে চিহ্নিত করেন। দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তি ঘটে। বৃটিশদের মিত্রই কর্ণাটের নবাব থেকে যান এবং ফরাসীদের মিত্র দাক্ষিণাত্যের নিজাম হিসাবে বহাল রইলেন। এইভাবে দাক্ষিণাত্যে দুই ইয়োরোপীয় জাতির শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকে। ফরাসীগণ নিজামের কাছ থেকে উত্তর সরকার বলে পরিচিত সমগ্র পূর্ব উপকূল লাভ করে।

ফরাসী শক্তির সম্পূর্ণ অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের অবসান ঘটে। স্বদেশপ্রেমিক ও আবেগপ্রবণ ফরাসী নেতা ল্যালি মাদ্রাজ অবরোধ করেন কিন্তু অধিকার করতে অক্ষম হন। তারপর ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের বন্দেবাসের যুদ্ধে তিনি আয়ার কুটের হাতে পরাজিত হন এবং ফরাসীদের দুর্দমনীয় প্রতি-রোধের পর পণ্ডিচেরীর ফরাসী উপনিবেশ বৃটিশদের হস্তগত হয়। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের শান্তি চুক্তি অনুযায়ী প্যারীর সন্ধিতে পণ্ডিচেরী প্রত্যর্পিত হয় কিন্তু ভারতে ফরাসী শক্তি চিরদিনের মতই নির্বাপিত হয়ে গেল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের পর ভারতে বৃটিশদের কোন ইয়োরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না।

ইতোমধ্যে বঙ্গদেশে কয়েকটি বিরাট ঘটনা ঘটেছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলা ইংরেজদের কাছ থেকে কলকাতা অধিকার করেন এবং প্রায় সমস্ত ইংরেজ বন্দীই এক গ্রীষ্মের রাত্রে 'অন্ধকূপ' বলে কুখ্যাত একটি ক্ষুদ্র ও বায়ুচলাচলের অব্যবস্থাযুক্ত বন্দীগৃহে মৃত্যুবরণ করে। ইয়োরোপ থেকে প্রত্যাগমনের পর পরবর্তী বৎসর ক্লাইভ কলকাতা পুনরধিকার করেন। নবাবের সঙ্গে প্রথমে তিনি এক সন্ধি করেন এবং পরে তাঁর বিরুদ্ধে

এক গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তারপর যখন চক্রান্ত অনুযায়ী সব কিছু ঠিকঠাক তখন তিনি নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন। ১৭৫৭-এর পলাশীর যুদ্ধে তিনি নবাবকে পরাজিত ক'রে প্রকৃত পক্ষে সমগ্র বাংলাদেশই অধিকার করেন। ফরাসীদের কাছ থেকে উত্তরসরকারও তিনি জয় করেন ফলে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপ যাত্রার পূর্বেই ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ক্লাইভ এক বিরাট স্থল-শক্তিতে পরিণত করে যান।

এর পর বাংলার নবাবেরা কোম্পানির কর্মচারীদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েন। পলাশীর যুদ্ধের পর মীর জাফরকে নবাবের মসনদে বসানো হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি মসনদচ্যুত হন। তখন মীরকাশিমকে নবাব করা হয়। শেষোক্ত জন ছিলেন কঠোর প্রশাসক এবং বাংলার স্থলবাণিজ্যে কোম্পানির লোকেরা যে অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করছিল তা তিনি বন্ধ করবার চেষ্টা করে-ছিলেন। ফলে যুদ্ধ বাধে। মীরকাশিম পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। মীর জাফরকে পুনরায় নবাব করা হয়। এই অশক্ত বৃদ্ধ কিছুদিন পরেই মারা যান এবং তাঁর অবৈধ পুত্রকে তাড়াহুড়ো করে নামেমাত্র বাংলার শাসকপদে বহাল করা হয়। বাংলার প্রশাসন চূড়ান্ত ভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। প্রজাদের উপর শোচনীয় অত্যাচার চলে।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ তৃতীয় এবং শেষবারের মত ভারতে আসেন এবং এক নূতন ও স্মরণীয় নীতির সূত্রপাত করেন। দিল্লীর সম্রাটের দুর্বল বংশধর তখন গৃহহারা পরিব্রাজক। কিন্তু তখনো তিনি ভারতের তত্ত্বাবধায়ক সার্বভৌম রূপে চিহ্নিত হতেন। এই বিরাট উপমহাদেশের সমস্ত রাজা এবং সামন্তপ্রধানগণ তখনো তাঁর প্রতি নামেমাত্র হলেও আনুগত্য প্রকাশ করতেন। যে সমস্ত রাজ্য এবং প্রদেশ বলপূর্বক তাঁরা অধিকার করেছিলেন সেখানে তাঁদের শক্তি দিল্লীর সম্রাটের নিকট হ'তে আহৃত বলেই তাঁরা ভান করতেন। ক্লাইভ এই দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি শস্ত্রবলে বাংলা জয় করেছিলেন। ১৭৬৫-তে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হ'তে তিনি এক ফরমান লাভ করেন যাতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলার দেওয়ান বা প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। এইভাবে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটা আইনগত পদাধিকার ঘটে এবং আট বৎসর পূর্বে তাঁরা যে প্রদেশ জয় করেছিল তার শাসনের দায়িত্ব এবার নিয়মমাফিক নিজেরাই গ্রহণ করে। সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনেও লর্ড ক্লাইভ কতগুলি সংস্কার সাধন করেন এবং ১৭৬৭-তে শেষবারের মত ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

তাঁর শাসন পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করে নি। নবাব এবং কোম্পানির দ্বৈত শাসনে বাংলার লোকেরা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রাজস্বে ঘাটতি দেখা দেয় এবং ১৭৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর মন্বন্তরে বাংলার মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

মাদ্রাজে বৃটিশ প্রশাসকবর্গ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ভারতের যোগ্যতম সামরিক অধিনায়ক হায়দার আলীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। হায়দার আলী কর্ণাটক অঞ্চল বিধ্বস্ত করেন এবং মাদ্রাজের কয়েক মাইলের মধ্যে উপস্থিত হন। কৌন্সিল সন্ত্রস্ত হয়ে ১৭৬৯-এ এই দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণকারীর সঙ্গে সন্ধি করেন।

ভারতে শাসন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্ট ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' নামে এক আইন পাশ করেন। এই এ্যাক্টে ভারতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকে পার্লামেণ্টের বিধিবলে আইনানুগ করে এই দেশে কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তির জন্য একজন গভর্ণর জেনারেলের পদ সৃষ্ট হয়। সেই সময়কার বাংলার গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস অপেক্ষা যোগ্যতর কোনও ইংরেজ সে সময়ে ভারতবর্ষে ছিলেন না এবং তাঁর চেয়ে ঘনিষ্ঠ ভাবে আর কেউই এই দেশ ও দেশবাসীদের জানতেন না। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে প্রায় বাল্যাবস্থায়ই তিনি ভারতে চলে আসেন। বাংলা ও মাদ্রাজে আপন দেশবাসীদের ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং এই সময়ে তাঁর উপর ক্ষমতা অর্পিত হওয়ায় তিনি প্রশাসনিক উন্নতির জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হন। কিন্তু তাঁর আর্থিক অসুবিধা, নিজ পরিষদে ফিলিপ ফ্রান্সিসের বিরোধিতা, নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহ এবং আপন স্বেচ্ছাচারী প্রবৃত্তি তাঁকে বিধিবহির্ভূত কার্যাবলীর প্রতি পরিচালিত করে যার জন্যে বৃটিশ পার্লামেণ্টে তাঁর পরবর্তী ইমপিচমেণ্ট বা বিচারের ব্যবস্থা হয়।

হেষ্টিংস দিল্লীর বাদশাকে চুক্তিবদ্ধ কর দেওয়া বন্ধ করে দেন। তিনি কোরা এবং এলাহাবাদে বাদশার সমস্ত সম্পত্তি দখল করে অযোধ্যার নবাবের কাছে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের বিনিময়ে বিক্রয় করেন এবং রোহিলাদের ধ্বংস করবার জন্য আরও চার লক্ষ পাউণ্ডের বিনিময়ে ঐ নবাবকে এক ইংরেজ ব্রিগেড ধার দেন।

তৎকালীন ভারতের বৃহত্তম শক্তি মারাঠাদের সঙ্গে বোম্বাই সরকার

নিজেদের নানা ঝামেলায় জড়িয়ে ফেলেন। পেশোয়া অর্থাৎ মারাঠা সংঘের প্রধানের পদের জন্য দু'জন দাবীদার ছিলেন। বোম্বাই সরকার তাঁদের একজনকে সাহায্য করবার জন্য এক সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং এইভাবে প্রথম মারাঠা যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। আমেদাবাদ এবং গোয়ালিয়োর অধিকার করে বৃটিশ বাহিনী আপন বৈশিষ্ট্য দেখায়। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যসাধনে যুদ্ধ ব্যর্থ হয়। বৃটিশদের মিত্র ভাতার বিনিময়ে অবসর গ্রহণ করেন, কিন্তু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের সন্ধির দ্বারা সলসেট এবং আরও কয়েকটি দ্বীপ বৃটিশদের হস্তগত হয়।

মহীশূরের বিখ্যাত হায়দার আলীর সঙ্গে সংঘর্ষে দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ বাধে। চারটি লড়াইয়ে তিনি স্যার আয়ার কুটের হাতে পরাজিত হন। আয়ার কুট চব্বিশ বৎসর পূর্বে বন্দেবাসের ফরাসীদের পরাজিত করে-ছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকটি যুদ্ধেই হায়দার আলী নিরাপদে তাঁর সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিতে সফলকাম হন এবং তাঁর শক্তিও অক্ষুন্ন রয়ে যায়। অপর পক্ষে চমকপ্রদ কৌশলে কর্ণেল বেইলি ও কর্ণেল ব্র্যাথওয়েট পরিচালিত দুইটি বৃটিশ বাহিনীকে ঘেরাও করে তিনি তাঁদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। কিন্তু ১৭৮২-তে হায়দার আলীর মৃত্যু হয় ও ১৭৮৩-তে তাঁর পুত্র টিপু সুলতানের সঙ্গে সন্ধির দ্বারা এ-যুদ্ধের অবসান ঘটে।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব পরলোকগমন করলে তাঁর উত্তরাধিকারীর নিকট থেকে ওয়ারেন হেষ্টিংস বারাণসী রাজ্য ছিন্ন করে নিয়ে নিজ শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন। বারাণসীর রাজা এই হিসেবে বৃটিশ সামন্তে পরিণত হন। চুক্তিবদ্ধ কর বাদেও হেষ্টিংস রাজার কাছে বিপুল অর্থ দাবী করেন, বিপুল জরিমানা ধার্য করেন, তাঁকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করে রাখেন এবং প্রজাদের বিদ্রোহী করে তোলেন। রাজা সিংহাসনচ্যুত হন এবং উচ্চতর কর প্রদানের সর্তে তাঁর এক আত্মীয়কে সিংহাসনে বসানো হয়।

অযোধ্যার নতুন নবাবকে বকেয়া কর প্রদানের জন্য আদেশ দেওয়া হয়। নবাব অসামর্থ্য স্বীকার করলে ঋণশোধের জন্য ১০ লক্ষ স্টার্লিং-এরও বেশী অর্থ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে তাঁর মাতা ও পিতামহীর সম্পদ লুণ্ঠনে সাহায্য করা হয়। অযোধ্যা ও মাদ্রাজে বৃটিশ পাওনাদারদের কাছে ভূমিরাজস্ব আদায়ের জন্য দলিল হস্তান্তরের ফলে জনসাধারণের দারিদ্র্য দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। বাংলা দেশে জমিদার বা ভূম্যধিকারীদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার অগ্রাহ্য করে ওয়ারেন হেষ্টিংস কোম্পানির জন্য উচ্চতর রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য তাদের সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করেন।

এই সকল ঘটনাই ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রশাসনের ওপর কলঙ্কের ছায়াপাত করে। পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট পাশ হয় ১৭৮৪-তে এবং এই সর্বপ্রথম কোম্পানির শাসনকে বৃটিশ রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। পরবৎসর ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারত ত্যাগ করেন।

১৭৮৫ পর্যন্ত ভারতে বৃটিশ শক্তির উত্থানের এই হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ফরাসীদের বিরুদ্ধে তিনটি যুদ্ধ, যা কর্ণাটক অঞ্চলে বৃটিশ শক্তিকে সর্বেসর্বা করে তুলেছিল, সিরাজ-উদ্-দৌলা ও মীরকাশিমের সঙ্গে দুই যুদ্ধ যার ফলে তাঁরা বাংলার অধীশ্বর হয়ে বসেছিলেন, এবং মহীশূর ও মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধই হল ভারতে প্রধানতম সামরিক কার্যাবলী যা ক্লাইভ ও হেষ্টিংসের সমকালীন প্রজন্মকে ভারতে আবদ্ধ করে রেখেছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন ভারত ত্যাগ করেন তখন কোম্পানির প্রকৃত অধিকারে ছিল বঙ্গদেশ, উত্তর সরকার, বারাণসী এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর চারদিকের সামান্য কিছু অঞ্চল।

(২) কর্ণওয়ালিস, ওয়েলেসলী এবং লর্ড হেষ্টিংসের যুগ, ১৭৮৫-১৮১৭

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট পাশ হয়। কোম্পানির অসামরিক, সামরিক এবং রাজস্ব সংক্রান্ত সকল ব্যাপার বৃটিশ রাজশক্তি কর্তৃক নিযুক্ত ছয়জন কমিশনারের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। ভারতবর্ষে প্রশাসনিক উন্নতি ঘটিয়ে বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগে সাধারণ লোক যে অত্যাচার ও কুশাসনে পীড়িত ছিলেন তার থেকে তাদের রেহাই দেবার জন্য আন্তরিক সদিচ্ছা ছিল। কোম্পানির পরিচালকবর্গই তাদের ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরে তাঁরা লর্ড কর্ণওয়ালিসকে গভর্ণর জেনারেল হিসেবে পাঠান। তিনি ছিলেন চরিত্রবান ও অভিজাতবংশীয় সদাশয় ব্যক্তি। জনসাধারণ যাতে কৃষিগত উন্নতির একটা অর্থ খুঁজে পায় এবং নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে সেজন্য জমি থেকে সরকারী দাবীর পরিমাণ চির-স্থায়ী ভাবে নির্ধারণ করবার জন্য যথাযথ আদেশ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

এক অন্ধকার এবং ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ যুগের পর ভারতে সূর্যালোকের আভাস দেখা গেল। লর্ড কর্ণওয়ালিসের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করা গিয়েছিল তা মিথ্যে প্রমাণিত হয় নি। তিনি প্রশাসনের উন্নতি বিধান করেছিলন, কর্মচারীদের যথাযথ বেতন দিতে তিনি কোম্পানিকে বাধ্য করেন। তাদের সৎ পদস্থ

কর্মচারীতে পরিণত করেছিলেন। অদ্যাবধি প্রচলিত ভারতের সিভিল সার্ভিসের তিনি প্রবর্তন করেন। তিনি মাত্র একটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন—মহীশূরের টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে। তিনি সুলতানের রাজধানী অধিকার করেন। টিপু সুলতানের কিছু অঞ্চল দখল এবং ক্ষমতা হ্রাস করার পর তিনি সন্ধি করেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতত্যাগের পূর্বে তিনি বঙ্গদেশে ভূমি রাজস্বের **চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত** করে যান। অন্য যে কোন বৃটিশ সরকারী নীতি অপেক্ষা এই বন্দোবস্ত ভারতস্থিত বৃটিশ প্রজাবৃন্দের সচ্ছলতা ও সুখের নিরাপত্তা রক্ষায় অনেক বেশী কার্যকর হয়েছে।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ নবীকৃত হয়। পার্লামেণ্টে ভারত সংক্রান্ত ব্যাপার আলোচিত হয় এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের সমস্ত মূল ধারাগুলিই রক্ষিত হয়। কিন্তু প্রাচ্যে বাণিজ্যকারী বণিকদের জন্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ৩০০০ টন জাহাজে প্রেরণযোগ্য মালের ব্যবসার সুযোগ দিতে হলো। কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ে এই প্রথম হস্তক্ষেপ। গভর্ণর জেনারেল রূপে লর্ড কর্ণওয়ালিসের উত্তরাধিকারী ছিলেন স্যর জন শোর, পরবর্তীকালের লর্ড টাইনমাউথ। পূর্বসূরীর শান্তিপূর্ণ নীতিই তিনি অনুসরণ করেছিলেন। এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস যে ভূমিরাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশকে দান করে গিয়েছিলেন তা' তিনি বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

পরে মারকুইস অব ওয়েলেসলী নামে খ্যাত লর্ড মর্ণিংটন ছিলেন স্যর জন শোরের উত্তরাধিকারী। ১৭৯৮ সালে তিনি ভারতে পদার্পণ করেন। ফ্রেডেরিক দি গ্রেট-এর যুদ্ধ যেমন পূর্ববর্তী যুগে বৃটিশ নীতি প্রভাবিত করেছিল, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের যুদ্ধ এবার বৃটিশ নীতি প্রভাবিত করে। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য উইলিয়ম পিট ইয়োরোপের বৃহৎ শক্তিগুলিকে সাহায্য করে আসছিলেন। ওয়েলেসলী ছিলেন পিটের বন্ধু এবং যোগ্য শিষ্য। তিনিও ভারতে আর্থিক সাহায্য দানের নীতি প্রবর্তন করেন, কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও তাতে ছিল। অপারদর্শী সৈন্যদল রক্ষার জন্য ভারতীয় নরপতিদের আর্থিক সাহায্য দান অর্থহীন হ'ত। এইজন্য তাদের রাজ্যে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী রক্ষার আনুষঙ্গিক খরচ চালাবার জন্য ওয়েলেসলী তাদের নিকট হ'তে আর্থিক সাহায্য লাভ করতেন। এতে কোম্পানির অর্থাগম হত এবং একই সঙ্গে ভারতীয় নৃপতিবর্গ বৃটিশের নিয়ন্ত্রণে থাকত। এই নীতিই 'অধীনতামূলক মিত্রতা'র নীতি বলে পরিচিত।

মহীশূরের নিরলস টিপু সুলতান ফরাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সুতরাং তাঁকে ধ্বংস করা প্রয়োজন হ'ল। এইভাবেই মহীশূরের বিরুদ্ধে চতুর্থ যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৭৯৯ সালে রাজধানী রক্ষাকালে টিপু মৃত্যু বরণ করেন। বিজেতাগণ মহীশূরের অঞ্চলবিশেষ অধিকার করেন। 'অধীনতা মূলক মিত্রতা' নীতি সাপেক্ষে মারাঠাদের কিছু অঞ্চল অর্পণ করা হয়, কিন্তু মারাঠাগণ তা প্রত্যাখ্যান করেন। আরেকটি অংশ দাক্ষিণাত্যের নিজামকে দেওয়া হল। কিন্তু পরে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর জন্য নিজামকে যে আর্থিক সাহায্যের ভরতুকি দিতে হ'ত তার বিনিময়ে ওয়েলেসলী প্রদত্ত অঞ্চলের অধিকার গ্রহণ করেন। মহীশূরের অবশিষ্ট অঞ্চল নিয়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত হয় এবং সেখানে আগেকার হিন্দু রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দুর্বলতর রাজ্যগুলির ব্যাপারে খুব সংক্ষেপেই কার্য সাধিত হয়। ওয়েলেসলী আপন কার্যপ্রণালীতে একই পদ্ধতিতে খব সনিষ্ঠ ছিলেন না। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে সুরাটের নবাব পরলোকগমন করেন। ওয়েলেসলী তাঁর ভ্রাতাকে ভাতার বিনিময়ে অবসর গ্রহণে বাধ্য করে রাজ্য অধিকার করেন।

তাঞ্জোরের রাজাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর ভ্রাতা বৃটিশদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে ভাতার বিনিময়ে অবসর গ্রহণ করেন। কর্ণাটকের নবাব ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁর উত্তরাধিকারী সিংহাসনত্যাগ করতে স্বীকার করেন। আর একজন রাজপুত্রকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়।. তিনি বৃটিশদের কাছে রাজ্য সমর্পণ করে ভাতার বিনিময়ে অবসর নেন। ফরাক্কাবাদের বালক-নবাব তখন প্রায় সাবালকত্বপ্রাপ্ত। বৃটিশের কাছে রাজ্য হস্তান্তরে তাঁকে বাধ্য করা হয়। তিনি ভাতার বিনিময়ে অপসৃত হন। অযোধ্যার নবাবকে বলা হ'ল যে হয় তিনি অসামরিক এবং সামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব বৃটিশ সরকারকে অর্পণ করুন নতুবা বৃটিশ সৈন্যবাহিনী রক্ষার জন্য রাজ্যের অর্ধভাগ ত্যাগ করে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' স্থাপন করুন। শেষোক্ত প্রস্তাব গ্রহণে তিনি বাধ্য হন এবং এলাহাবাদ ও অন্যান্য জিলাসমূহ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশদের হাতে ছেড়ে দেন।

তখনো ভারতে একটিই বৃহৎ শক্তি অবশিষ্ট রইল—মারাঠাশক্তি। লর্ড ওয়েলেসলীর সৌভাগ্যবশতঃ অন্যান্য মারাঠা প্রধানগণ পেশোয়া বা মারাঠা মিত্রসংঘের অধিকর্তার উপর তখন কঠোর চাপের সৃষ্টি করেছিলেন। পেশোয়া বৃটিশ সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে এক অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি স্থাপিত হয় এবং বৃটিশ সৈন্যের সহায়তায় পেশোয়াকে সিংহাসনে বসানো হয়।

অন্যান্য মারাঠা প্রধানগণ, সিন্দিয়া, হোলকার এবং ভোঁসলে, তাঁদের এলাকায় বৃটিশ শক্তির অনুপ্রবেশে হতচকিত হন এবং তারপরেই আরম্ভ হয় দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ। পরবর্তীকালে ডিউক অব ওয়েলিংটন নামে খ্যাত জেনারেল ওয়েলেসলী ১৮০৩ সালে আসাই এবং আরগাওঁ-এর যুদ্ধে সিন্দিয়া এবং ভোঁসলের সৈন্যবাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন। সেই বৎসরই লর্ড লেক বিজয়োল্লাসে দিল্লীতে প্রবেশ করেন এবং যুদ্ধে সিন্ধিয়ার বাহিনীকে পরাজিত করেন। কিন্তু হোলকার এতদিন অপেক্ষা করছিলেন, এবার তিনি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। কোম্পানির সতর্ক পরিচালকবর্গ যখন অতিরিক্ত যুদ্ধাভিলাষী গভর্ণর জেনারেলকে ফিরিয়ে আনলেন এবং ভারতবর্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পাঠালেন তখনও বহু প্রধানসমন্বিত মারাঠা মিত্রসংঘের সঙ্গে বৃটিশ শক্তির অবিরাম যুদ্ধ চলছে।

প্রাচ্যের মহান্ প্রো-কন্সাল ইংলণ্ডের মহান্ কমনারের* (হাউস অব কমনস এর প্রধান সদস্য অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী) সঙ্গে দেখা করবার জন্য ছুটে যান। মহান্ কমনারের ইয়োরোপীয় নীতিই প্রো-কন্সালের ভারতীয় নীতিকে পরিচালিত করেছিল। ওয়েলেসলী যখন পৌঁছুলেন তখন উইলিয়ম পিট মৃত্যু-শয্যায়। পিট ইয়োরোপীয় যুদ্ধের মীমাংসায় ব্যর্থ হয়েছিলেন, যেমন ওয়েলেসলী ভারতীয় যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারেন নি। একখানা ইয়োরোপীয় মানচিত্রের প্রতি অঙ্গুলী-নির্দেশ করে পিট বলেছিলেন, "ঐ মানচিত্রখানা গুটিয়ে ফেল, দশ বৎসরের মধ্যে এটার আর প্রয়োজন হবে না।" শয্যাশায়ী প্রধানমন্ত্রী এবং ফিরিয়ে আনা গভর্ণর-জেনারেলের মধ্যে এক মর্মস্পর্শী সাক্ষাৎকার ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে পিটের এটাই ছিল শেষ সাক্ষাৎ দান। আরও কিছুদিন ধরে যুদ্ধ চলেছিল। ইয়োরোপে যুদ্ধের মীমাংসা হয় ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে, ভারতে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে।

ইতোমধ্যে ভারতে সাময়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আগমনের কিছুদিন পরেই কর্ণওয়ালিস ভারতে পরলোকগমন করেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী স্যর জন বার্লো এবং লর্ড মিণ্টো মারাঠাদের আর বিরক্ত করেন নি। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ পুনর্লিখিত হয়। কিন্তু

---

* প্রো-কন্সাল: একদা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ শাসনের জন্য প্রধান রোমান রাজপুরুষকে প্রো-কনসাল বলা হত। কর্ণওয়ালিশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভারতীয় অঞ্চলের প্রধান রাজপুরুষ। কমনার বলতে এখানে বৃটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমনসের সদস্য বুঝতে হবে অর্থাৎ এ আলোচনায় উইলিয়ম পিট।—সম্পাদক

ভারতের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার অবলুপ্ত হয়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথের সনদের ফলে কোম্পানি প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের যে অধিকার পেয়েছিলেন চীন দেশের চা নিয়ে ব্যবসা করা ছাড়া তা বর্তমানে সমস্ত বৃটিশ বণিকদেরই দেওয়া হল।

পরে মারকুইস অব হেষ্টিংস বলে খ্যাত লর্ড ময়রা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড মিণ্টোর স্থলাভিষিক্ত হন তখন মারাঠাদের সঙ্গে শেষ সংঘর্ষের সময় উপস্থিত। নেপালের যুদ্ধে হিমালয়ের কিছু অঞ্চল কোম্পানির অধিকারে আসে। পিণ্ডারীদের ধ্বংস করবার জন্যও এক যুদ্ধের অবতারণা করা হয়েছিল। পিণ্ডারীরা ছিল আফগান জাট এবং মারাঠা ভাড়াটে সৈন্যের দল যারা অর্থের বিনিময়ে যে কোন দলপতিকেই সাহায্য করত এবং নিজেরাই অনেক সময় গ্রাম-জনপদ লুণ্ঠন করত। সর্বশেষে ঘটে মারাঠাদের সঙ্গে তৃতীয় এবং সমাপ্তিসূচক যুদ্ধ। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া বৃটিশদের সঙ্গে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' স্থাপন করেন কিন্তু পরাধীনতার নিয়ন্ত্রণে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সব ছদ্মবেশ খুলে ফেললেন এবং অন্যান্য মারাঠী প্রধানগণও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু খিরকিতে পেশোয়া পরাজিত হন, ভোঁসলের সৈন্যবাহিনী সিতাবল্‌দির যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে এবং মেহিদপুরে হোলকারের বাহিনী স্যর জন ম্যালকম কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার রাজ্য অধিকৃত হয় এবং বোম্বাই প্রদেশ গঠিত হয়। পর বৎসর পেশোয়া বন্দী হন এবং ভাতার বিনিময়ে অবসর গ্রহণ করেন। ক্ষুদ্রতর মারাঠা প্রধানগণ—সিন্দিয়া, হোলকার, ভোঁসলে এবং গাইকোয়ড়—ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যশক্তির অধীনে নিজ নিজ রাজ্যশাসনের অনুমতি লাভ করেন।

ভারতে বৃটিশ শাসনের দ্বিতীয় যুগে রাজনৈতিক এবং সামরিক কার্যাবলীর এই হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই যুগের অসামরিক প্রশাসনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং হিতকর কাজ হল ভূমিরাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যা প্রথমে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রবর্তিত হয়, ১৭৯৫-তে বারাণসীতে এবং ১৮০২ থেকে ১৮০৫-এর মধ্যে উত্তর সরকার এবং অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। এই যুগের প্রধানতম রাজনৈতিক কীর্তি হল মহীশূর এবং মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত অবদমন।

৩. মুনরো, এলফিনস্টোন এবং বেন্টিংকের যুগ, ১৮১৭-১৮৩৭

এবার আমরা ইয়োরোপে এবং ভারতে শান্তি, ব্যয়সংকোচ এবং সংস্কারের যুগে পদার্পন করলাম। নেপোলিয়নের যুদ্ধে ইয়োরোপীয় জাতিসমূহ ক্লান্ত হয়ে

পড়েছিল এবং ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পর চলছিল দীর্ঘ মেয়াদী শান্তির যুগ। সর্বত্রই সংস্কারসাধন এবং জনসাধারণের নাগরিক অধিকার লাভের জন্য প্রচেষ্টা চলেছিল। ফ্রান্সে এই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবে সমাপ্ত হয়েছিল। ইংলণ্ডে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের রিফর্ম এ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়েছিল। হল্যাণ্ডের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেলজিয়াম নিজস্ব জাতীয় সরকার গঠন করে। জার্মানী এবং ইটালীতে জাতীয় ঐক্য এবং স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন হয়েছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গ্রীস স্বাধীন হয়। ১৮৩৩ সালে ক্রীতদাস প্রথা রহিত হয়। এ যুগের মূল মন্ত্র ছিল সংস্কার সাধন ও সর্বত্র জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি এবং এই মন্ত্র ভারতে প্রশাসকগণের নীতিকে উজ্জীবিত করেছিল।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্ষ্ট গভর্ণর জেনারেল রূপে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে স্বল্পমেয়াদী বর্মী যুদ্ধে আসাম, আরাকান এবং টেনাসেরিম কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয়। দুই বৎসর পরে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক গভর্ণর জেনারেল হিসেবে কলকাতায় পদার্পন করেন। কুর্গ অধিকার ও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের শাসনভার গ্রহণ করে তিনিও বৃটিশ অধিকারে আরও কিছু অঞ্চল যোগ করেন। কিন্তু আমরা যে যুগের বর্ণনা করছি এই সামান্য কয়েকটি অন্তর্ভুক্তি তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বহীন উপাদান। মুনরো, এলফিনষ্টোন এবং বেণ্টিংকের নামের সঙ্গে জড়িত নাগরিক সংস্কার এ যুগের বৈশিষ্ট্য।

ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত বিচার বিভাগীয় শাসন ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল। কারণ দেশের অধিবাসিগণ প্রশাসনিক কার্যে অকিঞ্চিৎকর অংশগ্রহণেও বঞ্চিত ছিলেন। বিচার বিভাগীয় কাজ বকেয়া পড়ে থাকছিল। মামলার নিষ্পত্তিতে বৃটিশ বিচারকগণের বিলম্বের অর্থ ছিল বিচারের ব্যর্থতা। কোম্পানির এলাকায় অপরাধের সংখ্যা বেড়েই চলেছিল। গুপ্তচর নিয়োগ এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তাতে দুর্বৃত্তির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো লিখেছিলেন যে খুনজখম সহ ডাকাতি বঙ্গদেশের সর্বত্রই বিরাজমান ছিল। তারপরেই কোম্পানির যোগ্যতম কর্মচারিবৃন্দ ভারতে প্রশাসনিক কার্যের একটি বৃহত্তর অংশের ভার জনসাধারণের উপর ন্যস্ত করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কলকাতার বিচারপতি স্যর হেনরি স্ট্র্যাচি লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষের মত সভ্য, জনাকীর্ণ দেশে দেশজ লোকেদের দ্বারাই বিচারের সুনিষ্পত্তি হতে পারে।"

ভারতে টমাস মুনরোই ছিলেন প্রথম ইংরেজ যিনি এই নীতিকে কার্যে রূপান্তরিত করেন এবং জাতির ওপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনের নীতির প্রবর্তন করেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এক তরুণ সৈনিক হিসেবে তিনি ভারতে এসেছিলেন। হায়দার আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধগুলিতে তিনি লড়াই করেছিলেন এবং ১৭৯৩, ১৭৯৯ ও ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মহীশূর ও দাক্ষিণাত্যের অধিকৃত অঞ্চলের জমিজরিপ ও কর্মনির্ধারণে আপনার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। মাদ্রাজের বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতির জন্য একটি কমিশনের প্রধান-রূপে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং সেই বিখ্যাত প্রবিধানসমূহ পাশ করিয়েছিলেন যা দায়িত্বশীল প্রশাসনিক কাজে ভারতীয়দের প্রশস্ততর কর্মনিয়োগের সুযোগ করে দিয়েছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের গভর্ণর রূপে মুনরো তৃতীয় এবং শেষবারের মতন ভারতে আসেন। তিনি মাদ্রাজের রায়তওয়ারী জমি বন্দোবস্ত কার্যে রূপান্তরিত করেন। যাদের জন্য তিনি আজীবন কাজ করেছিলেন সেই জাতির প্রীতি ও শোকের মধ্য দিয়েই ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি ভারতে পরলোক গমন করেন।

মাদ্রাজে স্যর টমাস মুনরো যা করেছিলেন মাউণ্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন সে কাজই করেছিলেন বোম্বাইতে। মুনরোর থেকে তিনি বয়সে আঠার বৎসরের ছোট ছিলেন। তিনিও প্রথম জীবনেই ভারতে এসেছিলেন ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে, নিজ কাজের মধ্যেই আপনার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছিলেন এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আসি-র যুদ্ধ জয়ের সময় তিনি অনেকটা ডিউক অব ওয়েলিংটনের রাজনৈতিক সচিবের মতন ছিলেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্তানের দৌত্যকার্যের জন্য লর্ড মিণ্টো কর্তৃক তিনি নির্বাচিত হন এবং আফগান ও তাদের দেশের উপর প্রথম এবং সম্ভবত একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার রাজসভার রেসিডেণ্ট হিসেবে পুণায় প্রত্যাবর্তনের পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে শেষ মারাঠা যুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মারাঠা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর বিরাট অভিজ্ঞতার জন্য মারাঠারাজ্যের অন্তর্ভুক্তির পর তিনি বোম্বাই-এর গভর্ণর নিযুক্ত হন। আট বৎসর তিনি এই উচ্চপদে কর্তব্যপালন করেছিলেন। তিনি বোম্বাই-এর প্রবিধানগুলি (Regulations) সংকলনভুক্ত করেছিলেন, প্রশাসনিক কার্যে ভারতীয়দের ব্যাপকতর নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং ঐ প্রদেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। মাদ্রাজে টমাস মুনরোর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

সুতরাং ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বেন্টিংক যখন গভর্ণর জেনারেল হিসেবে ভারতে পদার্পণ করেন তখন সংস্কারের কাজ অর্ধেকেরও বেশী সাধিত হয়ে গেছে। বেন্টিংকের প্রথম জীবন ঘটনাবহুল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি মাদ্রাজের গভর্ণর হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু একটি বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয়। ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে ঝাঁপ দিয়ে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জেনোয়া অধিকার করেন, পুরনো শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইটালীর কল্পনা করেন। চৌদ্দ বৎসর পর পরিণত চুয়ান্ন বৎসর বয়সে গভর্ণর জেনারেল হয়ে তিনি ভারতে আসেন।

মুনরো কর্তৃক অনুমোদিত প্রবিধানসমূহ মাদ্রাজে পাশ হয়ে গিয়েছিল এবং বেসামরিক বিচার বিভাগীয় প্রশাসন প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় বিচারপতিগণের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছিল। এলফিনস্টোন বোম্বাইতেও অনুরূপ সংস্কার সাধন করেছিলেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক ভারতীয় বিচারপতিদের ক্ষমতা এবং বেতন উদার এবং ব্যাপক হারে স্থির করে বঙ্গদেশের বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের ভার তাঁদের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন এবং রাজস্ব বিভাগীয় প্রশাসনে ইয়োরোপীয় সমাহর্তাদের (Collector) সাহায্যের জন্য ভারতীয় উপ-সমাহর্ত্তাদের (Deputy-Collectors) নিযুক্ত করেছিলেন। প্রশাসনিক কার্যে ভারতীয়দের ব্যাপকতর নিয়োগ লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংককে দশ লক্ষ পাউণ্ডের বাৎসরিক ঘাটতিকে বিশ লক্ষ পাউণ্ড উদ্বৃত্তে পরিবর্তিত করতে সক্ষম করেছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরভারতে সংশোধিত মহলওয়ারি ভূমি বন্দোবস্ত এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে রায়তওয়ারি ভূমি বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ পুনরায় রচিত হয়। এবারে শর্ত হল যে তাঁরা বাণিজ্য একেবারেই ত্যাগ করবেন ; এখন থেকে কেবলমাত্র ভারতের পরিচালক এবং শাসক থাকবেন। এবং একই সঙ্গে আরও শর্ত আরোপিত হয়েছিল যে কোন ভারতবাসীই "কেবলমাত্র তার ধর্ম, জন্মস্থান, বংশ, বর্ণ বা তদনুরূপ কারণের জন্য পদাধিকার বা চাকুরী বা কর্ম লাভে অক্ষম হবেন না।"

বেন্টিংকের পর স্যর চার্লস মেটকাফ অস্থায়ীভাবে গভর্ণর জেনারেল হিসেবে কাজ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন লর্ড অকল্যাণ্ড। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন। পরের বৎসর মহারাণী ভিক্টোরিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহারাণীর সিংহাসনারোহণের তারিখ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত সমস্ত দেশগুলির পক্ষেই একটি স্মরণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তারিখ। কিন্তু পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে যে ভারতবর্ষে এই সিংহাসনারোহণ একটি ঐতিহাসিক যুগের সমাপ্তি এবং অন্যেকটির প্রারম্ভ সূচিত করে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রদেশ এবং উত্তর ভারতের প্রকৃষ্ট অঞ্চল সমূহ বৃটিশ শাসনভুক্ত হয়েছিল। এ সময় ভারতীয় বিশিষ্ট সিভিল সার্ভিসের প্রবর্তন হয়। বহু ব্যর্থতা এবং ব্যর্থ পরীক্ষানিরীক্ষার পর দেশের বিচার বিভাগীয় প্রশাসনকে একটি সন্তোষজনক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হ'ল। ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় প্রশাসন সংক্রান্ত কঠিনতর সমস্যাটিরও বিবেচনা বা অবিবেচনাপ্রসূত মীমাংসা হয়েছিল বঙ্গদেশে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে, ১৮২০-তে মাদ্রাজে, ১৮৩৩-এ উত্তর ভারতে এবং ১৮৩৫-এ বোম্বাইতে। দেশের সর্বত্রই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৩৩-এ কোম্পানির বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায় এবং ভারতের পরিচালক ও শাসক হিসেবেই কোম্পানি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় এবং ১৮৩৫-এ বোম্বাইতে ইংরেজী কলেজের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ১৮৩৬-এ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অনুমোদিত হয়। ইয়োরোপ ও ভারতের মধ্যে বাষ্পীয়পোতের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। জনসাধারণের জন্য প্রশাসনিক কার্যে প্রশস্ততর ক্ষেত্র উন্মুক্ত করা হয়। ভারতীয়দের কল্যাণই যে বৃটিশ সরকারের মহান উদ্দেশ্য অন্তত নীতিগতভাবে তা স্বীকৃত হয়। জনগণ এই ইচ্ছায় সাড়া দিয়েছিল। তাদের মধ্যে একটা মনীষাগত জাগরণ দেখা দেয়, প্রগতি ও প্রাগ্রসরতার নিদর্শনও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রায় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের ইতিহাসে একটা স্বাভাবিক গতি লক্ষ্য করা যায় এবং এই তারিখের সঙ্গেই ভারতে আশি বৎসরের বৃটিশ কার্যাবলীর বর্তমান আখ্যানের পরিসমাপ্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গদেশের স্থলবাণিজ্য (১৭৫৭-১৭৬৫)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থলপথে বা নাব্য নদীযোগে মাল চলাচল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও স্থল-শুল্কের বিষয়ীভূত ছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অবশ্য একটি ফরমান বা বাদশাহের আদেশনামা পেয়েছিলেন যাতে তাঁদের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যকে শুল্ক থেকে রেহাই দেওয়া হয়। কোম্পানি ইয়োরোপ থেকে যে মাল আমদানি করতেন এবং যে মাল তাঁরা ইয়োরোপে রপ্তানির জন্য ভারতে ক্রয় করতেন তা বিনাশুল্কেই এভাবে দেশের ভিতর দিয়ে চলাচল করবার অনুমতি পায়। ইংরেজ কোম্পানির সভাপতি বা ইংরেজী কুঠি সমূহের কর্তাব্যক্তিদের দস্তখত যুক্ত একটি দস্তক বা সাক্ষ্যপত্র শুল্ক চৌকীতে দেখানো হত এবং তাতেই কোম্পানির পণ্যদ্রব্য সমস্ত শুল্ক থেকে রেহাই পেত।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধজয় বঙ্গদেশে বৃটিশ জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং বাংলাদেশে স্থলবাণিজ্যে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে নিযুক্ত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিবৃন্দ বেসরকারী সওদাগর হিসেবে এরপর থেকে নিজেদের স্বার্থে কোম্পানির আমদানি ও রপ্তানির জন্য গ্রাহ্য স্থল-শুল্ক থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বুঝা প্রয়োজন, কারণ, পরবর্তী কয়েক বছরের অর্থ নৈতিক, বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস এর মধ্যেই অন্তর্নিহিত।

বিনাশুল্কে রপ্তানি এবং আমদানি বাণিজ্য চালিয়ে যাবার যে অধিকার কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছিল বাংলার নবাবগণ তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু কোম্পানির যে কর্মচারিগণ ব্যক্তিগত স্বার্থে বেসরকারী বাণিজ্য চালাতেন তাঁরা বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মাল চালান দিতেন এবং এই **বেসরকারি স্থলবাণিজ্যের** জন্যও শুল্ক থেকে রেহাই দাবি করতেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরকে বঙ্গদেশের নবাবী মসনদে বসান। মীরজাফর অযোগ্য শাসকের পরিচয় দেন এবং বৃটিশদের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম হন। ফলে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে মীরকাশিমকে নবাবী মসনদে বসানো হয়। নতুন নবাব বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম—এই তিনটি জেলার রাজস্বের স্বত্ব ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দিতে

রাজী হন। মীরজাফর যে অর্থবাকী রেখেছিলেন সেই বকেয়া টাকা শোধ করতে এবং দক্ষিণ ভারতে কোম্পানির যুদ্ধ বাবদ সাহায্য হিসেবে পাঁচ লক্ষ টাকা (৫০,০০০ পাউণ্ড) নজরানা দিতে তিনি সম্মত হয়েছিলেন। মীরকাশিম বিশ্বস্তভাবে এই প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করেন এবং দুই বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যেই তিনি বৃটিশদের নিকট প্রদেয় সমস্ত আর্থিক দায় থেকে মুক্ত হন।

কিন্তু স্থলবাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যা বৎসর বৎসর বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোম্পানির কর্মচারিবৃন্দ স্থান থেকে স্থানান্তরে বিনাশুল্কে মাল চালান দিত। পক্ষান্তরে দেশীয় বণিকদের মাল চলাচলে প্রচুর শুল্ক ধার্য হত। দেশীয় বণিকগণ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে, নবাবের রাজস্ব আদায় হ্রাস পেতে থাকে এবং কোম্পানির কর্মচারীরা স্থলবাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার পেয়ে বিপুল সৌভাগ্য গড়ে তোলে।

১৭৬০ সালে গভর্ণর হিসেবে ভ্যানসিট্রার্ট ক্লাইভের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি এই ক্রমবর্ধমান দুষ্কৃতি লক্ষ্য করেন এবং তার কারণগুলিও বর্ণনা করেন।

"বাণিজ্যের ব্যাপারে মীরজাফরের কাছে থেকে কোন নতুন সুবিধেই চাওয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানি কোন সুবিধেই চান নি। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে অনুমোদিত শর্তগুলি নিয়েই কোম্পানি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং নবাবের স্বেচ্ছাচারী শক্তির দরুন যে যে করভারের অধীন হয়ে পড়েছিলেন তার থেকে তাঁরা অব্যাহতি চাইছিলেন। দেশে আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে না হতেই কোম্পানির কিছু কর্মচারী অথবা তাঁদের অধীনে নিযুক্ত কিছু লোক অনেক কিছু নতুন নতুন ব্যাপার সুরু করে দেয়। পূর্ব থেকে নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবসা এবং দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ আরম্ভ করে দেয়।"[১]

পরবর্তীকালে গভর্ণরের স্থলাভিষিক্ত শ্রীযুক্ত ভেরেল্‌স্ট্‌ও একই কথা লিখেছিলেন।

"শুল্ক না দিয়েই যে বাণিজ্য চালানো হত, সেজন্য অকথ্য অত্যাচার চলত। ইংরেজ প্রতিনিধি বা গোমস্তারা মানুষকে জখম করেও সন্তুষ্ট না হয়ে যখনই নবাবের কর্মচারীরা হস্তক্ষেপ করছেন মনে হতো তখনই তাদের বেঁধে শাস্তি দিয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষের উপর চড়াও হতেন। মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধের এই ছিল প্রত্যক্ষ কারণ।"[২]

কোম্পানির কর্মচারিগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মীরকাশিম নিজেই ইংরেজ গভর্ণরের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

"কলকাতার কুঠি থেকে কাশিমবাজার, পাটনা এবং ঢাকা পর্যন্ত সমস্ত

ইংরেজ কর্তাব্যক্তিরা, তাঁদের গোমস্তা, কর্মচারী ও দালালরা সরকারের প্রত্যেক জেলাতেই রাজস্ব আদায়কারী সমাহর্তা, খাজনাবিলিকার, জমিদার ও তালুকদারের মত কাজ করছে এবং কোম্পানির পতাকা তুলে ধরে আমার কর্মচারীদের কোন ক্ষমতাই প্রয়োগ করতে দিচ্ছে না। এ বাদেও, গোমস্তা এবং অন্যান্য কর্মচারীরা প্রত্যেক জেলা, গঞ্জ, পরগণা এবং গ্রামে তেল, মাছ খড়, বাঁশ, চাল, ধান, সুপুরি ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা চালাচ্ছে। প্রত্যেকেই কোম্পানির একটা দস্তক হাতে নিয়ে নিজেকে কোম্পানির সমকক্ষ মনে করে।”[৩]

মীরকাশিমের অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিল না। পাটনাস্থিত কোম্পানির প্রতিনিধি এলিস তাঁর শত্রুতাপূর্ণ আচরণের দ্বারা নবাবের পক্ষে বিশেষ বিরক্তিকর ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। নবাবের ব্যবহারের জন্য সামান্য পরিমাণে শোরা ক্রয় করবার জন্য এক আর্মেনীয় বণিককে অভিযুক্ত করা হয়। এই শোরা কেনাকে কোম্পানির অধিকার লঙ্ঘণ বলে গণ্য করা হয় এবং এলিস তাঁকে গেপ্তার করে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কলকাতায় প্রেরণ করেন। বৃটিশ সেনাবাহিনী থেকে দুইজন পলাতক সৈন্য নবাবের মুঙ্গের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছে অনুমান করে দুর্গ তল্লাশী করবার জন্য এলিস তাঁর সৈন্যদের পাঠান। কিন্তু কোন পলাতককেই খুঁজে পাওয়া গেল না। গভর্ণরের পরিষদের তৎকালীন সভ্য ওয়ারেন হেষ্টিংস নবাবের কর্তৃত্বের প্রতি অবজ্ঞাজনিত এই অশোভনতা বুঝতে পেরেছিলেন এবং একটা খোলাখুলি বিচ্ছেদের সম্ভাবনাও অনুমান করেছিলেন।

“শ্রীযুক্ত এলিসের ব্যাপারে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি। আমার মতে তাঁর ব্যবহার এতই উদ্ধত, নবাবের প্রতি তাঁর বিরূপতা এতই প্রকটভাবে দৃষ্টিকটু রকমের অসৌজন্যমূলক যে এর যথার্থ মূল্যায়নে কোম্পানির তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করতে বাধ্য। দুনিয়াশুদ্ধ লোক ঘটনার বিচারেই দেখতে পাচ্ছে যে নবাবের কর্তৃত্ব প্রকাশ্যে অবমানিত হচ্ছে, তাঁর কর্মচারিবৃন্দ বন্দী হচ্ছে, তাঁর দুর্গের বিরুদ্ধে সিপাহীদের পাঠানো হয়েছে; তাদের বলা হয়েছে যে ইংরেজ অধ্যক্ষ এই সব অঞ্চলে নবাবের সুবাদারী অধিকার স্বীকার করতে রাজী নন। এই সমস্ত লক্ষণেরই নিশ্চিত পরিণতি হল একটা খোলাখুলি বিচ্ছেদ।”[৪]

ওয়ারেন হেষ্টিংসেরই কৃতিত্ব হ’ল যে তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের বিনাশুল্কে ব্যক্তিগত বাণিজ্য চালাবার বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং এর দরুন বঙ্গদেশবাসীদের বাণিজ্যের যে সর্বনাশ হয়েছিল তার জন্যও

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। স্বার্থান্বেষণে তাঁর দু'চোখ অন্ধ হয়নি, বরং বঙ্গদেশের জনগণের প্রতি যে অবিচার সাধিত হয়েছিল কঠোরতম ভাষায় তার তিরস্কার করা থেকে তাঁকে আপন দেশবাসীর প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতাও নিবৃত্ত করতে পারে নি।

"আমি আপনাদের কাছে এমন একটি অভিযোগ উপস্থাপিত করছি যার আশু প্রতিবিধান প্রয়োজন এবং সঠিক সময়ে অবহিত না হলে যা নবাব এবং কোম্পানির মধ্যে দৃঢ় এবং চিরস্থায়ী সৌহার্দ্য সৃষ্টির সকল প্রয়াস ব্যর্থ করে দেবে। ইংরেজের নামে যে সব অত্যাচার চালানো হচ্ছে আমি সে কথাই বলছি।…যে স্থান দিয়েই আমি গিয়েছি সেখানেই বেশ কয়েকটি ইংরেজ নিশান দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি এবং নদীবক্ষে এমন একটি নৌকাও দেখিনি যাতে ঐ ইংরেজ নিশান ছিলনা। যে মালিকানার দলিল হিসেবেই সেগুলি জাহির করা হোক না কেন (কারণ জিজ্ঞাসাবাদ না করেও নিজের দু'চোখকে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম) আমি নিশ্চিত যে সেগুলির আধিক্য নবাবের রাজস্ব, দেশের শান্তি অথবা আমাদের জাতির সম্মানের কোন শুভ পূর্বাভাস দেয় না, বরং স্পষ্টতঃ প্রত্যেকটিকেই ক্ষুণ্ন করবার দিকে প্রবণতা সৃষ্টি করে। আমাদের সম্মুখবর্তী ছিল একদল সিপাহী। তারা যেখানেই নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী চলেছে, সেখানেই ঐ লোকগুলির লোলুপ ও উদ্ধত চরিত্রের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে আমার কাছে বহু অভিযোগ করা হয়। একই রকম আচরণের আশঙ্কায় আমরা নিকটবর্তী হওয়া মাত্রই বেশীর ভাগ ছোট মফঃস্বল শহর এবং সরাইগুলি জনশূন্য হয়ে পড়ছিল এবং দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। মহাশয়, আপনি সুবিবেচক, ভেবে দেখুন যৎসামান্য এমন ধারা বেআইনী কার্যকলাপ – যা সরকারের কাছে আবেদন সাপেক্ষ হয়ে ওঠে না, তা বারবার সংঘটিত হলে দেশের মানুষ আমাদের সরকারের বিষয়ে সবচেয়ে প্রতিকূল মনোভাব গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।"[৫]

হেষ্টিংস ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ছিলেন এবং এ কথা বলে তিনি ভুল করেন নি যে কোম্পানির কর্মচারীদের প্রশাসন সম্পর্কে জনসাধারণ বিরুদ্ধ মত পোষণ করে। 'সিয়ার মুতাখারিণ' নামে সুখ্যাত সংকলনের গ্রন্থকার রণাঙ্গনে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর আচরণের প্রশংসা করেও তাঁদের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের এক শোচনীয় চিত্র এঁকেছেন।

"তাদের (ইংরেজদের) মধ্যে অবিচল সাহস এবং সতর্ক দূরদর্শিতার সংমিশ্রণ দেখা যায়।

ব্যূহপরিকল্পনার সুশৃঙ্খল বিন্যাস এবং যুদ্ধ পরিচালনার দক্ষতায়ও তাদের তুলনা নেই। এই সব সামরিক গুণাবলীর সঙ্গে প্রশাসনিক দক্ষতা কিভাবে যুক্ত করা যায় তা যদি তাঁরা জানতেন, কৃষক ও ভদ্রলোকদের প্রতি মনোযোগ দিয়ে সামরিক বিষয় সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যাপারে তাঁরা যতখানি করে থাকেন, খোদাতালার প্রজাদের দুঃখমোচন এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁরা যদি ততটা উদ্ভাবনীশক্তি এবং উৎকণ্ঠা দেখাতেন, তা হলে পৃথিবীর কোন জাতিই তাদের চেয়ে যোগ্যতর বা সার্বভৌম নেতৃত্বের জন্য অধিকতর উপযুক্ত প্রমাণিত হ'ত না।"

কিন্তু তাঁদের অধিকৃত রাজ্যসমূহের জনগণের প্রতি এতই সামান্য মনোযোগ তাঁরা দেখান, তাদের প্রতি সমানুভূতি ও মনোযোগ এতই কম যে তাঁদের অধিকারে জনগণ সমস্ত অঞ্চলেই আর্তনাদ করে থাকে। হা আল্লা! তোমার নির্যাতিত সন্তানদের পাশে এসে দাঁড়াও। অত্যাচারের হাত থেকে তাদের মুক্তি দাও।"[৬]

বাংলার নবাব ইংরেজ গভর্ণরের নিকট কেবলমাত্র ব্যর্থ প্রতিবাদই জানাতে থাকেন।

"প্রত্যেক পরগণা, গ্রাম এবং বাণিজ্যকুঠিতে, তারা [কোম্পানির গোমস্তারা] লবণ, সুপুরি, ঘি, চাল, খড়, বাঁশ, মাছ, গুণচট, আদা, চিনি, তামাক, আফিম, বেচাকেনা করে। আমি যেগুলি লিখছি তা বাদেও অনেক জিনিষ আছে, যেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। নির্দ্ধারিত মূল্যের এক চতুর্থাংশ দিয়ে তারা রায়ৎ, ব্যাপারী প্রভৃতিদের মাল ও পণ্যদ্রব্য নিয়ে চলে যায়; এবং জোর জবরদস্তি মারফৎ তারা রায়ৎ প্রভৃতিদের এক টাকা দামের মালের জন্য পাঁচ টাকা দিতে বাধ্য করে। প্রতিটি জেলার পদস্থ আমলারা কর্তব্যপালন থেকে বিরত হতে বাধ্য হয়েছেন। এই জুলুম এবং তদুপরি আমি কর্তব্য কর্ম থেকে বিরত হতে বাধ্য হবার ফলে আমার রাজকোষে পঁচিশ লক্ষ টাকার লোকসান হচ্ছে। খোদাতালার নামে বলছি আমি যে সন্ধি এবং চুক্তি করেছি, তা আমি লঙ্ঘন অতীতেও করিনি, এখনও করি না এবং ভবিষ্যতেও করব না। তা'হলে ইংরেজ কুঠিয়ালরা আমার সরকারকে অবজ্ঞেয় করে তুলছেন কেন এবং ক্ষতি সাধনের জন্য নিজেরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কেন?"[৭]

কোম্পানির গোমস্তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আরও একটি বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় সার্জেণ্ট ব্রেগোর পত্রে।

"ধরা যাক, জনৈক ভদ্রলোক ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য একজন গোমস্তাকে

এখানে পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে গোমস্তা প্রত্যেক অধিবাসীকে তার মাল ক্রয় এবং তার নিকটে তাদের মাল বিক্রয় করতে জবরদস্তি করার পক্ষে নিজেকে যথেষ্ট ক্ষমতাবান বলে ধরে নিলো। গররাজি (অসামর্থের ক্ষেত্রে) হলে অবিলম্বে চাবকানো বা গারদে পোরা শুরু হয়। ইচ্ছুক হলেও এটাই যথেষ্ট নয়। বরং তখন অন্য ধরনের বলপ্রয়োগ করা হয়—তা হ'ল বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখাগুলি আত্মসাৎ করা এবং তারা যে সমস্ত দ্রব্যের সওদাগরি করে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সেই সব দ্রব্যের বেচাকেনা বরদাস্ত না করা। যদি দেশের অধিবাসীরা তা মেনে নেয় তবে তাদের শক্তির আবার নিত্য নতুন কায়দায় পুনঃপ্রয়োগ ঘটে। আবার, কোন দ্রব্য ক্রয় করে, যে ন্যূনতম কাজটি তারা করতে পারে বলে মনে করে তা হল আরেকজন বণিক যে মূল্য দেবে তার চেয়ে ঢের কম মূল্য দেওয়া। এবং অনেক সময়ই তারা কোনও দামই দিতে রাজি হয় না। আমি হস্তক্ষেপ করায় তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। জায়গাটি [বাংলার একটি সমৃদ্ধ জেলা বাখরগঞ্জ] যে ক্রমশঃ বসতিশূন্য হয়ে আসছে তার কারণ হল এই সব এবং আরও বহু বর্ণনাতীত অত্যাচার, যা বঙ্গদেশের গোমস্তারা প্রতিদিন চালিয়ে যাচ্ছে। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বসতির খোঁজে প্রতিদিন বহু লোক শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পেয়াদারা গরীব লোকজনের ওপর জোর-জুলুমের অধিকারী হওয়ায় যে বাজারগুলিতে পূর্বে প্রাচুর্য ছিল, এখন সেখানে প্রয়োজনীয় কিছুই পাওয়া যায় না। জমিদার যদি তা' প্রতিরোধ করতে যান তবে তাঁকেও অনুরূপ শাস্তির ভয় দেখানো হয়। পূর্বে বিচার হত প্রকাশ্য কাছারিতে। কিন্তু এখন প্রত্যেক গোমস্তাই এক একজন বিচারক বনে গিয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের গৃহই হয়ে উঠেছে এক একটি করে কাছারি। তারা জমিদারগণকে দণ্ডাদেশ পর্যন্ত দিয়ে থাকে এবং ক্ষতির অছিলায় টাকা আদায় করে, যেমন কোন পেয়াদার সঙ্গে মারামারি হয়েছে কিংবা হয়ত তাদের জিনিষ চুরি গিয়েছে—নিজেদের লোকজনেরাই সম্ভবত এ চুরির জন্য দায়ী।"৮

কলকাতার ইংরেজ গভর্ণরের কাছে লেখা ঢাকার সমাহর্তা (কলেকটার) মহম্মদ আলীর পত্রে অনুরূপ বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

"প্রথমত, বেশ কয়েকজন বণিক কুঠির লোকদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নেয়, তাদের নৌকায় ইংরেজ নিশান ওড়ায় এবং তাদের যে মালের জন্য শাবন্দর ও অন্যান্য মাশুল নির্ধারিত হত সে মালপত্র ইংরেজ সম্পত্তি-এই অজুহাতে নিয়ে চলে যায়। দ্বিতীয়ত, লক্ষ্মীপুর এবং ঢাকার কুঠির

গোমস্তারা তামাক, তুলা, লোহা এবং অন্যান্য নানা জিনিষ বাজারদর থেকে বেশী দামে তাদের কাছ থেকে কিনতে সওদাগরদের বাধ্য করত। তারপর জোর করে তাদের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নিত। এ বাদেও পেয়াদাদের জন্য তারা খাই-খরচ আদায় করে। এ ধরনের কার্যকলাপের ফলে ঔরং এবং আরো কয়েকটি জায়গা ধ্বংস হয়ে গেছে! তৃতীয়ত, লক্ষ্মীপুরের গোমস্তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য তহশিলদারের কাছ থেকে জোর করে তালুকদারের তালুকগুলি (কৃষকের খামার) নিয়ে নিয়েছে এবং এজন্য তারা কোন খাজনা দেবে না। কিছু লোকের উস্কানিতে কোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে তারা ইয়োরোপীয় এবং সিপাহীদের একটি দস্তক সহ গ্রামাঞ্চলে পাঠায় এবং তারা সেখানে হুজ্জুতির সৃষ্টি করে। বিভিন্ন জায়গায় তারা চৌকি (শুল্ক অফিস) বসায় এবং গরীব লোকেদের বাড়ীতে যা পায় তাই বিক্রি করিয়ে টাকা নিয়ে চলে যায়। এই সব গোলযোগের ফলে দেশের সর্বনাশ হচ্ছে। রায়তেরা আপন গৃহে থাকতে পারে না, মালগুজারী (খাজনা) টাকাও দিতে পারে না। অনেক স্থানেই শ্রী শেভালিয়ার জোর করে নতুন বাজার এবং কুঠি বসিয়েছেন ও নিজেই ভুয়া সিপাহীদের নিযুক্ত করেছেন। যাকে খুশী তাকেই তারা পাকড়াও করে জরিমানা আদর করছে। তার জবরদস্তির ফলে বহু হাট, ঘাট এবং পরগণা ধ্বংস হয়ে গেছে।"[৯]

প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ জেলায় কোম্পানির কর্মচারী এবং মুৎসুদ্দিদের দ্বারা বঙ্গদেশের স্থলবাণিজ্য বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। যে উপায়ে তারা শিল্প সামগ্রী নিজেদের জন্য অধিকার করত তাও ছিল সমান জুলুমবাজী। উইলিয়ম বোল্ট্স্ নামে জনৈক ইংরেজ বণিকও নিজের চোখে দেখা ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন।

"এ-দেশের সমগ্র স্থলবাণিজ্য বর্তমানে যে ভাবে পরিচালিত হচ্ছে, বিশেষ করে ইয়োরোপের জন্য কোম্পানির অর্থ বিনিয়োগের ব্যাপারটি, তাতে এখন একথা নির্ভুল ভাবেই বলা যেতে পারে যে অত্যাচারের তা এক অবিরাম দৃশ্য। সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য একচেটিয়া হওয়ায় দেশের প্রতিটি তাঁতী এবং উৎপাদককে এর সর্বনাশা ফল ভোগ করতে হয়। প্রতি কারিগর কতটা পরিমাণ মাল সরবরাহ করবে এবং সেজন্য তারা কত দাম পাবে তা' বাণিয়া এবং অশ্বেতকায় গোমস্তাদের সঙ্গে ইংরেজগণ নিজেদের খেয়াল খুশী মত স্থির করে। গোমস্তা আরং-এ (শিল্পদ্রব্য উৎপাদনকারী জনপদ) পৌঁছে একটা বাসস্থান ঠিক করে যাকে বলা হয় কাছারী। পেয়াদা এবং হরকরাদের দিয়ে

দালাল, পাইকার এবং তাঁতীদের সেখানে ডেকে পাঠায়। মালিকদের প্রেরিত অর্থপ্রাপ্তির পর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট মূল্যে সরবরাহের জন্য গোমস্তা তাঁতীদের দিয়ে একটা মুচলেকা সহি করিয়ে ওই টাকার কিছুটা অংশ তাদের দাদন হিসাবে দেয়। গরীব তাঁতীর সম্মতি প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয় না। কারণ, কোম্পানির বিনিয়োগে নিযুক্ত গোমস্তাগণ তাদের দিয়ে যা খুশী তাই সহি করিয়ে নেয়। তাঁতীরা প্রদত্ত টাকা নিতে অস্বীকার করলে জানা গেছে কোমরের কোঁচার খুটের সঙ্গে তা বেঁধে দেওয়া হয় এবং চাবুক মেরে তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়।… কোম্পানির গোমস্তাদের খাতায় এ রকম অনেক তাঁতীর নাম আছে যাদের অন্য কারোর জন্য কাজ করতে দেওয়া হয়না। দাসের মত তাদের এক গোমস্তা থেকে অন্য গোমস্তার কাছে চালান দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক গোমস্তার স্বেচ্ছাচার ও শঠতার অধীন হয়ে তাদের থাকতে হয়।…এই বিভাগে যে প্রতারণার অনুশীলন হয় তা কল্পনাতীত। কিন্তু সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে গরীব তাঁতীকে প্রতারণায়। কারণ কোম্পানির গোমস্তারা এবং তাদের যোগসাজসে যাচনদাররা (কাপড়ের জমিন বিচারক) মালের যে দাম বেঁধে দেয়, প্রকাশ্য বাজারে খোলা বিক্রি করলে সেই মালের যা দাম পড়ে তার থেকে সব ক্ষেত্রেই তা শতকরা ১৫ এবং কখনো বা শতকরা ৪০ ভাগ কম। কোম্পানির মুৎসুদ্দিরা যে চুক্তি বলপূর্বক চাপিয়ে দেয়, সারা বঙ্গদেশে যা মুচলেকা বলে পরিচিত, তাঁতীরাও সে চুক্তি পালন করতে অক্ষম হলে তাদের মাল দখল করে ঘাটতি পুরণের জন্য সেখানেই বিক্রি করে দেওয়া হয়। নগদ বলে পরিচিত কাঁচা রেশমের উৎপাদকদের প্রতিও এ ধরনের অবিচার করা হচ্ছে। এমন নজিরের কথাও জানা গেছে যে জোর করে রেশম উৎপাদন থেকে বিরত করবার জন্য তাদের বুড়ো আঙুল কেটে দেওয়া হয়েছে।”[১০]

কেবল শিল্পই নয় এই প্রথায় বঙ্গদেশে কৃষিরও অবনতি ঘটে। কারণ দেশের কারিগরদের অনেকেই কৃষক ছিলেন।

“কারণ রায়তেরা যারা সাধারণত একই সঙ্গে জমির মালিক এবং শিল্পোৎপাদক, মালের জন্য হয়রানি ও উৎপীড়নের ফলে প্রায়শই জমির উন্নতি করতে পারছে না, এমন কি খাজনা পর্যন্ত দিতে পারছে না। অপর পক্ষে এ জন্য রাজস্ববিভাগীয় কর্মচারিগণ তাদের উপর জুলুম করে থাকে এবং প্রায়শই বকেয়া খাজনার টাকা মেটাবার জন্য ঐ লোভী দানবোপমেরা তাদের নিজেদের পুত্রকন্যা বিক্রয় করতে অথবা দেশে ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে।”[১১]

এই উদ্ধৃতিগুলিই যথেষ্ট। ইংরেজ গভর্ণর, পরিষদের ইংরেজ সভ্য ও ইংরেজ বণিকের পত্র ও রচনাবলী, এবং স্বয়ং নবাবের অভিযোগ, মুস্লিম রাজস্ব-কর্মচারীর বিবরণ এবং মুস্লিম ঐতিহাসিকের সংকলন প্রভৃতি বিভিন্ন সূত্র থেকে এগুলি সংগৃহীত হয়েছে। সমস্ত দলিলই সেই একই বিষাদময় ইতিকথার সাক্ষ্য দেয়। বঙ্গদেশের লোকেরা পূর্বেও অত্যাচারী শাসনে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু যে অত্যাচার প্রতিটি গঞ্জ এবং প্রতিটি বস্ত্রোৎপাদকের তাঁত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে সুদূরপ্রসারী তেমন অত্যাচারের সঙ্গে কখনো তারা বসবাস করে নি। ক্ষমতাসীন ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারী শাসনে তারা আগেও অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু যা তাদের বাণিজ্য, বৃত্তি এবং জীবনকে এতটা গভীরভাবে আঘাত করেছে এমন ধারা কোনো শাসনে কখনো তারা উৎপীড়িত হয় নি। ফলে তাদের শিল্পবিকাশের নির্ঝর স্তব্ধ হয়ে গেল, সম্পদসৃষ্টির উৎসমুখ শুকিয়ে গেল।

বঙ্গদেশে দু'জন ইংরেজ এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা হলেন হেনরি ভ্যানসিট্টার্ট ও ওয়ারেন হেষ্টিংস। নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সমস্যাগুলির আপোষমূলক মীমাংসার জন্য তাঁরা মুঙ্গেরে এসেছিলেন। মীরকাশিম স্বেচ্ছাচারী ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ ছিল। তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী এবং দৃঢ়চেতা ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জানতেন কোম্পানির বিরুদ্ধে তিনি কতখানি শক্তিহীন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কেবলমাত্র ভ্যানসিট্টার্ট এবং হেষ্টিংসই তাঁর মিত্র। তাঁর কাছে যে যে বিশেষ সুবিধা দাবী করা হয় তিনি তা স্বীকার করলেন এবং এই তিনজন মিলে একটি চুক্তি করেছিলেন।

নয়টি খাতে চুক্তির সর্তগুলি নিবদ্ধ হয়েছিল।[১২] প্রথম তিনটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি হ'ল --

(১) নৌবাহিত আমদানি বা রপ্তানি সকল বাণিজ্যেই কোম্পানির দস্তক অনুমোদিত হবে এবং তা বিনা উৎপীড়ন ও বিনাশুল্কে চালিত হবে।

(২) দেশের একস্থান থেকে অন্যস্থানে দেশের পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যে কোম্পানির দস্তক অনুমোদিত হবে।

(৩) নির্দিষ্ট হার অনুসারে এমন পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক দিতে হবে যা বিশেষভাবে নির্ধারিত হবে এবং চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

এর থেকে নিরপেক্ষ চুক্তি হতে পারে না। তবু এটাই কলকাতায় ক্রোধের একটা বিস্ফোরণ ঘটাল। এমিয়েট, হে এবং ওয়াট্‌স্ ১৭৬৩ সালের ১৭ই

জানুয়ারী লিখলেন, "তিনি (ভ্যানসিটার্ট) যে বিধানসমূহের প্রস্তাব করেছেন ইংরেজ হিসেবে আমাদের পক্ষে তা অসম্মানজনক। সরকারী ও বেসরকারী বাণিজ্য এতে অবলুপ্তির পথে যাবে।" ১৫ই ফেব্রুয়ারী সাধারণ পরিষদের (জেনারেল কাউন্সিল) বৈঠক বসে। ১লা মার্চ এক ভাবগম্ভীর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় স্থির হল (ভ্যানসিটার্ট এবং হেষ্টিংস দ্বিমত পোষণ করেছিলেন) যে কোম্পানির কর্মচারীদের বিনাশুল্কে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য চালাবার অধিকার আছে। ভ্যানসিটার্ট যেখানে সমস্ত দ্রব্যের উপর শতকরা নয় ভাগ শুল্কে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তার পরিবর্তে নবাবের প্রতি সম্মান দেখিয়ে কেবলমাত্র লবণের উপর শতকরা আড়াই ভাগ শুল্ক দেওয়া হবে স্থির হল।

নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির লড়াইয়ে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের এই ছিল অভিমত। ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভিন্নমত ছিল, ন্যায়বিচারের স্বপক্ষে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মতামত। হেষ্টিংসের দীর্ঘ বিবৃতির অংশবিশেষ উদ্ধৃতিযোগ্য এবং স্মরণ সাপেক্ষ।

"যেহেতু পূর্বে আমি নীচু পদে অতি নিকৃষ্ট স্থানে এ দেশের লোকজনের মধ্যেই বসবাস করেছি, বাস করেছি এমন একটা সময়ে যখন সরকারের নিকট দাসসুলভ পরাধীনতায় আমরা বাধ্য ছিলাম এবং তবুও জমিদার ও সরকারী কর্মচারিগণের কাছে বিপুল প্রশ্রয়, এমন কি সম্মান পর্যন্ত পেয়েছি, সেই হেতু পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে এই অভিমতের যথার্থতা আমি অস্বীকার করছি। বহু অভিজ্ঞতা থেকে আরও বলছি যে যদি আমাদের লোকেরা দেশের অত্যাচারী শাসক এবং মালিক হয়ে দাঁড়াবার পরিবর্তে, নিজেদের বৈধ বাণিজ্যে নিয়োজিত করেন এবং সরকারের বৈধ কর্তৃত্বের নিকট নতি স্বীকার করেন তা হলে সর্বত্রই তাঁরা আদর ও সম্মান লাভ করবেন। অখ্যাতির পরিবর্তে ইংরেজ নাম তাহ'লে সর্বত্রই সসম্মানে উচ্চারিত হবে। আমাদের বাণিজ্য থেকে দেশ একটা মুনাফা লাভ করবে। গরীব অধিবাসীদের ক্ষতি করে, তাদের উপর অত্যাচার করে নতি স্বীকার করানোর মধ্যে দিয়ে ইংরেজ শক্তিকে জুজুতে রূপান্তরিত করার বদলে তা হবে এই দেশবাসীদের কাছে চরম আশীর্বাদ ও সুরক্ষাদ্যোতক।"[১৩]

কলকাতার পরিষদ্ কর্তৃক চুক্তি প্রত্যাখ্যান এবং চুক্তি অনুযায়ী তাঁর আদেশ কার্যকরী করায় কর্মচারীদের যে বাধা দেওয়া হয়েছিল সে কথা মীরকাশিম শুনলেন। রাজকীয় ক্ষোভে তিনি যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা প্রজারঞ্জক কাজ করেছিলেন প্রাচ্যের কোন রাজা বা শাসকই তা আজ অবধি করতে পারেন নি। রাজস্ব আদায় বিসর্জন দিয়ে তিনি সর্বপ্রকার স্থলশুল্কের

বিলোপ সাধন করেন যাতে তাঁর প্রজাবৃন্দ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে অন্তত সমান সর্তে বাণিজ্য করতে পারে।

অবিশ্বাস্য হলেও একথা সত্য যে ভ্যানসিট্টার্ট এবং হেষ্টিংস ব্যতীত কলকাতার পরিষদ্ ইংরেজ জাতির প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ বিবেচনা করে সমস্ত শুল্ক প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। 'হিষ্ট্রি অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে জেমস মিল বলেছেন, "এই ঘটনায় কোম্পানির কর্মচারীদের আচরণ স্বার্থশক্তির সমস্ত বিচার ও লজ্জাবোধ মুছে ফেলবার নথিভুক্ত অন্যতম নজির হিসাবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।" এইচ. এইচ. উইলসন তাঁর টিপ্পনীতে আরও বলেছেন "সভার কার্যবিবরণীতে কোন মতবিরোধ হতে পারে না। ভ্যানসিট্টার্ট এবং হেষ্টিংসের সম্মানজনক ব্যতিক্রম ছাড়া ব্যবসায়িক অর্থলিপ্সাজনিত ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি পরিষদের সকল সভ্যকে যুক্তি, বিচার ও নীতির সহজতম নির্দেশের বিচারে একরোখা ও অনতিগম্য করে তুলেছিল।"

ভিন্ন মতানুসারী ভ্যানসিট্টার্ট ও হেষ্টিংস যথাযথরূপেই তাঁদের মত জানিয়েছিলেন এবং যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে "যদিও নিজেদের স্বার্থের জন্যই আমরা ঠিক করতে পারি যে সমস্ত বাণিজ্য আমাদের হাতে থাকুক, আমাদের নিজেদের লোকদের লবণ তৈরীর জন্য নিযুক্ত করে দেশের মাটিতে উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যই দখল করব…তথাপি একথা আশা করা যায় না যে বাণিজ্য চালাবার উপায় থেকে দেশের বণিকদের বঞ্চিত করবার প্রচেষ্টাতে নবাব আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।" সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলিকে এই যুক্তি পরিষ্কারভাবে আমাদের গোচরীভূত করছে। সুশাসন বা কুশাসনে সমানভাবেই ইতিপূর্বে একটি সম্পদশালিনী ও সুসভ্য দেশের জনসংখ্যা যে সমস্ত সম্পদের উৎসগুলি এতদিন পর্যন্ত ভোগ করে এসেছে, এবং পৃথিবীর যে কোনও সভ্য দেশের নিঃসর্ত উৎপাদন ও অনিয়ন্ত্রিত দ্রব্যবিনিময়ের যে ব্যবস্থা থাকে, ব্যক্তিগত সম্পদবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোম্পানির কর্মচারীরা সেগুলি থেকে তাদের বঞ্চিত করে রাখতে মনস্থ করলেন। কোম্পানির কর্মচারিগণ দু' একটি পণ্যদ্রব্যের একচেটিয়া অধিকার কেবল চান নি, তাঁরা চেয়েছিলেন সমস্ত পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে তাদের ব্যবসা এবং দেশীয় বণিকদের ব্যবসার মধ্যে একটা পার্থক্য বলবৎ রাখতে যাতে বঙ্গদেশের সমস্ত মানবসমাজ একটা সাধারণতম অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বিরাট জনাকীর্ণ এক দেশের সামগ্রিক বাণিজ্যকে করতলগত করার উদ্দেশ্যে অস্ত্রবলে বিদেশী বণিকদের সুদূরপ্রসারী দাবী ঘোষণা করার দ্বিতীয় নজির খুব সম্ভবত ইতিহাসে আর নেই। নবাব মীরকাশিম এই জুলুমের প্রতিরোধ করেছিলেন। ফলে যুদ্ধ বাধে।

হেনরি ভ্যানসিট্টার্ট মীরকাশিমের বঙ্গদেশ শাসনকালের সমস্ত সময়টাই কলকাতায় গভর্ণর ছিলেন—১৭৬০ থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত। মীরকাশিমের শাসনের তিনি নিম্নলিখিত পর্যালোচনা করেছেন :

"তিনি (মীরকাশিম) কোম্পানির ঋণ এবং তাঁর নিজ সেনাবাহিনীর বিপুল বকেয়া পাওনা মিটিয়েছেন, রাজসভার ব্যয় সংকোচ করেছেন। এই রাজসভার দরুন ব্যয় তাঁর পূর্বসূরীদের আয়ের অপচয় ঘটাতো। জমিদারের ক্ষমতা খর্ব করে দেশে তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছেন। এই জমিদারগণ পূর্বে এই প্রদেশে সর্বদা শান্তির বিঘ্নস্বরূপ ছিলেন। আমি সানন্দে এই সব লক্ষ্য করেছি। আমি ভাল ভাবেই জানতাম আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন তাঁর যত কম হবে, কোম্পানির ব্যয়ও তত কমবে, নিজেদের সম্পত্তির প্রতি যত্ন গ্রহণেও তাঁরা আরও সক্ষম হয়ে উঠবেন। একই সঙ্গে যে কোন সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে নিশ্চিত ও উপযোগী এক মিত্র হিসেবে তাঁর ওপর আমরা নির্ভর করতে পারতাম। আমার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে যদি আমরা নবাবের অধিকারে হস্তক্ষেপ অথবা তাঁর শাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করি তবে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে বিবাদে ইচ্ছুক হবেন না। এবং ফলত কলহের উপলক্ষ্য সৃষ্টি না করার ব্যাপারে তিনি এতই সতর্ক ছিলেন যে আমাদের গোমস্তাদের উৎপীড়ন ও বেসরকারী বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট নতুন দাবীগুলির ফলে তিনি যে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন তার পূর্বে এমন একটি দৃষ্টান্তও দেওয়া যাবে না যেখানে আমাদের নিকট হস্তান্তরিত অঞ্চলে নিজের লোক পাঠিয়েছেন বা আমাদের বাণিজ্যের একটিও দ্রব্য নিয়ে উৎপীড়ন করেছেন। আমাদের কলহের চরম উত্তেজনায় যুদ্ধ যখন প্রায় আরম্ভ হয় তখনও সর্বক্ষেত্রেই কোম্পানির ব্যবসা ধারাবাহিক ভাবেই চলেছে, ব্যতিক্রম হল শোরা ব্যবসায় সংক্রান্ত শ্রীএলিসের একটি বা দুটি অতি-উচ্চকিত অভিযোগ। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে যে ভদ্রলোকেরা দল গঠন করেছিলেন তাঁদের আচরণ কতখানি ভিন্ন ছিল। সুবাদারিপদে তাঁর ক্ষমতালাভের সময় থেকে এমন একটা দিনও যায় নি যেদিন তাঁর শাসনকে পদদলিত করবার জন্য তাঁর কর্মচারীদের বন্দী করবার এবং তাদের ভীতি প্রদর্শন ও তীব্রভাষায় অপমানিত করবার জন্য তুচ্ছ অজুহাতের সৃষ্টি করা হয় নি। এর নজিরগুলি দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। এই বিবরণীর প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই তা দেখতে পাওয়া যাবে।"[১৪]

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামরিক কার্যাবলীর বর্ণনা বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উপলক্ষ্যকে মুহূর্তের জন্যও বিতর্কমূলক বলে মনে হয় নি। বঙ্গদেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে কোন ভারতীয়

রাজা বা সেনাবাহিনী অপেক্ষা মীরকাশিম অনেক বেশী দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু ঘেরিয়া এবং তারপর উদয়নালার যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। প্রচণ্ড ক্রোধের বশে পাটনার সমস্ত ইংরেজ বন্দীকে তিনি হত্যা করান এবং তারপর চিরদিনের মত রাজ্য ছেড়ে চলে যান। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে যাকে একদা মসনদচ্যুত করা হয়েছিল সেই মীরজাফরকে পুনরায় নবাব করা হল। কিন্তু কিছুদিন বাদেই তিনি মারা যান এবং তাঁর অবৈধ সন্তান নাজিম-উদ্-দৌলাকে তাড়াহুড়ো করে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে নবাব করা হয়।

নতুন নবাবের মসনদে স্থাপনের প্রতিটি উপলক্ষ্যই রূপকথা-প্রসিদ্ধ প্রাচ্যের কল্পতরু ধরে ঝাঁকুনি দেবার পক্ষে এক উপযুক্ত সুযোগ বলে বিবেচিত হত। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফরকে যখন প্রথম নবাব করা হ'ল তখন বৃটিশ কর্মচারী এবং সৈন্যগণ ১, ২৩৮, ৫৭৫ পাউণ্ড জয় পারিতোষিক পেলেন। বঙ্গদেশে একটি সম্পদশালী জায়গীর বাদেও ক্লাইভ তার থেকে ৩১,৫০০ পাউণ্ড নিয়েছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে যখন মীরকাশিমকে নবাব করা হ'ল বৃটিশ পদস্থ ব্যক্তিদের কাছে খেলাৎ এল ২০০,২৬১ পাউণ্ড। তার থেকে ভ্যানসিট্টার্ট নিলেন ৫৮,৩৩৩ পাউণ্ড। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরকে যখন দ্বিতীয় বারের জন্য নবাব করা হ'ল তখন উপহারের পরিমাণ দাঁড়ালো ৫০০,১৬৫ পাউণ্ডে আর এবার যখন নাজিম-উদ্-দৌলাকে নবাব করা হল পুরস্কারের পরিমাণ হ'ল ২৩০,৩৫৬ পাউণ্ড। উপঢৌকন রূপে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ আট বছরে গিয়ে দাঁড়ালো ২,১৬৯,৬৬৫ পাউণ্ডে। এ বাদেও আরও অর্থ দাবী করা হয় এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাওয়া গিয়েছিল ৩,৭৭০,৮৩৩ পাউণ্ড।"[১৫]

এই অর্থপ্রাপ্তি হাউস অব কমন্স কমিটিতে প্রমাণিত এবং স্বীকৃত হয়েছিল। এই হাউস অব কমন্স কমিটি ১৭৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির অবস্থার তদন্ত করেন। ক্লাইভ আপন আচরণ সমর্থন করে লিখেছিলেন :

"নবাবের উদারতায় আমার সৌভাগ্যকে সহজলভ্য করেছি এবং এখন আমার ভারতে অবস্থানের একমাত্র উদ্দেশ্য কোম্পানির মঙ্গল সাধন—আমি একথা কোনদিন গোপন করি নি, বরং ভারতের পরিচালকবর্গের সিক্রেট কমিটিতে প্রেরিত পত্রে আমি সে কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলাম।

...আমি কোম্পানির কাজে বহুবার জীবন বিপন্ন করেছি। এরপর তাদের ক্ষতিসাধন না করেও সৌভাগ্য অর্জনের যে একমাত্র সুযোগ পেয়েছি তা প্রত্যাখ্যানের জন্য কি অজুহাত কোম্পানি আমার কাছে আশা করতে পারেন? আমি যদি স্বল্পলাভ করতাম কোম্পানি নিশ্চয়ই অধিকতর লাভবান হতেন না?"[১৬]

ক্লাইভের এ কথা মনে আসে নি যে এ দেশের সম্পদ কোম্পানির নয়, তাঁরও নয়। দেশের এবং দেশের জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য সে সম্পদ নিয়োজিত হওয়া উচিত।

জোর করে উপঢৌকনের নামে অর্থ আদায় এবং বিনাশুল্কে কোম্পানির কর্মচারীদের অন্তর্বাণিজ্য—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বপক্ষে একথা বলতে হবেই, তাঁরা এ-সব কিছুর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে উপঢৌকন প্রাপ্তির বিরুদ্ধে তাঁরা আদেশ জারী করেছিলেন এবং কর্মচারীদের স্থলবাণিজ্য বন্ধ করবার জন্য ক্লাইভকে পুনরায় পাঠিয়েছিলেন। স্থলবাণিজ্য অবশ্য তাঁরা আগেই রদ করেছিলেন, বঙ্গদেশে সে আদেশ পৌছে গিয়েছিল এবং কোম্পানির কর্মচারীদের সহিযুক্ত চুক্তিপত্র কিছুদিনের মধ্যেই আশা করা যাচ্ছিল। হাতে আর নষ্ট করবার মত সময় ছিল না। সুতরাং কলকাতার পরিষদ তাড়াহুড়ো করে নাজিম-উদ্-দৌলাকে সিংহাসনে বসিয়ে শেষ উপঢৌকনের ফসল ঘরে তুললেন।

---

1. *A narrative of the Transactions in Bengal*, Vol. I. p. 24
2, *View of Bengal*. p. 48
3. Mir Kasim's Letter, dated 26th March 1762
4. Letters of Hastings to the Governor, dated 13th and 26th May, 1762
5, Hastings' Letter. dated 25th April, 1762
6. *Siyar Mutakharin*, Fol. II. p. 101. Quoted in *Mill's History of British India*
7. Nawab's Letter, Written May, 1762
8. Letter dated 26th May, 1762
9. Letter received in October, 1762
10, *Considerations on Indian Affairs* (London, 1772) pp. 191-194
11, *Ibid.*
12. See *Monghyr Treaty* in Third Report of the House of Commons Committee on the Nature, &c, of the East India Campany 1773, Appendix, p,
13. Fourth Report of the House of Commons Committee, 1773. Appe nx, , 486
14, *Narra ve*, Vol. III, p. 381
15, House f Commons Committee's Third Report, 1773, p. 311
16. House Commons Committee's First Report 1772, p, 148

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্গদেশে লর্ড ক্লাইভ ও তাঁর পরবর্তিগণ (১৭৬৫-১৭৭২)

১৭৬৫ সাল বৃটিশ-ভারতের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

সেই বৎসর লর্ড ক্লাইভ তৃতীয় এবং শেষবারের মত ভারতে প্রত্যাবর্তন করে মুঘল বাদশাহের কাছ থেকে এক সনদ লাভ করেন, ঐ সনদে কোম্পানিকে বঙ্গদেশের দেওয়ান বা প্রশাসক করা হয়। যদিও মুঘল বাদশাহের তখন আর প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না, তথাপি তিনি তখনও ভারতের খেতাবধারী সম্রাট ছিলেন এবং তাঁর সনদ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে এদেশে একটা বৈধ প্রতিষ্ঠা দেয়।

লর্ড ক্লাইভের একটা শ্রমসাধ্য কর্তব্য পালন করার ব্যাপার ছিল। কোম্পানির কাজকর্ম তখন মন্দের দিকে যাচ্ছিল। কর্মচারীরা ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত। প্রজারা উৎপীড়িত হচ্ছিল। ক্লাইভেব প্রচেষ্টা ছিল ভারতে অবস্থানের স্বল্প কালের মধ্যে এই সব কিছু সংশোধন করবার। ভারতীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত দলিলপত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় দলিলগুলির অন্যতম হলো কলকাতা থেকে কোর্ট অব ডিরেকটার্সের কাছে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৭৬৫-এ লেখা তাঁর পত্র; এই পত্রে লর্ড ক্লাইভ শেষবারের মতন ভারতে এসে যে পরিস্থিতি দেখেছিলেন এবং সর্বত্র শৃঙ্খলা আনবার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তার বর্ণনা করেছেন। ক্লাইভের নিজের ভাষায়ই তাঁর কার্যাবলীর বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন।

"২। দুঃখের সঙ্গে বলছি, পৌছে আপনাদের কাজকর্ম এমন একটা বেপরোয়া পরিস্থিতির মধ্যে দেখলাম যা যে কোন স্তরের মানুষ, সুবিধা আদায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তৎপর ব্যক্তি ছাড়া যাদেরই নিয়োগকর্তার প্রতি সম্মান ও কর্তব্যবোধ বিচ্যুত হয় নি, তাদের সকলকেই শঙ্কিত করে তুলবে। আকস্মিকভাবে ও বহুক্ষেত্রেই অনধিকারীর ধনদৌলত অর্জন সর্বাকারে সর্বনাশা মাত্রাধিক্যে বিলাসিতার সূত্রপাত করেছে। এই দুই গুরুতর অন্যায় প্রতিটি বিভাগের প্রত্যেকটি সদস্যকে সংক্রামিত করে সমগ্র প্রেসিডেন্সিতেই পাশাপাশি চলেছিল। প্রতিটি নিম্নস্থ কর্মচারীই 'যেন ঐশ্বর্য আঁকড়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করেন যাতে তিনি একটা প্রাচুর্যের ভাব ধারণ করতে পারেন; প্রাচুর্যই এখন তাঁর সঙ্গে উচ্চতর পদাধিকারী ব্যক্তির পার্থক্য বিচারের একমাত্র মানদণ্ড। এটা কিছুই বিচিত্র নয় যে ধনলিপ্সা স্বার্থকতা অর্জনের জন্য নীচ উপায় অবলম্বন করবে,

অথবা আপনাদের শাসনযন্ত্র তাদের কর্তৃত্বেরই অনুগামী হবে ও যেসব ক্ষেত্রে সাধারণ দুষ্কৃতি তাদের লোলুপতার পক্ষে যথেষ্ঠ হবে না সেখানে এই শাসনতন্ত্র ব্যবহার করে তারা বলপ্রয়োগে পর্যন্ত অগ্রসর হবে। উচ্চপদাধিকারী কর্তৃক এ ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন অধস্তন কর্মচারী কর্তৃক সমানুপাতিক মাত্রায় অনুসৃত না হয়ে পারে না। এই অপকর্ম সংক্রামক এবং বেসামরিক ও সামরিক, একেবারে সর্বনিম্ন করণিক, সর্বনিম্নস্থ সেনাপতি এবং স্বাধীন বণিক—সকলের মধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়ে।

"৯। কাজেই আমার কাছে দুটো পথ খোলা ছিল। একটি ছিল মসৃণ, সহজে আহরণযোগ্য সমৃদ্ধ সুযোগের প্রাচুর্যে আস্তীর্ণ। অপরটি অনাক্রান্তপূর্ব, সে পথে প্রতিটি পদক্ষেপেই বাধা। যে অবস্থায় দেখেছিলাম সে অবস্থা অব্যাহত রাখার মধ্যদিয়েই আমি প্রশাসনের ভার নিতে পারতাম। অর্থাৎ, আমি গভর্ণরের পদ ভোগ করতে পারতাম এবং ঐ পদের সম্মান, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা ধ্বংস করার কাছে নীরব সম্মতি দিতে পারতাম।·· অবশ্য আমার সামনে একটি সম্মানজনক বিকল্প ছিল। আমার পথে সুকৌশলে পেতে রাখা অসংখ্য প্রলোভনের মধ্যেও সংস্কার-সাধনেচ্ছু যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধেই যে সব বিদ্বেষ ও ক্ষোভ উদ্ভাবিত হতে পারে সে সব আক্রমণে নিজেকে বিপদাপন্ন করে এবং জঘন্য সমঝোতার বিরুদ্ধে লড়াই করে সততায় অটল থেকে নিজ দফতরের কর্তব্যপালনের মত বল আমার বুকে ছিল—। পথ বেছে নিতে আমি এক মুহূর্তও দ্বিধা করিনি। স্কন্ধে এমন একটা গুরুভার চাপিয়ে নিয়েছিলাম যার জন্য প্রয়োজন ছিল দৃঢ় সংকল্প, অধ্যবসায় আর সে ভার বহন করার মত স্বাস্থ্য। নিজ ভূমিকা স্থির করবার পর সে প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগে আমি বদ্ধপরিকর ছিলাম। জাতির সম্মান এবং কোম্পানির অস্তিত্বকে এ কাজের সাফল্যই যে বাঁচিয়ে রাখতে পারে এই চিন্তাতেই তৃপ্তি বোধ করেছিলাম।

"১২। আশংকা করছি, কোম্পানির কর্মচারীদের কর্তৃত্বাধীনে কর্মরত ইয়োরোপীয় মুৎসুদ্দিরা (agents) এবং তাদেরই অধীনে কর্মরত অসংখ্য কৃষ্ণকায় মুৎসুদ্দি ও উপ-মুৎসুদ্দিরা (subagents) স্বেচ্ছাচার ও উৎপীড়নের যে উৎস খুলে দিয়েছে তা এ দেশে ইংরেজদের সুনামের একটি স্থায়ী কলঙ্ক হয়ে থাকবে।···একটা ঘটনার সমাপ্তি দেখবার সৌভাগ্য অবশেষে আমার হয়েছে, যা আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে ইতিপূর্বে অজানা সুযোগ তৈরী করে দিতে বাধ্য। এবং সেই সঙ্গে তা এমন বহু অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে, যাদের এখন পর্যন্ত কোন প্রতিষেধ সৃষ্টি হয়নি। আমি বলছি,

দেওয়ানার কথা যার অর্থ হ'ল বঙ্গদেশ, বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশের সমগ্র ভূমি এবং রাজস্ব আদায়ের তত্ত্বাবধান। আমাদের অস্ত্র এবং কোষাগার থেকে মুঘল বাদ্‌শাহ যে সাহায্য পেয়েছিলেন তাতেই তিনি কোম্পানিকে এই অধিকার প্রদানে সম্মত হন। আপনারা যতটা আশা করতে পারেন ততটা সাফল্যের সঙ্গেই এ কাজ সাধিত হয়েছে। নবাবের মর্যাদা ও শক্তি রক্ষানিমিত্ত ভাতা এবং শাহানশাহের (মুঘল বাদ্‌শাহের) বশ্যতামূলক কর নিয়মিত দিতে হবে; অবশিষ্টাংশ থাকবে কোম্পানির অধিকারে।...

"১৩। এই অধিকার অর্জনের পর, পূর্বাধিকৃত বর্ধমান প্রভৃতি নিয়ে আপনার রাজস্বের পরিমাণ, আমার যতটা মনে হয়, আগামী বৎসর ২৫০ লক্ষ সিক্কা টাকার থেকে খুব কম হসে না। এরপর তা নিশ্চয়ই আরও বিশ বা ত্রিশ লাখ বেড়ে যাবে। শান্তির সময় আপনাদের বেসামরিক এবং সামরিক ব্যয় নিশ্চয়ই ষাট লক্ষ টাকার বেশী হ'তে পারে না। নবাবের ভাতা ইতি-মধ্যেই বিয়াল্লিশ লক্ষে এবং মুঘল বাদ্‌শাহের কর ছাব্বিশ লক্ষে নামিয়ে আনা হয়েছে; যার অর্থ কোম্পানির স্পষ্ট লাভের পরিমাণ থাকবে ১২২ লক্ষ সিক্কা টাকা বা ১,৬৫০,৯০০ স্টার্লিং।...

"১৬। ভারতবর্ষে আগমনের পর সমস্ত কর্মচারীর যোগ্যতাই মেনে নেওয়া উচিত এবং পদাধিকারের অনুপাতে প্রত্যেকেরই সুবিধাদি বর্ধিত হওয়া উচিত। ...জাহাজ ভাড়া খাটানো, বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা (যে সুবিধাগুলি আপনাদের অপরিজ্ঞাত নয়) এবং লবণ, সুপারি ও তামাকের লভ্যাংশ অর্জন প্রভৃতি ঐ যোগ্যতা ও পদাধিকারের সাপেক্ষ হওয়া উচিত। এতদিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অন্যায়গুলি সংশোধন করবার জন্য আমরা যে নতুন আইন রচনা করেছি এটা তার পক্ষে উপযোগী।

"১৯। বেসামরিক বিভাগ সম্পর্কে আমার মনোভাব পেশ করবার পর সামরিক বিভাগের উপর আমার কয়েকটি বক্তব্য নিয়ে আপনাদের বিরক্ত করবার অনুমতি দিন।...যে কুফল আপনাদের বুঝিয়ে দিতে চাই তা হ'ল অসামরিক এক্তিয়ারে সামরিক বিভাগের অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং অসামরিক কর্তৃত্ব থেকে সামরিক বিভাগের স্বাধীনতা পাবার প্রচেষ্টা। সমগ্র সেনাবাহিনীরও অনুরূপ-ভাবে বেসামরিক কর্তৃত্বের অধীন থাকা উচিত। যদি কোন দিন সামরিক বিভাগ উচ্চতর পদমর্যাদার জন্য লড়তে চেষ্টা করে, তবে গভর্ণর এবং কাউন্সিলকে কঠোরভাবে তাদের পদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। তাঁদের সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে এই উপনিবেশে তাঁরাই হলেন কোম্পানির ন্যাসরক্ষক

(Trusty) এবং একটি বেসামরিক প্রতিষ্ঠানের অধীন জনসাধারণের সম্পত্তির অভিভাবক।...

"২৬। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেবার অনুমতি দিন যে আমার একটি বড় পরিবার আছে, যেখানে সন্তানেরা পিতার রক্ষণাবেক্ষণের মুখাপেক্ষী। এই জলবায়ুতে থেকে স্বাস্থ্য বিসর্জন দিচ্ছি, জীবনের সঙ্গে ভাগ্যের জুয়া খেলছি।... এখন আমি জানবার অপেক্ষায় আছি যে এই পর্যন্ত আমার আচরণ আপনাদের কাছে সমর্থিত হয়েছে কিনা এবং আপনাদের কাছে বিনীতভাবে যে প্রতিবিধান-গুলি উপস্থাপিত করেছি তা পুরোপুরি কিংবা অংশতঃ প্রবর্তনযোগ্য সংস্কার বিষয়ে আপনাদের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না। যদি সেগুলি আপনাদের অনুমোদন পায় তবে আমার সন্দেহ নেই যে এতটা সাফল্যের সঙ্গে যে আরব্ধ কার্যের সূত্রপাত হয়েছে তার পরিসমাপ্তির জন্য এক যোগে সিলেক্ট কমিটি এবং আমাকে অবিলম্বেই ক্ষমতা প্রদান করবেন।

আগামী বৎসর শেষ হবার পূর্বেই সহজেই এটা বলবৎ হতে পারে। আমি এখন ইয়োরোপে প্রত্যাবর্তনের জন্য বদ্ধপরিকর, এবং আশা করি বঙ্গদেশে আপনাদের কাজকর্মের উন্নতির জন্য যতটা প্রত্যাশা করতেন তার প্রত্যেকটির সম্পাদনের কথা সাক্ষাতে জানাতে পারব।"[১]

এই হ'ল ক্লাইভের নিজের ভাষায় কাজের বিবরণ যা ভারতে বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সূচনা করে। এতদিন পর্যন্ত ভারতে বৃটিশদের সওদাগর রূপেই পরিচিতি ছিল এবং যদিও ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর তাঁরাই বঙ্গদেশের প্রকৃত শাসক ছিলেন, তথাপি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর খেতাবধারী সম্রাট কর্তৃক দেওয়ানীর অধিকার দানই ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতে একটা বৈধ প্রতিষ্ঠায় দাঁড় করিয়েছিল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভূমির প্রশাসনিক কর্তব্য তাঁদের হাতে অর্পণ করেছিল। লর্ড ক্লাইভ কিভাবে সেই কর্তব্যগুলি সাধন করতে চেয়েছিলেন তা তাঁর নিজের ভাষাতেই বর্ণিত হয়েছে। বেসামরিক এবং সামরিক প্রশাসনে তাঁর সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা ঐতিহাসিকগণ যেভাবে প্রশংসা করেছেন, তা ন্যায্য। কিন্তু যদি আমরা তাঁর পরিকল্পনার অপরিহার্য উপাদানগুলি বিচার করি, তাহলে দেখব যে ভারতবর্ষে সেই থেকে রচিত আরও বহু পরিকল্পনার মতই এটিও মূলত বৃটিশ শাসকদের স্বার্থে রচিত হয়েছিল—এদেশের জনসাধারণের স্বার্থে নয়। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুনাফার উৎস হিসাবে সমগ্র বঙ্গদেশকেই একটা জমিদারি হিসাবে দেখা হত।

তিন কোটি মানুষের কাছ থেকে আদায়ীকৃত কর, খরচ-খরচা ও ভাতা বাবদ ব্যয় বাদ দেবার পর, এই দেশে এবং এই দেশের কল্যাণের জন্য বাকি অংশ সদ্ব্যবহার না করে, বরং কোম্পানির লভ্যাংশ হিসেবে ইংলণ্ডে তা প্রেরিতব্য ছিল। অধীনস্থ দেশ থেকে ইংলণ্ডের অংশীদারদের কাছে বাৎসরিক পনের লক্ষ স্টার্লিং-এরও বেশী অর্থ পাঠাতে হ'ত। এইভাবে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী জাতির সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য একটা দরিদ্র জাতির রাজস্ব থেকে প্রতিবৎসর স্বর্ণ নির্ঝর নিঃসারিত হত।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারত শাসনের জন্য বৃটিশ শাসকেরা যে নক্সা রচনা করেছিলেন তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এক মারাত্মক আর্থিক নিকাশ (Economic Drain) যা ফুলে ফেঁপে আজ বাৎসরিক বহু নিযুত স্টার্লিং প্রেরণে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতে বৃটিশ শক্তির জয়, এ দেশের বৃটিশ প্রবর্তিত সংগঠিত শাসন, শান্তি প্রতিষ্ঠা, বিচারের নিষ্পত্তি ব্যবস্থা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার—সব কিছুই তাঁদের প্রতি ইতিপূর্বে উচ্চারিত প্রশংসার যোগ্য ঠিকই। কিন্তু সূচনা থেকেই ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যেকার আর্থিক সম্পর্ক পক্ষপাতদুষ্ট। বিপুল সঙ্গতি, উর্বর মৃত্তিকা এবং অধ্যবসায়ী জনসংখ্যা নিয়েও ভারতবর্ষ দেড়শত বৎসরের বৃটিশ শাসনের পর আজ পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্রতম দেশ।

কোম্পানির জন্য বৎসরে পনের লক্ষ স্টার্লিং-এরও বেশী মুনাফা অর্জনেও সন্তুষ্ট না হয়ে কোম্পানির কর্মচারীদের মুনাফা অর্জনের জন্য লর্ড ক্লাইভ বঙ্গদেশের স্থলবাণিজ্য অব্যাহত রাখবার উপরে জোর দেন।

এই বেসরকারী বাণিজ্যে উৎপীড়নমূলক ঘটনা বন্ধ করবার উপায় তিনি উদ্ভাবন করলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের ইংরেজদের কাছে এই বাণিজ্য লাভজনক ছিল, কাজেই লর্ড ক্লাইভ তা ছাড়তে চাইলেন না। প্রকৃত পক্ষে, তাঁর প্রভু ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিশ্চিত বিরোধিতা সত্ত্বেও লবণ, সুপারি ও তামাকের স্থলবাণিজ্য চালিয়ে যাবার জন্য লর্ড ক্লাইভ এতটা বদ্ধপরিকর ছিলেন যে কোম্পানির হুকুম ছাড়াই বাণিজ্য চালিয়ে যাবার জন্য ১৭৬৫ খৃস্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে তিনি এক যুক্ত ইস্তাহার জারী করেন। ইস্তাহারের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি গুরুত্বপূর্ণ :

"যদি ইংলণ্ডের পরিচালকবর্গের সভা এমন কোন আদেশ জারী বা রচনা করেন যার ব:ল উক্ত যৌথ বাণিজ্য ও দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় গুটিয়ে ফেলা বা বন্ধ করে দেবার আদেশ ও নির্দেশ জারী হতে পারে, অথবা ঐ যৌথ বাণিজ্য বা

অংশবিশেষ চালিয়ে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হতে পারে অথবা ঐ আদেশে যদি এমন কিছু থাকে যা এখানে পূর্বে পঠিত, উল্লেখিত এবং অন্তর্ভুক্ত চুক্তিপত্রের শর্ত, উপধারা, মঞ্জুরী, ধারা বা চুক্তির বা এগুলির যে কোন একটির বিপরীত, যাতে ঐ চুক্তিপত্র নাকচ বা অকার্যকর হয়ে পড়ে, তা হলে, সেক্ষেত্রে, তাঁরা, সভাপতিরূপে লর্ড ক্লাইভ এবং পূর্বোল্লেখিত ফোর্ট উইলিয়ামের কাউন্সিল হিসাবে উইলিয়ম ব্রাইটওয়েল, সাম্‌নার্ প্রভৃতিগণ তাঁদের, উক্ত উইলিয়ম ব্রাইটওয়েল, সাম্‌নার, হ্যারি ভেরেল্‌স্ট্, রাল্‌ফ্ লিসেষ্টার ও জর্জ গ্রে এবং উক্ত একচেটিয়া যৌথ ব্যবসায় অধিকারী, ভবিষ্যৎ অধিকারী, তাঁদের উত্তরাধিকারী, সম্পাদক এবং প্রশাসকগণকে অক্ষত এবং নিরাপদে রাখবেন এবং অবশ্যই রাখবেন : এবং পূর্বোক্ত বিপরীত আদেশ বা নির্দেশ জারী সত্ত্বেও তাঁরা এক বৎসরের জন্য উক্ত একচেটিয়া যৌথ বাণিজ্য বজায় রাখবেন, চালিয়ে যাবেন ও বহাল করবেন কিংবা বজায় রাখবেন, চালিয়ে যাওয়াবেন ও বহাল রেখে যাওয়াবেন।"[২]

৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখযুক্ত লর্ড ক্লাইভের গুরুত্বপূর্ণ পত্র প্রাপ্তির পর পরিচালকবর্গের সভা কলকাতা কমিটির কাছে উত্তর পাঠান, তারিখ ১৭ই মে ১৭৬৬। এবং একই তারিখযুক্ত একটি পৃথক পত্র লর্ড ক্লাইভের কাছে পাঠান। পরিচালকবর্গ বিপুল কর্মসম্পাদনের জন্য লর্ড ক্লাইভকে আন্তরিক ভাষায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং দেওয়ানী বা বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়টি মেনে নেবার কথাও জ্ঞাপন করেন। কিন্তু এটা পরিচালকবর্গেরই কৃতিত্ব যে তাঁরা লর্ড-ক্লাইভ পরিকল্পিত-স্থলবাণিজ্যের খসড়া অনুমোদন করতে অস্বীকার করেন।

"সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরিত পত্রে দানস্বরূপ প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে আরও বলি, আমরা মনে করি যে স্থলবাণিজ্যের দ্বারা যে বিপুল সম্পদ অর্জিত হয়েছে তা স্বেচ্ছাচারী ও উৎপীড়নমূলক আচরণের প্রয়োগের দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। এমন স্বেচ্ছাচার ও উৎপীড়ন কোনো যুগে বা কোনো দেশে আজ পর্যন্ত ঘটেনি। অবহিত হবার অব্যবহিত পর থেকেই এ বিষয়ে আমাদের মনোভাব এবং আদেশ সংগতিপূর্ণ। কাজেই মহামান্য লর্ড নিশ্চয়ই অবাক হবেন না যে এই বাণিজ্যে অনুষ্ঠিত ক্ষমতার ভয়ঙ্কর অপব্যবহারের নিদারুণ অভিজ্ঞতালাভের পর কমিটির কার্যবিবরণীতে যে সীমিত ও বিধিবদ্ধ আকারের পরিকল্পনায় এটি উপস্থাপিত হয়েছিল তাও আমরা অনুমোদন করতে পারি নি।"[৩]

কোম্পানির কর্মচারিগণ কর্তৃক পরিচালিত স্থলবাণিজ্য বিষয়টি সম্পর্কে পরিচালকবর্গ কখনোই দ্ব্যর্থকভাষায় কিছু বলেন নি। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে তাঁরা এরূপ স্থলবাণিজ্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, এবং ১৭৬৫'র ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পত্রে নিষিদ্ধকরণের বিষয় জোরালোভাবে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। কিন্তু ভারতস্থ কর্মচারিগণ তাঁদের আদেশ অমান্য করেন। এখন, ১৭৬৬'র ১৭ই মে'র পত্রে পরিচালকগণ ক্লাইভেরই বিধান অনুযায়ী বাণিজ্য চালিয়ে যাবার পরিকল্পনা মঞ্জুর করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু এ আদেশও উপেক্ষিত হয়েছিল এবং চুক্তি হয়ে গেছে ও আগাম দেওয়া হয়ে গেছে এই অজুহাতে আরও দুই বৎসর স্থলবাণিজ্য চলেছিল।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। গভর্ণর হিসেবে তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন ভেরেল্স্ট্। ১৭৭০ পর্যন্ত তিনি শাসন করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন কার্টিয়ার। ১৭৭২ পর্যন্ত তিনি গভর্ণর ছিলেন। পূর্বেকার বৎসরগুলিতে বঙ্গদেশ যে কুশাসনে পীড়িত হচ্ছিল এই পাঁচ বৎসরের শাসন ছিল তারই অনুবৃত্তি। লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত শাসন পরিকল্পনা ছিল অনেকটা দ্বৈত শাসনের ন্যায়। তখনো রাজস্ব আদায়ের কাজ নবাবের রাজস্ব দফ্তরই করতেন। তখনো নবাবের পদস্থ কর্মচারিগণই বিচার বিভাগে শাসন করতেন এবং সমস্ত কাজকারবারই চলত নবাবী কর্তৃত্বের মুখোশের আড়ালে। কিন্তু দেশের প্রকৃত মালিক ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিই সমস্ত মুনাফা লাভ করতেন। নবাবের কর্মচারীদের ভয় দেখিয়ে, বিচারব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রে রূপান্তরিত করে কোম্পানির কর্মচারিগণ মুনাফার জন্য সীমাহীন উৎপীড়ন চালাতেন। ইংরেজ গভর্ণর এটা দেখেছিলেন, তার নিন্দাও করেছিলেন, কিন্তু এ পরিস্থিতির প্রতিবিধান করতে সমর্থ হন নি।

"আমাদের এবং সরকারের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীর আমরা অবিবেচকের মত ভেঙ্গে দিয়েছি। কার প্রতি বশ্যতা দেখাবে, এনিয়ে দেশজ মানুষ সন্দিহান হয়ে পড়ে। এইরকম একটা বিভক্ত ও জটিল কর্তৃত্ব যে উৎপীড়ন ও ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করেছিল তা অন্য যে কোন যুগে অপরিজ্ঞাত। সরকারী কর্তাব্যক্তিদের এই সংক্রামকের ছোঁয়া লাগল, আর কোন প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের অধীন না থাকায় তাঁরা আরও বেশ স্পর্দ্ধার সংগে এই ব্যাপারে অগ্রণী হলেন।"[৪]

কৃষি সবসময়েই বাঙালীর জীবিকার প্রধানতম উপায় ছিল। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের প্রবর্তিত ভূমি-বন্দোবস্তের নতুন প্রথার ফলে কৃষির অবনতি ঘটে। বহু প্রাচীন কাল থেকেই বঙ্গদেশে জমির মালিক ছিলেন

জমিদার বা পুরুষানুক্রমিক ভূম্যধিকারিগণ। তাঁরা আপাতঃ সামন্ততান্ত্রিক শক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। তাঁরা রাজস্ব প্রদান করতেন এবং প্রয়োজনের সময় নবাবকে সামরিক সাহায্য দান করতেন, নিজ নিজ জমিদারিতে প্রকৃত-ভাবে তাঁরাই প্রজাদের শাসন করতেন। প্রজা ও খাজনা-সাপেক্ষ প্রজারা তাঁদের রাজা হিসাবে মেনে চলত। তাঁরা শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন, বিবাদের নিষ্পত্তি করতেন, অপরাধের শাস্তি দিতেন। তাঁরা ধর্মকে উৎসাহিত করতেন, ধর্মানুরাগের প্রতিদান করতেন। তাঁরা শিল্পকলা ও বিদ্যানুরাগের ধারক পাণ্ডিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুর্শিদকুলি খাঁ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে মীরকাশিমের মত স্বেচ্ছাচারী নবাবগণ এই জমিদারদের কঠোর হস্তে নিষ্পেষণ করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁদের জমিদারি থেকে উৎখাত করেছিলেন কদাচিৎ। প্রথানুযায়ী জমিদারি পুরুষানুক্রমিক বলে বিবেচিত হত। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিমের কাছ থেকে মেদিনীপুর ও বর্ধমান অধিকারের কিছুদিন পরেই অবশ্য কোম্পানির কর্মচারিগণ ঐ দুই জেলায় একটি নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। রাজস্ববৃদ্ধির জন্য তাঁরা জমিদারদের প্রথাগত অধিকার লঙ্ঘন করেই জমিদারি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করে দিলেন। ফল হল শোকাবহ।

"১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিম বর্ধমান ও মেদিনীপুরের সম্পত্তি ও কর্তৃত্ব কোম্পানির হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মুর শাসনের ব্যর্থ নীতি হতেই একান্ত-ভাবে উৎসারিত কুফল ঐ দুই প্রদেশে এর ফলে বিন্দুমাত্রও কমে নি। বরং ঠিক বিপরীত হলো, ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যা এই প্রদেশে কতকগুলি সর্বনাশা ফলের সৃষ্টি করে। তিন বৎসরের মেয়াদে প্রকাশ্য নীলামে জমি ভাড়া দেওয়া হ'ল। নির্ধন এবং নীতিহীন ব্যক্তিরাই নীলামের দর হেঁকেছিল। আগেকার কৃষকেরা বসতি ছাড়তে অনিচ্ছুক হয়ে যখন প্রকৃত মূল্যেরও বেশী দর হাঁকতেন, তখন এই ব্যক্তিরা কোন ক্ষতির আশংকা ছিল না বলে আরও বেশী দর হাঁকতেন। সর্বক্ষেত্রেই তাদের উদ্দেশ্য ছিল অতি শীঘ্র জমির দখল নেওয়া। এইভাবে অসংখ্য লোভী দানবকে লুণ্ঠনের জন্য লেলিয়ে দেওয়া হ'ল। এক দুর্দশাগ্রস্ত জাতির লুণ্ঠিত দ্রব্যেই তারা প্রথম বৎসরের প্রদেয় অর্থ রাজকোষে জমা দিতে সমর্থ হয়েছিল।"[৫]

আমরা আরও দেখব যে ওয়ারেন হেস্টিংস এই নতুন উৎপীড়নমূলক প্রথা সমস্ত বঙ্গদেশেই ছড়িয়ে দেন এবং যার ফলে প্রচণ্ড ক্ষোভ, বিশৃঙ্খলা ও দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির খাঁই মেটাবার জন্য ভেরেল্‌ষ্ট্‌ ও কার্টিয়ারের সমগ্র শাসনকালেই ভূমিরাজস্ব কঠোরতমভাবে আদায় করা হত।

পরিচালকবর্গের সভার নিকটে গভর্ণর ভেরেল্‌ষ্ট্‌ লিখেছিলেন, "এটাই কাম্য ছিল এবং একাধিকবার তা প্রস্তাবিতও হয়েছে যে তাদের জমি যখন আমাদের তত্ত্বাবধানে এসেছে তখন জমির খাজনা বৃদ্ধির সামান্যতম প্রচেষ্টা না করে কৃষির উজ্জীবন ও উন্নতির জন্য আমরা প্রায় সব জেলার নির্ধারিত খাজনা হ্রাস করতে পারি।...আপনাদের আমার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিমতটি জানাবার অনুমতি দিন। আমার অভিমত আপনাদের অধিকারে বিভিন্ন জেলায় ও আপনাদের রাজস্বের বিভিন্ন বিভাগে কার্যব্যপদেশে লব্ধ প্রায় উনিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তা' হ'ল এই যে খাজনা কার্যতঃ বৃদ্ধি করা আপনাদের শাসন ক্ষমতার বাইরে।"[৬]

একচেটিয়া অধিকার ও দমননীতির ফলে বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনের অবনতি ঘটেছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকগণ তাঁদের কর্মচারীদের নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা নিজেরাই তার চেয়ে ঢের বেশী অপরাধের কাজ করলেন। বৃটেনের তাঁতীরা বাঙালী তাঁতীদের প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ হয়ে উঠেছিল। বাঙালী তাঁতীদের রেশমবস্ত্র ইংলণ্ডে আমদানি হত। ইংলণ্ডের শিল্পোৎপাদনের উন্নতিবিধানের প্রয়োজনে বাঙালী শিল্পোৎপাদকদের নিরুৎসাহিত করবার জন্য এবার কোম্পানি কর্তৃক প্রাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের একটা সুচিন্তিত প্রচেষ্টা চল্‌ল। বঙ্গদেশে প্রেরিত ১৭ই মার্চ, ১৭৬৯ তারিখের সাধারণ পত্রে কোম্পানি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে বঙ্গদেশে কাঁচা রেশমের উৎপাদন উৎসাহিত করা কর্তব্য এবং রেশম বস্ত্র উৎপাদনকে নিরুৎ-সাহিত করা উচিত। তাঁরা আরও সুপারিশ করেছিলেন যে কাঁচা রেশম উৎপাদকদের কোম্পানির কুঠিতে কাজ করতে বাধ্য করতে হবে; এবং তাদের নিজেদের গৃহে কাজ করা নিষিদ্ধ করে দিতে হবে।

"বিশেষতঃ ইতিপূর্বে বাড়ীতে কাজে রত রেশম উৎপাদকের কোম্পানির কুঠিতে কাজ করবার জন্য টেনে আনবার ক্ষেত্রে এই প্রবিধান খুবই ভাল ফল দিয়েছে বলে মনে হয়। আমাদের অমনোযোগের ফলে এই রেশম উৎপাদকদের নিজ নিজ গৃহে কাজ করা যদি আবার ঘটে তবে তা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়াই সমীচীন হবে এবং গুরুতর শাস্তিসাপেক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করণের দ্বারা সরকারী কর্তৃত্বে বর্তমানে এটি আরও সাফল্যের সঙ্গেই কার্যকর করতে পারেন।"[৮]

সিলেক্ট কমিটি যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন, "এই পত্রে নিপীড়ন ও উৎসাহ-দান, উভয় নীতিরই এক নিখুঁত পরিকল্পনা আছে যা নিশ্চিতভাবে বঙ্গদেশের শিল্পোৎপাদনের বিপুল ক্ষতি সাধন করবে। এর ফল [ছাড় যাতে না যায়

এমনভাবে যতটা কার্যকর হতে পারে] এই শিল্পোৎপাদনশীল দেশের সমগ্র চেহারারই পরিবর্তন। উদ্দেশ্য হল গ্রেট বৃটেনের শিল্পোৎপাদনের গোলামস্বরূপ ঐ দেশকে কাঁচা মাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিণত করা।"[৯]

বৎসর	মোট আদায়	মুঘল বাদশাহের কর, নবাবের ভাতা, আদায়ের খরচ, বেতন, কমিশন, প্রভৃতি বাদ দিয়ে নীট রাজস্ব	বেসামরিক, সামরিক, গৃহনির্মাণ, দুর্গ প্রভৃতি খাতে মোট ব্যয়	বাৎসরিক নীট উদ্বৃত্ত
মে এপ্রিল	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
১৭৬৫-১৭৬৬	২, ২৫৮, ২২৭	১, ৬৮১, ৪২৭	১, ২১০, ৩৬০	৪৭১, ০৬৭
১৭৬৬-১৭৬৭	৩, ৮০৫, ৮১৭	২, ৫২৭, ৫৯৪	১, ২৭৪, ০৯৩	১, ২৫৩, ৫০১
১৭৬৭-১৭৬৮	৩, ৬০৮, ০০৯	২, ৩৫৯, ০০৫	১, ৪৮৭, ৩৮৩	৮৭১, ৬৬২
১৭৬৮-১৭৬৯	৩, ৭৮৭, ২০৭	২, ৪০২, ১৯১	১, ৫৭৩, ১২৯	৮২৯, ০৬২
১৭৬৯-১৭৭০	৩, ৩৪১, ৯৭৬	২, ০৮৯, ৩৬৮	১, ৭৫২, ৫৫৬	৩৩৬, ৮১২
১৭৭০-১৭৭১	৩, ৩৩২, ৩৪৩	২, ০০৭, ১৭৬	১, ৭৩২, ০৮৮	২৭৫, ০৮৮
মোট	২০, ১৩৩, ৫৭৯	১৩, ০৬৬, ৭৬১	৯, ০২৭, ৬০৯	৪, ০৩৭, ১৫২

আমাদের এই ইতিবৃত্তকথন-প্রসঙ্গে আমরা আরও দেখব যে পঞ্চাশ বছরের বেশী কাল ধরে এটাই ছিল ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংলণ্ডের নির্ধারিত নীতি ; হাউস

অব কমন্সের সম্মুখে এটা প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়েছিল এবং ১৮৩৩ ও আরও পরেও তা জোরালো ভাবে অনুসৃত হয় এবং ইংলণ্ডের শিল্পের উপকারার্থে ভারতের বহু জাতীয় শিল্পকেই সাফল্যের সঙ্গে উৎপাটিত করে।

কিন্তু দেশের ভাগ্যে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বড় কুফল ছিল বঙ্গদেশ থেকে অবিরাম আর্থিক নিকাশ (Economic Drain)। কোম্পানির মুনাফার জন্য অথবা গোলার্ধের অন্য অঞ্চলে খরচনির্বাহের জন্য বছরের পর বছর এই আর্থিক নিকাশ চলেছিল।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের হাউস্ অব কমন্সের চতুর্থ রিপোর্টে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়ানী মঞ্জুরীর পর বঙ্গদেশে প্রথম ছয় বৎসরের রাজস্ব ও আর্থিক ব্যয়ের একটি হিসেব আছে। তার থেকে নিম্নলিখিত সারণীর পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয়েছে: [১০] (৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-সম্পাদক)

এই পরিসংখ্যানই দেখিয়ে দিচ্ছে যে বঙ্গদেশের নীট রাজস্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই প্রতিবৎসর দেশের বাইরে পাঠানো হত। কিন্তু এই দেশ থেকে আর্থিক নিকাশের প্রকৃত পরিমাণ ছিল আরও বেশী। বেসামরিক ও সামরিক খরচের একটা বিরাট অংশই ছিল পদস্থ ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের বেতন। সমস্ত সঞ্চয়ই তাঁরা বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। বৈধ বাণিজ্য ও শিল্প থেকে দেশী বণিকদের হটিয়ে দিয়ে গড়ে তোলা বিরাট ঐশ্বর্যও প্রতিবৎসর বাইরে চলে যেত। গভর্ণর হ্যারি ভেরেল্‌ষ্ট কর্তৃক সংগৃহীত ১৭৬৬, ১৭৬৭ ও ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের আমদানি ও রপ্তানি বিষয়ক পরিসংখ্যানে প্রকৃত আর্থিক নিকাশটি বোধ হয় আরও শুদ্ধরূপে পরিবেশিত: [১২]

আমদানি	রপ্তানি
পাউণ্ড ৬২৪, ৩৭৫	পাউণ্ড ৬, ৩১১, ২৫০

অন্যভাবে বলা যায়, দেশে যা আমদানি হত, দেশ থেকে তার দশগুণ রপ্তানি হ'ত। শ্রীযুত ভেরেল্‌ষ্ট এই কুফলের বিস্তার নিজেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং এরই ফলে উদ্ভুত দেশের জনসাধারণের শোচনীয় আর্থিক অবস্থা তিনি অক্লান্ত ভাবে বর্ণনা করে গেছেন।

পূর্বে দিল্লীতে যে পরিমাণ অর্থই প্রেরিত হয়ে থাক না কেন, বিপুল বাণিজ্যের প্রতিদানে তা বঙ্গদেশে যথাযথভাবে পুনঃসংগৃহীত হত…নবাবের

এলাকার বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে এ-গুলির কি বিরাট পার্থক্য!... এই প্রদেশের সম্পদবৃদ্ধিকল্পে একটি টাকাও জমা না দিয়ে প্রত্যেকটি ইয়োরোপীয় কোম্পানিই এ দেশে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা তাদের বাৎসরিক লগ্নীর পরিমাণ বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করেছে।"[১৩]

"সব দিক থেকে অর্থ সরবরাহের জন্য এই প্রদেশের উপর যে বিপুল চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে তা আপনাদের কোষাগারকে শোচনীয় অবস্থায় পরিণত করেছে এবং এই দেশ থেকে এত বিপুল রপ্তানির অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের কথা ভেবেই আমরা শঙ্কিত হচ্ছি।

"একথা বললে খুব বাড়িয়ে বলা হবে না যে যত সমৃদ্ধই হোক না কেন, যদি কোন দেশ কোনরূপ আর্থিক সাহায্য না পায় এবং সামগ্রিক বাৎসরিক আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বাৎসরিক ঘাটতি বহন করে, তবে উন্নতিলাভ তো দূরের কথা সে দেশের পক্ষে বেশী দিন টিকে থাকাই অসম্ভব। কিন্তু এ ছাড়াও আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি আছে যা দেশের সম্পদহ্রাস করেছে এবং, যদি এর প্রতিবিধান না হয়, তবে তা অবিলম্বেই সম্পদ নিঃশেষ করে ফেলবে। পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে পূর্বে এই দেশ যে বিরাট সুবিধা ভোগ করত, তা হ'ল বিভিন্ন পরিবারকে অনুদান এবং শাসকবর্গের ব্যয়বহুল বিলাসিতার মাধ্যমে রাজস্বের বণ্টন। কিন্তু এখন ভূমি থেকে আহৃত সমস্ত অর্থ একটি গহ্বরই গ্রাস করছে—তা হল আপনাদের কোষাগার। আমাদের লগ্নী ও প্রয়োজনীয় ব্যয় থেকে উৎসারিত অর্থ ব্যতীত, এর বিন্দুমাত্র অংশও বাজারে সঞ্চালিত হয় না।"

এই লগ্নী বলতে কি বোঝাত হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটি ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের নবম রিপোর্টে তা পরিষ্কার করে বলেছেন।

"বঙ্গদেশের রাজস্বের একটা নির্ধারিত অংশ বহু বৎসর যাবৎ ইংলণ্ডে রপ্তানির উদ্দেশ্যে মাল কিনবার জন্য আলাদা করে রেখে দেওয়া হয় এবং একেই বলে লগ্নী। এই লগ্নীর বিশালত্বের অনুপাতেই কোম্পানির বিশিষ্ট কর্মচারীদের গুণাবলীর মান সাধারণতঃ নিরূপণ করা হয়। ভারতের দারিদ্র্যের এই মূল কারণকেই সে দেশের সম্পদ ও সমৃদ্ধির পরিমাপ হিসেবে সাধারণতঃ ধরা হয়ে থাকে। প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা মহার্ঘ দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে বিরাট বিরাট জাহাজের বহর প্রতি বৎসর অবিরাম ও ক্রমবর্দ্ধিত সাফল্যের সঙ্গে ইংলণ্ডে পৌঁছে লোকদের চোখ ধাঁধিয়ে দিত এবং যে দেশের উদ্বৃত্ত উৎপাদন বাণিজ্য দুনিয়ার এত বড় একটা সীমানা অধিকার করে রাখতে পারে, স্বাভাবিকভাবেই সে দেশের সচ্ছল পরিস্থিতি ও ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির ধারণা এরই ফলে সৃষ্টি হ'ত।

ভারতবর্ষ থেকে এই রপ্তানি অন্য দিকে একটা অনুপূরক যোগানের ব্যবস্থারও ইঙ্গিত দিত যার ফলে ঐ যোগানদ্রব্যের উৎপাদনে বিনিযুক্ত বাণিজ্যিক মূলধন ক্রমাগতই জোরদার হচ্ছিল ও বেড়েই চলেছিল। কিন্তু লাভজনক ব্যবসার পরিবর্তে বরং ঐ দেশের কাছে প্রদত্ত রাজস্ব আপাতরম্য অথচ বিভ্রান্তিকর রূপ ধারণ করেছিল।"[১৪]

গভর্ণর ভেরেলষ্ট ও হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত অবিরাম আর্থিক নিকাশের কুফলের দিক ইংলণ্ডের মহত্তম রাষ্ট্র-দার্শনিকও নিন্দা করেছেন। যে ভাষায় তিনি সেই নিন্দা করেছেন, যতদিন ইংরেজী ভাষা লোকে বুঝবে, ততদিন তা সকলে পড়বে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ফক্স্-এর ইণ্ডিয়া বিলের ওপর বক্তৃতায় এডমণ্ড বার্ক ভারতবর্ষ থেকে স্থায়ী আর্থিক নিকাশের ফলে রসশূন্য করে দেওয়ার ফলাফলের কথা বর্ণনা করে-ছিলেন। তাঁর মত বড় বাগ্মীও তাঁর আইনসভায় সদস্যকালীন গৌরবোজ্জ্বল জীবনে এর চেয়ে জোরালো, ওজস্বী ও সত্যনিষ্ঠ ভাষণ কদাচ দিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ।

"এশিয়ার বিজেতাগণ অবিলম্বে তাঁদের হিংস্রতা প্রশমিত করতেন। কেননা বিজিত দেশকে তাঁরা আপন করে নিতেন। যে অঞ্চলে তাঁরা বাস করতেন তার উত্থানপতনের সঙ্গেই তাঁদের উত্থানপতন জড়িত থাকতো। উত্তরপুরুষের সমস্ত প্রত্যাশাকে পিতৃপিতামহগণ সেখানে সঞ্চিত রেখে যেতেন। উত্তর-পুরুষেরা দেখতেন পিতৃপিতামহের কীর্তিস্তম্ভ। এখানেই তাঁদের ভাগ্য চূড়ান্ত-ভাবে জড়িত ছিল। এবং সকলেরই স্বাভাবিক সাধ ছিল যে অপকৃষ্ট দেশের সঙ্গে যেন তাদের ভাগ্য না জড়িয়ে যায়। দারিদ্র্য, শস্যহীনতা ও অনুর্বর উষরতা কোন মানুষের চোখেই আনন্দদায়ক সম্ভাবনা নয়। সমগ্র জাতির অভিশাপের মধ্যে পুরো জীবন কাটানো অতি অল্প সংখ্যক লোকই সহ্য করতে পারে। যদি আক্রোশ বা ধনলিপ্সা তাতার প্রধানদের লোলুপতা বা স্বেচ্ছা-চারিতার দিকে নিয়ে গিয়েও থাকে, ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে একটি রাজ শক্তির ওপর যে কুফল নেমে আসে তা দূর করবার জন্য মানুষের স্বল্প পরিসর জীবনেও যথেষ্ট সময় থাকতো। যদি বলপ্রয়োগ বা উৎপীড়নের দ্বারা সম্পদ মজুত করা হয়ে থাকে, তা ছিল পারিবারিক অর্থভাণ্ডার বা পারিবারিক বদান্যতা। অধিকতর শক্তিশালী ও অপচয়ী হস্তের লুণ্ঠনে তা প্রজাদের নিকট প্রত্যর্পিত হত। বহু বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর অকিঞ্চিৎকর নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও, প্রকৃতির এই দেনা পাওনার খেলা সুনিয়মিত। সম্পদ

আহরণের উৎসগুলি তখনো শুকিয়ে যায় নি। কাজেই দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনের উন্নতি ঘটতে পারতো। জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও বিনিয়োগের জন্য অর্থলিপ্সা ও তেজারতি পর্যন্ত কাজ করছিল, কৃষক ও উৎপাদকেরা প্রচুর সুদ দিত। এর দ্বারা তারা সেই তহবিলেরই বৃদ্ধি ঘটাতো, যেখান থেকে তারা আবার ঋণ নিতে পারত। তাদের সম্পদ উচ্চমূল্যে বিক্রিত হ'ত কিন্তু সে বিক্রয় বিষয়ে তারা নিশ্চিতই ছিল এবং সমাজের সাধারণ সম্পদ সমাজের গুণাগুণেই বর্ধিত হত।

"কিন্তু বৃটিশ শাসনে সামগ্রিক ক্রমটাই পাল্টে গেছে। তাতার আক্রমণ ক্ষতিকারক ছিল, কিন্তু আমাদের রক্ষণাবেক্ষণই ভারতবর্ষকে ধ্বংস করছে। তাদের ছিল শত্রুতা আর আমাদের আছে বন্ধুতা। সেখানে আমাদের বিজয় বিশ বৎসর পূর্বে যে কুৎসীত অবস্থায় ছিল এখনো সেই অবস্থাতেই আছে। দেশজ লোকেরা জানেনা ইংরেজদের পাকা চুল ভর্তি মাথা দেখতে কেমন হয়। তরুণ ইংরেজরা, যাদের প্রায় বালকই বলা চলে, সেখানে দেশী লোকজনের সঙ্গে কোনরকম মেলামেশা না করেও তাদের প্রতি কোন সহানুভূতি না দেখিয়েই তাঁরা সে দেশ শাসন করেন। এখনো যদি তাঁরা ইংলণ্ডেই থাকতেন তবে যতটা সামাজিক আচার পালন করতেন, তার চেয়ে বেশী কিছু তাঁরা সেখানে পালন করেন না। সুদূর প্রবাসের হঠাৎ ঐশ্বর্যলাভের জন্য যতটা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত কোনরকম মেলামেশাও তাঁরা করেন না। বয়সের লোভ ও যৌবনের দুর্দমনীয়তায় উদ্দীপিত হয়ে তাঁরা তরঙ্গের ক্রমপরম্পরায় ভেসে আসেন। দেশী লোকেদের সম্মুখে কিছুই থাকে না, থাকে শুধু শিকারী ও যাযাবর পাখীর নতুন নতুন ঝাঁকের সামনে সীমাহীন হতাশা। সেই যাযাবর পাখীদের আছে খাদ্যের জন্য নতুন নতুন উজ্জীবিত ক্ষুধা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে খাদ্যের ঘটছে নিরন্তর অপচয়। যে কোন ইংরেজের অর্জিত মুনাফার প্রতিটি টাকাই ভারতবর্ষ থেকে চিরদিনের জন্য উধাও হয়ে যায়।"

গভর্ণর ভেরেলষ্ট ও এড্মাণ্ড বার্কের সময়ের তুলনায় ভারতবর্ষের প্রশাসনে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। অর্ধ-শতাব্দী কাল ভারতীয় উপমহাদেশ অবিচ্ছিন্ন শান্তি ভোগ করেছে। অষ্টাদশ শতকে এরকম নজির আর পাওয়া যাবেনা। আপত্তিকর ও নিষেধমূলক শুল্ক থেকে ব্যবসাবাণিজ্য রেহাই পেয়েছে। বিচারবিভাগীয় শাসন এবং জীবন ও সম্পত্তিরক্ষার কাজ আরও পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। শিক্ষার বিস্তার জনসাধারণের মনে একটা নতুন জীবনের উন্মেষ ঘটিয়েছে এবং তাদের উচ্চতর কাজ ও বৃহত্তর দায়িত্বপালনের উপযুক্ত করে তুলেছে। তবুও, ভেরেলষ্ট ও

এডমণ্ড বার্ক তাঁদের সময়ে ভারতবর্ষ থেকে যে নিরন্তর আর্থিক নিকাশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, তা অদ্যাপি বিপুলতর বেগে বয়ে চলেছে এবং ভারতবর্ষকে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত করেছে।

ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ কারণ বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা। কিন্তু এরকম দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ডতা ও তজ্জনিত জীবনহানির জন্য বিশেষভাবে দায়ী জনসাধারণের দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য। জনসাধারণ মোটামুটি ভাবে যদি সম্পন্ন অবস্থায় থাকত, তবে প্রতিবেশী প্রদেশ থেকে শস্য ক্রয় করে স্থানীয় অজন্মাজনিত ঘাটতি পূরণ করতে পারত, ফলে জীবনহানি ঘটত না। কিন্তু জনসাধারণ একেবারেই সঙ্গতিহীন ব'লে আশেপাশের অঞ্চল থেকে তারা ক্রয় করতে পারে না এবং যেখানেই অজন্মা ঘটেছে সেখানেই তারা হাজারে হাজারে বা লাখে লাখে মারা গেছে।

১৭৬৯-এর প্রথম দিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আসন্ন দুর্ভিক্ষের সঙ্কেত দেয়। কিন্তু সে বছর পূর্বাপেক্ষায়ও অধিকতর বলপ্রয়োগ ক'রে ভূমি-কর আদায় করা হয়। "এর আগে কোনদিনই রাজস্ব এত ভালভাবে আদায় হয় নি।"[১৫] বৎসরের শেষের দিকে সাময়িক বৃষ্টিপাত অকালেই বন্ধ হয়ে যায় এবং কলকাতার পরিষদ্ কোর্ট অব ডিরেক্টরসদের কাছে লেখা ২৩শে নভেম্বরের চিঠিতে রাজস্বহ্রাসের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কার্যকরী করবার মতন কোন ত্রাণমূলক ব্যবস্থা নির্ধারিত করেন নি। ১৭৭০ সালের ৯ই মে তাঁরা লিখেছিলেন "যে-দুর্ভিক্ষ চলেছে, তার ফলে মৃত্যু, ভিক্ষাবৃত্তি, সমস্ত বর্ণনার বাইরে। একদা প্রাচুর্যময় প্রদেশ পূর্ণিয়াতেই মোট অধিবাসীর একতৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্যান্য অঞ্চলেও সমান দুর্দশা চলেছে।" ১১ই সেপ্টেম্বর তাঁরা লিখেছিলেন,…"জনসাধারণ যে দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে তার কোন বর্ণনাই অতিরঞ্জিত হতে পারে না। কাজেই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে এই বিপর্যয় রাজস্ব আদায়কেও প্রভাবিত করেছে। কিন্তু আনন্দের সঙ্গেই লিখছি যে, যতটা মনে হয়েছিল—রাজস্বহ্রাসের পরিমাণ তারচেয়ে কম।" ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তাঁরা লিখেছিলেন, "বিগত দুর্ভিক্ষের নিদারুণ ভয়াবহতা ও তারই ফলস্বরূপ জনসংখ্যার বিপুল হ্রাস সত্ত্বেও বর্তমান বৎসরের জন্য বাংলা ও বিহার প্রদেশের ভূমি বন্দোবস্তের প্রসার ঘটেছে।" ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তাঁরা লিখেছিলেন, "আমরা যতটা আশা করতে পারতাম, বর্তমান বৎসরে রাজস্ব দফ্তরের প্রতিটি বিভাগেই ততটা সাফল্যের সঙ্গেই আদায় সম্ভবপর হয়েছে।"[১৬]

সমগ্র মানবসমাজের ইতিহাসে তুলনারহিত মানবিক দুর্দশা ও মৃত্যুর বৎসরগুলিতে ভূমিরাজস্বের জবরদস্তি আদায়ের এই কাহিনী বেদনাদায়ক। দুর্ভিক্ষের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সমগ্র দেশ সফর করে পরিষদের সভ্যগণ সরকারীভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে বঙ্গদেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বা প্রায় **এক কোটি মানুষ** এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারিয়েছে। এবং যখন প্রতিটি গ্রামে, রাস্তার ধারে, বাজারে মুমূর্ষু দুর্ভিক্ষপীড়িতদের ত্রাণের জন্য কোন সুসম্বদ্ধ উপায়ই কার্যকরী করা হয় নি, তখন, কোম্পানির কর্মচারীদের দুষ্কর্মের ফলেই মৃত্যুর হার বেড়ে গিয়েছিল। তাদের গোমস্তারা মানুষের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে মোটা মুনাফার উদ্দেশ্যে কেবল সমস্ত শস্যই একচেটিয়াভাবে অধিকার করে নেয় নি, অধিকন্তু, পরের মরশুমে বপনের জন্য রাখা শস্যবীজ বিক্রয় করতেও চাষীদের বাধ্য করেছিল। এই সংবাদ পেয়ে কোর্ট অব ডিরেকটর্‌স্ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে "কোম্পানির বদান্যতা বান্‌চাল করবার মত হঠকারিতা যারা দেখিয়েছে এবং সর্বব্যাপী দুর্দশার সুযোগে মুনাফা লাভের চিন্তা পোষণ করেছে সেই সব অপরাধীদের আদর্শ স্থাপন মূলক উল্লেখযোগ্য শাস্তি দেওয়া উচিত।"[১৭]

কিন্তু যেখানে স্বার্থের সংঘাত ছিল সেখানে "কোম্পানির বদান্যতা" এতটা দর্শনীয় ছিল না। এবং এক-তৃতীয়াংশ লোক মুছে যাবার পরে ও এক-তৃতীয়াংশ জমি পতিত হয়ে যাবার পরও বঙ্গদেশে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ হ্রাসের কোন ইঙ্গিতই আমরা পাই নি। ১৭৭২ এর ৩০শে নবেম্বর কোর্ট অব ডিরেটর্‌সের কাছে ওয়ারেন হেষ্টিংস লিখেছিলেন,

"এই প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোকের জীবনহানি ও তজ্জনিত কৃষির উৎপাদন হ্রাস হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ১৭৭১ সালের নীট আদায়ের পরিমাণ ১৭৬৮ সালের আদায়কেও ছাপিয়ে গেছে।...স্বভাবতই আশা করা গিয়েছিল যে এই বিরাট বিপর্যয়ের ফলাফলগুলির সঙ্গে তাল রেখেই ভূমিরাজস্বের পরিমাণ কমানো হবে। এটা যে ঘটেনি তার কারণ পূর্বের মান অনুযায়ীই বলপূর্বক এটা বজায় রাখা হয়।"[১৮]

বর্তমান ভারতীয় প্রশাসনিক ভাষায় এই বলপ্রয়োগের দ্বারা ভূমিরাজস্বের পরিমাণ বজায় রাখাকেই বর্ণনা করা হবে ভারতের স্বাস্থ্যোদ্ধারের সালসা হিসেবে!

১। House of Commons Committee's Third Report, 1778, Appendix, pp. 891-898

২। House of Commons Committee's Fourth Report, 1778, Appendix, p. 534,

৩। House of Commons Committee's Third Report, 1773, Appendix, p. 400.

৪। Governor Verelst's Letter to the Directors, dated 16th December, 1769.

৫। *View of the Rise, &c.*, of the *English Government in Bengal*, by Harry Verelst, Esq., Late Governor of Bengal, London. 1772, p. 70.

৬। Letter to the Court of Directors, dated 26th September, 1768

৭। Ninth Report of House of Commons Select Committee on Administration of Justice in India, 1788, Appendix, p. 87.

৮। Ninth Report, 1783, p, 64.

৯। Fourth Report, 1773, p. 585.

১০। *View of the Rise &c., of the English Government in Bengal,* Appendix, p. 117.

১১। Letter, dated 26th september, 1767,

১২। Letter, dated 24th March, 1768

১৩। Letter, dated 5th April, 1769.

১৪। Ninth Report, 1783. p, 54

১৫। Resident at the Durbar, 17th February. 1769. India Office Records, quoted in Hunter's *Annals of Rural Bengal.* London 1868, p, 21. *note.*

১৬। Extracts from India Office Records, quoted in Hunters' *Annals of Rural Bengal,* pp, 899-404.

১৭। *Ibid.*, p. 420.

১৮। *Ibid.*, p- 381.

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্গদেশে ওয়ারেন হেষ্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫)

বৃটিশ পার্লামেণ্ট ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস করে। ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭২ সালে বঙ্গদেশের গভর্ণর হন। নতুন অ্যাক্ট অনুযায়ী ১৭৭৪ সালে তিনিই হন প্রথম গভর্ণর জেনারেল। ফিলিপ ফ্রান্সিস সহ তাঁর কাউন্সিলের তিনজন সদস্য নিযুক্ত হন ইংলণ্ড থেকে, এবং অন্য দুজন সদস্যকে নেওয়া হয় কোম্পানির চাকুরেদের মধ্য থেকে। কলকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। আশা করা গিয়েছিল যে এই সমস্ত নতুন ব্যবস্থায় ভারতের প্রশাসনের উন্নতি ঘটবে।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের নাম ভারতের ইতিহাসের অনেকগুলি স্মরণীয় ঘটনার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সেই ঘটনাগুলি একদা পার্লামেণ্টে দীর্ঘ বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ে অযোধ্যার বেগমদের কথা, বারাণসীর রাজার কাহিনী এবং রোহিলাদের সঙ্গে যুদ্ধের কথা। হেষ্টিংসের প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত অপেক্ষাকৃত কম নাটকীয় অথচ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল পশ্চিমে মারাঠীদের সঙ্গে এবং দক্ষিণে হায়দার আলির সঙ্গে বৃটিশদের বিরাট লড়াই। এবং এই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে ওয়ারেন হেষ্টিংসের আচরণ বহু বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তাঁর প্রশাসনের সমাপ্তির এক শতাব্দীরও অধিক কাল পরে সে বিতর্ক এখনও শেষ হয়নি।

বর্তমান বিবরণী থেকে এই সমস্ত বিতর্ককে একপাশে সরিয়ে রাখতে পেরেছি বলে আমরা অবর্ণনীয় স্বস্তি বোধ করেছি। এই রচনার পরিধি অনুসারে আমরা আমাদের মনোযোগকে ওয়ারেন হেষ্টিংসের ঠিক সেই ব্যবস্থা-গুলির প্রতিই সীমাবদ্ধ রাখব যেগুলি লক্ষ লক্ষ মানুষের বৈষয়িক কল্যাণকে, জাতির অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল। বর্তমান গ্রন্থে আমরা ওয়ারেন হেষ্টিংসের অসামরিক ও রাজস্ব প্রশাসনেরই পর্যালোচনা করব; যে বিতর্কমূলক বিষয়গুলি প্রায় শতাধিক বছর ধরে বাগ্মীর রসনা ও ঐতিহাসিকের লেখনীকে ব্যাপৃত রেখেছে সেগুলিকে পরিহার করব।

ইতিপূর্বে আমরা ওয়ারেন হেষ্টিংসের সাক্ষাৎ পেয়েছি একজন কড়া ও যোগ্য মানুষ হিসেবে, ন্যায়পরায়ণ ও সম্মানার্হ ব্যক্তিরূপে, যিনি কোম্পানির কর্ম-চারীদের জবরদখলের বিরুদ্ধে মীরকাসিমের সুস্পষ্ট অধিকারগুলি রক্ষা করার

জন্য, বঙ্গদেশের মানুষের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যকে তাদের নতুন শাসকদের সুবিধাভোগী লোলুপতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পৌরুষ সহকারে চেষ্টা করছেন, যদিও তা ব্যর্থ চেষ্টা। কিন্তু বঙ্গদেশের ভূমিব্যবস্থা তাঁর সময়কার সমস্ত ইংরেজদের কাছে যে রকম ছিল, হেষ্টিংসের কাছেও ছিল সেই রকমই একেবারে একটা নতুন সমস্যা; এবং জমি থেকে বর্ধিত রাজস্বের জন্য কোম্পানির ডিরেক্টরদের ক্রমাগত তাগাদার ফলে তিনি সমস্যাটিকে সঠিকভাবে আয়ত্ত করার অথবা সুষ্ঠুভাবে তাকে বিচার করার সুযোগই পাননি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজরা শুধু ইংলণ্ডীয় ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন—যে ব্যবস্থায় জমির মালিকানা ছিল জমিদারের, জমি ভাড়া দেওয়া হ'ত চাষীদের এবং চাষ করত মজুররা। বঙ্গদেশের ব্যবস্থা ছিল একেবারে ভিন্ন; মাঝে মাঝেই রাষ্ট্র, ভূম্যধিকারী বা জমিদার ও কর্ষক বা রায়তরা যে পরস্পর-বিরোধী দাবি উত্থাপন করত তা এই প্রথাটির প্রকৃত বৈশিষ্ট্যগুলিকে দীর্ঘকাল অস্পষ্ট করে রেখেছিল। রাষ্ট্র কোন অর্থেই স্বত্বাধিকারী ছিল না, জমি থেকে শুধু একটা রাজস্ব পাবার অধিকারী ছিল। জমিদাররা তাঁদের জমিদারি দখলে রাখতেন পুরুষানুক্রমে; তাঁরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতায় ক্ষমতাবান সামন্ত প্রভু। তাঁরা কৃষকদের কাছ থেকে প্রথাগত খাজনা লাভ করার অধিকারী ছিলেন। কৃষক কিংবা রায়তরা নিছক মজুর ছিল না, তাদের জোতের উপর অধিকার ছিল। জমিদারকে প্রথাগত খাজনা দিয়ে তারা এই জোত দিয়ে যেত উত্তর পুরুষের হাতে। বঙ্গদেশের নবাবরা মাঝে মাঝে জমিদারি নতুন করে জরিপ করতেন; এবং ভূমিরাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে জমিদাররা তাঁদের খাজনা বাড়াতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ব্যবস্থাগুলি অপরিবর্তিতই ছিল। রাষ্ট্র ছিল রাজস্ব পাবার অধিকারী; জমিদাররা ছিলেন প্রথাগত খাজনা পাবার অধিকারী, রাষ্ট্রকে তাঁরা একটা রাজস্ব দিতেন; জমিদারদের প্রথাগত খাজনা প্রদান সাপেক্ষে রায়তদের ছিল তাদের জোতের উপর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার।

১৭৬৫ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন বাদশাহী সনদ অনুযায়ী বঙ্গের দেওয়ান বা প্রশাসক হল, কোম্পানির কর্মচারীরা তার সঙ্গে সঙ্গেই রাজস্ব-বিষয়ের ব্যবস্থাপনার বা বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করেন নি। মুর্শিদাবাদের মুসলমান আমলা নবাবের রাজসভাস্থ কোম্পানির রেসিডেন্টের তত্ত্বাবধানে বাঙলাদেশে রাজস্ব আদায়ের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এবং

সিতাব রায় নামে জনৈক হিন্দু রাজস্বপ্রধান পাটনাস্থিত কোম্পানির এজেন্টের তত্ত্বাবধানে বিহারে রাজস্ব আদায়ের কাজ চালিয়ে যান।[১] শুধু মাত্র যে জেলাগুলিতে কোম্পানির পুরনো দখলী স্বত্ব ছিল সেই চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার সমস্ত ব্যবস্থাপনা চালাতেন কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীরা।

১৭৬৯ সালে কোম্পানি রাজস্ব আদায় ও বিচারের কাজ তত্ত্বাবধানের ক্ষমতাসম্পন্ন সুপারভাইজার বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করে। "দ্বৈত সরকার" ভালোভাবে কাজ করেনি। দেশের প্রকৃত শাসকরা হিন্দু ও মুসলমান রাজস্ব আদায়কারীদের অন্তরালে থেকে আদায় করা অর্থাদি গ্রহণ করতেন বটে কিন্তু শাসকের দায়িত্ব তাঁরা বোধ করেননি। হিন্দু ও মুসলমান রাজস্ব আদায়কারীরা নিজেদের মনে করতেন কোম্পানির প্রতিনিধি বলে এবং সেজন্য শাসকদের দায়িত্ব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। জনগণ উভয়ের দ্বারাই নিপীড়িত হত, কোন পক্ষই তাদের রক্ষা করতেন না। ১৭৬৯ সালে নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়কদের তদন্ত থেকে দেখা যায় যে প্রশাসন ছিল চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে। আদায়কারী কর্তারা "জমিদার ও বেশী আয়ের বড় বড় চাষীদের কাছ থেকে যতখানি সম্ভব রাজস্ব আদায় করতেন, তাঁদের নিম্নস্থ সকলকে লুণ্ঠন করার অবাধ অধিকার দিয়ে রাখতেন এবং নিজেদের জন্য সংরক্ষিত রাখতেন আবার তাদের লুণ্ঠন করার অধিকার।" এবং বিচারকার্য সম্পর্কে—"নিয়মিত পন্থাটি সর্বত্রই মুলতুবি রাখা হয়; কিন্তু অন্যকে নিজের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করাবার মতো যার ক্ষমতা ছিল, তারা প্রত্যেকেই তা প্রয়োগ করত।"[২]

১৭৭২ সালে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা বৃটিশ অফিসারদের হাতে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং তাঁর কাউন্সিলের চারজন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি রাজস্ব-দপ্তর ও কোষাগার মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করে গভর্ণর ও তার কাউন্সিলকে নিয়ে গঠিত বোর্ড অব রেভিনিউর অধীনে আনা হয়। প্রদেশগুলিতে, বর্তমানে কলেক্টর নামে অভিহিত ইউরোপীয় তত্ত্বাবধায়কদের উপর রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়; পাঁচ বছরের জন্য ভূমিরাজস্বের একটি বন্দোবস্ত গৃহীত হয়; কমিটির চারজন কনিষ্ঠ সদস্য এই পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণে যান। বিচারকার্যের জন্য প্রতি জেলায় একটি দেওয়ানী আদালত ও একটি ফৌজদারী আদালত গঠিত হয়; কলেক্টর দেওয়ানী আদালতের কার্য পরিচালনা করতেন, এবং তিনি ফৌজদারী

আদালতেও উপস্থিত থাকতেন; সেখানে একজন মুসলমান কাজী দুজন মৌলবীর সাহায্যে বিচার করতেন। এই দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত থেকে আপীল করতে দেওয়া হ'ত কলকাতার দুটি উচ্চতর আদালতে। এক নতুন পুলিস ব্যবস্থা সংগঠিত হয়; ফৌজদার নামে অভিহিত দেশীয় পুলিস অফিসারদের চৌদ্দটি জেলায় নিযুক্ত করা হয়। বঙ্গদেশ তখন এই চৌদ্দটি জেলাতেই বিভক্ত ছিল; রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নির্দেশনার জন্য রচিত নিয়মাবলী দেশের বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার ওয়ারেন হেস্টিংসের যোগ্যতা ও ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে; কিন্তু সেগুলি বৃটিশ প্রশাসনব্যবস্থার যে ত্রুটিটি বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে এসেছে—অর্থাৎ জনগণের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার অভাব—সেই ত্রুটিটিকেও প্রকাশ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দু ও মুসলমান কর্মকর্তারা ছিলেন কোম্পানির কর্মচারীদের মতোই দুর্নীতিগ্রস্ত ও লোলুপ। হেস্টিংস, এবং তাঁর উত্তরসূরী কর্ণওয়ালিস বৃটিশ কর্মচারীদের বিশ্বাস ও দায়িত্বের পদে অধিষ্ঠিত করে এবং তাদের কাজের জন্য যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দিয়ে তাদের সৎ করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান কর্মকর্তাদের বিশ্বাস ও দায়িত্বের পদে বসানো, তাঁদের যথাযথভাবে বেতন দেওয়া এবং প্রশাসনের কাজে তাঁদের সহযোগিতা গ্রহণ করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি।

১৭৭৪ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্ণর জেনারেল হন। পাঁচ বছরের জন্য জমির বন্দোবস্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। জমিদারদের বংশপরম্পরাগত অধিকারকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, বন্দোবস্ত করা হয়েছিল নীলামের দ্বারা। নিলামে যাঁরা ডাক তুলেছিলেন তাঁরা উচ্চ মূল্য দেবার প্রতিযোগিতার ব্যগ্রতার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন, জমি যারা চাষ করে তাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তা সত্ত্বেও প্রতিশ্রুত রাজস্ব দিতে পারেননি। বঙ্গদেশের ভূমিব্যবস্থাকে ভুলভাবে বোঝা হয়েছিল; জমিসম্পন্ন প্রাচীন পরিবারগুলি ধ্বংস হয়ে যায় এবং চাষীরা মর্মান্তিক ভাবে নিপীড়িত হতে থাকে। ১৭৭৪ সালে ইয়োরোপীয় কলেক্টরদের ফিরিয়ে নেওয়া হয়, আদায়-কার্যের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হয় কলকাতা, বর্ধমান, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও পাটনাস্থিত প্রাদেশিক পরিষদের উপর; জেলাগুলিতে দেশীয় আমিনদের নিয়োগ করা হয় এক অসম্ভব কর্তব্য পালনের জন্য।

১৭৭৬ সালে কলকাতায় এক ন্যায়বিচারপূর্ণ ভূমিবন্দোবস্ত-নীতি আলোচনা করা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস ও বারওয়েল প্রস্তাব করেন যে ভূসম্পত্তি প্রকাশ্য

নিলামের মারফৎ বিক্রি করা হোক অথবা চাষের জন্য ইজারা দেওয়া হোক এবং ক্রেতা বা ইজারাদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হোক **সারাজীবনের জন্য**। ইংরেজি সাহিত্যে "Letters of Junius"-এর লেখক রূপে পরিচিত বিজ্ঞতর এক রাষ্ট্রনীতিবিদ এই পরিস্থিতিকে উদারতর ও অধিকতর ন্যায্য দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছিলেন। ফিলিপ ফ্রান্সিস তখন গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন, এবং ভারতে নথীবদ্ধ যোগ্যতম কার্যবিবরণীগুলির একটিতে তিনি সুপারিশ করেন যে রাষ্ট্রের ভূমি রাজস্বের চাহিদাকে **চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট** করা উচিত।

"জমিদারদের অধিকাংশই সর্বস্বান্ত হন এবং তাঁদের জমির ব্যবস্থাপনা তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যায়; পদ ও বংশমর্যাদাসম্পন্ন লোক কিংবা আগে যাঁরা ভালো চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের সংখ্যাও হয়ে পড়ে অতি সামান্য; যারা ছিল তারা চাইত মোটা মুনাফা আর তা দেবার মতো এবং সেই সঙ্গে খাজনা দেবার মতো সামর্থ্য দেশের ছিল না। নিম্নস্তরের লোকেরাই তাই আবশ্যিক ভাবে নিযুক্ত হতেন সরকারে আমিন বা রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে। যে জেলায় তাঁরা নিযুক্ত হতেন সেই জেলার জন্য একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক স্থির করে তাঁরা চুক্তি করতেন এবং কার্যত তাঁদের বলা যায় রাজস্বের পত্তনিদার। তাঁরা তখন সদর থেকে অথবা সরকারের পরিচালনা কেন্দ্র থেকে যেতেন জেলায় জেলায়, যে রাজস্ব তাঁরা দেবেন বলে চুক্তি করেছেন জমিদারদের সঙ্গে বা বর্গাদারদের সঙ্গে সে-ব্যাপারে ফয়সালা করার উদ্দেশ্যে।

এই পত্তনি ব্যবস্থার দোষ এবং দেশের উপর তার সর্বনাশা প্রভাব বর্ণনা করে ফিলিপ ফ্রান্সিস জনসাধারণের সমৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে ভূমি রাজস্বের এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুপারিশ করেন।

"জমা (ধার্য কর) একবার স্থির করার পর, সেটা হবে সরকারি রেকর্ডের ব্যাপার। সেটা হতে হবে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়; এবং সম্ভব হলে, জনসাধারণকে বোঝাতে হবে যে তা স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। বর্তমান বা ভবিষ্যৎ মালিক যেই হোক না কেন সে-সব বিবেচনা ছাড়া সেই জমিরই উপর এই শর্ত আরোপ করতে হবে। যদি তখনও কোনো গুপ্ত সম্পদ থাকে, তাকে বার করে এনে জমির উন্নয়নের কাজে লাগানো হবে, কারণ মালিক একথা জেনে আনন্দ পাবে যে সে তার নিজের জন্যেই পরিশ্রম করছে।"৩

এই প্রস্তাবগুলি যখন লণ্ডনে ডিরেক্টরদের সামনে আসে, তখন তাঁরা একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ইতস্তত করেন। খাঁটি ব্রিটিশসুলভ দোদুল্যমান-

তার এক নীতি নিয়ে তাঁরা ঘোষণা করেন যে "জীবৎকালের জন্য অথবা চির-কালের জন্য জমি লীজ দেবার বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে আমরা অনেক-গুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণে এর কোন একটি পদ্ধতিকেও গ্রহণ করা বর্তমানে শ্রেয় মনে করি না।" ডিরেক্টরদের এই সিদ্ধান্তটি ছিল নিকৃষ্টতম; কারণ এর দ্বারা ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রস্তাবিত আজীবন লীজ এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রস্তাবিত চির-কালীন লীজকে নাকচ করা হয় এবং সেই নীলামে স্বল্পমেয়াদী লীজের ব্যবস্থাই চলতে দেওয়া হয় যে-ব্যবস্থার ফলে বঙ্গ প্রদেশ ইতিমধ্যেই অর্ধেক ধ্বংস হয়েছিল। ভারতের বণিক শাসকরা "অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণে" তাঁদের রাজস্বের ক্রমাগত ও প্রায়শ বৃদ্ধির ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন এবং বঙ্গদেশকে আরো দশ বছরের জন্য নীলাম ব্যবস্থা, স্বল্পমেয়াদী লীজ ও রাজস্ব বাকি-ফেলা জমিদারদের কারাদণ্ডের দুর্ভোগ মেনে নিতে হল।

১৭৭২ সালে আয়োজিত পাঁচ বৎসরের বন্দোবস্তের অবসান হয় ১৭৭৭ সালে। নীলাম ব্যবস্থার কিছুটা সংশোধন হয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদারদের তখন অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু যখন ঘোষণা করা হ'ল যে ভূসম্পত্তি খাজনায় দেওয়া হবে, পাঁচ বছরের পরিবর্তে এক বছর অন্তর, তখন এই ব্যবস্থার কঠোরতা অনেকখানি বেড়ে গেল। এই ভাবে ১৭৭৮, ১৭৭৯ ও ১৭৮০ সালে জমিদারদের জমি দেওয়া হয় বার্ষিক বন্দোবস্তে। এই অর্থনৈতিক নিপীড়নে যন্ত্রণায় দেশ আর্তনাদ করতে থাকে; রাজস্ব আবার হ্রাস পায়।

১৭৮১ সালে বিরাট বিরাট পরিবর্তন প্রবর্তন করা হয়। দেওয়ানী আদালত-গুলির নির্দেশের জন্য তেরোটি ধারা ও প্রবিধান তৈরি করা হয়। এগুলিকে পরে পঁচানব্বইটি আর্টিকল অব রেগুলেশন বিশিষ্ট সিভিল কোডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সমস্ত বিধি-নিয়ম ফারসী ও বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। প্রদেশে অপরাধের সংখ্যাবৃদ্ধির মোকাবিলা করার জন্য দেওয়ানী জজ ও কলেক্টরদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়। কলকাতায় এক রাজস্ব কমিটি গঠিত হয় এবং জমিদারদের অগ্রাধিকার দিয়ে মাত্র এক বছরের জন্য ভূমিরাজস্বের এক নতুন বন্দোবস্তের পরিকল্পনা পেশ করা হয়। এই বন্দোবস্ত কার্যকর করা হয় এবং ভূমিরাজস্ব বেড়ে যায় প্রায় ছাব্বিশ লাখ, অথবা প্রায় ২৬০,০০০ পাউণ্ড।

বার্ষিক বন্দোবস্ত, প্রায়শই খাজনা-বৃদ্ধি ও খাজনা আদায়ের নিষ্করুণ পদ্ধতির এই ব্যবস্থায় বাঙলা দেশের সমস্ত বড় বড় জমিদার, প্রাচীন ভূসম্পত্তিসম্পন্ন সমস্ত পরিবার যে দুর্ভোগে ভোগেন, এর আগে তাঁরা কখনও তা ভোগেন নি।

কলকাতার মহাজন এবং ফাটকাবাজদের হাতে ; বিধবা ও নাবালক মালিকরা দেখতে পান যে তাঁদের নিরীহ প্রজারা কলকাতা থেকে নিযুক্ত অর্থগৃধ্নু অছিদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। ঘটনাক্রমে, বাঙলাদেশের যে-তিনটি বৃহত্তম জমিদারী প্রত্যেকে বছরে এক লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং-এরও বেশি রাজস্ব দিত সেই জমিদারী তিনটি তখন তিনজন বিশিষ্টা রমণীর প্রশাসনব্যবস্থার অধীনে ছিল। এঁদের তিনজনের নামই স্বদেশবাসীর স্মৃতিতে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। ৩৫০,০০০ পাউণ্ডেরও বেশি আদায় যুক্ত বর্ধমান ছিল সুবিখ্যাত তিলকচাঁদের বিধবা পত্নী এবং সমধিক বিখ্যাত তেজচাঁদের জননীর শাসনাধীনে। ২৬০,০০০ পাউণ্ডেরও বেশি আদায়যুক্ত রাজশাহী শাসন করতেন শ্রদ্ধেয়া রাণী ভবানী, উচ্চ পদমর্যাদা ও যোগ্যতার জন্য তথা ধার্মিক জীবন ও দানশীলতার জন্য যাঁর নাম আজও পর্যন্ত ভারতে স্মরিত হয়। আর ১৪০,০০০ পাউণ্ড-এর বেশি আদায়যুক্ত দিনাজপুরের রাজা ১৭৮০ সালে লোকান্তরিত হবার পর তাঁর বিধবা পত্নী পাঁচ বছর বয়স্ক উত্তরাধিকারীর অভিভাবিকা হন। এই তিনটি অঞ্চলের ইতিহাসই ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর নিষ্করুণ ও চির পরিবর্তনশীল রাজস্ব নীতিতে জনসাধারণের দুঃখকষ্টের কিছুটা উদাহরণ দিতে পারবে।

সবচেয়ে বেশি কষ্টভোগ করে দিনাজপুর। উত্তরাধিকারী নাবালক থাকাকালীন দেবী সিং নামক জনৈক নীতিবোধহীন ও অর্থলোলুপ এজেন্টকে এই এস্টেট চালানোর জন্য কলকাতা থেকে নিযুক্ত করা হয়। দেবী সিং পূর্ণিয়া ও রংপুরে অত্যাচার করার দোষে দোষী ছিল। তাকে তার আগেকার চাকরী থেকে অপসারিত করা হয় এবং কোম্পানির রেকর্ডে সে চিহ্নিত হয়ে থাকে। কিন্তু উত্তরাধিকারী নাবালক থাকাকালীন দিনাজপুরের রাজস্ব নিংড়ে আদায় করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন তাকেই বেছে নেওয়া হ'ল যথাযোগ্য এজেণ্ট হিসেবে। দেবী সিংও একাজে যোগ্যতার পরিচয় দিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমন কি সম্ভবত বঙ্গদেশেও তুলনাবিহীন এক নিষ্ঠুরতায় তিনি রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে জমিদারদের বন্দী করেন এবং চাষীদের উপর চাবুক চালান। তাঁর অত্যাচার থেকে নারীরাও নিষ্কৃতি পাননি, খুঁটিতে বেঁধে রাখা আর চাবুকের অত্যাচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অপমান আর শ্লীলতাহানি।

দেবী সিং-এর নির্যাতনের ফলে দিনাজপুরের ক্লিষ্ট চাষীরা তাঁদের ঘরবাড়ি ও গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। তাঁরা সেই জেলা ছেড়ে চলে যাবার চেষ্টাও করেন, কিন্তু সশস্ত্র সৈনিকদের বড় বড় দল তাঁদের তাড়া করে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। অনেকে জঙ্গলে পালিয়ে যান এবং পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ক্রিয়, বিনীত ও

অনুগত এইসব চাষীরা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হন। বিদ্রোহী অভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়ে দিনাজপুর ও রংপুরে ; সৈন্যদের তলব করা হয়, আর তারপর চলে শাস্তি ও নির্মম জল্লাদবৃত্তি। ইংরেজ জেলা-প্রধান শ্রীগুডল্যাণ্ড এই অভ্যুত্থানের বর্ণনা করেছেন বাঙলাদেশের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে গুরুতর গোলযোগ বলে। আর যে নির্মম কঠোরতায় একে দমন করা হয়, বঙ্গদেশে তারও বোধহয় কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

বর্ধমানের কাহিনীটি এর চেয়ে কম মর্মান্তিক, কারণ অন্যায় অবিচারটা পড়েছিল আঞ্চলিক পরিবারটির উপরে, জনসাধারণের উপরে ততটা পড়েনি। মহারাজা তিলকচাঁদের মৃত্যু হয় ১৭৬৭ সালে এবং নাবালক পুত্র তেজচাঁদ উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃত হন। মৃত জমিদার পারিবারিক বন্ধু লালা উমিচাঁদকে এস্টেটের প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু বৃটিশ জেলা-প্রধান জন গ্রাহাম ব্রজকিশোর নামে এক অর্থগৃধ্নু ও ন্যায়নীতিহীন ব্যক্তিকে ম্যানেজার হিসেবে জোর করে রাণীর উপর চাপিয়ে দেন। একজন নারীর পক্ষে যতদূর সম্ভব রাণী ততদূর পর্যন্ত তার অসাধুতাকে থামাবার চেষ্টা করেন এবং এস্টেটের সীলমোহর তার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেন।

১৭৭৪ সালে, এক আবেদনপত্রে তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসকে লেখেন : "আমার পুত্রের সীলমোহর ছিল আমারই কাছে, এবং যেহেতু প্রথমে ভালোভাবে না দেখে কোনো কাগজেই এই সীলমোহর লাগাতাম না, সেইজন্য ব্রজ সকল উপায়ে সেটি হস্তগত করার চেষ্টা করে এবং আমি ক্রমাগত তাকে সেটি দিতে অস্বীকার করি। তাতে, বাংলা সন ১১৭৯ সালে (১৭৭২ খৃষ্টাব্দ) ব্রজকিশোর শ্রীগ্রাহামকে বর্ধমানে আসতে রাজী করিয়ে আমার কাছে থেকে আমার নয় বৎসর বয়স্ক পুত্র তেজচাঁদকে নিয়ে যায় এবং একজন প্রহরীর প্রহরাধীনে এক পৃথক স্থানে তাকে আটক করে রাখে। এই পরিস্থিতিতে, ক্লেশ ও আশঙ্কার মধ্য দিয়ে, আমার জীবনকে বিপন্ন করে সাত দিনেরও বেশি অভুক্ত অবস্থায় থাকার পর উপায়ান্তর না দেখে আমি সীলমোহরটি দিয়ে দিই।"[৪]

চিঠিতে আরো বলা হয় যে এস্টেটের সীলমোহর এইভাবে হস্তগত করে ব্রজকিশোর এস্টেটের সম্পদের অপচয় করে, বিরাট পরিমাণ অর্থ তছরূপ করে এবং কোনো হিসাব পেশ করতে অস্বীকার করে। পুত্রসহ রাণী প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে থাকেন এবং নিরাপদে বসবাসের জন্য কলকাতায় চলে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন।

গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য ক্লেভারিং, মনসন ও ফ্রান্সিস

ব্রজকিশোর ও জন গ্রাহামের বিরুদ্ধে তছরূপের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত দাবি করেন। ১৭৭৭ সালের ১১ জানুয়ারি তাঁরা লেখেন, "মিঃ গ্রাহাম ও বর্ধমানের দেওয়ানের বিরুদ্ধে মহিলার শিশুপুত্রের সম্পত্তি বলে কথিত এগারো লক্ষ টাকারও বেশি (১১০,০০০ পাউণ্ড) পরিমাণ অর্থ তছরূপ করার অভিযোগের সত্যাসত্য সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি না। তাঁর অভিযোগের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা সেই মহিলারই কাজ। প্রমাণ উপস্থাপিত করার আগেই কোনো লোকের, সম্মান বা নিরপরাধিতার বিরুদ্ধে অভিযোগকে মেনে নেবার মতো ন্যায়নীতিহীন আমরা নই ; রাণীর আবেদনপত্র আমাদের কাছ থেকে তা দাবিও করেনা। আবেদনপত্রের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হোক।"[৫]

অবশ্য কাউন্সিলে মতদ্বৈধের ফলে যথাযথ তদন্তের ব্যবস্থা বন্ধ হয় এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস জন গ্রাহামের পক্ষ সমর্থন করেন। ক্লেভারিং, মনসন ও ফ্রান্সিস লেখেন, "মিঃ গ্রাহাম যে নগণ্য উপহার পেয়েছেন বলে গভর্ণর জেনারেল বলছেন, তার দ্বারা তিনি যে অস্বাভাবিক বিত্তের অধিকারী হয়েছেন বলে জানা যায় সেটা কখনোই সৃষ্টি হতে পারে না।" হেষ্টিংস উত্তর দেন, "মিঃ গ্রাহামের বিত্ত সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণরূপে অনবহিত ; আমি জানি না কিসের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাকে অস্বাভাবিক বলে অভিহিত করছেন। আমার মনে হয়েছিল বর্ধমানের রাণীর দেওয়া মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্ত করে তাঁকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা আমার দায়িত্ব।"

এর পরে বর্ধমান এস্টেটের উপর বিরাট রাজস্ব ধার্য করা হয়। রেভিনিউ বোর্ডের দেওয়ান, গঙ্গাগোবিন্দ সিং বর্ধমান পরিবারের আদৌ মিত্র ছিলেন না। এবং তিনি ধার্য রাজস্ব নির্দিষ্ট করেন বঙ্গদেশের যেকোনো পুরনো জমিদারির চেয়ে উচ্চতর হারে। তারপর বহু দশক ধরে এর ফলে বর্ধমান কষ্টভোগ করে ; এবং সামন্ত প্রভুদের বংশধররা, যাঁরা কার্যত তাঁদের নিজেদের এস্টেটের মধ্যে প্রায় শাসকই ছিলেন এবং মারাঠা আক্রমণের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশের পুরনো নবাবদের সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা বঙ্গদেশের নতুন প্রভুদের অত্যধিক আর্থিক দাবি মিটাতে অপারগ হয়ে পড়লেন। এই বংশটি অবশ্য চরম ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় চিরস্থায়ী ইজারাদারদের এক নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টির ফলে। এরা জমিদারদের দায়দায়িত্বের ভাগ নিতেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বর্ধমান এস্টেট বঙ্গদেশের অন্য যে কোনো বড় এস্টেটের চেয়ে আনুপাতিক হারে বেশি আদায়ীকৃত খাজনা সরকারি রাজস্ব হিসেবে দিয়ে থাকে।

কিন্তু যে শ্রদ্ধেয়া নারীর দুর্ভাগ্যকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সবচেয়ে বেশি

সমবেদনার সঙ্গে বিচার করা হত এবং যাঁর নাম আজও বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রায় ধর্মীয় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন, তিনি হলেন রাজশাহীর রাণী ভবানী। তাঁর বিরাট এস্টেটের এলাকা লর্ড ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করার আগে কার্যত প্রায় সমগ্র উত্তর বঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। তিনি মুসলিম শক্তির বিরাটত্ব ও অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করেছেন, দেখেছেন বৃটিশ শক্তির উত্থান ও সম্প্রসারণ। তাঁর প্রতিভা ও যোগ্যতা প্রশাসন কার্যে হিন্দু রমণীর ক্ষমতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত রূপে ভাস্বর ছিল। তাঁর ধর্মপ্রাণ জীবন ও অসীম দানশীলতার ফলে তাঁর নাম বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে কীর্তিত হত। আজও হিন্দু বালক-বালিকারা তাঁর কাহিনী পাঠ করে ইতিহাস ও কল্পকাহিনীতে ভারতীয় নারীত্বের আদর্শস্বরূপিনী নয়জন নারীর অন্যতমা রূপে।

ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রবর্তিত নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা এবং ১৭৭২-এর পাঁচসালা বন্দোবস্ত বাঙলা দেশের অন্য যেকোনো এস্টেটের মতোই রাজশাহীকেও আঘাত করেছিল। গভর্ণর ও কাউন্সিল ৩১ ডিসেম্বর, ১৭৭৩ তারিখের চিঠিতে মন্তব্য করেন যে "রাজশাহীর জমিদার রাণী ভবানী তাঁর প্রদেয় অর্থের ব্যাপারে বহু বকেয়া ফেলেন।" এবং ১৫ মার্চ ১৭৭৪ তারিখে তাঁরা স্থির করেন যে "রাণীর কাছে এই ঘোষণা করা হবে যে, তাঁর কাছে বাঙলা মাঘ মাসের শেষ পর্যন্ত (১০ ফেব্রুয়ারী) প্রাপ্য রাজস্ব যদি তিনি ২০শে ফাল্গুনের মধ্যে (১ মার্চ) না দেন, তবে আমরা তাঁকে তাঁর জমিদারি থেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য হব এবং সরকারের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি পালনে যাঁরা অধিকতর সময়ানুবর্তী হবেন তাঁদের হাতে সেই জমিদারি তুলে দিতে বাধ্য হব।" ১৮ অক্টোবর, ১৭৭৪ তারিখের আরেকটি চিঠিতে গভর্ণর জেনারেল "তাঁকে তাঁর খামার ও জমিদারি উভয় থেকেই এবং সমস্ত ভূসম্পত্তি থেকে অধিকারচ্যুত করার এবং তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য জীবনকালে ৪০০০ টাকা (৪০০ পাউণ্ড) মাসিক পেনসন মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত করেন।"[৫]

এই অসম্মান ও লাঞ্ছনা এড়াবার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধা রাণী বহু আবেদনপত্র পেশ করেছিলেন; তার মধ্যে কয়েকটি অসাধারণ কৌতূহলোদ্দীপক। এর একটি আবেদনপত্রে তিনি ১৭৭২ সালের পাঁচ-সালা বন্দোবস্তের পর থেকে তাঁর মহালের ইতিহাস বর্ণনা করেন, দুলাল রায় নামে যে রাজস্ব-খামারীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল তার অত্যাচার এবং তার ফলে মানুষের দেশত্যাগের কথা বর্ণনা করেন।

"১১৭৯ সনে (১৭৭২ খৃষ্টাব্দ) সরকারের ইংরেজ ভদ্রমহোদয়গণ আমার

জমির সমস্ত পুরনো খাজনা একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন এবং 'জিলাদারি মাথোট' (প্রজাদের কাছ থেকে আদায়) ও অন্যান্য সাময়িক খাজনাকে চিরস্থায়ী করে দিয়েছিলেন ;···আমি একজন পুরনো জমিদার ; এবং আমার রায়তদের দুঃখকষ্ট দেখতে না-পেরে আমি রাজস্ব-খামারী হিসেবে গ্রামাঞ্চলটিকে হাতে নিতে সম্মত হই। আমি গ্রামাঞ্চলে শীঘ্রই পরীক্ষা করে দেখতে পাই যে সেখানে খাজনা দেবার মতো যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যাবে না।···

"ভাদ্রমাসে, অথবা আগষ্ট ১৭৭৩-এ নদীর তীর ভেঙে যায় এবং জলে ডুবে যাবার ফলে রায়তদের জমি ও তাদের ফসল নষ্ট হয়। আমি জমিদার, তাই আমি রায়তদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে বাধ্য হই এবং তাদের বকেয়া পরিশোধ করার মতো সময় দিয়ে আমার সাধ্যমত সুবিধা তাদের দিই ; এবং ভদ্রমহোদয়দের [ইংরেজ কর্তাব্যক্তিদের] অনুরোধ করি যে তাঁরাও অনুরূপভাবে আমাকে সময় দিন, আমিও আমার রাজস্ব তখন পরিশোধ করব ; কিন্তু আমাকে আমল না দিয়ে তাঁরা আমার বাড়ি থেকে রাজস্ব আদায়ের কাছারি তুলে মোতিঝিলে নিয়ে আসেন এবং আমার কাছ থেকে এবং আমার অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় করার জন্য দুলাল রায়কে কর্মচারী ও সাজাওয়াল রূপে নিযুক্ত করেন।

"তারপর আমার বাড়ি ঘিরে ফেলা হয়, এবং আমার সমস্ত সম্পত্তি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হয় ; চাষী ও জমিদার হিসেবে যা আমি আদায় করেছিলাম তা নিয়ে নেওয়া হয় ; যে অর্থ আমি ঋণ করেছিলাম এবং আমার মাসিক মাসোহারা সব নিয়ে নেওয়া হয়—সব মিলিয়ে মোট ২২, ৫৮, ৬৭৪ টাকা (২২৬,৯০০ পাউণ্ড)।

"নতুন বছর ১১৮১ সনে (১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ), ২২,২৭,৮২৪ টাকায় (২২৩,০০০ পাউণ্ড) জন্য আমার কাছ থেকে সমস্ত কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে আঞ্চলিক দুলাল রায়ের কাছে রাজস্ব আদায়ে দেওয়া হয়। তারপর দুলাল রায় এবং একটি নীচ প্রকৃতির লোক পরাণ বোস গ্রামের উপর আরো কর চাপিয়ে দেয়, যেমন আরেকটি জিলাদারী মাথোট (প্রজাদের কাছ থেকে জোর করে আদায়) ও অ্যাসে জাজাফ্ফর, জমি থেকে পালিয়ে যাওয়া চাষীর কাছে প্রাপ্তব্য অর্থের ক্ষতিপূরণ বর্তমান রায়তদের কাছ থেকে নেওয়া হয়ে থাকে এবং ইত্যাদি। এই লোক দুটি তাদের হুকুম জারী করেছে, এবং রায়তদের কাছ থেকে তাদের যথাসর্বস্ব নিয়েছে, বীজ ধান ও চাষের বলদ পর্যন্ত নিয়েছে এবং গ্রামকে গ্রাম জনশূন্য ও ধ্বংস করেছে। আমি একজন পুরনো জমিদার ; আমার ধারণা

আমি কোনো অপরাধ করিনি। দেশ আজ লুণ্ঠিত এবং রায়তদের প্রচুর অভিযোগ আছে।

"এই সমস্ত কারণে আমি এখন আমার আর্জি পেশ করছি ; যেহেতু এই বছর দুলাল রায়ের প্রদেয় রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২,২৭,৮১৭ টাকা (২২৩,০০০ পাউণ্ড), সেই জন্য আমি ঐ পরিমাণ রাজস্ব দিতে নিজেই প্রস্তুত, এবং সর্বপ্রযত্নে লক্ষ্য রাখব যাতে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত না হন এবং এই অর্থ প্রদান করা হয়।"[৬]

এই উদ্ধৃতিগুলি মূল্যবান কারণ বাঙলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে কী ঘটছিল এ থেকে আমরা তার আভাস পাই। পুরনো জমিদাররা যদি নীলামে যারা ডাক তুলছে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হতেন তবে যে-ভূসম্পত্তি তাঁদের পিতৃপুরুষ পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করছিলেন সেখান থেকে তাঁদের বিতাড়িত করা হত। যদি বর্ধিত রাজস্ব দিয়ে চাষী হিসেবে তাঁরা তাঁদের ভূসম্পত্তি রাখতেন এবং যথাসময়ে রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হতেন, তাহলে তাঁদের জমি-জোতের উপর জোর করে ম্যানেজারদের চাপিয়ে দেওয়া হত এবং তারা জমির চাষীদের উপর লুণ্ঠন চালাত, দুঃখদুর্দশা ডেকে আনত ও গ্রামকে জনশূন্য করে তুলত। অবশ্য, চরম বলপ্রয়োগ সত্ত্বেও ভূমিরাজস্ব ঠিকমত আদায় হল না, বঙ্গদেশের কর্ষিত জমির এক তৃতীয়াংশ জঙ্গলে ছেয়ে গেল।

রাণী ভবানীর পুত্র প্রাণকিশোর আরো কতকগুলি আবেদন পেশ করেছিলেন এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বহু আলোচনা হয়েছিল। ইওরোপীয় চাকুরেরা তাদের বানিয়ান বা ভারতীয় এজেণ্টদের নামে জমিদারীর মালিকানা রাখতেন ; ফিলিপ ফ্রান্সিস তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, "দেশটা হল দেশীয় লোকেদের। প্রাক্তন বিজেতারা জমি থেকে নজরানা আদায় করে সন্তুষ্ট থাকতেন।...প্রাচীন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের যতগুলি রদবদল আজ পর্যন্ত প্রবর্তিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিরই......এবং সে পরিণতি এতদূর মারাত্মক যে আমার মনে হয় এটাই হল সামূহিক অভিমত যে বঙ্গদেশের ও বিহারের জমির অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণ জনশূন্য অবস্থায় রয়েছে। নিরীহ হিন্দুরা অত্যাচারের কবল থেকে পালিয়ে যায়, অত্যাচারকে প্রতিরোধ করার দুঃসাহস তাদের নেই।"[৭]

অবশেষে কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ১৭৭৫ সালে প্রস্তাব করেন যে "রাজা দুলাল রায়কে রাজশাহী খামার থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং রাণীকে জমিদারীতে তাঁর জমির মালিকানায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে।" হেষ্টিংস

কখনোই এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করেননি ; তাঁর উত্তরসূরী লর্ড কর্ণওয়ালিসের মতো তিনি ,কখনোই বঙ্গদেশের পুরনো পুরুষানুক্রমিক পরিবারগুলির দাবিকে আমল দেননি ; তাঁর কঠোর ও সহানুভূতিহীন ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা নীলাম ক্রেতা ও জমিদারীর দখলদারদের উপর থেকে তাঁর সমর্থনও তিনি কখনো প্রত্যাহার করেননি। রাজশাহীর পুরনো জমিদারীগুলির বড় বড় টুকরো আলাদা করে ওয়ারেন হেষ্টিংসের বানিয়ান কান্ত বাবুর জন্য একটা সমৃদ্ধিশালী এস্টেট সৃষ্টি করা হল।

ভূমি-প্রশাসনের এক নিপীড়নমূলক ও চিরপরিবর্তনশীল ব্যবস্থার কুফলগুলি আরো গুরুতর হয়ে উঠল এই কারণে যে কার্যত প্রদেশের সমস্ত রাজস্বই বাইরে চলে যেতে লাগল এবং জনসাধারণের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিকে ফলপ্রসূ করার জন্য তা কোনো রূপেই তাদের কাছে ফিরে এল না।

"১৭৭০ সালের যে-দুর্ভিক্ষ বাঙলাদেশকে দৃষ্টান্তের অতীত এক ভয়াবহ রূপে নিঃস্ব করে দিয়েছিল, সেই দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও, পরপর অনেকগুলি সুবিধাজনক কৌশলের দ্বারা—সেই কৌশলের অনেকগুলিই ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রকৃতি ও প্রবণতাসম্পন্ন—কোম্পানির লগ্নিকে জোর করে বজায় রাখা হয়েছিল।··· আঞ্চলিক রাজস্ব থেকে, ইওরোপীয় পণ্য বিক্রয় থেকে, এবং একচেটিয়া গোষ্ঠী-গুলির উৎপাদিত পণ্য থেকে সংগৃহীত অর্থে বঙ্গদেশ থেকে কেনা পণ্যাদির মূল্য ··কখনোই দশ লক্ষ স্টার্লিংয়ের কম ছিল না, এবং প্রায়শই তা হত ১,২০০,০০০ পাউণ্ডের কাছাকাছি। এই দশ লক্ষই ছিল ইওরোপে প্রেরিত পণ্যাদির নিম্নতম মূল্য, যার জন্য কোনো প্রতিদান প্রাপ্তব্য ছিলনা। কোম্পানির হিসাবে বঙ্গদেশ থেকে বছরে প্রায় এক লক্ষ পাউণ্ড চীনে পাঠানো হয় এবং সেই অর্থে উৎপন্ন সমস্ত সামগ্রীই চীন থেকে ইওরোপের বাণিজ্যে চলে যায়। এছাড়াও, (ভারতের) যে সমস্ত প্রেসিডেন্সির নিজেদের দায় সামলাবার সামর্থ্য নেই, বঙ্গদেশ শান্তির সময় তাদেরও নিয়মিত সরবরাহ যোগায় ··

"এই আদানপ্রদানের যদি একটি হিসাব নেওয়া যায়,—আদানপ্রদান, কারণ বঙ্গদেশ ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যা চলে সেটা ঠিক বাণিজ্য নয়—তাহলে রাজস্ব থেকে লগ্নি প্রথার ক্ষতিকর ফলাফল জোরালোভাবে মতামতের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। সেই দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখলে দেখা যায়, কোম্পানি এব্যাপারে যতদূর সংশ্লিষ্ট সেক্ষেত্রে দেশের সমগ্র রপ্তানি-কৃত উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময় প্রসঙ্গে লেনদেন হয় না, বরং তা নিয়ে যাওয়া হয় কোনোরূপ প্রতিদান বা অর্থপ্রদান ব্যতিরেকেই···

কিন্তু এই নিঃস্থতি ও তার ফলাফলের বিরাটত্ব আরও দর্শনীয় হয়ে ওঠে যখন দেখি, এই কমিটি বঙ্গদেশে প্রাপ্ত রাজস্ব কোম্পানির নিজের লগ্নি হিসাবে ব্যবহার না করে, চীন ও ইউরোপে ব্যবহার করার জন্য বিবেচনা করেন। যে-অঙ্কটি অসামরিক বা সিভিল সরকারের ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য খরচ হয় তা থেকে দেশীয় লোকেদের প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বাদ দেওয়া হয়, এই অঙ্ক আসে রাজস্ব আদায়ের প্রধান অংশ থেকে। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তারা শুধু ইওরোপীয়দের নফর বা এজেন্ট হিসেবেই নিযুক্ত হয় অথবা যখন তাদের সাহায্য ছাড়া এক পা-ও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন তাদের নিযুক্ত করা হয় আদায়ের নিম্নতর বিভাগগুলিতে।"[৮]

আট বছরে বঙ্গদেশের জন্য আয়-ব্যয়ের পরবর্তী পৃষ্ঠার অঙ্কগুলি সরকারি দলিলপত্র থেকে গৃহীত।[৯]

এ-পর্যন্ত আমরা বঙ্গদেশের অবস্থা নিয়েই আলোচনা করেছি। যদি আমরা বঙ্গদেশের বাইরে যাই, ও অন্যান্য যেসমস্ত প্রদেশ ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রশাসন বা প্রভাবের আওতায় এসেছিল সেখানকার অবস্থা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে তাঁর ক্ষমতার প্রসারের প্রথম ফলগুলি আনন্দদায়ক ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারত যেসমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল তাদের মধ্যে, সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য অনুযায়ী, বারাণসী রাজ্যের চেয়ে বেশি উন্নত সমৃদ্ধিশালী আর কোন রাজ্যই ছিল না। সে দেশে জনসাধারণ ছিল কঠোর পরিশ্রমী, কৃষি ও শিল্প দ্রব্য উৎপাদনে ছিল উন্নত এবং ভারতের সমস্ত প্রান্তের সকল হিন্দুর নিকটে শ্রদ্ধেয় সেই পবিত্র নগরীটি ছিল রাজা বলবন্ত সিংয়ের রাজধানী।

বলবন্ত সিংহের মৃত্যু হয় ১৭৭০ সালে ; এবং তাঁর সামন্ত প্রভু, উজির নামে পরিচিত অযোধ্যার রাজা উত্তরাধিকার মূল্য গ্রহণ ক'রে এবং পূর্বে প্রদত্ত রাজস্বের সামান্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে তাঁর পুত্র চৈৎ সিংকে উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি দেন। এই উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আগ্রহ দেখায় এবং ডিরেক্টরদের কাছে লিখিত ৩১ অক্টোবর ১৭৭০ তারিখের চিঠিতে বঙ্গদেশের গভর্ণর লেখেন যে "আমাদের এই সুপারিশ ও অনুরোধ রক্ষা করার ব্যাপারে উজিরের তৎপরতা আমাদের বিরাট সন্তুষ্টিবিধান করেছে, এবং এই ঘটনাটি অত্যন্ত আনন্দদায়ক, কারণ এটা তাঁর ও ইংরেজদের মধ্যে বিদ্যমান দৃঢ় মৈত্রী সম্পর্কে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শক্তির মতামতকে শক্তি যোগাবে।[১০]

অযোধ্যার রাজা সুজাউদ্দৌলা মারা যান ১৭৭৫ সালে এবং গভর্ণর জেনারেল

বছর	ভূমি রাজস্ব	মোট রাজস্ব	বেসামরিক খাতে ব্যয়	সামরিক খাতে ব্যয়	মোট ব্যয়
মে থেকে এপ্রিল	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
১৭৭১ „ ১৭৭২	২, ৩৪১, ৯৪১	৩, ২৫৯, ৫৬৪	২০৬, ৭৮১	১, ১৬৪, ৩৪৮	২, ৮৮৪, ১৯২
১৭৭২ „ ১৭৭৩	২, ২৯৮, ৪৪১	২, ৮৬৬, ৯৬৮	২৩৪, ০৫১	১, ২৮৮, ৬৬৭	২, ৮২৭, ১৪১
১৭৭৩ „ ১৭৭৪	২, ৪২৮, ৪০৫	৩, ১৬০, ১৮৬	২১৩, ২৩৭	১, ৩০৪, ৮৮৩	২, ৭২৭, ৯৭৫
১৭৭৪ „ ১৭৭৫	২, ৭৭৭, ৮৭০	৩, ৫৬৪, ৯১৫	২৬৮, ২৩২	১, ০৮০, ৩০৪	৩, ৩০০, ১২৪
১৭৭৫ „ ১৭৭৬	২, ৮১৮, ০৭১	৪, ১৯৮, ০১৭	৩৩৫, ৯৬৮	১, ০৫১, ৯৬৯	৩, ৪৩৮, ৪৮০
১৭৭৬ „ ১৭৭৭	২, ৭৫৫, ০৪৩	৩, ৯৭১, ৪৪০	৩২৫, ১৯২	৯৪২, ১৯৯	৩, ৪২৪, ৪০১
১৭৭৭ „ ১৭৭৮	২, ৫৩০, ০৪২	৩, ৬৮৮, ০১৮	৪৭৭, ২৯৩	১, ১৮৪, ৭০৮	৩, ৩৫৩, ০২৯
১৭৭৮ „ ১৭৭৯	২. ৬৫৬, ৮০৯	৩, ৭৮২, ৬১০	৫৫৩, ৮১০	১, ৮৪৬, ২৩৭	৪, ৯৭২, ৫৯০

ওয়ারেন হেস্টিংস বৃটিশ এলাকা ও ক্ষমতাকে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে বৃটিশের পুরনো মিত্রের মৃত্যুর সুযোগ গ্রহণ করলেন। মে, ১৭৭৫-এ তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী আসফউদ্দৌলার সঙ্গে এক নতুন চুক্তি চূড়ান্তভাবে সম্পাদিত হয়, যে-চুক্তিবলে বারাণসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে সমর্পণ করা হয় এবং রাজা চৈৎ সিং ব্রিটিশের একজন সামন্তে পরিণত হন।

আগস্ট ১৭৭৫-এ গভর্ণর জেনারেল ডিরেক্টরদের কাছে লেখেন, "বারাণসী এবং চৈৎ সিংয়ের অন্যান্য অঞ্চল কোম্পানির হাতে সমর্পণের কাজটি আপনাদের চিন্তার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মানানসই হবে, কারণ এর অর্থ হল কোম্পানির এক মূল্যবান প্রাপ্তি।...এখান থেকে আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ ২৩,৭২,৬৫৬ টাকা (২৩৭,০০০ পাউণ্ড) এবং রাজা এই অর্থ কর হিসেবে প্রদান করেন মাসিক কিস্তিতে, তাঁর আদায়ের কোনোরূপ হিসাব পেশ করা ছাড়াই অথবা কর আদায়ের জন্য খরচ খরচার ছাড় পাবার কোনো দাবি পেশ করার অধিকার ছাড়াই।"[১১]

এর তিন বছর পরে হতভাগ্য চৈৎ সিং তাঁর প্রভু পরিবর্তনের সম্পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি করেন। জুলাই ১৭৭৮-এ ওয়ারেন হেস্টিংস চৈৎ সিংকে লেখেন, "গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের রাজসভার মধ্যে গত ১৮ই মার্চ পূর্বোক্ত দরবার-কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ায়...আমি নিজের নামে ও বোর্ডের নামে, প্রত্যেক অবকাশে কোম্পানির স্বার্থের সেবা করতে বাধ্য! কোম্পানির একজন প্রজা হিসাবে আপনাকে বর্তমান যুদ্ধের আপনার অংশের দায়টি বহন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।"[১২]

একজন সৎ ইংরেজের প্রতি ন্যায়বিচার ক'রে একথাও বলা দরকার যে ফিলিপ ফ্রান্সিস ওয়ারেন হেস্টিংসের এই দাবিদাওয়া ও জোর করে আদায়ের বিরোধিতা করার চেষ্টা করেছিলেন। বারাণসী রাজ্যকে বৃটিশ প্রভুত্বাধীনে আনার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন অগ্রণী, কিন্তু যে-রাজা এখন কোম্পানির এক জন সামন্ত তাঁর উপরে এক তরফা দাবির বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন।

"এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে রাজাকে এই সরকারের ক্ষমতার কাছে নতিস্বীকার করতেই হবে, এবং যতদিন পর্যন্ত এই ক্ষমতা ন্যায়বিচারের দ্বারা চালিত হবে ততদিন আমি বোর্ডের যেকোনো সদস্যের মতোই তার প্রভুত্বকে সমর্থন করতে প্রস্তুত থাকব। আমি প্রথম থেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছি, আমরা যে-সমস্ত শর্ত মূলত রাজাকে দিতে সম্মত হয়েছিলাম, যে-শর্ত তিনি মেনে নিয়েছিলেন এবং আমি যেভাবে ক্রমাগত বুঝে এসেছি, যে-শর্তকে

তাঁর জমিদারীর মৌলিক স্বত্ব করা হয়েছিল তার বাইরে রাজার উপর আমাদের দাবি বাড়িয়ে দেবার কোনো অধিকার আমাদের আছে কি না। ঊর্ধ্বতন শক্তির বিবেচনা অনুযায়ী যদি এরূপ দাবি বাড়ানো যায়, তবে তাঁর কোনো অধিকারই নেই, কোনো সম্পত্তি নেই এবং কোনটিরই জন্য অন্তত কোনো নিরাপত্তাও নেই। পাঁচ লাখের পরিবর্তে আমাদের দাবি ৫০ লক্ষ করা যেতে পারে, কিংবা তিনি যদি অর্থ প্রদান করতে অসম্মত হন অথবা অক্ষম হন তাহলে তার আশু পরিণতি হতে পারে তাঁর জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা।"১৩

এই সমস্ত প্রতিবাদ ব্যর্থ হল। চৈৎ সিংয়ের কাছে দাবি করা হল দ্বিতীয় বছরের প্রদেয় অর্থস্বরূপ পাঁচ লক্ষ টাকা (৫০,০০০ পাউণ্ড), তারপর তৃতীয় বছরের প্রদেয় পাঁচ লক্ষ টাকা এবং তারও পর চতুর্থ বছরের জন্যও – এছাড়া সৈন্যবাবদ ব্যয় তো ছিলই। অর্থপ্রদানের ব্যর্থতার জন্য তিনি ভর্ৎসিত হন, তারপর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়; এবং তাঁর প্রজারা যখন কোম্পানির রক্ষীদের আক্রমণ করল, তাঁর ভাগ্যে অনিবার্য দুর্দশা ঘনিয়ে এল। তিনি তাঁর জমিদারী ছেড়ে পালালেন; তাঁর ভাগিনেয় মহীপ নারায়ণকে তাঁর জায়গায় বসানো হল, সেই সঙ্গে রাজস্বের দাবিও অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়া হল; এবং প্রশাসন-কার্য নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল গভর্ণর জেনারেলের নিজস্ব এজেন্টদের দ্বারা।

শাসনকার্য শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল—যে বলবন্ত সিং ও চৈৎ সিংয়ের অধীনে বারাণসী সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল, ওয়ারেন হেষ্টিংস যে তাঁদের চেয়ে কম যোগ্য প্রশাসক ছিলেন, সে জন্যে নয়…হয়েছিল এই কারণে যে নতুন শাসনব্যবস্থার অধীনে বর্ধিত রাজস্বের চাপ রাজ্যের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে পিষে ফেলেছিল।

রাজার জন্য হেষ্টিংস প্রথম যে প্রতিনিধিকে নিযুক্ত করেছিলেন, যথাসময়ে অর্থপ্রদান না করার অপরাধে তাঁকে বরখাস্ত করা হল। দ্বিতীয়জন তদনুযায়ী কাজ করলেন এই "প্রতিশ্রুতি নীতি অনুযায়ী যে রাজস্বরূপে নির্ধারিত অর্থ সংগ্রহ করতেই হবে।" জমির কর আরোপ মূল্য বেশী করে ধার্য হল, চরম কঠোরতার সঙ্গে অর্থ আদায় করা হল, জনসমষ্টি দুর্দশায় নিমজ্জিত হল এবং ১৭৮৪ সালে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে দেশ জনশূন্য হল।

হেষ্টিংস নিজে এই দুর্ভিক্ষের ও জনশূন্যতার ফলাফল প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ২ এপ্রিল ১৭৮৪ সালে তিনি কাউন্সিল বোর্ডের কাছে লিখেছিলেন, "বক্সারের সীমানা থেকে বারাণসী পর্যন্ত আমাকে অনুসরণ করেছে, ক্লান্ত করেছে অসন্তুষ্ট

অধিবাসীদের দাবি দাওয়ার আবেদনপূর্ণ কলরব। দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টির ফলে যে দুঃখ দুর্দশা দেখা দিয়েছিল তা অনিবার্য ভাবেই সাধারণ অসন্তোষের ভাবকে বাড়িয়ে তুলছিল। তবু আমার এমন আশঙ্কার কারণ আছে যে কারণটা ছিল প্রধানত একটা ত্রুটিপূর্ণ, দুর্নীতিগ্রস্ত ও অত্যাচারী তো বটেই, এমন প্রশাসনের মধ্যে। আমি দুঃখের সঙ্গে আরও বলতে চাই যে বক্সার থেকে বিপরীত দিকের সামানা পর্যন্ত প্রতিটি গ্রামে সম্পূর্ণ ধ্বংসের চিহ্ন ছাড়া আর কিছু আমি দেখিনি। এই মন্তব্য না করে আমি পারছি না যে বারাণসী শহরটি ছাড়া, প্রদেশে কার্যত কোনো সরকার নেই। প্রদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা কুপরিচালিত এবং জনসাধারণ অত্যাচারিত, বাণিজ্যে উৎসাহ দেওয়া হয় না এবং প্রত্যক্ষত উপকরণসমূহ আত্মসাৎ করার ফলে রাজস্বের দ্রুত হ্রাস পাবার বিপদ রয়ে গেছে।"[১৪]

অযোধ্যার কর্তৃত্ব থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্বাধীনে যাবার নয় বছর পরে এই ছিল বারাণসীর অবস্থা। আমরা এবারে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে অযোধ্যার অবস্থা পর্যালোচনা করব।

আগেই বলা হয়েছে, ব্রিটিশের মিত্র সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হয় ১৭৭৫ সালে। তাঁর শত্রুদের প্রতি তিনি ছিলেন নির্মম ও কঠোর, কিন্তু তাঁর রাজত্বের জনসমষ্টিকে তিনি সন্তুষ্ট, সমৃদ্ধ ও সুখী রেখেছিলেন; এবং তাঁর শাসনকালের শেষ বছরগুলিতে যে সমস্ত ইংরেজ অফিসার অযোধ্যায় গেছেন তাঁরা সেই দেশের ও সেখানকার জনসাধারণের সমৃদ্ধিশালী অবস্থার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

আসফউদ্দৌলা যখন তাঁর পিতার মসনদে অধিষ্ঠিত হন, তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতাকে অযোধ্যায় প্রসারিত করেন। সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সম্পাদিত পুরনো চুক্তিটি সংশোধন করা হয় এবং আসফউদ্দৌলার সঙ্গে এক নতুন চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী "শেষোক্তজন ক্রমে ক্রমে এবং আবশ্যিক ভাবেই কোম্পানীর একজন সামন্তে পরিণত হন।[১৫]

এই সামন্তগিরিই অযোধ্যার সর্বনাশের কারণ হয়েছিল। হেষ্টিংস কর্তৃক একটি ফৌজী বাহিনীর অধিনায়কত্বের জন্য অযোধ্যায় প্রেরিত কর্নেল হ্যানি তখনকার দিনে তাঁর স্বদেশবাসীর অনেকের মতোই পদাধিকারগত সুযোগের সদ্ব্যবহার করা এবং তাঁর এই নতুন অবস্থান কেন্দ্রে দ্রুত কপাল ফিরিয়ে নেবার বাসনা পোষণ করতেন। ভূমিরাজস্বের স্বত্বনিয়োগ করার যে ব্যবস্থা মাদ্রাজে ও অন্যত্র মারাত্মক হয়েছিল, সেটা অযোধ্যাতে অনুসরণ করা হল। কর্নেল হ্যানি অযোধ্যায় বেসামরিক ও সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন

এবং বাহরাইচ ও গোরখপুরের রাজস্বের ইজারাদার হয়ে উঠলেন, খাজনা বাড়ানো হল; সর্বপ্রকার নিষ্ঠুরতা ও বলপ্রয়োগের দ্বারা খাজনা আদায় করা হতে লাগল; জনসাধারণ তাদের ক্ষেত ও গ্রাম ছেড়ে পালালো; দেশ জনশূন্য হল।

আসফউদ্দৌলা নিজেই নিজের যে সর্বনাশ ডেকে এনেছেন তা দেখলেন। ১৭৭৯ সালে তিনি বৃটিশ সরকারকে লিখলেন: "ব্যয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রাজস্বের ইজারা দেওয়া হয়েছে উচ্চ হারে এবং বছর-বছর ঘাটতি হয়েছে। গ্রামদেশ ও চাষবাস পরিত্যক্ত হয়েছে।"[১৫] তদনুযায়ী নবাব নতুন ফৌজী বাহিনীর জন্য নতুন স্বত্ব নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন; ঘোষণা করেন যে ফৌজ তাঁর কোনো কাজে আসে না এবং তাঁরই রাজস্ব অনাদায় ও তাঁর সরকারের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলার কারণ।

ক্যালকাটা কাউন্সিল এই গুরুত্বপূর্ণ পত্রটি সম্পর্কে আলোচনা করেন। ফিলিপ ফ্রান্সিস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ন্যায়বিচার বোধ নিয়ে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বক্তব্য নথিবদ্ধ করেন।

"যারা তাঁর দেশকে রক্ষা করার নামে তাঁর রাজস্ব ও দেশকে গ্রাস করেছে বলে ইতিমধ্যেই কুখ্যাত, সেই রকম একটা বিদেশী সেনাবাহিনীকে ভরণপোষণ করার বোঝা থেকে অব্যাহতি লাভের যে দাবি একজন স্বাধীন নৃপতি করেছেন তার মধ্যে আপত্তিকর অথবা ভয়ানক কিছু দেখার মতো এ রাজ্যে দীর্ঘ অবস্থানের অভিজ্ঞতায় আমার নেই।

"কোর্ট অব ডিরেক্টরস তাঁদের ১৫ ডিসেম্বর, ১৭৭৫ তারিখের চিঠিতে সুবা অযোধ্যার কাজে একটি সৈন্যবাহিনী রাখার কথা অনুমোদন করেছেন **এই শর্তে যে সেটা করা হবে সেই সুবার অবাধ সম্মতি অনুযায়ী, সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো মতেই নয়।**

"সেনাবাহিনীর এই অংশ সম্পর্কে অবশ্য বর্তমানে কোনো বিবাদ নেই কারণ তাকে ফিরিয়ে নেওয়া হোক এটা উজির চান না; তাঁর দাবিটা শুধুমাত্র মেজর হ্যানি ও ক্যাপ্টেন অসবোর্ণের অধীনস্থ অস্থায়ী ব্রিগেড ও স্বতন্ত্র বাহিনী-গুলি সম্পর্কেই; তিনি বলেছেন প্রথমটি শুধু যে তাঁর সরকারের কোনো কাজেই আসে না তাই নয়, অধিকন্তু এটি রাজস্ব ও শুল্ক উভয় ক্ষেত্রেই প্রচুর ক্ষতির কারণ হয়; শেষোক্তটি তাঁর সরকারের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছু আনে না। এবং তারা নিজেরাই নিজেদের কর্তা···

"প্রস্তাবে শুধু ঐ সমস্ত ফৌজকে তাঁরই প্রদত্ত বেতনে রাখবার জন্য আমাদের

পক্ষ থেকে তাঁকে বাধ্য করার প্রয়োজনীয়তাই অনুমান করা হয় নি, একথাও অনুমান করা হয়েছে যে তাদের বেতন মেটাবার জন্য রাজস্ব আদায়কারী হতে হবে আমাদের নিজেদেরই ; এখন যে ভাবে কাজকর্ম করা হচ্ছে, সেদিক থেকে সেটা হবে তাঁর দেশকে সামরিক কর্তৃত্বাধীন রাখার সমতুল। এইভাবে একটা প্রয়োজন সৃষ্টি করে আরেকটা প্রয়োজনের, এবং তা চলতে থাকবে ততদিন যতদিন ভারতীয় রাজ্যগুলির হাতে আমাদের প্রলুব্ধ করার মতো অথবা আমাদের উচ্চাশা পরিতৃপ্ত করার মতো কিছু থাকবে, কিংবা যতদিন আমরা অভিজ্ঞতার দ্বারা এই শিক্ষা লাভ না-করি যে অপরের প্রতি ন্যায়বিচার করার মধ্যে কিছুটা আত্মস্থ হবার কাণ্ডজ্ঞান আছে।"[১৬]

ওয়ারেন হেষ্টিংসের চোখে সেনাবাহিনী অপসারণ করার ফলে কোম্পানির যে আর্থিক ক্ষতি হবে, তার ওজন ছিল অযোধ্যার জনসাধারণের উপরে চাপানো দুঃখদুর্দশার চাইতে বেশি। তিনি বলেন, নবাব কোম্পানির সামন্ত এবং এই ফৌজকে "তাদের ব্যয়ের বাড়তি বোঝা কোম্পানির উপরে না-চাপিয়ে অপসারিত করা যাবে না।" ভারতের ইতিহাস লেখক জেমস মিল লিখেছেন, "সুতরাং কেবলমাত্র বিরাট সুবিধালাভের উদ্দেশ্যেই, কোন প্রকার অধিকার ব্যতীতই ইংরেজগণ নবাব উজিরকে তাঁদের সৈন্যবাহিনী পোষণের জন্য ব্যয় বহন করতে বাধ্য করেন, হেষ্টিংসের উক্তিমতো তাঁকে করদ সামন্তের মতো ব্যবহার করা হয় এবং ইংরেজগণ সার্বভৌম রাজার মতো তাঁর উপরে ও তাঁর রাজ্যের উপরে অধিকারবিস্তার করতে শুরু করলেন।"[১৭]

১৭৮০ সালে বৃটিশ সরকারের দাবি ছিল ১,৪০০,০০০। পাউণ্ড গভর্ণর জেনারেল কিভাবে ব্রিসটোকে লখনো থেকে ফিরিয়ে এনে মিডলটনকে রেসিডেণ্ট করে পাঠিয়েছিলেন ; কোম্পানির সরকারের দাবি মেটাবার জন্য নবাবকে কিভাবে তাঁর মাতা ও পিতামহী—অযোধ্যার বেগমদের সর্বস্ব কেড়ে নিতে সাহায্য করা হয়েছিল ; এবং কিভাবে সর্বপ্রকার অত্যাচার ও অশালীনতার আশ্রয় নিয়ে তাঁদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছিল, তা ইতিহাসের বিষয়, এখানে তা বিবৃত করার প্রয়োজন নেই। রাজপ্রাসাদের অন্যায়-অবিচার সম্পর্কে নাটকীয় কাহিনীর চাইতে বর্তমান রচনার পক্ষে অযোধ্যার চাষীদের অবস্থা পর্যালোচনা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিখ্যাত মামলায় দারিদ্র্যপ্রপীড়িত প্রজাবর্গের কাছ থেকে খাজনা আদায় সম্পর্কে যে-সমস্ত তথ্য, জবানবন্দীতে প্রকাশ পেয়েছিল সেগুলিই যথেষ্ট বেদনাদায়ক। বলা হয়েছিল যে যথাসময়ে

খাজনা পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিদের অনাবৃত খাঁচায় আটক রাখা হয়েছে, এবং তার জবাবে বলা হয়েছিল যে ভারতীয় রৌদ্রের মধ্যে এ-ধরনের খাঁচায় আটক রাখাটা কোনো অত্যাচারই নয়। বলা হয়েছিল যে পিতারা তাদের সন্তানদের বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে; তার উত্তরে বলা হয় যে এরূপ অস্বাভাবিক বিক্রির বিরুদ্ধে কর্ণেল হ্যানি হুকুম জারী করেছিলেন। অসংখ্য মানুষ তাদের গ্রাম ত্যাগ করে এবং দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং তাদের পলায়ন বন্ধ করার জন্য ফৌজ মোতায়েন করা হয়। অবশেষে এক বিরাট বিদ্রোহ দেখা দেয়; ভূস্বামী ও কর্ষকেরা অসহ্য জবরদস্তি আদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন; তারপর আসে সেই বীভৎস ভয়াবহতা ও জল্লাদবৃত্তি যার সাহায্যে ক্রোধোন্মত্ত সৈন্যরা সামরিক বিদ্যায় অশিক্ষিত চাষীদের দমন করে।

কর্ণেল হ্যানিকে তখন অযোধ্যা থেকে ফিরিয়ে আনা হয়, বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। কিন্তু অযোধ্যা জনশূন্য হয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস অযোধ্যায় যান ১৭৭৪ ও ১৭৮৩ সালে। প্রথম বার তিনি দেশটিকে শিল্প পণ্য উৎপাদনে, কৃষিকর্মে ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালী দেখেছিলেন। শেষবার তিনি দেশটিকে দেখেন "পরিত্যক্ত ও জনশূন্য।" মিঃ হোল্টও বলেছেন যে পূর্বতন অবস্থা থেকে অযোধ্যার পতন ঘটেছে, এক একটি গোটা শহর ও গ্রাম পরিত্যক্ত, দেশে দুর্ভিক্ষের চিহ্ন। ১৭৮৪ সালে প্রদেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ সত্যই দেখা দিয়েছিল এবং কুশাসন ও যুদ্ধের ভয়াবহতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অনাহারের ভয়াবহতা।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিষ্ঠুর জবরদস্তি আদায়, তাদের রাজত্বের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত প্রতিটি অঞ্চলের জনগণের উপর চাপানো দুঃখদুর্দশা এবং ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্টের যথাযথ কোনো সংস্কার সাধনে ব্যর্থতা বৃটিশ পার্লামেন্টের কাছে প্রকাশিত হয় কমিটি অব সিক্রেসির ছয়টি রিপোর্টে এবং ১৭৮২ ও ১৭৮৩ সালে প্রকাশিত সিলেক্ট কমিটির এগারোটি রিপোর্টে। প্রশাসন ব্যবস্থায় সংস্কারের জন্য উচ্চকণ্ঠে দাবি ওঠে। এডমণ্ড বার্ক-সমর্থিত ফক্সের ইণ্ডিয়া বিল পার্লামেণ্টে বাতিল হয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত, ভারতের উন্নততর শাসনের জন্য মিঃ পিটের বিলটি পাস হয়ে ১৭৮৪ সালে আইনে পরিণত হয় এবং এই সর্বপ্রথম কোম্পানির প্রশাসনব্যবস্থাকে বৃটিশ রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়। কোম্পানির সমস্ত অসামরিক, সামরিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়কে রাখা হয় বৃটিশ রাজশক্তি কর্তৃক নিযুক্ত ছ-জন কমিশনারের তত্ত্বাবধানে। পরের বছর ওয়ারেন হেষ্টিংস স্বপদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ভারতের গভর্ণর

জেনারেল করে পাঠানো হয় লর্ড কর্ণওয়ালিসকে। ইনি ছিলেন উচ্চ চরিত্রগুণের অধিকারী ও উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রশাসনব্যবস্থার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে আমরা আমাদের মনোযোগকে সীমাবদ্ধ রেখেছি জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে, এবং সমস্ত নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের সঙ্গে আমরাও সখেদে বলি যে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে, তাঁর প্রশাসন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। অবশ্য ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রতি সুবিচার করে, ১৭৮৯ সালে পরবর্তীকালের লর্ড টেইনমাউথ মিঃ শোর তাঁর পক্ষ সমর্থনে যে-কথা যোগ্যতাসহকারেই বলেছিলেন, তাও উদ্ধৃত করা দরকার :

"কোম্পানি প্রদেশগুলির কোনো একটা উল্লেখযোগ্য অংশের রাজস্বের উপর প্রথম অধিকার লাভ করার পর আঠাশ বছর কেটে গেছে, এবং দেওয়ানি মঞ্জুর করার ফলে চিরকালের জন্য সমগ্র অংশের হস্তান্তর নিয়মমাফিক হবার পর মাত্র চব্বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা যখন এই প্রাপ্তির চরিত্র ও বিরাটত্ব, আমাদের রাজত্বের অধীনে জনসাধারণের চরিত্র, তাদের ভাষাগত পার্থক্য ও রীতিনীতির বৈষম্য বিবেচনা করি, যখন বিবেচনা করে দেখি যে আমরা সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থা আরম্ভ করেছিলাম তার প্রাক্তন সংবিধান সম্পর্কে অজ্ঞ অবস্থায় এবং এশিয়ার রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়াই, তখন এটা বিস্ময়কর কিছু মনে হয় না যে আমরা ভুল করে থাকতে পারি অথবা যদি ভুল হয়েই থাকে তবে এখন তার সংশোধন প্রয়োজন।"[২০]

এই মন্তব্যের মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে; তবু সম্ভবত সমকালের অন্য যে কোনো ইংরেজের ক্ষেত্রে একথাগুলি যতখানি প্রযোজ্য, ওয়ারেন হেষ্টিংসের ক্ষেত্রে ততখানি নয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারতে সদ্য আসা আগন্তুক ছিলেন না। তিনি জনসাধারণের সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন না। তিনি ভারতে এসেছিলেন প্রায় বালকাবস্থায়। প্রথম জীবন তিনি অতি সাধারণ পদেই কাটিয়েছিলেন, জনগণের সঙ্গে মেলামেশা করেছিলেন, তাদের চরিত্র মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, বুঝেছেন। ভারত থেকে অবসর গ্রহণের আঠাশ বছর পরে তিনি বৃটিশ পার্লামেণ্টের সামনে বলেছিলেন : "আমি যে শপথ গ্রহণ করেছি তদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে তাদের সম্পর্কে এই বর্ণনা [যে ভারতের জনসাধারণ ছিলেন এক নৈতিক নীচতার অবস্থায়] অসত্য ও সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন।...তারা ভদ্র, সদাশয়, তাদের প্রতি অন্যায়ের প্রতি-

হিংসাকৃত-প্রবণতার চেয়ে তাদের প্রতি প্রদর্শিত সহৃদয়তার জন্য কৃতজ্ঞ হবার দিকেই প্রবণতা তাদের বেশি এবং পৃথিবীর বুকে যে কোনো জাতির মতোই মানবিক আবেগানুভূতির নিকৃষ্টতম উপাদানগুলি থেকে তারা মুক্ত।”[২১] যে মানুষদের হেষ্টিংস চিনতেন তারা ছিল এই রকম,—অনুপস্থিতিহেতু স্বল্পকালীন বিরতি সহ—১৭৫০ থেকে ১৭৮৫—তাঁর জীবনের এই পঁয়ত্রিশটি বছর ধরে এদেরই মধ্যে তিনি কাজ করেছেন।

জনসাধারণের প্রতি ওয়ারেন হেষ্টিংসের এই মনোভাব যে একেবারে অসত্য নয় সেটা ভারতে তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে বোঝা যায়। যে সময়ে কোম্পানির চাকুরেরা বঙ্গদেশের মানুষের স্থল বাণিজ্য কেড়ে নিয়ে আকস্মিক-ভাবে বিরাট ধনসম্পত্তি লাভ করার কাজে প্রবৃত্ত ছিল তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁর স্বদেশবাসীর অত্যাচারের বিরোধিতায় তাঁর নেতা ভ্যানসিট্টার্টের পাশে একাই এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং এমন কি ১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ পর্যন্ত--তাঁর ১৩ বছরের শাসনকালে তিনি চেষ্টা করেছিলেন বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে একটা শৃঙ্খলা নিয়ে আসতে; হিন্দু ও মুসলমানদের আইন-কানুন তিনি সংকলন ও প্রকাশ করেছিলেন। সেই আইনগুলিকে প্রয়োগ করার জন্য তিনি আদালত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; তিনি একটা প্রশাসনব্যবস্থাকে রূপ দিয়েছিলেন, পরে তার উন্নতিবিধান করা হলেও তিনিই ছিলেন এর প্রথম মহাস্থপতি।

এরূপ সংগঠন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং দেশ ও তার মানুষ সম্পর্কে জ্ঞানসমৃদ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে স্বভাবতই উচ্চস্তরের প্রশাসনিক সাফল্য প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু একটি সরকারের সাফল্যকে যদি জনসাধারণকে তা কতটা সুখ দিয়েছে তা দিয়ে বিচার করা হয় তাহলে বলতেই হবে হেষ্টিংসের শাসন ছিল ভয়াবহরূপে ব্যর্থ। বৃটিশ ক্ষমতা ও প্রভাবের প্রসার জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিবিধান করেনি বরং বঙ্গদেশে, বারাণসী এবং অযোধ্যায় তা রেখে গেছে দুঃখ, বিদ্রোহ ও দুর্ভিক্ষের পদচিহ্ন।

এক শতাব্দী পর এই ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে ঠাণ্ডা মাথায় অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। হেষ্টিংস তাঁর সময়কার অন্যান্য সমস্ত ইংরেজের মতোই এই দৃঢ়মূল বিশ্বাস পোষণ করতেন যে ভারত হল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের মুনাফার জন্য একটা বিরাট ভূসম্পত্তি বিশেষ এবং ভারতকে সেই অর্থপ্রদানের জন্য তিনি তাঁর সবল মনের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। জনসাধারণের কল্যাণকে কোম্পানির প্রশাসনের পরে স্থান দেওয়া হয়; রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণের অধিকার, জমিদার ও রায়তদের অধিকারকে বলি

দেওয়া হয়েছিল ভারতের বানিয়া শাসকদের এই প্রধান চিন্তার কাছে। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ বঙ্গদেশের জনসমষ্টির এক-তৃতীয়াংশকে গ্রাস করার পরেও ভূমিরাজস্ব বাড়ানো হয়েছিল; যে সমস্ত ভূম্যধিকারী পরিবার শত শত বছর ধরে তাঁদের ভূসম্পত্তির মালিক তাঁদেরও মহাজন ও ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে নিলাম ডাকতে বাধ্য করা হয়েছিল বার্ষিক ইজারাদারদের মতো; নিজেদের বাসগৃহ ও গ্রাম থেকে পলায়মান চাষী বা বিদ্রোহী চাষীদের সৈনিকরা নির্মম কঠোরতার সঙ্গে ফিরিয়ে আনত তাদের বাসস্থানে; এইভাবে সংগৃহীত অর্থের একটা বড় অংশ প্রতিবছর পাঠানো হত ইংলণ্ডে শেয়ার হোল্ডারদের লাভ চরিতার্থ করে লগ্নী হিসেবে। প্রশাসক যতই প্রতিভাবান হোন না কেন, প্রশাসন যতই ত্রুটিহীন হোক না কেন, যখন তাদের সমগ্র রাজস্ব-রীতিনীতির লক্ষ্য ছিল এক দেশের সম্পদকে অন্য এক দেশের বণিকদের জন্য বার করে নিয়ে যাওয়া, তখন কারো পক্ষেই জাতীয় দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ রোধ করা সম্ভব ছিল না।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রশাসনের ব্যর্থতার এই ছিল প্রধান কারণ; এবং তাঁর রুক্ষ, স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থাসমূহ গলদগুলিকে বাড়িয়ে তুলেছিল। বড় বড় শাসকদের কাজকর্ম সম্পর্কে একটি রায় আছে যা ঐতিহাসিকদের রায়ের চেয়ে বেশি সত্য, বেশি স্থায়ী; সেটি হল জনসাধারণের রায়। ভারতের জনসাধারণ হেষ্টিংসের প্রশাসনের দিকে ফিরে তাকান বেদনা ও আতঙ্ক নিয়ে, সেই শাসন দেশকে নিঃস্ব করেছিল; আর তাঁর উত্তরাধিকারীর প্রশাসনের দিকে তাঁরা তাকান কৃতজ্ঞতার মনোভাব নিয়ে, কেননা তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত বিশাল জনসমষ্টির বৈষয়িক মঙ্গল সম্পর্কে অনুভব করার মতো সমবেদনা ও তার জন্য কাজ করার মত সাহস তাঁর ছিল।

১। Select Committee's Fifth Report, 1812, p. 5.

২। Letter from the President and Council, dated 3rd November, 1772.

৩। Philip Francis' Minute of 1776, Published in London in 1782.

৪। Select Committee's Eleventh Report, 1783, Appendix O.

৫। *Ibid.*

৬। *Ibid.*

৭। *Ibid.*

৮। *Ibid.*

৯। Select Committee's Ninth Report, 1783, p. 55.

১০। Volume II of the Six Reports of the Committee of Secrecy, 1782, p. 362.

১১। Select Committee's Second Report, 1782, p. 452.

১২। *Ibid.*, p, 460

১৩। *Ibid.*, p. 463

১৪। *Ibid.* p. 465

১৫। Quoted in Mill's *History of British India*, 1858, Vol. IV, Chapter VII.

১৬। Select Committee's Tenth Report, 1783, Appendix 7

১৭। *Ibid.*

১৮। *Ibid*

১৯। *History of British India.* Vol. IV, chapter VIII,

২০। Select Committee's Fifth Report, 1812, p. 169.

২১। Minutes of Evidence taken before the Lord Committees, 1813, p. 1.

পঞ্চম অধ্যায়

লর্ড কর্ণওয়ালিস ও বঙ্গদেশে জমিদারী বন্দোবস্ত (১৭৮৫-১৭৯৩)

পিটের ইণ্ডিয়া বিল আইনে পরিণত হয় ১৩ আগস্ট, ১৭৮৪-তে। এই আইনে কোম্পানির শাসনব্যবস্থাকে সম্রাটের অধীনে আনা হয় এবং তার ফলে কিছু সংস্কার করতেই হয়। কোম্পানির ডিরেক্টররা অনুভব করেন যে তাঁদের সংগঠনকে সুবিন্যস্ত করা দরকার। ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরবর্তী ব্যক্তিরূপে তাঁরা চরিত্রবান, উদার ও সদ্বংশজাত এক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেন এবং তাঁদের ১২ এপ্রিল ১৭৮৬ তারিখের পত্রে তাঁরা নতুন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসকে প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্দেশ দেন।

এই স্মরণীয় পত্রে ডিরেক্টররা বঙ্গদেশের রাজস্ব প্রথার ঘন ঘন পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁদের অমত এবং যে-কোনো একটি মাত্র প্রথা সজাগ তত্ত্বাবধানে অনুসরণ করার বাসনা প্রকাশ করেন। ভূমি-কর ক্রমাগত বৃদ্ধি করার জন্য, এবং কৃষকদের মঙ্গলামঙ্গলের ব্যাপারে যাদের কোনো স্থায়ী আগ্রহ নেই সেই সমস্ত চাষী, সাজাওয়াল ও আমিনদের অনুকূলে জমিদারদের উচ্ছেদ করার জন্য যে প্রচেষ্টা করা হয়েছিল তাঁরা তার নিন্দা করেন। তাঁরা এই মত প্রকাশ করেন যে তদ্রূপ এড়াবার সম্ভাব্যতম উপায় হবে যুক্তিসংগত নীতি অনুযায়ী ধার্য ভূমি-রাজস্বের এক **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** প্রবর্তন করা, যে-রাজস্ব প্রদানের জন্য মালিকের বংশপরম্পরাগত অধিকারই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র প্রয়োজনীয় জামিন। তাঁরা এই নির্দেশ দেন যে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রেই বন্দোবস্ত করতে হবে জমিদারদের সঙ্গে, এবং ঘোষণা করেন যে "নিয়মিতভাবে ও যথাসময়ে সংগৃহীত পরিমিত মাত্রায় জমা বা ধার্যকৃত রাজস্ব, কঠোরতা ও বিড়ম্বনার সঙ্গে চাপানো কোনো মাত্রাতিরিক্ত জমার ত্রুটিহীন সংগ্রহের চাইতে অনেক বেশি যুক্তিসংগতভাবে দেশীয় লোকদের সুখ ও জমিদারদের নিরাপত্তার সঙ্গে আমাদের স্বার্থকে মিলিত করে।"[১] তাঁরা যদিও চেয়েছিলেন যে এই বন্দোবস্ত শেষ পর্যন্ত চিরস্থায়ী করা হবে, তবু তাঁরা এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে প্রথম বন্দোবস্ত করা দরকার মাত্র দশ বছরের জন্য। ১৭৮৬ সালের ডিরেক্টরদের এই চিঠি থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন যে ১৭৭৬ সালে ফিলিপ ফ্রান্সিস যে-রাষ্ট্রনীতিকসুলভ সুপারিশ করেছিলেন তা দশ বছরের মধ্যে ফলপ্রসূ হয়।

বঙ্গদেশের জনগণের উপর যে দুঃখদুর্দশা চাপানো হয়েছিল সেই দিক থেকে দশ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ফিলিপ ফ্রান্সিসের প্রস্তাবের সারবত্তা প্রমাণিত হয়েছিল, এবং হেষ্টিংসের নিষ্করুণ ও বহুবিচিত্র পরিকল্পনায় যে জ্ঞানবুদ্ধির অভাব তা ধিক্কৃত হয়েছিল।

নতুন পরিকল্পনাটিকে কার্যকর করার জন্যে যে ব্যক্তিটিকে বেছে নেওয়া হয়, তিনি তার যোগ্য ছিলেন। ভারতীয় সমস্ত বিষয় সম্পর্কে ওয়ারেন হেষ্টিংসের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ছিল, লর্ড কর্ণওয়ালিসের সেই জ্ঞান না থাকলেও যাদের উপর শাসন চালাবার জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছিল, সেই জনসাধারণের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। ভারতের ইতিহাসে এমন ঘটনা শুধু দু-একবারই ঘটেনি যে ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ও উদার সহানুভূতিশীল প্রশাসকই সফল হয়েছেন, আর বৃহত্তর স্থানীয় অভিজ্ঞতা অথচ সংকীর্ণতর সহানুভূতিসম্পন্ন প্রশাসক ব্যর্থ হয়েছেন। এবং ইয়োরোপের প্রশস্ত রাষ্ট্রনীতির দ্বারা ইঙ্গ-ভারতীয় প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কারের এজন্যই প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতকের মত সে প্রয়োজন আজও অনুভূত হচ্ছে।

ভারতে পৌঁছে লর্ড কর্ণওয়ালিস দেখলেন যে রীতিনীতি, ভোগদখলের শর্তাদি ও খাজনার প্রশ্নগুলি আরো ভালোভাবে অনুসন্ধান না করে দশ বছরের বন্দোবস্ত সম্পন্ন করা অসম্ভব। এই তদন্তের কাজ তিনি তৎপরতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। কমিটি অব রেভিনিউয়ের নাম ইতিমধ্যে পরিবর্তিত হয়েছিল বোর্ড অব রেভিনিউতে। তার ক্ষমতা ও কাজকর্ম অব্যাহত রাখা হয়েছিল। ইয়োরোপীয় সিভিল সার্ভেন্টদের উপর ন্যস্ত করা হয় একাধারে কলেক্টর, জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা।[২] এবং ফৌজদারী বিচার পরিচালনার দায়িত্ব বাঙলাদেশের নবাবজাদার হাতেই থাকল। ইয়োরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেটরা বিচারের জন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলাই এঁর আদালতে পাঠাতেন।

১৭৯০ সালে প্রশাসন ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন সাধন করা হয়। কাউন্সিলে গভর্নর-জেনারেল সমস্ত প্রদেশগুলি জুড়ে ফৌজদারী বিচারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।[৩] প্রধান ফৌজদারী আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে সরিয়ে আনা হয় কলকাতায়। যথাক্রমে দুজন চুক্তিবদ্ধ অফিসারের তত্ত্বাবধানে চারটি ভ্রাম্যমান আদালত ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা বিচার্য নয় এরূপ অপরাধের বিচারকার্য পরিচালনা করত। দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব বিভাগের নিয়মকানুন সংশোধন করা হয় এবং ইংরজী ও ভারতীয় ভাষাগুলিতে সেগুলি মুদ্রিত হয়।

১৭৯৩ সালে আরো প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় সংস্কার সম্পন্ন করা হল। বিচার বিভাগীয় ও কার্যনির্বাহী কর্তব্যের বিযুক্তি সাধিত হল। বোর্ড অব রেভিনিউ ও জিলা কলেক্টরদের রাজস্ব সংক্রান্ত মামলায় তাঁদের বিচার-সংক্রান্ত কাজকর্ম থেকে বঞ্চিত করা হয়। কলেক্টরদের কাছ থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাও নিয়ে নেওয়া হল। কলেক্টর অপেক্ষা উচ্চতর পদের একজন চুক্তিবদ্ধ অফিসারকে প্রতিটি ডিভিশনে জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়, এবং এই অফিসারকে স্বীয় ডিভিশনের মধ্যে পুলিসের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যথাক্রমে কলকাতা, পাটনা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে চারটি আপীল আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৪]

মহীশূরের টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে লর্ড কর্ণওয়ালিস যুদ্ধের কাজের দায়িত্ব স্বয়ং নিতে বাধ্য হন। তিনি মহীশূরের রাজধানীতে সসৈন্য প্রবেশ করেন, এবং ১৭৯২ সালে সুলতানকে শান্তি স্থাপনের শর্তগুলি নির্দেশ করেন। বৃটিশরা পশ্চিম দিকে কালিকট ও কুর্গ এবং পূর্ব-দিকে বড়ামহল জেলাও লাভ করে। বড়ামহলের রাজস্বের বন্দোবস্তের ব্যাপারে টমাস মনরো ১৭৯২ থেকে ১৭৯৯ পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। এই বড়ামহলের রাজস্বের বন্দোবস্তেই তিনি যে অভিজ্ঞতা ও সাফল্য অর্জন করেন, তারই অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত তাঁকে মাদ্রাজের বিশিষ্টতম রাজস্ব অফিসার করে তুলেছিল।

বঙ্গদেশে রাজস্ব সংক্রান্ত অনুসন্ধানের কাজ দ্রুত সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মিঃ শোর বা পরবর্তীকালে লর্ড টেইনমাউথের ১৮ জুন ১৭৮৯ তারিখের বিখ্যাত 'নথিভুক্ত' (মিনিট) বক্তব্যে বা বিবরণীতে "বঙ্গ প্রদেশে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে মর্যাদা দিয়ে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও লর্ড কর্ণওয়ালিস যে-বন্দোবস্ত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেই বন্দোবস্তের ভিত্তি স্থাপন করা হয়"। আমাদের সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে এই যোগ্যতাপূর্ণ ও বিশদ 'নথিভুক্ত' বক্তব্যের কোনো সংক্ষিপ্তসার দেওয়া অসম্ভব। পরিশিষ্ট ও প্রস্তাবাদি সহ এই 'নথিভুক্ত' বক্তব্য বিখ্যাত পঞ্চম রিপোর্টের ছোট ছোট হরফে ছাপানো সত্তরটি ফোলিও জুড়ে আছে।[৫] কিন্তু মিঃ শোরের বিশদ তদন্তের ফলে উদ্‌ঘাটিত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার।

মিঃ শোর ১৫৮২ সালে টোডরমল ও ১৭২২ সালে জাফর খাঁ-কৃত রাজস্ব-বন্দোবস্তের উল্লেখ করেছেন।

"আমরা যদি টোডরমলের ধার্য করকে প্রথমত পরিমিত বলে মনে করি, তবে ইতিপূর্বে বিবাদীকৃত বৃদ্ধিকে মাত্রাতিরিক্ত মনে করা চলে না। টোডরমল

ও জাফর খাঁ—এই দুজনের মধ্যবর্তী সময়ে দেশের যথেষ্ট সমৃদ্ধি হয়েছিল, কারণ বাণিজ্যের নতুন নতুন উৎসমুখ উন্মুক্ত হয়েছিল এবং সাধারণভাবে বাণিজ্য অনেক বেশি ছড়িয়ে গিয়েছিল ; আকবরের শাসনকালে যে স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষাকৃত দুর্লভ ছিল তা পরবর্তীকালে নতুন নতুন খাত ধরে দেশের মধ্যে পৌছয়। বিপরীত পক্ষে, যে-রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আদায়ের সীমা নিধারণ করেছিল এবং রাজ্যের প্রজাদের নিজেদের শ্রম ও ভালো ব্যবস্থাপনার সুফলগুলি ভোগ করতে দিয়েছিল, সেই রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, স্বীকার করি এবং তার প্রশংসা করি।"[৬]

মি: শোর তারপর সুজা খাঁ, আলিবর্দি খাঁ ও মীরকাসিম পরবর্তীকালে যে-বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন তার উল্লেখ করেছেন ; বিভিন্ন সময়ে বঙ্গদেশের ভূমিরাজস্বের নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান একটি পরিশিষ্টে[৭] দেওয়া হয়েছে।

		টাকা	পাউণ্ড
টোডরমলের বন্দোবস্ত,	১৫৮২	১০,৬৯২,১৫২	[১,০৭০,০০০]
সুলতান সুজার বন্দোবস্ত,	১৬৫৮	১৩,১১৫,৯০৭	[১,৩১২,০০০]
জাফর খাঁর বন্দোবস্ত	১৭২২	১৪,২৮৮,১৮৬	[১,৪২৯,০০০]
সুজা খাঁর বন্দোবস্ত,	১৭২৮	১৪,২৪৫,৫৬১	[১,৪২৫,০০০]

এথেকে দেখা যাবে যে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ মুসলমান শাসনের শেষ দিকে খুব বেশি পরিবর্তিত হয়নি, যদিও ১৭২২ থেকে ১৭৬৩-র মধ্যে অন্যান্য কিছু খুচরো কর বসানো হয়েছিল।

বৃটিশ শাসন আরম্ভের অব্যবহিত আগে আদায়ের উল্লেখ করে মিঃ শোর আমাদের চার বছরের ১৭৬২-১৭৬৫ পরিসংখ্যান দিয়েছেন। "এই সময়ের প্রথম বছরটি হল কাসিম আলির (মীরকাসিম) ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছর হল মীরজাফরের প্রভুত্বে নন্দকুমারের আমল ; এবং চতুর্থ বছরটি হল মহম্মদ রেজা খাঁর—এটাই ছিল দেওয়ানীর প্রথম বছর।"[৮]

		প্রকৃত আদায় টাকা	প্রকৃত আদায় পাউণ্ড
১৭৬২-৬৩	...	৬,৪৫৬,১৯৮	[৬৪৬,০০০]
১৭৬৩-৬৪	...	৭,৬১৮,৪০৭	[৭৬২,০০০]
১৭৬৪-৬৫	...	৮,১৭৫,৫৩৩	[৮১৮,০০০]
১৭৬৫-৬৬	...	১৪,৭০৪,৮৭৫	[১৪৭০,০০০]

পূর্ববর্তী মুসলমান শাসনের থেকে পৃথক বৃটিশ শাসনের অদ্ভুত অর্থনৈতিক

বৈশিষ্ট্যটি ছিল বিদেশী শাসকদের দ্বারা প্রবর্তিত দেশ থেকে অর্থনৈতিক নির্গমন। এটা মিঃ শোরের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

"কোম্পানি হল বণিক তথা দেশের সার্বভৌম কর্তা। প্রথমোক্ত পদে তাঁরা তার বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকেন আর দ্বিতীয়োক্ত ক্ষমতায় তাঁরা রাজস্ব আত্মসাৎ করেন। ইয়োরোপে যে-আয় প্রেরণ করা হয়, সেটা করা হয় তাঁদের ক্রীত দেশীয় সামগ্রীতে।"

"শিল্পে উৎপন্ন পণ্যের জন্য বর্ধিত চাহিদার দরুন (চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এ কথা ধরে নিয়ে) রাজ্যের প্রজাদের বর্ধিত শিল্প সম্পর্কে আমরা যতই ছাড় দিই না কেন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার যথেষ্ট কারণ আছে যে সুদূর বিদেশী আধিপত্যের ব্যবস্থার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য দোষগুলি উপকারের চাইতে অপকারের দিকে পাল্লায় ভারী।"

"বাণিয়েরের সময় থেকে দেওয়ানী দখল পর্যন্ত প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য থেকেই দেখা যায় যে বঙ্গদেশ এবং হিন্দুস্থানের উত্তরাংশ, মোরো উপসাগর, পারস্য-উপসাগর ও মালাবার তটের মধ্যে দেশের যে-স্থল বাণিজ্য চলত, তা রীতিমত বিরাট ছিল। বিদেশী ইয়োরোপীয় কোম্পানিগুলি এই পথেই মুদ্রা ও পণ্য পাঠাত এবং পূর্বদিক থেকে আফিমের জন্য চূর্ণ-সোনায় লেনদেন করত।"

"কিন্তু ১৭৬৫ সাল থেকে এর বিপরীতটাই ঘটেছে। কোম্পানির বাণিজ্য থেকে সমমূল্যের লাভ আসেনি। বিদেশী কোম্পানিগুলি ধাতুমুদ্রা এদেশে আমদানি করে না বললেই চলে, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুদ্রা হিন্দুস্তানের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাঙলাদেশেও নিয়ে আসা হয় না।"

"মোটের উপর, উপসংহারে এই কথা বলতে আমার কোনো সঙ্কোচ নেই যে কোম্পানির দেওয়ানি দখলের পর থেকে দেশের স্বর্ণমুদ্রা পরিমাণে অনেক হ্রাস পেয়েছে, আমদানির যে-পুরনো পথে বহির্গমন আগে পূরণ করা হত সেটা অনেকাংশে বন্ধ হয়ে গেছে, এবং চীন, মাদ্রাজ ও বোম্বাইকে অর্থ সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা তথা ইয়োরোপীযদের দ্বারা তা ইংলণ্ডে রপ্তানির প্রয়োজনীয়তা দেশের রৌপ্যভাণ্ডারকে আরো নিঃশেষ করে চলবে।"[৯]

লক্ষণীয় যে মিঃ শোর রৌপ্য নিঃশেষিত হওয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। অ্যাডাম স্মিথের আগে মূল্যবান ধাতুকেই মনে করা হত দেশের সম্পদের প্রতিভূ বলে। কিন্তু এত জোরালোভাবে যে-নিঃসরণের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, সেই প্রকৃত নিঃশেষতা হল সম্পদের, পণ্যের, জনসাধারণের খাদ্যের।

বঙ্গদেশের ভূমি-বন্দোবস্তের তিনটি সম্ভাব্য পদ্ধতি, যথা রায়তদের সঙ্গে বন্দোবস্ত, ভূমিরাজস্ব আদায়কারী মহলদার চাষীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত এবং জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত সম্পর্কে আলোচনা করে মিঃ শোর চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছেন যে শেষোক্তটিই হল দেশের সুশাসন ও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একমাত্র পদ্ধতি।

"আমরা জমির মালিকানা জমিদারদের উপরেই ন্যস্ত বলে স্বীকার করেছি ···একে মর্যাদা দেবার মতো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শুধু অধিকারের স্বীকৃতিদান দেশের উন্নয়নের পক্ষে সামান্যই কাজ করবে। আমাদের মতো এক বিদেশীদের পক্ষে অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ তাই দেশীয় নৃপতিরা যা-চাপাতে পারেন তার থেকে আরো পরিমিত হওয়া দরকার, এবং আমরা যাকে চিরস্থায়ী বলে গণ্য করি তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার জন্য আমাদের আদায় পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। আমাদের নিজস্ব সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে অর্ধেক ভূ-গোলার্ধের দূরত্বে অবস্থিত থাকার দরুন প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সীমাবদ্ধ না-করে ভারতের প্রশাসনের উপর সর্বপ্রকার সম্ভাব্য বিধিনিষেধ চাপানো উচিত এবং পরিবর্তমান স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে অথবা অসংযত নিয়ন্ত্রণের স্বাধিকার-প্রমত্ততার বিরুদ্ধে অধিবাসীদের সম্পত্তিকে নিরাপদ রাখা দরকার।"[১০]

রাষ্ট্রের দাবি নির্ধারিত হল প্রকৃত খাজনার নয়-দশমাংশ ; এটা করা হল এই আশায় যে জমিদাররা জমিদারীর উন্নতি ঘটিয়ে তাঁদের ভাগের এই সামান্য এক-দশমাংশকে ক্রমে ক্রমে বাড়াতে সক্ষম হবেন।

"জমিদারী আদায়ের নয়-দশমাংশের অনুপাতটি নিশ্চিতভাবে আমাদের সরকার যতটুকু দাবি করা উচিত ঠিক ততটুকুই, যদি অবশ্য সে জমিদারী আদায়ের সাহায্যে প্রজাদের মঙ্গলের কথা বিচার করে ; মোট উৎপন্নের যে-আনুপাতিক হারটি আশু মুনাফা ও অন্যান্য খরচ বাদ দেবার পর জমিদারের হাতে আসে, আমি তার কথাই বলছি। আমি আশা করব, জমিদারের লাভ তাঁদের জমির প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ ও তাঁদের রায়তদের উৎসাহ দেবার ফলে যথাসময়ে এই আনুপাতিক হারকে অতিক্রম করবে।"[১১]

এরও পরে, বঙ্গদেশের জমিদারদের অধিকার বলতে তিনি কী বোঝেন মিঃ শোর তা পরিষ্কারভাবে এবং বলিষ্ঠভাবে বর্ণনা করেছেন।

"আমি জমিদারদের জমির মালিক বলে মনে করি, এই মালিকানা তাঁদের নিজেদের ধর্মের আইন অনুযায়ী তাঁরা অর্জন করেছেন উত্তরাধিকার সূত্রে, এবং যখন কোনো বৈধ উত্তরাধিকারী থাকে তখন তাঁকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি

থেকে বঞ্চিত করা, অথবা সে অধিকারের পরিবর্তন ঘটাবার ক্ষমতা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ ন্যায়সংগতভাবে প্রয়োগ করতে পারেন না। বিক্রি বা বন্ধকের দ্বারা জমির বিলিব্যবস্থা করার সুযোগ আসে এই মৌলিক অধিকার থেকে, এবং আমরা দেওয়ানী দখল করার আগে থেকেই জমিদাররা এ অধিকার প্রয়োগ করছেন।"

"জমিদারদের অধিকারের উপর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ না করেও স্বৈরতন্ত্র তাঁদের সেই অধিকার খর্ব করার দিকে হাত বাড়াতে পারত, কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে তার প্রয়োগটা হয়েছে তাঁদেরই অনুকূলে। বঙ্গদেশের জমিদাররা আকবরের রাজত্বকালে সমৃদ্ধিশালী ছিলেন, সংখ্যায়ও ছিলেন অজস্র, এবং জাফর খাঁ যখন তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের অধীনে প্রশাসনে নিযুক্ত হয়েছিলেন তখনও তাঁদের অস্তিত্ব ছিল। তাঁদের নিজ নিজ আঞ্চলিক ক্ষমতা মনে হয় অনেকখানি বেড়েছিল; এবং ইংরেজরা যখন দেওয়ানী লাভ করে তখন প্রধান প্রধান জমিদাররা সমৃদ্ধি ও মর্যাদার চিত্রই প্রদর্শন করেছেন।[১২]

জমিদারদের সম্পর্কে এই পর্যন্ত। রায়ত বা চাষীদের সম্পর্কেও মিঃ শোর সমান জোর দিয়ে মন্তব্য করেছেন।

"বঙ্গদেশ জুড়ে প্রতিটি জেলায়, যেখানে খাজনা আদায়ের স্বাধিকার প্রমত্ততা সমস্ত নিয়মকে ছাপিয়ে যায়নি, সেখানে জমির খাজনা নিয়ন্ত্রিত হয় 'নিরিক' নামে পরিচিত হার দিয়ে এবং কোনো কোনো জেলায় প্রতিটি-গ্রামের নিজস্ব হার আছে। জমিতে উৎপন্ন ফসল অনুযায়ী এই হার নির্ধারিত হয় প্রতি বিঘায় (একরের এক-তৃতীয়াংশ) একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক হিসাবে; কোনো কোনো জমিতে বছরে দুবার আলাদা ধরনের ফসল হয়, কোথাও তিনবার। তুঁত গাছ, পান, তামাক, আখ প্রভৃতির মতো অধিকতর লাভজনক সামগ্রী জমির মূল্য আনুপাতিক হারে অনেক বাড়িয়ে দেয়।"

"খোদ-খাস্ত্ রায়তদের অথবা যে-গ্রামে তারা বসবাস করে সেখানকারই জমিকে যারা চাষ করে তাদের পাট্টা দেওয়া হয় সাধারণত কোনো সময়সীমা ছাড়া, এবং তাতে বলা হয় যে তাদের জমি রাখতে হবে বছরে বছরে খাজনা দিয়ে। এইখান থেকেই দখলি-স্বত্বের উদ্ভব হয়।"

"পাইকস্ত্ রায়তরা, অথবা যে-গ্রামে তারা বাস করে না সেখানকার জমি যারা চাষ করে, তারা তাদের জমি দখলে রাখে আরো বেশি অনির্দিষ্ট এক স্বত্ব অনুযায়ী। তাদের সাধারণত পাট্টা দেওয়া হয় একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে; যেখানে শর্তগুলি তাদের অসুবিধাজনক মনে হয়, সেখান থেকে অন্য কোন স্থানে তারা চলে যায়।"[১৩]

মিঃ শোর তাঁর নথিভুক্ত বক্তব্যের শেষের দিকে তাঁর প্রস্তাবগুলির এক সারসংক্ষেপ উপস্থিত করেছেন।

"আসন্ন বন্দোবস্তের জন্য যে প্রধান প্রধান নীতির উপরে আমার প্রস্তাবসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করবো, তার সংখ্যা হল দুটি।"

"সরকারের রাজস্বের ব্যাপারে সরকারের নিরাপত্তা এবং তার প্রজাদের নিরাপত্তা ও রক্ষার ব্যবস্থা।"

"প্রথম কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে জমিদারদের সঙ্গে অথবা জমির মালিকদের সঙ্গে এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে; তাদের সম্পত্তি জমিই হল সরকারের কাছে জামিন।"

"দ্বিতীয় কাজটি করতে হবে করের এক স্বীকৃত সর্বোচ্চ হার যথাসম্ভব কাজে প্রয়োগ করে। প্রতিটি ব্যক্তি যে-কর দিতে বাধ্য থাকবে তা সুনিশ্চিত হওয়া দরকার, খেয়াল মাফিক নয়। প্রদাতা ও অন্য সকলের কাছেই কর প্রদানের সময়, পদ্ধতি ও পরিমাণ পরিষ্কার ও সরল হয়ে যাওয়া দরকার।"

"তারপরে বন্দোবস্ত করতে হবে নিশ্চিতভাবে দশ বছরের জন্য, লক্ষ্য থাকবে চিরস্থায়ী করার দিকে।[১৪]

উপরে মিঃ শোর বিশদ নথিভুক্ত বক্তব্যের নিছক একটা রূপরেখা দেওয়া হল। এই 'মিনিটে' ফিলিপ ফ্রান্সিস সর্বপ্রথম যে-চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে বলেছিলেন, তিনি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। সেই বছরেই দাখিল করা দ্বিতীয় একটি নথিভুক্ত বক্তব্যে মিঃ শোর অবশ্য দশ বছরের জন্য করা এই বন্দোবস্ত শেষ পর্যন্ত চিরস্থায়ী হবে—জমিদারদের কাছে এই মর্মে প্রস্তাবিত বিজ্ঞপ্তিটি বাদ দেবার পরামর্শ দেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস এই বাদ দেওয়া সম্পর্কে আপত্তি করেন, কারণ এর ফলে সরকারের নীতি সম্পর্কে কিছু অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত দেখা দিতে পারে; এবং সেই মহদাশয় দ্বারা নথিবদ্ধ কতকগুলি মন্তব্য এত স্বচ্ছ, এত অকাট্য, এত বলিষ্ঠ যে এই সংক্ষিপ্ত রচনাতেও তা বাদ দেওয়া অসম্ভব।

"মিঃ শোর অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে, এবং আমার মতে, অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তাঁর গত জুন মাসে প্রদত্ত মিনিটে জমিদারদের জমির মালিকানার অধিকারের সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে যে বন্দোবস্ত নিয়ে আলোড়ন চলছে তা থেকে যদি এখন চিরস্থায়িত্বের মূল্যটি সরিয়ে নেওয়া হয় তবে যে-জমিদারদের অধিকারের জন্য তিনি যুক্তিতর্ক তুলেছেন তাঁদের কাছে তাঁর যুক্তির কী দাম থাকবে?…

"যখন জমির ন্যায্য মালিক, জমিদার নিজেই দশ বছরের জন্য কেবলমাত্র ভূমিরাজস্ব আদায়দার মহলদার হতে যাচ্ছেন, এবং তারপর যখন তাঁকে নতুন খাজনার বিপদের সম্মুখীন হতে হবে—সেই খাজনার দাবী অজ্ঞতা বা লোভপ্রসূত হতে পারে—তখন, আমি উন্নতির কথা বলব না, প্রজাশূন্যতা রোধ করারই বা কোন্ আশা থাকবে ?…

"আমি অনায়াসেই দাবি করতে পারি যে হিন্দুস্থানে কোম্পানির এলাকার এক তৃতীয়াংশ এখন জঙ্গল, সেখানে বাস করে শুধু বন্য জন্তু। দশ বছরের পাট্টা কি কোনো মালিককে এই জঙ্গল পরিষ্কারে প্রবৃত্ত করবে, এবং রায়তদের উৎসাহিত করবে সেখানে এসে তাঁর জমি চাষ করতে, যখন সেই লীজ শেষ হয়ে যাবার পর নতুন চাষ করা জমির জন্য তাকে হয় রাজস্বনির্ণায়কের ইচ্ছামত নতুন ট্যাক্স দিতে হবে, না-হয় যে-শ্রমের জন্য তখন হয়তো তিনি মূল্যও পাবেন না, সেই শ্রম থেকে কোনোরূপ উপকার লাভের সমস্ত আশা হারাবেন ?…

"আমি আমার দৃঢ়তম প্রত্যয়ে ঘোষণা না করে পারি না যে যদি সেই প্রদেশগুলিকে শুধু ঐ সময়ের জন্যই লীজ দেওয়া হয় তার শেষে তাঁরা দেখতে পাবেন এক বিধ্বস্ত ও দারিদ্র্যপূর্ণ দেশকে।"[১৫]

পরবর্তী এক 'মিনিটে' লর্ড কর্ণওয়ালিস পুনরায় তাঁর রাষ্ট্রনীতিজ্ঞসুলভ মতামত নথিবদ্ধ করেন।

"এমন আইন যদি বলবৎ করা যায় যা তাদের (জমিদারদের) কাছে শিল্প ও অর্থনীতির লাভ এনে দেবে, এবং সেই সঙ্গে অলসতা ও অমিতব্যয়িতার পরিণাম ভোগ করারও সুযোগ রেখে দেবে, তবে তাঁরা হয় নিজেদের কাজ চালাবার মতো কর্মক্ষম করে তুলবেন, না হয় তাঁদের প্রয়োজনই তাঁদের বাধ্য করবে অন্যকে জমি দিয়ে দিতে, যারা সেই জমি চাষবাস করবে এবং তার উন্নতি ঘটাবে। আমি মনে করি, জমির মালিকদের হিসাবী জমিদার ও জনস্বার্থের বিজ্ঞ অছি করে তোলবার জন্য এই সরকার বা অন্য যে-কোনো সরকারের পক্ষে এটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য কার্যকর ব্যবস্থা।…

"তথ্য সংগ্রহের পিছনে ২০ বছর ব্যয় করা হয়েছে। ১৭৬৯ সালে সুপারভাইজারদের নিযুক্ত করা হয় ; ১৭৭০ সালে প্রাদেশিক কাউন্সিল স্থাপিত হয় ; ১৭৭২ সালে প্রেসিডেন্সির সকল ক্ষমতাবিশিষ্ট এক 'কমিটি অব সার্কিট'-কে ভূমি বন্দোবস্ত করার ভার দেওয়া হয় ; ১৭৭৬ সালে গ্রামের একটা হস্তবুদ' (খাজনার ক্রম) তৈরির জন্য আমিনদের নিযুক্ত করা হয় ; ১৭৮১ সালে রাজস্বের প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলিকে উঠিয়ে দেওয়া হয় এবং কলেক্টরদের

পাঠানো হয় বিভিন্ন জেলায় এবং জেনারেল কাউন্সিল ও রাজস্বের ব্যবস্থাপনা ন্যস্ত হয় সরকারের সরাসরি পর্যবেক্ষণাধীন কলকাতাস্থিত এক রাজস্ব কমিটির উপরে। আমাদের পূর্বসূরীদের মতো আমরা নতুন তথ্য আহরণের জন্য যাত্রা করেছি, এবং তিন বছর ধরে তা সংগ্রহ করছি। যে-বিষয়গুলিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কেই বিভিন্ন কলেক্টর বিরাট বিরাট রিপোর্ট পাঠিয়েছেন।…

"উপরোক্ত কারণে সম্পদের প্রচণ্ড নির্গমনের পরিণতি, তদুপরি ব্যক্তিগত সম্পদ প্রেরণের ফলে যে পরিণতি হয়েছে, সেটা গত কয়েকবছর ধরে, এবং বর্তমানে, গুরুতরভাবে অনুভব করা যাচ্ছে চলতি মুদ্রা হ্রাস থেকে এবং তারফলে গ্রামের চাষ-আবাদ ও সাধারণ বাণিজ্যের উপর যে-মন্দা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই থেকে।…

"তাই, আমাদের ব্যবস্থাপনার নীতিতে একটি অত্যন্ত বাস্তব পরিবর্তন ঘটানো অপরিহার্য-রূপে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, যাতে এই দেশকে সমৃদ্ধির অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় এবং পৃথিবীর এই অংশে যাতে সে বৃটিশ স্বার্থ ও ক্ষমতায় একটা দৃঢ় খুঁটি হিসাবে থাকতে পারে।…

"আমাদের উপর তাই দায়িত্ব পড়েছে—যে-দোষগুলির ফলে জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার সংশোধন করার জন্য; এবং এক নির্দিষ্ট ধার্য হারে জমির স্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়ে আমরা আমাদের প্রজাদের ভারতের মধ্যে সবচেয়ে সুখী মানুষে পরিণত করব।"[১৬]

নভেম্বর, ১৭৯১-তে দশ বছরের বন্দোবস্তের জন্য সরকার এক সংশোধিত ও সম্পূর্ণ বিধি-নিয়ম জারী করেন এবং বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলাতেই এই বন্দোবস্ত সম্পন্ন হয় ১৭৯৩ সালে। ১৭৯০-৯১ সালে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রদেশ-গুলি থেকে প্রাপ্ত ভূমি-রাজস্বের সমগ্র পরিমাণ[১৭] ছিল ২৬,৮০০,৯৮৯ টাকা (২,৬৮০,০০০ পাউণ্ড)। এই অঙ্কটা ছিল শতাব্দীর প্রথম ভাগে জাফর খাঁ ও সুজা খাঁর ধার্য-রাজস্বের প্রায় দ্বিগুণ; মীরজাফরের শাসনের (১৭৬৪-৬৫) প্রথম বছরে মহারাজা নন্দকুমারের সংগ্রহের তিনগুণ; এবং কোম্পানির দেওয়ানীর (১৭৬৫-৬৬) প্রথম বছরে বৃটিশ তত্ত্বাবধানে মহম্মদ রেজা খাঁর সংগৃহীত রাজস্বের প্রায় দ্বিগুণ। অতএব ধার্য করের হার যথাসম্ভব কঠোর করা হয়েছিল; এবং তা এত বাড়ানো সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে তাকে চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

ডিরেক্টররা তাঁদের ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৭৯২ তারিখের চিঠিতে যে কাজ করা

হয়েছে তার উচ্চ প্রশংসায় নিজেদের মত প্রকাশ করেন এবং চিরকালের জন্য ভূমি-রাজস্বের বন্দোবস্তে তাঁদের সম্মতি দেন। এই সমস্ত নির্দেশ পেয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস ২২ মার্চ ১৭৯৩ তারিখে এক ঘোষণা জারী করেন। অতি সম্প্রতি যে-বন্দোবস্ত হয়েছে অথবা যার কাজ চলছে, এই ঘোষণায় সেই বন্দোবস্তের চিরস্থায়িত্ব ঘোষণা করা হয়। ঘোষণার প্রথম তিনটি ধারা ছিল নিম্নরূপ :

১নং ধারা। "বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সরকারি রাজস্বের দশ-বৎসরকাল স্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য যে মূল বিধিনিয়ম এই প্রদেশগুলির জন্য যথাক্রমে ১৮ সেপ্টেম্বর ১৭৮৯, ২৫ নভেম্বর ১৭৮৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারী ১৭৯০ তারিখে পাশ করা হয়েছিল, তাতে জমির যে-সমস্ত মালিকদের সঙ্গে অথবা যাঁদের তরফে বন্দোবস্ত করা যায়, তাঁদের এই মর্মে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল যে সেই নিয়ম অনুযায়ী জমির উপরে ধার্য জমা দশ বছর পূর্ণ হবার পর চালিয়ে যাওয়া হবে এবং চিরকাল অপরিবর্তনীয় থাকবে, যদি অবশ্য এরূপ অনুক্রমণ ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিষয়ক মাননীয় কোর্ট অব ডিরেক্টরদের অনুমোদন লাভ করে, অন্যথায় নয়।"

২নং ধারা। "কাউন্সিলের গভর্ণর জেনারেল মার্কুইস কর্ণওয়ালিস, নাইট অব দি মোস্ট নোবল অর্ডার অব দি গার্টার, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমিদারদের স্বাধীন তালুকদারদের ও জমির অন্যান্য প্রকৃত মালিকদের এই মর্মে বিজ্ঞাপিত করছেন যে উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের জমির উপর যে-জমা ধার্য হয়েছে অথবা হবে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিষয়ক মাননীয় কোর্ট অব ডিরেক্টরদের দ্বারা তাকে তিনি চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট ঘোষণা করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন।"

৩নং ধারা। "নিয়মাবলী অনুযায়ী যেসমস্ত জমিদার, স্বাধীন তালুকদার, ও জমির অন্যান্য মালিকের সঙ্গে অথবা যাঁদের তরফে উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী বন্দোবস্ত সম্পন্ন হয়েছে, কাউন্সিলের গভর্ণর জেনারেল তাঁদের কাছে ঘোষণা করছেন যে বন্দোবস্তের কাল শেষ হয়ে যাবার পর তাঁরা যথাক্রমে যে ধার্য-রাজস্ব প্রদান করতে সম্মত হয়েছেন তার কোনও পরিবর্তন হবে না, কিন্তু তাঁদের এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের এবং আইনসঙ্গত ওয়ারিশদের এই রাজস্বের হারে তাঁদের জমিদারি চিরকাল রাখতে দেওয়া হবে।"[১৮]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘটিয়ে ১৭৯৩ সালের ১নং প্রবিধান যথারীতি পাশ হল। ভারতে বৃটিশ জনগণের দেড়শো বছরের মধ্যে তাদের এই একটি কাজই

জনগণের অর্থনৈতিক মঙ্গলামঙ্গলকে সবচেয়ে কার্যকরভাবে রক্ষা করেছে। অনিশ্চিত ও ক্রমবর্ধমান এক রাষ্ট্রীয় চাহিদার দ্বারা জনগণের পরিশ্রমকে পঙ্গু করার পরিবর্তে জনগণকে তাঁদের নিজেদের শ্রমের দ্বারা লাভবান হতে দেওয়ার জন্য সভ্য জাতিগুলির আধুনিক নীতির সঙ্গে এই কাজটি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। গত একশো বছরে বঙ্গদেশে কৃষি বিপুলভাবে বিস্তৃত হয়েছে এবং ১৭৯৩ সালে বঙ্গদেশের যে-ভূমি-কর নির্ধারিত হয়েছিল খাজনার ৯০ শতাংশ হারে, তার আনুপাতিক হার এখন জমিদারদের খাজনার প্রায় ২৮ শতাংশ ; এবং পথনির্মাণ ও জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য খাজনার উপরে ৬¼ শতাংশ পরিমাণে নতুন কর যোগ করা হয়েছে।

১৭৯৩ সাল থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত বঙ্গদেশে কখনো এমন কোনো দুর্ভিক্ষ হয়নি যাতে গুরুতর লোকক্ষয় ঘটেছে। ভারতের অন্যান্য অংশে, যেখানে জমি-কর এখনও অনিশ্চিত ও অতিরিক্ত, সেখানে কৃষির উন্নয়নে সমস্ত উদ্দেশ্যই অপহৃত হয়েছে এবং সঞ্চয় বাধা পেয়েছে, এবং দুর্ভিক্ষের সঙ্গে এসেছে হাজার হাজার, কখনো বা লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু। একটি জাতির সমৃদ্ধি ও সুখ যদি প্রজ্ঞা ও সাফল্যের মাপকাঠি হয়, তবে লর্ড কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হল ভারতে বৃটিশ জাতির গৃহীত ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ও সবচেয়ে সফল ব্যবস্থা।

পাঁচ বছর বাদে, অর্থাৎ ১৭৯৮ সালে ইংলণ্ডে যে-ভূমি-করের বন্দোবস্ত করা হয় তার সঙ্গে বঙ্গদেশের ভূমি-করের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তুলনা না-করে এই বিবরণী আমরা শেষ করতে পারছি না। তৃতীয় উইলিয়ামের সম্পত্তি-করের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অর্থনীতিক অবস্থার উপরে কর বসানো ; পরবর্তীকালে একে বর্ণনা করা হয়েছিল বার্ষিক ভূমি-কর বলে, যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধার্য-করের আওতা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধের জন্য এই কর বাড়ানো হয়েছিল বার্ষিক মূল্যে প্রতি পাউণ্ডে চার শিলিং অর্থাৎ খাজনার ২০ শতাংশ, আবার ১৭১৩ সালে ইউট্রেকটের শান্তির পর তা কমানো হয়েছিল দুই শিলিংয়ে, অর্থাৎ খাজনার ১০ শতাংশে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এটা পাউণ্ডে চার শিলিং থেকে এক শিলিংয়ের মধ্যে, অর্থাৎ খাজনার ২০ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে ওঠা-নামা করত।

বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পাঁচ বছর পরে, মহান মন্ত্রী উইলিয়াম পিট অ্যাক্টে নির্ধারিত বিভিন্ন জেলায় ভূমি-করকে চিরস্থায়ী করেন এবং

এই এ্যাক্টের ফলে জমিদাররা এককালীন থোক অর্থ দিয়ে এই কর থেকে একেবারে দায়মুক্ত হতে পারতেন। এ পর্যন্ত করের ১,৩০০,০০০ পাউণ্ড রেহাই দেওয়া হয়েছে এবং ১,০০০,০০০ পাউণ্ডেরও বেশী এখনও ছাড় দেওয়া বাকি। এই শেষোক্ত অঙ্কটিকে এখন জমিদারী বাবদ নির্ধারিত দেয় অর্থ বলে গণ্য করা হচ্ছে, তদনুযায়ীই জমি ক্রয়-বিক্রয় হয়।[১৯]

ইংলণ্ডে ভূমি-করের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা পিটের পক্ষে কতখানি বিজ্ঞজনোচিত হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু কিছু সন্দেহ থাকতে পারে; কিন্তু কর্ণওয়ালিস-কৃত বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিজ্ঞতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। ইংলণ্ডে এই বন্দোবস্ত শুধু ভূম্যধিকারী শ্রেণী-গুলিকেই উপকৃত করেছিল; বঙ্গদেশে এই বন্দোবস্ত উপকৃত করেছে সমগ্র কৃষিজীবী সম্প্রদায়কে; সমগ্র কৃষক জনসমষ্টি এই উপকার ভোগ করেন, এবং এই ব্যবস্থার ফলে তাঁরা অনেক বেশী সমৃদ্ধিশালী ও সম্পদশালী হয়েছেন। ইংলণ্ডে এই বন্দোবস্ত জাতীয় আয়ের অনেকগুলি উৎসের মধ্য থেকে একটির উপরেই করকে সীমাবদ্ধ করেছিল; বঙ্গদেশে কৃষিকে তা রক্ষণ-ব্যবস্থা যুগিয়েছে—যে-কৃষি কার্যত জাতির জীবনধারণের একমাত্র উপায়। ইংলণ্ডে জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে দেশে ব্যয় করার জন্য বৃহত্তর এক ভূমি-কর সংগ্রহ করা থেকে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করেছিল; বঙ্গদেশে তা দেশের বাইরে সম্পদের বার্ষিক অর্থনৈতিক নির্গমনের পরিমাণ বাড়ানো থেকে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করে। ইংলণ্ডে তা জমিদার শ্রেণীকে বাড়তি করের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল; বঙ্গদেশে তা জাতিকে বাঁচিয়েছে মারাত্মক ও সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের হাত থেকে।

১। Select Committee's Fifth Report, 1812, p. 18.

২। Regulations of June 1787.

৩। Bengal Consultations, 3rd December 1790. Lord Cornwallis' Minute.

৪। Regulation's V of 1793. ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে পঞ্চম আপীল কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলির জন্য ষষ্ঠ আপীল কোর্টটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। Fifth Report, 1812, pp. 169-288

৬। Paragraph 14.

৭। Appendix I to the Minute.

৮। Paragraph 68.

৯। **Paragraphs 131, 132, 135, 136 and 140.**

১০। **Paragraph 264.**

১১। Paragraph 355.

১২। Paragraphs 370 and 382.

১৩। Paragraphs 391, 406 and 407.

১৪। Paragraphs 457, 458, 459, 460 and 462.

১৫। Lord Cornwallis's Minute, dated 18th September 1789.

১৬। Lord Cornwallis's Minute, dated 3rd February, 1790.

১৭। Fifth Report, 1812, p. 19.

১৮। *Ibid.*, p. 21.

১৯। Stephen Dowell's *History of Taxation and Taxes in England*, 1881 Vol. iii, pp. 97-101.

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাদ্রাজে রাজস্ব ব্যবস্থা (১৭৬৩—১৭৮৫)

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা ১৭৫৭ থেকে ১৭৯৩ পর্যন্ত বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস বিবৃত করেছি, এখন আমাদের দৃষ্টিপাত করা দরকার মাদ্রাজের অবস্থার দিকে, যেখানে অবশেষে বৃটিশ ও ফরাসীদের মধ্যে দীর্ঘ যুদ্ধ সমাপ্ত হয় ১৭৬৩ সালে প্যারিসের শান্তি চুক্তিতে।

এই যুদ্ধগুলির ঘটনাবহুল ইতিহাস প্রায়শই বর্ণিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারত অধিকারের জন্য এটি ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ এক সংগ্রাম। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাটি ছিল একটি ফরাসী সাম্রাজ্য গঠনের কাজ যিনি শুরু করেছিলেন সেই ডুপ্লে এবং সেই অসম্পূর্ণ কাঠামোকে যিনি ধ্বংস করেছিলেন সেই লর্ড ক্লাইভের মধ্যে। পরবর্তীকালে এই যুদ্ধ ছিল প্রাচ্যে ফ্রান্সের ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য গুণবান বুসি ও প্রচণ্ড শক্তিমান লালির দেশপ্রেমিক ও অধ্যবসায়পূর্ণ একটি উদ্যম। এই ক্ষমতাকে শেষ পর্যন্ত আয়ার কূট ধ্বংস করেন। প্যারিস চুক্তিতে ইংলণ্ডের সাফল্যকে চূড়ান্তভাবে স্বীকার করা হয়; এর পরে ভারতে ফ্রান্স আর কখনো ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।

এই সমস্ত যুদ্ধের বহু-কথিত কাহিনী থেকে এইবার জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করতে পেরে আমরা গভীর স্বস্তি বোধ করছি। ভারতের ইতিহাস বৃটিশ ও ফরাসী যুদ্ধের ইতিহাস নয়, বরং তা হল ভারতের জনসাধারণের ইতিহাস—তাদের বৈষয়িক ও নৈতিক অবস্থা, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বৃত্তি ও কৃষির ইতিহাস। এবং যেহেতু জনসাধারণের এই প্রকৃত ইতিহাস এযাবৎ সামান্যই মনোযোগ লাভ করেছে, সেই হেতু বর্তমান রচনাটিকে আমরা সম্পূর্ণভাবে সেই শিক্ষাপ্রদ বিষয়টির উদ্দেশেই নিয়োজিত করছি—যুদ্ধবিগ্রহের অধিকতর নাটকীয় কাহিনী রচনার ভার ছেড়ে দিচ্ছি প্রতিভাবান যোগ্যতর লেখকদের হাতে।

ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে বিশ বৎসর যাবৎ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে ১৭৬৩ সালে সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পণ্ডিচেরী ও অপর কয়েকটি অঞ্চলের ফরাসী উপনিবেশ প্রত্যর্পণ করা হয়, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদেরই চরম আধিপত্য থাকে। বৃটিশেরই সৃষ্টি মহম্মদ আলিকে কর্ণাটকের নবাব রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, আর বৃটিশদের খাস দখলের এলাকাগুলি বিস্তৃত থাকে

মাদ্রাজের আশে পাশে কিছুটা অঞ্চল জুড়ে, এবং উত্তরদিকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পূর্ব সমুদ্রোপকূল জুড়ে।

কর্ণাটকের নবাব মহম্মদ আলির চরিত্র ছিল তাঁর সমসাময়িক বঙ্গদেশের নবাব মীরকাসিমের ঠিক বিপরীত। মীরকাসিন ছিলেন দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তি এবং কড়া শাসনকর্তা; মহম্মদ আলি ছিলেন দুর্বল চরিত্রের লোক এবং বিলাসবহুল নৃপতি। বৃটিশ প্রভাব থেকে দূরে নিজের প্রশাসন ব্যবস্থাকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে মীরকাসিম তাঁর সরকারের সদর দপ্তরকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেছিলেন; মহম্মদ আলি তাঁর নিজের রাজধানী আরকট ছেড়ে চলে এসেছিলেন বৃটিশের অধীনস্থ মাদ্রাজ শহরের বিলাসব্যসনের মধ্যে জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে। মীরকাসিম ছিলেন কড়া অর্থনীতিবিদ; সিংহাসন আরোহণের দু-বছরের মধ্যে তিনি বৃটিশদের প্রদেয় সমস্ত আর্থিক দায়দায়িত্ব পরিশোধ করেছিলেন; মহম্মদ আলি কোনো দিনই কোম্পানির দাবি শেষ পর্যন্ত মেটাতে পারেন নি, বরং আরো বেশি করে ঋণগ্রস্ত হয়েছেন। মীরকাসিম বঙ্গের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যকে তাঁর নিজের প্রজাদের হাতে রাখার জন্য বৃটিশের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন; মহম্মদ আলি তাঁর ভূমি-রাজস্বকে তাঁর বৃটিশ মহাজনদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত কার্যত তাঁর সমস্ত এলাকাই তাঁর পাওনাদারদের হস্তগত হয়। মীরকাসিম তাঁর নিজের রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে নির্বাসনে মৃত্যুবরণ করেছিলেন; মহম্মদ আলি বেঁচে ছিলেন অগৌরবজনক পরাধীনতা, বিলাস ও ঋণের মধ্যে এবং তাঁর মৃত্যু হয়েছিল পরিণত বৃদ্ধ বয়সে। প্রাচ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রকল্পের মধ্যে একজন কড়া শাসকের কোনো স্থান ছিল না; একজন দুর্বল শাসককে বেঁচে থেকে ঋণ করতে এবং তাঁর রাজ্যের রাজস্ব থেকে সুদ গুণে দিয়ে যেতে অনুমতি দেওয়া হত।

এই দুর্বল নৃপতির শাসনাধীনে কোম্পানির পক্ষে তার প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তৃত করা সহজ হয়েছিল। ১৭৬৫ সালে বঙ্গে কোম্পানি যেমন করেছিল, সে ভাবে তারা কর্ণাটকের দেওয়ান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। বরং, মহম্মদ আলিই ছিলেন নামত দেওয়ান বা রাজস্বপ্রশাসক তথা নিজাম বা সামরিক শাসক, আর কার্যত কোম্পানিই সমস্ত প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করত। দেশের সামরিক প্রতিরক্ষার ভার গ্রহণ করেছিল কোম্পানি, এবং নবাবের রাজস্বের একটি অংশ এই উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে বরাদ্দ ছিল। কোম্পানির চাহিদা তাদের যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে এবং কোম্পানির খাই মেটাবার

জন্য নবাব কোম্পানির কর্মচারীদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের বিচিত্র পন্থা গ্রহণ করেন।

এর চেয়েও যা তাৎপর্যপূর্ণ ও মারাত্মক, তা হল এই সমস্ত ব্যক্তিগত ঋণের জন্য নবাব যে-জামিন দিতেন, সেইটি। নিজের ভাণ্ডার থেকে আহরণ করতে অপারগ অথবা অনিচ্ছুক হওয়ায় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত পাওনাদারদের হাতে অম্লানবদনে তাঁর রাজত্বের রাজস্ব তুলে দিতেন। কর্ণাটকের চাষীরা নবাবের প্রতিনিধিদের শাসন থেকে চলে গেল বৃটিশ ঋণদাতাদের শাসনাধীনে। মাঠে যে ফসল জন্মাত, তার উপরে ছিল বৃটিশ পাওনাদারদের অলঙ্ঘনীয় দাবি। নবাবের কর্মচারীরা বলপ্রয়োগ করে এবং চাবুক ব্যবহার করে যা আদায় করত, তা তুলে দেওয়া হত কোম্পানির বৃটিশ কর্মচারীদের হাতে, যাতে তা ইউরোপে পাঠানো হয়। সমগ্র কর্ণাটক যেন অন্তঃসারশূন্য ডিমের খোলসের মতো হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত ও গ্রামগুলিকে পরিণত করা হয়েছিল এক বিশাল খামারে, এবং সেখানে চাষীরা চাষ করত আর মজুররা পরিশ্রম করত যাতে উৎপন্ন দ্রব্যের সমস্ত মূল্য প্রতি বছর ইওরোপে রপ্তানি করা যায়।

এই ভাবে দেশের প্রতি ও জনসাধারণের প্রতি দ্বিবিধ ক্ষতি করা হয়েছিল। নবাবের আদায়ের পদ্ধতি সর্বদা নির্মম ও কঠোর হলেও নমনীয় ছিল; এবং বছরে বছরে জমির উৎপন্ন দ্রব্য অনুযায়ী তাঁর চাহিদা মানানসই ছিল। কিন্তু যখন তাঁর পাওনাদাররা দৃশ্যপটে আবির্ভূত হল, তখন নবাবের পদ্ধতির নির্মমতার সঙ্গে যুক্ত হল বৃটিশ পদ্ধতির কঠোরতা ও অনমনীয়তা। নবাবের পাওনাদারদের দাবি কঠোরভাবে চাপিযে দেওয়া হল এবং কৃষিজীবীরা যে-চাপ ইতিপূর্বে খুব কমই ভোগ করেছেন, সেই চাপ ভোগ করতে লাগলেন। দ্বিতীয়ত, যতদিন পর্যন্ত নবাবই রাজস্ব ভোগ করতেন, ততদিন তা দেশেই ব্যয়িত হত এবং কোনো না কোনো রূপে জনসাধারণের কাছেই তা ফিরে আসত; কিন্তু যখন নির্ধারিত জেলাগুলির সমগ্র রাজস্ব বৃটিশ মহাজনরা দাবি এবং আদায় করতে লাগল, তখন তারা চিরতরে সে-অঞ্চল ছেড়ে চলে গেল। দেশ দরিদ্রতর হয়ে পড়ল, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি ঘটল।

ভারতে বিচারকার্য সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য ১৭৮২তে নিযুক্ত কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটি-কর্তৃক পরীক্ষিত সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মধ্যে আমরা এর প্রমাণ পাই।

"নির্দেশ অনুযায়ী হাজির জর্জ স্মিথ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কতদিন ভারতে বাস করেছেন, কোথায় এবং কোন্ পদাধিকারে? তিনি

বলেন তিনি ভারতে পৌঁছেছেন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ; ১৭৭৭ থেকে অক্টোবর ১৭৭৯ পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজে বসবাস করেছেন। প্রথম যখন তিনি মাদ্রাজ দেখেন সে সময় মাদ্রাজে বাণিজ্যের অবস্থা কী ছিল ; এই প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন যে জায়গাটি সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল এবং মাদ্রাজ ছিল ভারতের প্রথম শ্রেণীর বাণিজ্যস্থলগুলির অন্যতম। বাণিজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন্ অবস্থায় তিনি মাদ্রাজ ত্যাগ করেছিলেন এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন তাঁর মাদ্রাজ ত্যাগের সময়ে সেখানে বাণিজ্য ছিল অতি নগণ্য কিংবা আদৌ ছিল না বলা যায় এবং একটিই জাহাজ তখন সে অঞ্চলের মালিকাধীন ছিল। কর্ণাটকের গ্রামাঞ্চলের অভ্যন্তর সম্পর্কে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় হয় তখন সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাষবাসের অবস্থা কী ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে সে সময়ে তিনি কর্ণাটক সু-কর্ষিত ও জনবহুল অবস্থায় ছিল বলেই জানতেন, এবং সেই হেতু তখন সে অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রচুর সওদাগরী পণ্য ও বাণিজ্যসামগ্রী ব্যবহার করত। তিনি যখন মাদ্রাজ ত্যাগ করেন তখন চাষবাস, জনসংখ্যা ও আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের দিক থেকে সেখানকার অবস্থা কী ছিল, এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, চাষের দিক থেকে এবং জনসংখ্যার দিক থেকে সে অঞ্চল তখন ছিল অনেকখানি অবনতির পথে ; আর বাণিজ্যের ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।”[১]

মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়ে গঠিত কোম্পানির কর্মচারীরা নবাবকে প্রদত্ত তাঁদের ঋণ থেকে বিরাট সম্পত্তি গড়ে তুলছিলেন এবং তাঁরা কী করছেন সে-সম্পর্কে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সকে সম্পূর্ণরূপে অবহিত রাখতেও তাঁরা উদ্বিগ্ন ছিলেন না। অবশ্য কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নির্দেশে তাঁরা তাদের সমস্ত ঋণকে ১৭৬৭ সালের একটি থোক ঋণে পরিণত করেন ১০ শতাংশ মাঝামাঝি সুদের হারে এবং তাঁরা মাঝে মাঝে এই আশাও প্রকাশ করতে থাকেন যে নবাব তাঁর ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। অবশ্য এই লেনদেন বন্ধ করতে তাঁদেরও আগ্রহ ছিল না, অক্ষম, দুর্বল ও অযোগ্য নবাবেরও আগ্রহ ছিল না ; এবং তা কোনোদিন বন্ধও হয়নি। অবশেষে ১৭৬৯ সালে যখন এই লেনদেনের সম্পূর্ণ সরকারি বিবরণ ডিরেক্টরদের কাছে গিয়ে পৌঁছল, তখন তাঁদের ক্রোধ সীমা ছাড়াল।

“এই সমগ্র লেনদেনের ব্যাপারটি যেহেতু, আপনাদের পক্ষে বিরাট কলঙ্কজনক ভাবে, আমাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছে, সেই জন্য আমরা সন্দেহ না করে পারি না যে এই ঋণই আপনাদের প্রস্তাবিত মহম্মদ আলির

ধনবৃদ্ধির ব্যাপারে তার বিপুল ভার বিস্তার ঘটিয়েছিল ; কিন্তু তা করুক অথবা নাই করুক, একথা সুনিশ্চিত যে একথা আমাদের কাছে গোপন রেখে আপনারা কর্তব্য লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী হয়েছেন।”[২]

“প্রায় বিশ বছরের যুদ্ধে তাঁকে সমর্থন দানের জন্য নবাবের কাছে প্রাপ্য ঋণ আদায়ের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে আমাদের কর্মচারীরা তাঁদের কর্তব্যবোধ ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিভাবে এত বড় একটি সরকারি দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করতে পারেন, অথবা তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এসে নিজেদের কোনরূপ স্বার্থলাভ ঘটাতে পারেন ? কিংবা তাঁদেরই কাছে বন্ধক রাখা নবাবের রাজস্ব আদায়ে তাঁরা কোন সাহসে কোম্পানির শক্তি, প্রভাব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন ?”[৩]

“উক্ত গভর্ণর এবং কাউন্সিল তাঁদের উপরে ন্যাস্ত আস্থা কলঙ্কজনক ভাবে ভঙ্গ করে, কতকগুলি মূল্যবান জেলার যে-রাজস্ব কোম্পানির কাছে নবাবের ঋণ পরিশোধে প্রয়োগ করা উচিত ছিল, তাকে নবাবের কাছ থেকে ব্যক্তি-বিশেষের কাছে নির্দিষ্ট করে দেবার অনুমতি দিয়ে স্পষ্টতই কোম্পানির স্বার্থের চেয়ে কয়েকজন ব্যক্তির স্বার্থকেই শ্রেয়তর বলে বেছে নিয়েছিলেন ; যে-আচরণের অশোভনতা আরো বেশি প্রকট এই কারণে যে, ঐ সমস্ত রাজস্ব তার অস্তিত্বের জন্য কোম্পানির রক্ষাব্যবস্থার কাছে অনেকখানি ঋণী ; এবং উক্ত রাজস্বের এরূপ অস্বাভাবিক প্রয়োগের দরুন, কর্ণাটককে রক্ষা করার দায় ও ব্যয়ভার প্রধানত কোম্পানির উপর থাকলেও, নবাবের কাছে আমাদের প্রাপ্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ পরিশোধের সম্ভাবনা স্থগিত থেকেছে।”[৪]

কোম্পানির কর্মচারীদের কার্যত বঙ্গদেশে আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের দাবির বিরোধিতা যিনি করেছিলেন, সেই ওয়ারেন হেস্টিংস তখন মাদ্রাজ কাউন্সিলের একজন সদস্য, এবং তিনি আরকটের নবাব কর্তৃক মাদ্রাজস্থ কোম্পানির কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা ভূমি-রাজস্বের অবসান ঘটাবার একটি সৎ-প্রচেষ্টা করেন। তাঁর শৈলীর চিহ্নবাহী এবং তাঁর ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের অপর তিনজন সদস্যের স্বাক্ষরিত এক সুস্পষ্ট ও জোরালো চিঠিতে ডিরেক্টরদের পত্র পাবার পর মাদ্রাজে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

“আমরা মনে করি, আমাদের প্রতি আপনাদের নির্দেশের অর্থ ও সারমর্ম এই : নবাব তাঁর স্বহস্তে ও সীলমোহরে দলিলের সাহায্যে কর্ণাটকের একাংশের রাজস্বের দায়িত্ব প্রাপ্ত কিছু ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এই মর্মে যে-স্বত্ব হস্তান্তর করেন

যে, সেটি কোম্পানিকে বাদ দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে, তা আপনারা অত্যন্ত অপছন্দ করেন বলে আমাদের বলেছেন যে আপনারা নবাব অথবা আপনাদের কর্মচারীদের কারোই এরূপ এক স্বাধীন অধিকারের ধারণা বরদাস্ত করবেন না, এবং আমাদের আদেশ করছেন সেই হস্তান্তরের দলিল অনুযায়ী তারা যে অধিকার দাবি করছে সেই দাবি পরিত্যাগ করতে ; সে কাজটি করা হলে, আপনারা আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন নবাবকে এই কথা জানাতে যে তাঁর প্রথম বাধ্যবাধকতা হল কোম্পানির ঋণ পরিশোধ করা, এবং সে কাজটি সম্পন্ন করার পর, ব্যক্তিবিশেষের কাছে তাঁর ঋণ পরিশোধের জন্য নবাবের সঙ্গে একমত হয়ে আমরা যে ব্যবস্থা নেব তাতে কোম্পানির ক্ষমতার অনুমোদন দানের অধিকার আপনারা আমাদের দিচ্ছেন…

"প্রেসিডেন্ট মহোদয় ও মিঃ দু প্রে হস্তান্তরের দলিল অনুযায়ী তাঁদের সমস্ত দাবি আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিত্যাগ করেছেন এবং তাঁদের ঋণ আদায়ের জন্য নিজেদের কোম্পানির রক্ষণাধীনে এনেছেন ; এবং আপনাদের নির্দেশ প্রকাশ্যে অবহিত করাবার পর আরো বেশ কয়েকজন এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন : কিন্তু এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আমাদের প্রস্তাবিত ধরনে কোম্পানির রক্ষণাধীনে আসতে কার্যত অস্বীকার করায় আমরা বাধ্যতামূলক কোনো ব্যবস্থার দ্বারা এই দাবি চাপিয়ে না-দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করেছি।"[৫]

সেই বছরেই লিখিত আরেকটি চিঠিতে ওয়ারেন হেস্টিংস ইঙ্গিত দিয়েছেন, ব্যক্তিগত পাওনাদারদের হাতের পুতুল নবাব কিভাবে কোম্পানির বিরুদ্ধে এবং তাঁর পাওনাদারদের অনুকূলে ইংলণ্ডে প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন।

"অতি সাম্প্রতিককাল পর্যন্তও নবাব কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, এবং তাঁদেরই কোম্পানি বলে বিবেচনা করতেন ; এখন তাঁর দুষ্টবুদ্ধিদাতারা তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছে যে ঘরের বাইরে কোনো একটা পক্ষ তাঁর উপকারে আসতে পারে , তাঁকে বিশ্বাস করানো হয়েছে যে তাঁর ব্যক্তিগত পাওনাদারদের কোর্ট অব ডিরেক্টর্সকে বাতিল করে দেবার মতো ক্ষমতা ও প্রভাব আছে ; এবং সবচেয়ে যেটা খারাপ, মনে হয় এমন একটা অভিমত তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে যে পার্লামেণ্ট ও সম্রাটের ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে কোম্পানির বিরুদ্ধে তাঁর পক্ষে।"[৬]

নবাবকে ভুল জানানো হয়নি। তাঁর পাওনাদাররা হস্তান্তরিত জেলাগুলির খাজনা থেকে বিরাট সম্পত্তি সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁরা অচিরেও প্রচুর সংখ্যক

ভোট স্বপক্ষে পেতে এবং নিজেদেরই কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের প্রভু করে তুলতে সক্ষম হলেন। এবং আমরা এর পরে দেখতে পাব, শেষ পর্যন্ত তাঁদের সমস্ত দাবি তদন্ত ছাড়াই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে, নবাব তাঁর নিজের রাজ্যকে পাওনাদারদের কাছে ভাগে ভাগে হস্তান্তর করায়, সেখানকার সম্পদভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ করে এনেছেন এবং তাঞ্জোরের রাজার সমৃদ্ধ রাজ্যের উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে শুরু করেছেন। ১৭৬৯ সালে বৃটিশ ও হায়দার আলির মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তাতে তাঞ্জোরের রাজাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল বৃটিশের মিত্র বলে। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টর্স পর্যন্ত তাঁদের "মিত্রের" সম্পদ সম্পর্কে লোলুপ হয়ে উঠলেন, এবং মহম্মদ আলি যাতে কোম্পানিকে তাঁর ঋণ পরিশোধ করতে পারেন সে জন্য তাঁর প্রস্তাব সাগ্রহে শুনলেন।

ডিরেক্টররা লিখলেন, "আমাদের কাছে এটা খুবই অযৌক্তিক মনে হয় যে তাঞ্জোরের রাজা দেশের সবচেয়ে ফলপ্রদ অংশটিকে. যেটি একাই একটা সৈন্যবাহিনীকে তার জীবনধারণের উপযোগী সামগ্রী যোগাতে পারে, তা দখল করে থাকবেন, এবং কর্ণাটক রক্ষার ব্যবস্থায় কোনো সাহায্য করবেন না।··· আমরা তাই নবাবকে তাঁর দাবির ব্যাপারে আপনাদের এমন সমর্থন দান করতে নির্দেশ দিচ্ছি, যা সার্থক হতে পারে। এবং রাজা যদি যুদ্ধের ব্যয় বাবদ এক ন্যায়সঙ্গত অংশ দান করতে অসম্মত হন, তাহলে নবাব যে-ব্যবস্থাকে তাঁর ন্যায়বিচারের সঙ্গে ও তাঁর সরকারের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করবেন, আপনাদের সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। উপরোক্ত নির্দেশের পরিণামস্বরূপ তাঞ্জোরের রাজার কাছ থেকে যে-অর্থ ই আদায় হোক না কেন, আমরা আশা করি, তা কোম্পানির কাছে নবাবের ঋণ পরিশোধের জন্যই কাজে লাগানো হবে ; এবং সে-অর্থ যদি এই উদ্দেশ্যে যতটা দরকার তার চেয়েও বেশি হয়, তবে তা ব্যয়িত হবে ব্যক্তিবিশেষের কাছে তাঁর ঋণ পরিশোধ বাবদ।"[৭]

ইঙ্গিতটি ছিল বেশ ব্যাপক, এবং তদনুযায়ী কাজও করা হল। ১৭৭১ সালে তাঞ্জোর অবরোধ করা হয়। সে নিজেকে রক্ষা করে ৪,০০০,০০ পাউণ্ড প্রদান করে। কিন্তু এর ফলে নবাবের লোভ আরো বেড়ে গেল এবং তাঁর বন্ধু বৃটিশদের দিয়েও সহজেই একথা চিন্তা করানো গেল যে "প্রদেশের একেবারে কেন্দ্রে এরকম একটা শক্তি থাকা বিপজ্জনক।" আবার তাঞ্জোর অবরোধ করা হল এবং ১৬ সেপ্টেম্বর ১৭৭৩ তারিখে দখল করা হল ; হতভাগ্য

রাজা ও তাঁর পরিবারবর্গকে দুর্গে বন্দী করা হল ; এবং তাঁর রাজস্ব হস্তান্তরিত করা হল নবাবের কাছে।

তাঞ্জোর রাজ্য নবাবের সরকারের অধীনে চলে যাবার পর যে ভাবে কয়েক বছরের কুশাসনে দৈন্যদুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, এমন ভাবে আর কোনো উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হয়নি। তাকে একটা বৈরিভাবাপন্ন ও অধিকৃত দেশ বলে গণ্য করে মহম্মদ আলি জনগণের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন, তার রাজস্বকে তাঁর বৃটিশ পাওনাদারদের হাতে তুলে দেন এবং তার ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পকে ধ্বংস করেন ; আর, কয়েক বছরের মধ্যেই দক্ষিণ ভারতের উদ্যান তাঞ্জোর পরিণত হয় পূর্ব উপকূলের অন্যতম উষর স্থানে।

১৭৮২ সালে কমিটি অব সিক্রেসির সামনে সাক্ষ্যপ্রদান কালে মিঃ পেত্রি বলেন, "তাঞ্জোরের বর্তমান অবস্থার কথা বলার আগে কমিটিকে একথা জানানো দরকার যে খুব বেশি বছর আগেকার কথা নয়, সেই জেলাটিকে মনে করা হত হিন্দুস্থানের সবচেয়ে উন্নতিশীল, সবচেয়ে ভালো চাষবাস করা, জনবহুল জেলাগুলির অন্যতম বলে। আমি এই জায়গাটি প্রথম দেখি ১৭৬৮ সালে, তখন এখানকার চেহারা ছিল তার বর্তমান অবস্থা থেকে অনেক আলাদা। পূর্বে তাঞ্জোর ছিল এক বৈদেশিক ও আভ্যন্তরিক বাণিজ্যস্থল ; সে বোম্বাই ও সুরাট থেকে আমদানি করত তুলা, বঙ্গদেশ থেকে কাঁচা ও তৈরি রেশম, সুমাত্রা, মালাক্কা ও পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপগুলি থেকে চিনি, মশলাপাতি প্রভৃতি ; পেগু থেকে আমদানি করত সোনা, ঘোড়া, হাতি আর কাঠ ; চীন থেকে আনত বিভিন্ন বাণিজ্যোপকরণ। তাঞ্জোরের সাহায্যেই হায়দর আলির রাজ্যের একটা বড় অংশ এবং মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সরবরাহ হত বহু ইওরোপীয় পণ্যসামগ্রী এবং বঙ্গদেশের তৈরি একধরনের রেশম বস্ত্র, যা হিন্দুস্থানের দেশীয় লোকেরা প্রায় সকলেই তাদের পোশাকের অংশ হিসেবে পরে। তাঞ্জোরের রপ্তানি-সামগ্রী ছিল মসলিন, ছিট-কাপড়, রুমাল, রঙীন ডোরাকাটা কাপড়, বিভিন্ন ধরনের লং-ক্লথ এবং এক ধরনের মোটা ছাপা-কাপড়। আফ্রিকা, ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ ও দক্ষিণ আমেরিকার বাজারে শেষোক্তটির বিরাট চাহিদা থাকার ফলে ওলন্দাজ ও ডেনদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সেটিই হল একটি প্রধান দ্রব্য। তাঞ্জোরের চেয়ে বেশি প্রাকৃতিক সুবিধা খুব কম দেশেরই আছে ; সে এক সমৃদ্ধ ও উর্বর জমির অধিকারী, দুটি বিরাট নদী কাবেরী ও কোলেরুন থেকে সেখানে জল সরবরাহ হয় অত্যন্ত ভালোভাবে ;

জলাধার, স্লুইস ও খালের সাহায্যে এই নদী দুটির জল দেশের প্রায় প্রতিটি খেতেই ছড়িয়ে দেওয়া হয় ; এই শেষোক্ত কারণটির উপরেই আমরা তাঞ্জোরের অসাধারণ উর্বরতার কৃতিত্ব আরোপ করতে পারি। দেশটির চেহারা সুন্দরভাবে বৈচিত্র্যময় ; এবং চেহারার দিক থেকে আমার দেখা ভারতের অন্য যে কোনো অংশের তুলনায় সে ইংলণ্ডের অনেক কাছাকাছি। অল্প কয়েক বছর আগেও এই ছিল তাঞ্জোরের অবস্থা, কিন্তু এর অধঃপতন এত দ্রুত হয়েছে যে বহু জেলাতেই তার পূর্বতন সমৃদ্ধির অবশেষ খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর হবে।...

"আমাকে অবহিত করা হয়েছে, এই সময়ে (১৭৭১) পণ্য তৈরির কাজ উন্নত ছিল, দেশ ছিল জনবহুল ও সু-কর্ষিত, অধিবাসীরা ছিল বিত্তবান ও পরিশ্রমী। প্রথম অবরোধের কালপর্বে, ১৭৭১ সালের পর থেকে রাজার পুনঃক্ষমতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত—এই কালপর্বে, দেশ দুবার যুদ্ধের ক্ষেত্রস্বরূপ হওয়ায় এবং সরকারে বহু আলোড়ন ঘটায় বাণিজ্য, পণ্য-নির্মাণ ও কৃষি অবহেলিত হয় এবং বহু সহস্র অধিবাসী নিরাপদতর বাসস্থানের সন্ধানে অন্যত্র চলে যান।"[৮]

মাদ্রাজের এক নতুন গভর্নর নিয়োগের সময় উপস্থিত হয়। ফরাসি যুদ্ধের সময়ে মিঃ পিগট ছিলেন মাদ্রাজের গভর্নর, তিনি ইংলণ্ডে ফিরে যান ১৭৬৩ সালে এবং তারপরে যথাক্রমে ব্যারনেট ও আইরিশ লর্ডের মর্যাদায় উন্নীত হন। প্রদেশের প্রশাসনে সংস্কার প্রবর্তন করার আশায় তাঁকে ১৭৭৫ সালে পুনরায় মাদ্রাজের গভর্নর রূপে নিযুক্ত করা হয়। ডিরেক্টররা মহম্মদ আলির তাঞ্জোর অধিকার সর্বতোভাবে অনুমোদন করেন নি, এবং তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী লর্ড পিগট রাজাকে পুনরধিষ্ঠিত করতে মনস্থ করেন। এই পুনরধিষ্ঠান বন্ধ করার জন্য মহম্মদ আলি তাঁর সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করেন, কিন্তু লর্ড পিগট কৃতসংকল্প ছিলেন, এবং ৩০ মার্চ, ১৭১৬ তারিখে রাজাকে পুনরায় তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়।

গভর্নরের অসুবিধা তখন শুরু হয়। আরকটের নবাবের বহু পাওনাদারের মধ্যে, পল বেনফিল্ড নামে জনৈক ব্যক্তি ঈর্ষার অতীত এক উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছিলেন। তিনি ভারতে এসেছিলেন ১৭৬৩-তে কোম্পানির চাকরিতে, অসামরিক স্থপতি রূপে, কিন্তু তিনি তেজারতি কারবারের সাহায্যে তাঁর নিজের সম্পদসৃষ্টির স্থপতি রূপেই অধিকতর সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঞ্জোরের রাজাকে যখন তাঁর সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত করা হয়, তখন বেনফিল্ড দাবি করেন যে নবাবকে ঋণ-প্রদত্ত অর্থের জন্য তাঞ্জোরের রাজস্বের উপর তাঁর

১৬২,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ পর্যন্ত অধিকার আছে। এবং তাঞ্জোরে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ঋণ-স্বরূপ প্রদত্ত অর্থের জন্য ফসলের উপর তাঁর ৭২,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ পর্যন্ত অধিকার আছে। এই ঘটনা সেই সময়ের উপর জোরালো ভাবে আলোকপাত করে। বেনফিল্ড তখনও ছিলেন কোম্পানির একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী, বছরে বেতন পেতেন কয়েকশো পাউণ্ড; কিন্তু তিনি ছিলেন মাদ্রাজে সবচেয়ে সেরা গাড়ি ও ঘোড়ার মালিক এবং নবাবের কাছে তিনি অবিশ্বাস্য এক মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করেন। তাঁর দাবি মেটাবার জন্য একটি বিত্তশালী রাজ্যের রাজস্ব এবং একটি কৃষিজীবী জাতির ফসলকে বন্ধক রাখার সম্ভাব্যতার কথা বলা হল।

লর্ড পিগট বোর্ডের সামনে বেনফিল্ডের দাবি পেশ করেন। বেনফিল্ড কোনো প্রামাণিক দলিল দেখাতে অপারগ হন, কিন্তু বলেন যে নবাব তাঁর ঋণ স্বীকার করবেন। বোর্ড সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে বেনফিল্ডের দাবি যথেষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়নি, এবং তাঞ্জোরের রাজস্বের উপরে নবাবের অধিকার-নির্দেশ স্বীকৃতি যোগ্য নয়। বেনফিল্ড সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁরও বন্ধুবান্ধব ও সহায়সম্পদ ছিল। তাঁর দাবি পুনরায় কাউন্সিলের সামনে উপস্থিত করা হয়, এবং তা গ্রহণ করা হয়। রাসেলকে রেসিডেন্ট হিসেবে তাঞ্জোরে পাঠাবার জন্য লর্ড পিগটের প্রস্তাব অধিকাংশ সদস্যকে সন্তুষ্ট করেনি। কর্নেল স্টুয়ার্ট নাকি পাওনাদারদের স্বার্থে তাঞ্জোরের রাজকর্ম চালাতে সম্মত হয়েছিলেন। তাঁকেই বেছে নেওয়া হয়। লর্ড পিগট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে প্রতিরোধ করেন, এবং ২৪ আগস্ট ১৭৭৬ তারিখে তিনি কর্নেল স্টুয়ার্টের হাতে গ্রেপ্তার হন। তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়।

"কর্নেল স্টুয়ার্ট আমার সঙ্গে ডিনার খেলেন, এবং ডিনারের পর আমি তাঁকে কোম্পানির বাগানবাড়িতে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানালাম···রাত সাতটা থেকে আটটার মধ্যে আমি কর্নেল স্টুয়ার্টের সঙ্গে দুর্গ থেকে আমার গাড়ির দিকে গেলাম। দুটি সেতুর মাঝখানের দ্বীপটিতে আমি দেখলাম অ্যাডজুটান্ট জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্নেল এডিংটন দক্ষিণ দিক থেকে পথ দিয়ে তির্যকভাবে ছুটে আসছেন গাড়ির দিকে। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান মনে করে, আমি ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলাম; এবং এডিংটন ঘোড়াগুলির মাথার কাছাকাছি এসে উন্মুক্ত তরবারি আন্দোলিত করে 'সিপাই' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন; তাতে অপর দিকের গাছের আড়াল থেকে একদল সিপাই বেরিয়ে

আসে, এবং ক্যাপ্টেন লাইসট্ একটি পিস্তল হাতে নিয়ে সেই দিক থেকে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ান এবং আমাকে বলেন **'আপনি আমার বন্দী'**···তারপর ক্যাপ্টেন লাইসট্ আমাকে নিয়ে যান মিঃ বেনফিল্ডের গাড়িতে।"[৯]

কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এই সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে যান, কিন্তু তাঁদের মধ্যে মতভেদ ছিল। তাঁরা লর্ড পিগটের মুক্তির আদেশ দেন বটে, কিন্তু তাঁকে ফিরিয়ে আনার আদেশও দেন। এই আদেশ ভারতে পৌছবার আগেই লর্ড মান-অপমানের সীমার বাইরে চলে গেছেন। বন্দী অবস্থায় তিনি মারা যান ১৭৭৭ সালে। ১৭৭৮ সালে স্যার টমাস রামবোল্ড তাঁর পরে মাদ্রাজের গভর্ণর হয়ে আসেন।

নবাবের যে সমস্ত পাওনাদার ১৭৭৬ সালের এই উপপ্লব সংঘটিত করেছিলেন, তাঁরা নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। ইতিপূর্বে আমরা ১৭৬৭ সালের প্রথম ঋণটির কথা বলেছি। দ্বিতীয় ঋণটি দলিলীকৃত হয় ১৭৭৭ সালে। নবাবকে তাঁর অনাবশ্যক অশ্বারোহী বাহিনী বরখাস্ত করতে রাজী করানো হয়, কিন্তু তাদের বেতন মিটিয়ে দেবার মতো অর্থ ছিল না। টেলর, ম্যাজেণ্ডি ও কল ১৬০,০০০ পাউণ্ড অগ্রিম হিসেবে দিতে চান, অবশ্য কোম্পানি যদি এই ঋণ মঞ্জুর করেন। কোম্পানি তা মঞ্জুর করেন। রাজস্বও অবশ্য হস্তান্তর করা হয়, এবং দুবছর পরে নবাবের ম্যানেজার তাঁকে অনুযোগ করেন: "আপনার আদেশে ঐ জেলাগুলির সমস্ত রাজস্ব ইয়োরোপীয়দের প্রদত্ত টুংক মেটাবার জন্য আলাদা করে রাখা হয়। মিঃ টেলরের গোমস্তরা··· সেই টুংক আদায়ের জন্য সেখানে আছে, এবং সংগৃহীত সমস্ত রাজস্বই তারা পায় বলে আপনার সৈন্যদের সাত-আট মাসের বেতন বাকি পড়েছে, এই বেতন তারা পাচ্ছে না।"

১৭৭৭-এর এই ঘটনাবহুল বছরে ২০ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিংয়েরও বেশি তৃতীয় একটি ঋণেরও ব্যবস্থা হয়, এবং স্যার টমাস রামবোল্ড মাদ্রাজে পৌছবার পর এই নতুন ঋণ সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গত ক্ষোভের সঙ্গে লেখেন:

"আমার এখানে এসে পৌছবার পর যখন আমাকে জানানো হল যে এই চার লাখ প্যাগোডা (১৬০,০০০ পাউণ্ডের অশ্বারোহী বাহিনী বাবদ ঋণ) ছাড়াও, পুরনো পাওনাদারদের কাছে নবাবের ঋণ ও কোম্পানিকে প্রদেয় অর্থ ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে তিনি এক বিরাট অঙ্ক—৬৩ লক্ষ প্যাগোডা (২,৫২০,০০০ পাউণ্ড) ঋণ দলিলীকৃত করেছেন, তখন আমার সেই বিস্ময়ের কথা আপনাদের কাছে বর্ণনা করার ভাষা আমি খুঁজে পাই না। আমি আতঙ্কের সঙ্গে

আপনাদের কাছে এই অবস্থা উল্লেখ করছি, কারণ সাধারণ ভাবে এই পাওনাদাররা কোম্পানির কর্মচারী হওয়ায় কোম্পানির পক্ষ থেকে আমার কাজ দুরূহ ও মনোমালিন্যজনক হয়ে পড়ে।"[১০]

কর্ণাটকের এই শোচনীয় অবস্থার দিক থেকে স্যর টমাস রামবোল্ড দৃষ্টি ফেরান উত্তরাঞ্চলের 'সরকার'গুলির দিকে—উত্তরদিকে প্রসারিত যে সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ বৃটিশদের অধিকারে ছিল। এই অঞ্চলটি বিলি করে দেওয়া ছিল জমিদারদের মধ্যে, এঁরা ছিলেন পুরুষানুক্রমে জমিদার তথা নিজস্ব ভূসম্পত্তির সীমানার মধ্যেকার শাসক নৃপতি। এই জমিদারদের প্রতি কোম্পানির প্রশাসন ছিল কঠোর, এবং তাঁদের ভূসম্পত্তি দারিদ্র্যদশাপ্রাপ্ত হয়। স্যর টমাস রামবোল্ড স্বয়ং তাঁদের পূর্বেকার সমৃদ্ধি ও বর্তমান দুর্দশার বাঙ্ময় সাক্ষ্য বহন করেন।

"ভারতে কোম্পানির শাসনের উদ্দেশ্যে এটি একটি চিরন্তন ভর্ৎসনা হিসেবে থাকবে যে, সামাজিক প্রতিপত্তিসম্পন্ন প্রতিটি দেশীয় ব্যক্তিকে তাঁদের অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করাটাই যেন তাদের কর্মনীতির মূল নীতি ছিল। বঙ্গদেশ ও 'সরকারগুলি'র অধিকতর সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ দিনগুলি থেকে তাদের বর্তমান জনহীন পরিত্যক্ত দশা লক্ষ্য করেছেন, এমন কোনো ব্যক্তি এগিয়ে এসে জাতির কাছে—যার সুনাম ও সম্মান এই প্রশ্নের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত—ব্যাখ্যা করে বলুন এই সমস্ত দেশে একদা যে সমস্ত নৃপতি, ভূস্বামী ও বিত্তবান জমিদারদের দেখা যেত তাঁদের কী হয়েছে?...

"সম্প্রতি কোম্পানি যে-ভাষা অবলম্বন করেছেন, তা থেকে জনসাধারণ এই সিদ্ধান্ত করতেই বাধ্য হবেন যে কোম্পানি এদেশে শুধু সার্বভৌমত্বের কিছু অধিকার লাভ করতেই সক্ষম হননি, তাঁরা জমির একমাত্র মালিকে পরিণত হয়েছেন! আর এই সমস্ত সম্ভ্রান্ত জমিদাররা, ইয়োরোপে অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে এমন বংশধারা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমির প্রকৃত ও একমাত্র মালিকরা হঠাৎ রূপান্তরিত হয়েছেন কৃষকে কিংবা বরং বলা যায় কোম্পানির ক্ষেতে নিছক চাষী ও মজুরে। এই ভূস্বামীরা মোগল হানাদারদের (তারা কখনোই তাদের দেশকে সম্পূর্ণরূপে পদানত করতে পারে নি) যে নজরানা দিত, খাজনা নয়, তা ছিল অনেকটা তাঁদের পুরনো স্বাধীনতার জন্য মুক্তিপণ স্বরূপ। এটা ছিল তাঁদের সম্পত্তি, সুযোগসুবিধা, রীতিনীতি ও আচার-আচরণ নির্বিঘ্নে বজায় রাখার মূল্য। তা সর্বদা নির্ধারিত হত পরিমিতি সহকারে, এঁদের মতো সামাজিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের দেশের

জনমতের প্রয়োজনে যে-বিরাট গৃহস্থালি চাকরবাকর-কর্মচারীদের রাখতে হত, যথাযথ ভাবে তা বিবেচনা করে। জমিদারদের সঙ্গে সুবাহ্ (মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি) বন্দোবস্ত করেছিলেন খাজনা-আদায়ের পরে কোনরূপ হস্তক্ষেপের চেষ্টা না করে। 'সরকার'গুলি কোম্পানির হাতে সমর্পিত হবার পর যদি সেই বিজ্ঞজনোচিত নিয়ম চালিয়ে যাওয়া হত তাহলে তা সকলের পক্ষেই সুখের হত। দেশ সমৃদ্ধ হত এবং কোম্পানি তাঁদের করদ নৃপতিদের সমৃদ্ধিতে নিজেও সমৃদ্ধ হতেন।"[১১]

স্থানীয় অনুসন্ধানাদির পর উত্তরাঞ্চলে 'সরকার'গুলির জমিদারগণ কর্তৃক প্রদেয় রাজস্বের বন্দোবস্ত করার জন্য এক 'সার্কিট কমিটি' গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। স্যর টমাস রামবোল্ডে এই কমিটি বাতিল করে দেন, এবং জমিদারদের মাদ্রাজে আসার নির্দেশ দেন। এর ফলে তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট আতঙ্কের সঞ্চার হয়; কিন্তু মাদ্রাজে আহূত একত্রিশ জন জমিদারের মধ্যে আঠারো জন এই নির্দেশ পালন করেন। পাঁচ বছরের জন্য বন্দোবস্ত করা হয় এবং 'সরকারগুলি'র সঙ্গে কোম্পানির সংযোজনের পর বিভিন্ন সময়ে রাজস্বের সঙ্গে যত অর্থ যোগ হয়েছে তার মোট পরিমাণ হল পুরনো ব্যবস্থার চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি।"[১২]

কিন্তু ডিরেক্টররা সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁদের মনে হল সার্কিট কমিটি এর চেয়ে আরো বেশি সন্তোষজনক ফল দেখাত। কমিটি বাতিল করায় তাঁরা স্যর টমাস রামবোল্ডকে আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে এবং জমিদারদের মাদ্রাজে ডাকায় তাঁদের প্রতি কঠোরতা দেখানো হয়েছে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও করেন, এবং দেখান যে তিনি দু-বছরের মধ্যে ইয়োরোপে ১৬৪,০০০ পাউণ্ড পাঠিয়েছেন। তদনুযায়ী তাঁরা জানুয়ারী ১৭৮১-তে কোম্পানির চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করেন।

লর্ড ম্যাকার্টনি নামক সুমার্জিত ও বিবেচক, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও সন্দেহাতীত প্রতিভার অধিকারী একজন সম্রান্ত ব্যক্তি মাদ্রাজের গভর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি এসে পৌছান জুন ১৭৮১-তে। প্রদেশটি তখন ছিল দুঃখদুর্দশার নিম্নতম গহ্বরে। দীর্ঘকালের কুশাসনের ফলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মহীশূর রাজ হায়দার আলির সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধজনিত নিদারুণ দুর্দশা। তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত বিধ্বস্ত করেছিল, মাদ্রাজের চারপাশে বহু মাইল পরিধির মধ্যে ধ্বংস ও জনশূন্যতা ঘটিয়েছিল, এবং কর্ণাটক অঞ্চলকে

আতঙ্কে পরিপূর্ণ করেছিল। লোকজন পালিয়ে গিয়েছিল জঙ্গলে, ক্ষেতগুলি পড়েছিল অকর্ষিত অবস্থায়, গ্রামগুলিকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল। আতঙ্কের পর আতঙ্ক দেখা দিচ্ছিল, আর অন্যদিকে মাদ্রাজে কাউন্সিল এই ভয়ঙ্কর শত্রুকে মোকাবিলা করার পরিকল্পনা নিয়ে দোদুল্যমানতার পরিচয় দিচ্ছিলেন।

এই যুদ্ধের ঘটনাবলীর মধ্যে প্রবেশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ওয়ারেন হেস্টিংস তখন গভর্ণর জেনারেল। তিনি আরো একবার দক্ষিণ ভারতকে রক্ষা করার জন্য প্রবীণ কম্যাণ্ডার স্যর আয়ার কুটকে প্রেরণ করেন। স্যার আয়ার হায়দার আলির সঙ্গে চারবার যুদ্ধ করেন। হায়দার আলি পশ্চাদপসরণ করেন বটে, কিন্তু পর্যুদস্ত হন না। সেপ্টেম্বর ১৭৮২-তে স্যার আয়ার মাদ্রাজ ত্যাগ করে বঙ্গদেশে যান এবং ডিসেম্বর ১৭৮২-তে হায়দার আলির মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র টিপু সুলতানের সঙ্গে ১৭৮৩ সালে শান্তি স্থাপিত হয়।

এই পুঞ্জীভূত দুঃখদুর্দশা, তার সঙ্গে জনসাধারণের দারিদ্র্য ১৭৮৩ সালে মাদ্রাজের ব্যাপক ও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের জন্ম দিল। কোম্পানির রাজস্বে সাধারণভাবে উদ্বৃত্ত দেখানো হলেও সেগুলির "লগ্নী" অর্থাৎ ইয়োরোপে বিক্রয়ের জন্য সেই রাজস্ব দিয়ে কেনা পণ্য ও বাণিজ্যসম্ভার উদ্বৃত্তকে পরিণত করল ঘাটতিতে। সরকারী নথিপত্র[১৩] থেকে নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানগুলি গৃহীত: (১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য—সম্পাদক)

উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি যাই হোক না কেন, 'লগ্নী' ক্রয় কখনও বন্ধ হয়নি; এবং এই সময়ে কেবল উৎপাদনের প্রাথমিক খরচের হিসেবে যে-পরিমাণ পণ্যসামগ্রী ইয়োরোপে পাঠানো হয় তার মূল্য ২০ লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশি ছিল।

কিন্তু যে সমস্ত বৃটিশ পাওনাদার তাঁদের ঋণের দরুন রাজস্বের নির্দিষ্ট অধিকার পেয়েছিলেন, তাঁদের দ্বারা কোম্পানির কর আদায়ের নিষ্করুণতা দশগুণ বৃদ্ধি পায়। এবং বিষয়টি যখন চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য কমন্স সভায় উত্থাপিত হয় তখন সেই সমস্ত পাওনাদারদের সৃষ্ট প্রভাব এত বিরাট ছিল যে সমস্ত তথাকথিত দাবি—জাল অথবা খাঁটি—অনুসন্ধান ছাড়াই মেনে নেওয়া হয়।

পাওনাদারদের মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সফলতম ব্যক্তি পল বেনফিল্ড তাঁর ভারতে সঞ্চিত বিশাল বিত্তকে ব্যবহার করেন ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টারি প্রভাব সৃষ্টির জন্য। পার্লামেণ্টে তিনি নিজেকে নিয়ে আটজন সদস্যকে নির্বাচিত করান, এবং তিনি ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন বলে তাঁকে অসন্তুষ্ট করার সাহস

মন্ত্রিসভার ছিল না। "আরকটের নবাবের প্রতারণাপূর্ণ এবং প্রতারণাপূর্ণ নয় এমন পাওনাদার ও জীবদের সৃষ্ট এক বৃহৎ সংসদীয় স্বার্থের দুর্নীতিপূর্ণ সুবিধা ভোগের জন্যই···১৭৮৪ সালের মন্ত্রিসভা স্থির করেন যে, প্রতারণাপূর্ণ হোক অথবা নাই হোক, তাঁরা সবাই তাঁদের দাবি অনুযায়ী পাবেন।"[১৪]

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ১২ বছরের আয় ও ব্যয়—

বছর	মোট নীট রাজস্ব	অসামরিক ও সামরিক খাতে কোম্পানি কর্তৃক মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত	ঘাটতি
মে থেকে এপ্রিল	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
১৭৬৭ „ ১৭৬৮	৩৮১,৩৩০	৪৮৯,০১২	—	১০৭ ৬৮২
১৭৬৮ „ ১৭৬৯	৩৬৯,৭২০	৬৯১,৪৭১	—	৩২১,৭৫১
১৭৬৯ „ ১৭৭০	৫০০,১১০	৪৬৭,৪৯২	৩৬,৬১৮	—
১৭৭০ „ ১৭৭১	৫৬২,৩৫৯	৪৩৪,৩৯৩	১২৭,৯৬০	—
১৭৭১ „ ১৭৭২	৫৫৮,৮৬০	৪০৭,৩৪৬	১৫১,৪১৪	—
১৭৭২ „ ১৭৭৩	৫২৯,২৩৩	৩০৯,১৩৮	২২০,০৯৫	—
১৭৭৩ „ ১৭৭৪	৫২৪,৭৬২	৪০৭,১৪৪	১১৭,৬১৮	—
১৭৭৪ „ ১৭৭৫	৫০৩,৬২৯	৪৫৪,৫৮৯	৪৯,০৪০	—
১৭৭৫ „ ১৭৭৬	৫১৪,৫৯১	৩৪৫,৮৬৭	১৬৮,৭২৪	—
১৭৭৬ „ ১৭৭৭	৫৬৩,৩৪৯	৫৩৩,১৮২	৩০,১৬৭	—
১৭৭৭ „ ১৭৭৮	২৮৩,১৯৮	৪৮৫,৮৩০	—	২০২,৬৩২
১৭৭৮ „ ১৭৭৯	৪৯৪,২০৮	৮০৩,৯২৪	—	৩০৯,৭১৬
মোট	৫,৭৮৫,৩৪৯	৫,৮২৯,৪৮৮	৮৯৭,৬৪২	৯৪১,৭৮১

আমরা যাঁর রচনা থেকে উপরোক্ত অংশটি উদ্ধৃত করলাম, বৃটিশ শাসিত ভারতের সেই ঐতিহাসিক এরপর এডমণ্ড বার্কের চিরস্মরণীয় সেই বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যাতে তিনি বৃটিশ সংসদীয় ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক এই ঘটনাটির নিন্দা করেছিলেন।

"পল বেনফিল্ড হলেন এক বিরাট সংসদীয় সংস্কারক। সাম্রাজ্যের কোন অঞ্চল, কোন শহর, কোন বরো, কোন কাউন্টি, এই রাজ্যে কোন ট্রাইবুন্যাল তাঁর পরিশ্রমে পূর্ণ নয়? সমস্ত ভবিষ্যৎ সংস্কারকর্মের জন্য এক ঘনবিন্যস্ত ব্যূহ মোতায়েন করার উদ্দেশ্যে, লোকহিতৈষণার মনোবৃত্তিসম্পন্ন এই কুসীদজীবী ভারতের ত্রাণের জন্য তাঁর বদান্যতাপূর্ণ পরিশ্রমের মধ্যে তাঁর স্বদেশের দুর্দশাগ্রস্ত দরিদ্র অবস্থার কথা বিস্মৃত হন নি। প্রাচীন বিবর্ণ কারুকার্যময় পর্দায় অঙ্কিত মানুষের চেহারা দিয়ে অন্য কোনো (সংসদ) কক্ষকে যেমন সুসজ্জিত অথবা কুৎসিত করা হয়, দেশের জন্য তিনি এই কক্ষকে নিছক সেরূপ বস্তু দিয়ে নয়, বরং সত্যকার আধুনিক গুণসম্পন্ন বাস্তব, সারবান ও জীবন্ত নকশা দিয়ে অলঙ্কৃত করার জন্য পাইকারি গৃহসজ্জা নির্মাতার কাজ গ্রহণেও ঘৃণাবোধ করেন নি। পল বেনফিল্ড নিজেকে নিয়ে অন্তত আটজনকে গত সংসদের সদস্য করেছেন। বর্তমান সংসদের ধমনীতে তিনি বিশুদ্ধ রক্তের কী প্রাচুর্যপূর্ণ ধারাই না সঞ্চালন করে থাকবেন...

"আপনাদের মিনিস্টারের জন্য এই ক্লান্ত প্রবীণ ব্যক্তিটি [বেনফিল্ডের প্রতিনিধি] লণ্ডনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধূলিধূসর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে রাজী হয়েছিলেন; এবং আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে সেই সুনীতিপূর্ণ কাজে তিনি এক ধরনের সাধারণ অফিস বা লেনদেনের অফিস চালাতে রাজী হয়েছিলেন, সেখানে বিগত সাধারণ নির্বাচনের গোটা ব্যাপারটা সামলানো হয়েছিল। বেনফিল্ডের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি ও অ্যাটর্নি একাজ প্রকাশ্যেই চালিয়েছিল। কাজটা চালানো হয়েছিল ভারতীয় নীতি অনুযায়ী এবং এক ভারতীয় স্বার্থে। এটা ছিল জঘন্য বস্তুতে পরিপূর্ণ স্বর্ণপাত্র...যে পানপাত্রটি বহু মানুষ, এদেশের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিঃশেষে পান করছেন। আপনারা কি মনে করেন যে এরপর এই ইতর লম্পটের বিচার হবে না? এই উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশ্য মাতলামি ও জাতীয় গণিকাবৃত্তির জন্য মূল্য দাবি করা হবে না? বিষয়টি এখানেই রয়েছে, আপনাদের সামনেই রয়েছে। বিরাট নির্বাচন ব্যবস্থাপকের কর্তাকে অবশ্যই নিরাপদ করতে হবে। তদনুযায়ী, বেনফিল্ড ও তাঁর দলবলের দাবিকে রাখতে হবে সমস্ত তদন্তের ঊর্ধ্বে।"[১৫]

স্বর্ণপাত্রটি নিঃশেষে পান করেছিলেন ইংলণ্ডের জনসাধারণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা, আর তার খরচ দাবি করা হল ভারতের কাছে। বেনফিল্ডের দাবি সম্পর্কে কোনো তদন্ত করা হল না, কারণ অর্থ দিতে হবে কর্ণাটকের চাষীদের। এ ধরনের সমস্ত দাবি মেনে নেওয়ার ফলে পাপ বাড়ল, এবং দলে দলে বৃটিশ ঋণদাতারা কর্ণাটকে গিয়ে ভীড় জমাল অনুরূপভাবে দ্রুত সম্পদবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। কর্ণাটকের নবাবের নামে ২০,৩৯০,৫৭০ পাউণ্ড পরিমাণের নতুন দাবি রাখা হয়, এবং এই সমস্ত দাবির নিষ্পত্তি করার জন্য কমিশনার নিয়োগ করা হয়। ইতিমধ্যে লর্ড ওয়েলেসলি কর্ণাটক দখল করেছেন, কর্ণাটক তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত। সেই সমস্ত দাবি যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবে তা মেটাতে হবে কোম্পানির সরকারকে, নবাবকে নয়। তাই একটি তদন্ত করা হয়; এবং এই তদন্তের ফল হল এই যে মাত্র ১,৩৪৬,৭৯৬ পাউণ্ড পরিমাণ অর্থের দাবিকে বৈধ বলে স্বীকার করা হয় এবং অবশিষ্ট অর্থকে—১৯০ লক্ষ স্টার্লিংয়েরও বেশি—বাতিল করা হয় জাল এবং অবৈধ বলে।

১। Ninth Report, 1783, Appendix, p. 120.

২। Court of Directors to the President and Council at Fort St George, dated 17th March, 1769.

৩। Court of Directors to the Select Committee at Fort St. George, dated 17th March, 1769. পাঠক লক্ষ্য করবেন যে ভারতবর্ষে আধিপত্য লাভের জন্য ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধকে ডিরেক্টরগণ উপস্থাপিত করেছিলেন নবাবের জন্য চালিয়ে যাওয়া সংগ্রাম হিসাবে, নবাবকেই যুদ্ধের সমস্ত ব্যয়বহন করতে হবে।

৪। Court of Directors to the Superintending Commissioners, dated 23rd March, 1770. রাজস্ব নির্ধারণ কোর্টের কাছে "অস্বাভাবিক" ঠেকেছিল। তার কারণ এই নয় যে দেশকে তা দরিদ্র করে তুলেছিল, আসল কারণ কোম্পানিকে নবাবের ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা এতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

৫। Select Committee at Fort St. George, to the Court of Directors, dated 31st January, 1770.

৬। Select Committee at Fort St. George, to the Court of Directors, dated 6th April, 1770.

৭। Court of Directors to the Select Committee at Fort St, George, dated 17th March, 1769.

৮। Fourth Report of the Committee of Secrecy, 1782, Appendix, No. 22.

৯। Lord Pigots' *Narrative of the Revolution in the Government of Madras*, dated 11th September, 1776, p. 11 et Seg.

১০। Letter to the Court of Directors, dated 15th March, 1778.

১১। *An Answer to the Charges exhibited against Sir Thomas Rumbold.* By himself, pp. and 22.

১২। *Ibid.*, p. 32. উদাহরণস্বরূপ, পেড্ডাপোরের জমিদার মুঘল শাসনে ৩৭,০০০ পাউণ্ড দিতেন। স্যর টমাস রামবোল্ড ঐ রাজস্ব ৫৬,০০০ পাউণ্ডে বর্দ্ধিত করেছিলেন। একটি মাত্র দরিদ্র এস্টেট বাদে আর সমস্ত জমিদারীতেই রাজস্বের অনুরূপ বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

১৩। Fourth Report of the Committee of Secrecy, 1782, pp. 672 and 674.

১৪। Mill's *History of British India*, book vi, chap I.

১৫। Burke's speech on the Nawab of Arcots' debts.

সপ্তম অধ্যায়

মাদ্রাজের পুরনো ও নতুন অধিকৃত অঞ্চল (১৭৮৫-১৮০৭)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পিটের ইণ্ডিয়া বিল ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে আইনে পরিণত হয়। ঐ তারিখ পর্যন্ত মাদ্রাজ প্রদেশে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রত্যক্ষ অধিকার বলতে বোঝাত মাদ্রাজ নগরীর চারপাশের সামান্য এলাকা ও 'উত্তর সরকার' বলে পরিচিত সমুদ্রকূলবর্তী অপ্রশস্ত দীর্ঘ অঞ্চল। কাজেই মাদ্রাজের প্রথম ভূমি-বন্দোবস্ত এই সব সরকার বা রাজ্যেই হয়েছিল।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দেই লর্ড ক্লাইভ যখন কোম্পানির হয়ে বঙ্গদেশের দেওয়ানী লাভ করেছিলেন, সেই সময়েই মুঘল বাদশাহের কাছ থেকে চিকাকোল, রাজমুন্দ্রি, এলোর ও কোণ্ডপিল্লি—এই চারটি সরকারও অনুদান হিসেবে লাভ করেছিলেন। কিছুদিন দেশীয় প্রশাসনের পর এই সরকারগুলির শাসনভার প্রাদেশিক অধিকর্তা ও পরিষদের (Provincial Chiefs and Councils) ওপর ন্যস্ত করার ফলে শাসনব্যবস্থা বঙ্গদেশের জিলাসমূহের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ হয়।

জনসংখ্যা, উৎপাদন ও শিল্পসামগ্রী উৎপাদনের পরিস্থিতি নির্ধারণ, এবং রাজ্যের মোট রাজস্বের পরিমাণ এবং জমিদার ও কৃষকদের প্রথাগত অধিকার নির্ধারিত করার উদ্দেশ্যে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে পরিচালকবর্গের সভা (Court of Directors) উত্তর সরকারের পরিস্থিতি অনুসন্ধান করার জন্য একটি পরিক্রমণকারী কমিটি (Committee of Circuit) নিয়োগের স্বপক্ষে নির্দেশ জারী করেন।[১] বাৎসরিক আয় সম্পর্কে জমিদারদের নিরাপত্তা দেওয়া ও অন্যায় শোষণ থেকে কৃষকদের রক্ষা করবার ইচ্ছাও সভা জানিয়েছিলেন। বঙ্গদেশে যে প্রবিধানগুলি কার্যকরী হয়েছে, 'সরকারে'ও সে ধরনের প্রবিধান প্রবর্তন করা সম্ভবপর কি না সেটা স্থির করার ইচ্ছাও সভার ছিল। সেই মোতাবেক একটি কমিটিও নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে স্যার টমাস রামবোল্ড সে কমিটি নাকচ করে দেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সে কথা বলা হয়েছে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কমিটি আবার পুনর্জীবন লাভ করে এবং ১৭৮৮ পর্যন্ত অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে যায়।

এই কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তাতে দেখা যায় যে 'উত্তর সরকারে' মুখ্যত জমিদারগণই জমির মালিক ছিলেন। পাহাড়ী এলাকার জমিদারগণ উড়িষ্যার রাজ্যের রাজাদের বংশধর ছিলেন। নিজ রাজ্যে তাঁরা কার্যত স্বাধীন

ছিলেন। তাঁরা মুসলমান শাসকদের একটা নির্ধারিত কর মাত্র দিতেন। সমতল অঞ্চলের জমিদারগণ অবশ্য অনেকখানি সরকারের অধীনেই ছিলেন কিন্তু সরকারকে একটা নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে তাঁরা জমিদারীর খাজনা ভোগ-দখলের অধিকারী ছিলেন।

জমিদারী জমি বাদেও, হাবেলি জমি নামে কিছু খাস জমি বা সরকারের নিজস্ব কিছু জমি ছিল। হাবেলি জমি বলতে বোঝাত রাজধানীর সন্নিহিত পল্লী অঞ্চল। সৈন্যবাহিনীর ছাউনি ও মুসলমান শাসকদের বেসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির সরবরাহের প্রয়োজনে তা সংরক্ষিত থাকত। "বৃটিশ শাসন চালু হবার পর থেকে এগুলিকে (হাবেলি জমি) সঠিক ভাবে এমন অঞ্চল বলে বর্ণনা করা যেতে পারে যা জমিদারগণের হাতে নেই, আছে সরকারের হাতে, এবং সেখানে রায়তদের কাছ থেকে ভূমি-রাজস্ব আদায় করবার জন্য পছন্দমাফিক শাসনব্যবস্থা বেছে নেওয়া যেতে পারে।" যে ব্যবস্থাটি প্রকৃতপক্ষে গ্রহণ করা হয়েছিল তা অবিবেচনাপ্রসূত ছিল। হাবেলি-জমিগুলি মুৎসুদ্দি বা ফাট্কাবাজ খাজনাবিলি করা জমিভোগকারীদের ইজারা দিয়ে দেওয়া হয়, তারা এইভাবে "অত্যাচারের চমৎকার পন্থার"[২] অধিকারী হয়ে দাঁড়ায়।

কি-জমিদারী ও কি-হাবেলি এলাকা, উভয় অঞ্চলেই স্মরণাতীত কাল থেকে গ্রামসমাজ (village Community) ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসনের একটা প্রকারভেদ মাত্র, যা প্রত্যেক গ্রামের কৃষককে জমিদার ও সরকারের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করত। মনুর যুগের এই প্রাচীন প্রথা বহু রাজ-বংশের বিনাশ ও সাম্রাজ্যের পতনের পরও বেঁচে ছিল, যুদ্ধের সময় গ্রামগুলির শান্তি ও শৃংখলায় নিরাপত্তা এনেছিল, এবং এক অদ্বিতীয় ও চমৎকার প্রথা হিসাবে অষ্টাদশ শতকে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

"ভৌগোলিক বিচারে একটি গ্রাম হ'ল কয়েক শত বা কয়েক হাজার কর্ষণ-যোগ্য ও পতিত জমি নিয়ে গঠিত এলাকা; রাজনৈতিক দিক থেকে এর সাদৃশ্য আছে নিগম (Corporation) বা পৌরাঞ্চলের (Township) সঙ্গে। গ্রামের কর্মকর্তা ও সাধারণ কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নলিখিত বর্ণনানুযায়ী গঠিত। প্যাটেল (*Patail*) বা গ্রামমুখ্য – গ্রামের সমস্ত ব্যাপারেই তিনি তত্ত্বাবধায়ক। গ্রামের অধিবাসীদের বিবাদের নিষ্পত্তি তিনিই করেন, শান্তি-রক্ষীদের মোলাকাত করেন ও যে কথা আগেই বলা হয়েছে, নিজ গ্রামের মধ্যে রাজস্ব আদায়ের কাজও তিনিই করেন। ব্যক্তিগত প্রভাব এবং গ্রামবাসীদের পরিস্থিতি ও অবস্থা সম্পর্কে গভীর পরিচিতি তাঁকে এ কাজে যোগ্যতম ক'রে

তোলে। কর্ণম (*Curnum*) হলেন কৃষির হিসাবরক্ষক, কৃষিসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তিনি লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তালিয়ার ও তোতির (*Talliar* and *Totie*) মধ্যে দেখা যায় তালিয়ার-এর কার্যক্ষেত্র, প্রশস্ত ও বিস্তৃততর ছিল। তার কাজ অপরাধ ও অভিযোগের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করা এবং এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ভ্রমণরত ব্যক্তিকে সঙ্গদান ও রক্ষা করা। তোতিয়ের কার্যক্ষেত্র মনে হয় একেবারে গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্যান্য কাজের মধ্যে তাকে শস্য পাহারা দিতে এবং শস্যের পরিমাণ পরিমাপে সহায়তা করতে হয়। সীমানারক্ষক গ্রামের সীমা ঠিক রাখেন ও সীমানা নিয়ে বিবাদের সময় সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন। জলাধার ও খালবিলের অধ্যক্ষ কৃষির জন্য জল বণ্টন করে থাকেন। ব্রাহ্মণ গ্রামের পূর্জাচনা করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বালির উপরে গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে দেখা যায়। পঞ্জিকা-ব্রাহ্মণ বা জ্যোতিষী বীজবপন ও মাড়াইএর শুভাশুভ কাল ঘোষণা করেন। কর্মকার ও সূত্রধর কৃষির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রায়তদের গৃহ নির্মাণ করেন। গ্রাম সমাজে আছেন কুম্ভকার, রজক; নরসুন্দর; গোপালক বা গোমহিষাদি রক্ষক; বৈদ্য; আমোদ উৎসবে যোগদানকারিণী নর্তকী, সঙ্গীতকার ও কবি। এই কর্মকর্তা ও সেবকদের নিয়েই সাধারণভাবে গ্রাম সংগঠন। কোন কোন অঞ্চলে অবশ্য সংগঠনের পরিধি কিছুটা কম। সে সব অঞ্চলে উপরে বর্ণিত একাধিক কর্তব্য ও কার্যাবলী একই কর্মচারীর উপরে ন্যস্ত থাকে। আবার কোন অঞ্চলে কর্মচারীর সংখ্যা উপরে বর্ণিত সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যায়।

"এই সহজ প্রণালীর পৌর শাসনের মধ্যেই এদেশের অধিবাসীরা স্মরণাতীত কাল থেকে বাস করে এসেছে। গ্রামের সীমানা কদাচিৎ পরিবর্তিত হয়েছে, এবং যদিও যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে গ্রামগুলির ক্ষতি হয়েছে, এমন কি পরিত্যক্তও হয়েছে, তবুও একই নাম, একই সীমানা, একই অধিকার, এমন কি একই পরিবারগুলি যুগ যুগ ধরে সেখানে টিকে আছে। সাম্রাজ্যের পতন বা বিভাজনে তারা কোন চাঞ্চল্যই প্রকাশ করে না। গ্রাম যখন অখণ্ড থাকে তখন কোন শক্তির কাছে তা হস্তান্তরিত হল বা কোন সম্রাটের তা অধীনস্থ হল তা নিয়ে গ্রামবাসীরা কখনোই মাথা ঘামায় না। গ্রামের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি অপরিবর্তিত থেকে যায়। প্যাটেল তখনও গ্রামপ্রধান থাকেন এবং তখনো তিনি গ্রামের ছোটখাট বিচারক, এবং প্রশাসক (Magistrate) ও সমাহর্তা (Collector) বা খাজনা-বিলিকার থেকে যান।"৩

উপরের উদ্ধৃতিটির গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ ভারতের স্বায়ত্তশাসিত গ্রামগুলির শাসনতন্ত্র সম্পর্কে একটা ধারণা এতে পাচ্ছি এবং সেটা প্রাচীন কালের হিন্দু-

রাজত্বের অস্পষ্ট যুগের নয়, মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর; কিংবা মনুসংহিতার মত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তা বর্ণিত হয় নি, প্রকৃত পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণই সরকারী দলিলে তার চিত্র এঁকেছেন। এক নজরেই এর থেকে বোঝা যাচ্ছে এক রাজবংশের পর অন্য রাজবংশের অভ্যুদয় ও সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে কি ভাবে ভারতের কৃষক সমাজ নিজেদের ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ গণরাজ্যের মধ্যে জমি চাষ করতেন ও পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন করতেন। অত্যন্ত সুখের বিষয় হত যদি ভারতের বৃটিশ শাসকগণ এই প্রাচীন প্রথার সংরক্ষণ, উন্নতিবিধান ও সংস্কারসাধন করতেন এবং এইভাবে তাদের সুসংগঠিত গণপরিষদের মারফৎ এদেশের শাসনকার্য চালিয়ে যেতেন! কিন্তু বৃটিশ শাসনের শুরু থেকে দুটো কারণ পুরনো গ্রামীন সমাজকে দুর্বলতর করে তুলেছিল। সর্বোচ্চ সীমায় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির উদগ্র ব্যগ্রতা শাসকবর্গকে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি কৃষকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগে বাধ্য করেছিল।[৪] সমস্ত বিচারবিভাগীয় ও প্রশাসনিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করবার জন্য অনুরূপ যুক্তিহীন ব্যগ্রতার ফলে আধুনিক শাসকবর্গ সেই সব গ্রামীন কর্তাব্যক্তিদের প্রকৃতপক্ষে সরিয়ে দিয়েছিলেন যারা এতদিন পর্যন্ত নিজ নিজ গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে এসেছেন। কর্মচ্যুত হবার ফলে গ্রাম-সমাজগুলি অবিলম্বেই দ্রুত পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে। অতীতের শাসনব্যবস্থা থেকে বহু দিক দিয়ে অনেক বেশী সুসংগঠিত হলেও বর্তমান ভারতীয় শাসনব্যবস্থার একটি গলদ আছে—এই শাসনব্যব্যস্থা অনেক বেশি স্বৈরতন্ত্রী এবং প্রজাদের সহযোগিতার ওপর খুবই কম নির্ভরশীল।

কিন্তু আমাদের এবার 'উত্তর সরকারে' জমিদারী ভূমির বন্দোবস্তের কথায় ফিরে যেতে হবে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই জমিগুলি বাৎসরিক বন্দোবস্তে জমিদারগণকে দেওয়া হত। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে স্যর টমাস রামবোল্ড পাঁচ বছরের বন্দোবস্ত করেন। সে কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এই উৎপীড়নমূলক বাৎসরিক বন্দোবস্তের ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তিত হয় এবং ১৭৮৬ পর্যন্ত তা চালু থাকে। ১৭৮৬-তেই রাজস্ব বোর্ডের (Board of Revenue) বর্দ্ধিত হারে রাজস্বের দাবিতে শেষ পর্যন্ত তিন বৎসরের বন্দোবস্ত করা হয়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিন সালা ও শেষ পর্যন্ত পাঁচসালা বন্দোবস্ত স্থির করা হয় এবং জমিদারদের কাছ থেকে মোট আদায়ের দুই-তৃতীয়াংশ দেয় নির্ধারিত হয়। নতুন সরকার বা গুণ্টুর রাজ্য কোম্পানির অধিকারে এসেছিল ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে এবং সেখানেও একই বন্দোবস্ত চালু করা হয়।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হোবার্ট মাদ্রাজের গভর্ণর নিযুক্ত হন। কোম্পানির প্রধান (chief) ও পরিষদের (councils) বিলোপ ও রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় প্রশাসনের নিমিত্ত সমস্ত জেলায় সমাহর্তাদের (Collectors) নিযুক্ত করে তিনি এক বিরাট সংস্কার সাধন করেছিলেন। জমিদারী ভূমি-বন্দোবস্ত পূর্ব-নির্ধারিত নীতি অনুসারেই চলতে থাকে। পলাশীর বিজয়ী বীরের পুত্র লর্ড ক্লাইভ লর্ড হোবার্টের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। লর্ড ক্লাইভের শাসনকালেই, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে যেমনটি হয়েছিল, উত্তর সরকারেও তেমনি ১৮০২ থেকে ১৮০৫ সালের মধ্যে ভূমিরাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সাধারণভাবে প্রসার লাভ করে। সম্ভবত কৃষকদের কাছ থেকে মোট আদায়ের দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ রাজস্বনির্ধারণের জন্য সাধারণ হার হিসাবে স্থিরীকৃত হয়।[৫]

'উত্তর সরকারের' হাবেলি জমির ইতিহাস ছিল কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে সমাহর্তাদের (Collectors) প্রথম নিযুক্ত করা হয়। হাবেলি ভূমির রাজস্ব আদায়ের জন্য তারা দুটো পৃথক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। কতগুলি জায়গায় তাঁরা অর্থের পরিবর্তে উৎপাদনের মাধ্যমেই সরাসরিভাবে কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন, আবার কতগুলি জায়গায় চুক্তিবদ্ধ অর্থের বিনিময়ে জমি পত্তনী দিয়ে দিতেন। অবশ্য সাধারণ ব্যবস্থা হল যে সমাহর্তা গ্রাম প্রধানদের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত করতেন এবং তারা আবার প্রতিটি কৃষকের সঙ্গে পৃথক বন্দোবস্ত করতেন।[৬] ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন কোম্পানির প্রধান ও পরিষদের অবলুপ্তি ঘটে, তখন রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে কেবলমাত্র সমাহর্তাগণই এই বন্দোবস্তগুলির জন্য দায়ী থাকতেন। ১৮০২ থেকে ১৮০৪ এর মধ্যে জমিদারী ভূমির যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হল, তখন হাবেলি জমিগুলিকে সুবিধাজনক আকারের মুটা (mootas) বা আকারে ভাগ করে প্রকাশ্য নীলামে চিরস্থায়ী জমিদারীরূপে বিক্রি করে দেওয়া হল। প্রত্যেকটি ক্ষেত্র বাৎসরিক রাজস্ব হিসেবে ১০০০ থেকে ৫০০০ স্টার প্যাগোডা জোগাত। সেই সঙ্গে মাদ্রাজ নগরীর চারপাশের জায়গীর ভূমিরও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

১৭৬৫ থেকে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর সরকার ও মাদ্রাজ নগরীর চারপাশের অঞ্চল নিয়ে গঠিত মাদ্রাজে কোম্পানির প্রাচীনতম এলাকার ভূমি-প্রশাসনের এই হল ইতিহাস। কিন্তু ইতোমধ্যে অন্যান্য কিছু অঞ্চলও কোম্পানির অধিকারে এসেছিল এবং এখন এই নবলব্ধ এলাকাগুলির উল্লেখ প্রয়োজন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দের শ্রীরঙ্গপট্টনমের সন্ধি মারফৎ কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে টিপু

সুলতানের যুদ্ধের অবসান ঘটেছিল। এই যুদ্ধে বড়মহলের অন্তর্গত সালেম ও কৃষ্ণগিরি জেলা কোম্পানির অধিকারে আসে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের সঙ্গে লর্ড ওয়েলেসলীর চূড়ান্ত যুদ্ধে কানাড়া, কোয়েম্বাটুর, বালাঘাট ও আরও কয়েকটি অঞ্চল কোম্পানির অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলী তাঞ্জোর অধিকার করেন এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের নিজামের কাছ থেকে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চলই অধিকৃত হয়। আর্কটের নবাবকে লর্ড ওয়েলেসলী ভাতার বিনিময়ে অবসর গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন। সমগ্র কর্ণাটকই কোম্পানির অধিকৃত অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এইভাবে ১৭৯২ থেকে ১৮০২—এই দশ বৎসরের মধ্যেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সেই সব সম্পদশালী ও উর্বর অঞ্চলসমূহ অধিকার করে নিয়েছিলেন যা নিয়ে বর্তমান মাদ্রাজ প্রদেশ গঠিত। এই নতুন এলাকা দখলের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-বন্দোবস্তের এক নতুন ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছিল।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন বড়মহলের জেলাগুলি দখল করেন তখন কর্ণওয়ালিস সেখানকার শাসনভার ক্যাপ্টেন রীড ও আরও তিনজন সামরিক পদাধিকারীর ওপর ন্যস্ত করেন। সেখানকার অধিবাসীদের ভাষা ও আচারব্যবহার সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান তখনকার দিনের পদস্থ আমলাদের চাইতে অনেক বেশী ছিল। যে নীতির ভিত্তিতে ক্যাপটেন রীড প্রতিটি কৃষকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন, সেই নীতিই টমাস মুনরো, পরবর্তীকালের মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড মুনরো, তাঁর সহকারী হিসাবে সম্প্রসারিত করেন ও অন্যান্য অঞ্চলে প্রবর্তন করেন। বঙ্গদেশে জমিদারী বন্দোবস্তের সঙ্গে লর্ড কর্ণওয়ালিসের নামের মতো মাদ্রাজে রায়তোয়ারী বন্দোবস্তের সঙ্গেও টমাস মুনরোর নামও অঙ্গাঙ্গী ভাবেই জড়িত।

উনিশ বৎসর বয়সে তরুণ টমাস মুনরো ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে আসেন এবং হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশও গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়মাল্য অর্জন করেন এবং সাহস, যোগ্যতা ও সাফল্যের জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টের প্রশস্তি লাভ করেছিলেন। কিন্তু একজন সফল সৈনিক হিসেবে ভারতে মুনরোর নাম স্মরণ করা হয় না। যে সামান্য কয়েকজন কোম্পানির কর্মচারী এদেশের জনগণের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তিনি তাঁদেরই একজন। এ জন্য, বাংলাদেশে কর্ণওয়ালিসের নাম, বোম্বাইতে এলফিনস্টোনের নাম যেমন উচ্চারিত হয় তেমনি মাদ্রাজে এখনও তাঁর নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা হয়।

ক্যাপ্টেন রীডের অধীনে বড়মহলের জেলাগুলিতে জমিজরিপের কাজে নিযুক্ত হবার পর কোম্পানির শাসনব্যবস্থার গলদগুলি তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এবং তাঁর সহানুভূতিশীল সিদ্ধান্ত প্রকৃত প্রতিবিধানের পথ বাৎলে দেয়।

কর্ণাটদেশ সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, "নবাবের রাজস্বের একটা বিরাট অংশই মাদ্রাজস্থিত মুৎসুদ্দিদের মারফৎ মাসে শতকরা তিন ও চার শতাংশ হারে পাঠানো হয়। কর্ণাটের কোনো কোনো অঞ্চলে খাজনা নির্ধারিত হয় শস্যের বীজ বপন অনুযায়ী ! প্রতিটি ভিন্ন প্রকার বীজের জন্য খাজনার হারও ভিন্ন ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে শস্যপরিমাণে রাজস্ব দেওয়া হয়, এবং সর্বত্রই ইজারা বাৎসরিক হ'ল। শস্য অনুযায়ী যখন খাজনা নির্ধারিত হয়, তখন প্রতি বৎসরই জমি জরিপ করা হয়। আমিনেরা রিপোর্ট তৈরীর ব্যাপারে প্রাপ্য উৎকোচের দ্বারা পরিচালিত হন। ইজারাদার ও সরকার উভয় তরফেই সহস্র উপায়ে প্রতারিত হন। যে সব জায়গায় ফসলকে রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হত সে সব জায়গায় প্রকৃত মূল্যের অনেক বেশী দামে জমির উৎপন্ন শস্য কৃষকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হত, নতুন এমন একটা নির্দিষ্ট বাজার দর বেঁধে দেওয়া হত—যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত শস্য সংগৃহীত না হচ্ছে ততক্ষণ কেউই যার থেকে কম দামে বিক্রি করতে পারতো না। সবারই মনে হবে যে এই জঘন্য ব্যবস্থা শীঘ্রই দেশের সর্বনাশ করবে।"

অনুরূপ ভাবে বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "কিছুদিন আগে রাজস্ব বোর্ডে সমাহর্তাদের (Collectors) বেতন বৃদ্ধির জন্য সরকারের নিকটে এক দরখাস্ত করেছিলেন। সরকার গভীর অসন্তোষের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু একাজের দ্বারা তাঁরা সঠিক নীতি বা মানব চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞানতারই পরিচয় দিয়েছেন। কারণ মানুষ যখন এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যায় যেখানে নির্দিষ্ট বেতনে স্বাধীন জীবন যাপন কখনোই সম্ভবপর নয়; অথচ সেখানে জানাজানি হয়ে যাবার বিন্দুমাত্র বিপদ ছাড়াই সাধারণ লোকের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে হঠাৎ স্বাধীন জীবন যাপন করা যায়, সে সব ক্ষেত্রে কোন্ পথ বেছে নেবেন তা নিয়ে যাঁরা হিসেব কষবেন তাঁদের সংখ্যা এতই স্বল্প যে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। নিয়তই দেখতে পাচ্ছি যে সমাহর্তাগণ (Collectors) বেতন অনুযায়ী যে ধরনের জীবন যাপন করা উচিত তার চেয়েও উঁচু মানের জীবন যাপন করছেন, তাঁরাও কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিপুল সম্পদ সঞ্চয় করছেন। যে ক্রিয়াপ্রণালীর দ্বারা তা অর্জন করা যায় সেটা খুবই সরল। খাজনা যখন নগদ টাকায় দেওয়া হয় তখন জমির খাজনার তালিকা

কম করে সরকারকে দেখানো হয় ; আর খাজনা যখন দ্রব্যের মারফৎ দেওয়া হয় তখন জমির উৎপাদন বা বিক্রয়লব্ধ উৎপাদন কমিয়ে দেখানো হয়। একথা বলা অর্থহীন যে সমাহর্তাগণ (Collectors) শিক্ষিত ও ব্যক্তিত্ববান পুরুষ হয়ে এত নীচ কাজে নেমে আসবেন না। কেননা প্রকৃত তথ্য এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে।"[৮]

১৭৯৮ খৃস্টাব্দে নব অর্জিত বড়মহলের অন্তর্গত জেলাগুলিতে রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

"এখন বড়মহলের জরিপের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। খাজনাও নির্ধারিত হয়েছে……বড়মহলের বিরাট সংখ্যক পত্তনিদারদের প্রায়শঃই রাজস্ব ব্যবস্থাপনার অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। কিন্তু এর মধ্যে মুস্কিলের কিছুই নেই—অবিচ্ছিন্ন মনোযোগ ছাড়া আর কিছুরই প্রয়োজন ঘটে না। যখন সেই মনোযোগ দেওয়া হয় তখন সেটা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হয়ে ওঠে, সমাহর্তাদের পক্ষেও দশ-বারজন জমিদার বা বিরাট বিরাট ভূম্যধিকারীর মারফতের পরিবর্তে প্রত্যক্ষভাবে ষাট হাজার পত্তনিদারের কাছ থেকে খাজনা আদায় সহজতর হয়। যে এলাকা গত বৎসর আমার অধীনে ছিল তার খাজনা ছিল ১৬৫,০০০ প্যাগোডা। একটি টাকাও অনাদায়ী না রেখে এবং প্রায় বিশ হাজার পত্তনিদারের কাছ থেকে কোন রকম বাধার সম্মুখীন না হয়েই সেই খাজনা ঐ বৎসরের মধ্যেই আদায় হয়েছিল।"[৯]

দেশের যে সব অঞ্চলে বংশগত জমিদারদের অস্তিত্ব ছিল না সে সব অঞ্চলে রায়তোয়ারী বন্দোবস্তের জন্য টমাস মুনরোর ক্রমবর্ধমান পক্ষপাতিত্ব এই পত্রে দেখতে পাচ্ছি। বঙ্গদেশ ও উত্তর সরকারের মত অঞ্চলে, যেখানে বড় বড় ভূম্যধিকারিগণ কর্তৃক জমির দখলই ছিল চলতি প্রথা, সে সব অঞ্চলে সরকার সেই প্রথাই চালু রেখেছিলেন এবং জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন। অন্যান্য যে সব অঞ্চলে রায়ত বা চাষী কর্তৃক সরাসরিভাবে রাষ্ট্রকে খাজনা প্রদানই ছিল চলতি প্রথা সেখানে মুনরো সেই ব্যবস্থাই চালু রেখেছিলেন এবং রায়তদের সঙ্গে সরাসরি বন্দোবস্ত করেছিলেন। কৃষির উন্নতি ও জনসাধারণের সমৃদ্ধির জন্য উভয় ক্ষেত্রেই সরকারী দাবীর কিছুটা স্থায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন ও অপরিহার্য ছিল। বঙ্গদেশে লর্ড কর্ণওয়ালিস সে কাজ করেছিলেন। মাদ্রাজের জন্যও টমাস মুনরো তাই চেয়েছিলেন ও অনুমোদন করেছিলেন, কিন্তু কোন দিনই তা কার্যকরী করা হয় নি। দক্ষিণ ভারতের ভূমি-বন্দোবস্তের এখানেই হল মারাত্মক গলদ।

বড়মহল থেকে মুনরো কানাড়াতে বদলী হন. সেখানে তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে এক বৎসরের মধ্যেই বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করেন। এখানে বন্দোবস্ত হয়েছিল জমিদারদের সঙ্গে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে তিনি লিখেছিলেন "আমি এখানে এসেছি কারণ দেশের প্রকৃত রাজস্ব নির্ধারণের ব্যাপারে একজন যোগ্য লোক বলে খ্যাত হবার পর নিজ কর্তব্য থেকে সরে আসছি—এটা প্রতিপন্ন না করে আমি সে কাজ প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম না। এখন যখন সে কাজ করা হয়ে গেছে এবং আক্রমণের জন্য আদায় বাধা পেয়েছে এমন কয়েকটি এলাকা ভিন্ন সমস্ত অঞ্চলেই যখন রাজস্ব আদায় বড়মহলের মত কিংবা তার চেয়েও বেশী নিয়মিত হয়েছে, তখন মনে হয় আমার কার্য সম্পন্ন হয়েছে।"[১০]

"সমস্ত বন্দোবস্তই হয়েছে জমিদারদের সঙ্গে, অথবা, যেখানে কোনো জমিদার ছিলেন না সেখানে জমির সঠিক দখলদারের সঙ্গে। উৎপাদন সঠিক ভাবে নির্ধারিত হয়েছিল কারণ উভয় পক্ষ থেকেই উৎপাদনের হিসেব দাখিল করা হয়েছিল। কোন ক্ষেত্রেই সরকারের এক-তৃতীয়াংশের অধিক ভাগ ছিল না। বহু ক্ষেত্রেই মোট উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ বা এক-ষষ্ঠাংশ ভাগও সরকারের ছিল না, কোন কোন ক্ষেত্রে এক-দশমাংশও নয়।"[১১]

১৮০০ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের নিজাম যখন কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সমর্পণ করলেন তখন যিনি বড়মহল ও কানাড়াতে বন্দোবস্ত করেছিলেন সেই টমাস মুনরোকেই সে অঞ্চলের বন্দোবস্তের জন্য নির্বাচিত করা হল। কাজেই সমর্পিত জেলাগুলি ছিল মুনরোর বেসামরিক প্রশাসনের তৃতীয় ক্ষেত্র। এই নতুন এলাকাতেও যে মুনরো তাঁর স্বাভাবিক যোগ্যতা ও বিশদ জ্ঞান নিয়ে কাজ শেষ করেছিলেন তা প্রশ্নাতীত। কিন্তু নিজের বিবেক অনুযায়ী প্রজাদের কথাটা তিনি যতটা বিবেচনা করবেন বলে মনে করেছিলেন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিঙ্‌ড়িয়ে-নেওয়া দাবীর ফলে সে বিবেচনা তিনি করতে পারেন নি। সে কথা তিনি যে অকপটতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন তা প্রায় সমালোচনাকে নিরস্ত্র করেছে বলা যায়।

"যদি নিশ্চিত হতাম যে পরপর প্রতিটি রাজস্ব বোর্ড এবং সরকার রাজস্বের ধীর ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি সমর্থন করবেন, যা এর মধ্যেই অনুমোদিত হয়েছে, তা হলে নিঃসন্দেহে আমি এর অনুষঙ্গী হতাম। কিন্তু মনে হয় না অনুমতি পাব। নিজ পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের কিংবা অন্ততঃ জনসাধারণের আয়ের উন্নতি প্রত্যক্ষ করবার যে ইচ্ছা সাধারণভাবে ভারপ্রাপ্ত কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে থেকে থাকে সেই ইচ্ছাই

আমাকে খুব বেশী তাড়াহুড়ো করে এগুতে বাধ্য করবে।...বয়স বাড়ার ফলে আমি শঙ্কিত হতে পারি এবং নিন্দার জন্যও ভয় পেতে পারি। রাজস্ব আদায়ের জন্য যদি আমার উত্তরাধিকারীর জন্য সুযোগ রেখে যাই তা হলে বলা হবে যে সরকারকে প্রতারিত করবার ব্যাপারে আমি দেশের অধিবাসীদের সুযোগ করে দিয়েছি।...ব্যাপারগুলি দ্রুত বাড়িয়ে তোলা নিয়ে বর্তমানে কিছু ভাবছি না। তবে প্রশাসনকে লোকের অর্থাভাবে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে রায়তদের ওপর যতটা চাপ দেওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত তার চেয়েও বেশী চাপ দেব।"[১২]

মুনরো যখন একথা লিখেছিলেন তখন তাঁর মনে ছিল বন্ধু জি-(G—) এর ব্যাপারটি, যাকে চাকুরী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কারণ কর্ণাটে তিনি যে রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন রাজস্ব বোর্ডের কাছে তা খুবই কম মনে হয়েছিল। রাজস্ব কর্মচারিদের ওপর এই অন্যায় চাপের দ্বারাই কোম্পানির সরকার নবার্জিত অঞ্চলে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণকে এমন তুঙ্গে তুলে নিয়ে যেতেন যা জমির কৃষকদের পক্ষে কঠোর ও উৎপীড়নমূলক ছিল।

"রিপোর্টটি হল যে বোর্ড মনে করছেন যে কর্ণাটে বন্দোবস্ত করবার কাজ তিনি খুব বেশী ত্বরান্বিত করেছেন এবং তা খুবই কম দরে। তাঁর পুরনো বন্ধু লাকম্যান রো-এর ওপর তিনি বড় বেশী বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। জি-(G—) বলছেন যে উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই তিনি এটা নীচে নামিয়ে এনেছেন যাতে এর পর তা বাড়িয়ে দিতে পারেন। তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হলে আমি খুবই বিচলিত হব —বহুদিনের বন্ধু হিসেবে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার জন্যই নয়, অধিকন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে রাজস্ব বিভাগে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর তাঁর বিবাহ আর্থিকক্ষেত্রে তাঁকে প্রায় সর্বস্বান্ত করেছে। বিচারের ভুলের ফলে কাউকে চাকুরী থেকে সরিয়ে দেওয়া আমার মনে হয় খুবই রূঢ় কাজ। মনে হয় তিরস্কারই যথেষ্ট ছিল। আপনি আরও লক্ষ্য করবেন যে ভুলটা তাঁর স্বপক্ষেই যায়।"[১৩]

সমর্পিত জেলাগুলি সাত বৎসর শাসন করবার পর টমাস মুনরো যথাযথ লব্ধ বিশ্রামের জন্য অবশেষে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ভারত ত্যাগ করেন। রাজস্বের ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষ খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সাত বৎসরের মধ্যে ৪০২,৬৩৭ পাউণ্ড থেকে ৬০৬,৯০৯ পাউণ্ড বা পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি তিনি দেখিয়েছিলেন।[১৪] এই ধরনের ফলাফল দেখেই কোম্পানি কর্মচারীদের কাজের বিচার করতেন।

ইতোমধ্যে অন্যান্য জেলাগুলির বন্দোবস্ত অন্যান্য কর্মচারিগণ করে ফেলেছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মালাবার কোম্পানির অধিকারে আসে এবং কিছুকালের জন্য তা ছিল বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত। বোম্বাই সরকার মালাবারের রাজা ও

নায়ারদের সঙ্গে দুটি বাৎসরিক বন্দোবস্ত করেন। পরে একটি পাঁচ বৎসরের বন্দোবস্ত করা হয়। রাজা ও নায়ারগণ যথাযথ সময়ে টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁদের জমি কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাঁরা বিদ্রোহ করেন। এইভাবে বোম্বাই সরকার প্রশাসনে ব্যর্থ হওয়ায় মালাবারকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মাদ্রাজের তৎকালীন গভর্ণর লর্ড ক্লাইভ ঐ অঞ্চলের শাসনের জন্য একজন প্রধান সমাহর্তা (Principal Collector) ও তাঁর অধীনস্থ সমাহর্তাদের নিযুক্ত করেন। বন্দোবস্ত হয় আংশিকভাবে জমিদারদের সঙ্গে অংশতঃ প্রজাদের সঙ্গে। কিন্তু রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য সাধারণভাবে রায়তোয়ারী ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছিল যা সে সময় কর্তৃপক্ষের আনুকূল্য লাভ করছিল।[১৫] বৃটিশ শাসনের আগেই যে সব পুরুষানুক্রমিক রাজা ও নায়ারগণ মালাবারে জমির মালিক ছিলেন তাঁদের ধীরে ধীরে এই ভাবে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা দৃশ্যের আড়ালে চলে যান। সঠিক রাজনীতিজ্ঞান পুরনো ব্যবস্থাই চালু রাখত এবং রাজা ও নায়ার—প্রধানদের বৃটিশ সরকারের অনুগত প্রজা ও জনসাধারণের নেতা রূপে পরিণত করে তুলত। কিন্তু জমি থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব লাভের জন্য কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি বন্দোবস্ত করবার ইচ্ছাটাই সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ কোম্পানির সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করল।

লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক তাঞ্জোরের অন্তর্ভুক্তি ঘটে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে। এই রাজ্যের কৃষকেরা পত্তকদার বলে পরিচিত মুখ্য রায়তের মারফৎ রাজার কাছে খাজনা জমা দিত। এক একজন পত্তকদারের এলাকায় থাকত ১২৮টি করে গ্রাম, এবং পত্তকদারগণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে জমিদার। বৃটিশ সরকার এই পত্তকদারদের সোজা হটিয়ে দিয়ে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলেন। এবং জরিপের দ্বারা জমির মূল্যায়নের পরিবর্তে বেশ কয়েক বৎসরের উৎপাদনের নিরিখে রাজস্ব নির্ধারিত করলেন।[১৬]

কর্ণাটের শাসনব্যবস্থা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে এসেছিল প্রথমতঃ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে নবাবের সঙ্গে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সন্ধির মারফৎ এবং শেষ পর্যন্ত ১৮০১ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক কর্ণাটের অন্তর্ভুক্তির মারফৎ। এই এলাকার একটা বিরাট অংশই বহু প্রজন্ম ধরে কখনো বা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পলিগার (Polygar) বলে পরিচিত স্থানীয় সেনানায়কদের শাসনাধীন ছিল।

এই পলিগাররা ছিলেন "গ্রামের মোড়ল বা অন্যভাবে বলতে গেলে সরকারী কর্মচারী। দাক্ষিণাত্যে বিভিন্ন শক্তির উত্থানপতনের সময় তাঁদের মূল পদমর্যাদার

পরিবর্তন ঘটেছিল এবং তাঁরা সামরিক শাসক হয়ে উঠেছিলেন। সর্বত্রই ক্ষমতার জবরদখলের ব্যাপারে শক্তির উত্থানপতনের হাত ছিল বটে কিন্তু উপদ্বীপের দক্ষিণাংশে যতটা হাত ছিল ততটা আর কোথাও নয়। তাঁদের যেখানে দাখিল করবার মতো সনদ ছিল, সেই সনদে যদিও তাঁরা যে সর্তে জমিদারি ভোগ করতেন সেই সর্তগুলির কথা পরিষ্কার করে বলা হয় নি, তবু তার থেকেই সম্রাটের নিকট তাঁদের অধীনতা ও কর্ণাটের সুবাদারগণের প্রতি আনুগত্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সুবাদারদের কাছেই তাঁদের কর জমা দিতে এবং যখনই ডাক পড়ত তখনই স্থানীয় একৃতিয়ায় অনুযায়ী সৈন্যবল নিয়ে শিবিরে হাজিরা দিতে তাঁরা বাধ্য ছিলেন।"[১৭]

পলিগারদের অবস্থা নিয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় থেকে বহু চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ঘটেছিল। প্রজাদের ওপর ক্ষমতা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কর্ণাটের নবাব এই ক্ষুদ্র শাসকদের উৎখাত করবার জন্য বহুবারই বৃটিশ মিত্রের সাহায্য ভিক্ষা করেছেন। কিন্তু পলিগারদের বিরুদ্ধে নবাবকে সাহায্য দানের অবাঞ্ছিত কার্যে সৈন্যনিয়োগের ব্যাপারে কোর্ট অব ডিরেকটারস্ উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা পরিষ্কার আদেশ জারী করলেন যে "পলিগার বলে পরিচিত এই দেশীয় রাজাদের উৎখাত করা চলবে না।" "বলপ্রয়োগের দ্বারা তাঁদের (পলিগারদের) এই ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়াকে" তাঁরা "মানবতা বিরোধী" বলে রায় দিলেন। তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন যে নবাবের শাসন "নরম কিছু নয়" এবং "তাঁর রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উৎপীড়ন চলত।" কর্ণাটের লোকেরা যে বহু দুর্দশায় ভুগছেন এটা তাঁরা জানতেন এবং সেই সঙ্গে তাঁরা এটাও মনে করতেন যে কর্ণাটের নবাবের অত্যাচারের পরিমাণ ছিল সেক্ষেত্রে 'সর্বাপেক্ষা বেশী'।"

কর্ণাটের নবাবের সঙ্গে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিসের সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পর ডিরেকটারগণ ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুনের তাঁদের কূটনৈতিক বার্তায় ঐ সন্ধির নীতিগুলি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এর পরে ভারতবর্ষেও এ নিয়ে আলোচনা চলেছিল এবং ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড হোবার্ট একটি সভার কার্যবিবরণী নথীভুক্ত করেছিলেন। এই কার্যবিবরণীতে পলিগারদের কি উপায়ে বৃটিশ সরকারের কার্যকর প্রজা ও বশংবদ করপ্রদাতা রূপে পরিণত করা যেতে পারে তার পথ নির্দেশ করা হয়েছিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুনের সরকারী বার্তায় পরিচালকবর্গ যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে তাঁরা পলিগারদের সামরিক শক্তির সমূলে বিনাশ ও পলিগাররা পূর্বে যে কর দিতেন তার থেকে উচ্চতর আর্থিক করদানের প্রথার ওপর জোর দিলেন।

এই বার্তার বলে বলীয়ান মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ সমস্ত ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিগ্রাহ্য সীমা ছাড়িয়ে গেলেন। ১৭৯৯—১৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁরা একটি চুক্তি করলেন যার ফলে নিজ নিজ গ্রামের বাইরে পলিগারদের অধিকৃত সমস্ত অঞ্চলেই কর্তৃপক্ষ অধিকার বজায় রাখলেন এবং এমন একটা রাজস্ব দাবী করলেন যা পূর্বতন দাবীর শতকরা ১১৭ ভাগ বেশী ছিল। দক্ষিণাঞ্চলে পলিগারগণ বিদ্রোহ করলেন। শীঘ্রই এই অভ্যুত্থান দমন করা হল। বিদ্রোহীরা তাঁদের সমস্ত ভূসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কয়েক বৎসরের জন্য রাজস্ব বৃদ্ধিমূলক বলে ঘোষণা করা হল। পরে মোট আদায়ের দুই-তৃতীয়াংশের সমান হিসেব করে তা অপরিবর্তনীয় থাকবে বলে ঘোষিত হল। শেষ পর্যন্ত যে চৌদ্দটি জমিদারী তখনও দক্ষিণাঞ্চলের পলিগারদের হাতে ছিল সেই চৌদ্দটি জমিদারীতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়। ধার্য রাজস্বের পরিমাণও ছিল ১৭৯৯—১৮০০ খৃষ্টাব্দের বিপুল দাবীর তুলনায় অনেকটা সহনীয়। মোট খাজনার ৪১ থেকে ৫১ শতাংশের মধ্যে তা ওঠানামা করত। এই জমিদারীগুলির বেশির ভাগই ছিল টিনাভেলী জেলায়। শিবগঙ্গা ও রামনাদ-এর পলিগারদের সঙ্গেও একই বন্দোবস্ত করা হয়।[১৮]

১৮০২ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমাঞ্চলের পলিগারদের সঙ্গেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু চিটুরের যে-পলিগারগণ কর্ণাটের অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ শাসনাধীনে এসেছিলেন, তাঁদের ভাগ্যে বুঝি আরও দুর্ভাগ্য সঞ্চিত ছিল। তাঁরা বৃটিশের দাবীর বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে তাঁদের প্রায় সকলেই জমিদারী থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং তাঁরা জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কয়েকটি বাদে চিটুরের পলিগারদের সমস্ত জমিদারই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ভোগ-দখলকারীদের সঙ্গে সরাসরি বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

এক শতাব্দী অতিবাহিত হবার পর যে কঠোর নীতির ফলে কর্ণাট থেকে পলিগারগণ প্রকৃতপক্ষে উৎখাত হয়েছিলেন তার জন্য সকলেই দুঃখ প্রকাশ করবেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেকটরগণ তাঁদের সমস্ত সামরিক শক্তি থেকে বঞ্চিত করে ঠিকই করেছিলেন, কারণ আধুনিক শাসন ব্যবস্থায় সামরিক শক্তি আবশ্যিকরূপে একমাত্র রাষ্ট্রেরই থাকতে পারে। কিন্তু নিজ নিজ গ্রামের বাইরে অবস্থিত জমিদারী থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা, তাঁদের কাছ থেকে আকস্মিক এবং বিপুল রাজস্ব দাবী অথবা তাঁদের বিদ্রোহ দমন করার পর একেবারে উৎখাত করে দেওয়া যথাযথ বা জ্ঞানগর্ভ নীতি ছিল না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের হয়রানিকর ও গোলযোগপূর্ণ যুদ্ধের সময় তাঁরা নিজ নিজ

জমিদারীতে কিছুটা শান্তি ও শৃংখলা বজায় রেখেছিলেন। যখন কোন গঠনতন্ত্রী কর্তৃপক্ষ বলতে কিছুই ছিল না তখনো তাঁরা তাঁতী ও উৎপাদনকারীদের রক্ষা করেছিলেন এবং কৃষকদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সেচের জন্য দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই তাঁরা বড় বড় থাল ও জলাধার নির্মাণ করেছিলেন। পূর্বেকার কর্ণাট যুদ্ধে যখন ফরাসীরা মাদ্রাজ অধিকার করে নেয় তখন তাঁরাই বৃটিশদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। যদি পলিগারগণ প্রচণ্ড উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচারের অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকেন সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এশিয়া ও ইয়োরোপের সমস্ত আঞ্চলিক প্রধান ও খেতাবধারী অভিজাতগণও তো এই সব দোষে দুষ্ট ছিলেন। বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞান "পলিগারদের উৎখাত করার" পরিবর্তে তাঁদের শৃংখলাবদ্ধ করবার চেষ্টা করত। একটি দেশের প্রাচীন প্রথাগুলোর পরিবর্তন করা কোন সরকারের পক্ষেই খুব বিচক্ষণ কাজ নয়। আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে জমির কর্ষকদের সঙ্গে সরাসরি বন্দোবস্ত করার অজুহাতে একটি শ্রেণীকে দমন করা, সেই শ্রেণীর মালিকানা সংক্রান্ত অধিকার বাজেয়াপ্ত করা কোন বিদেশী সরকারের পক্ষেই মনুষ্যত্বের নীতি নয়।

মাদ্রাজে লর্ড ওয়েলেসলী সরকারের নীতি বঙ্গদেশে লর্ড কর্ণওয়ালিসের নীতির প্রতি সুস্পষ্ট ও প্রতিকূল বৈপরীত্যে প্রতিভাত। লর্ড কর্ণওয়ালিস বঙ্গদেশের কৃষকসমাজকে বংশানুক্রমিক জমিদারদের অধীনে বসবাস করতে দেখেছিলেন এবং জমিদারী প্রথাকে শক্তিশালী ও চিরস্থায়ী করে তুলেছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলীর সরকার কর্ণাটের এক বিরাট অংশকে পলিগারদের অধীনে দেখেছিলেন এবং প্রজাদের সরাসরি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনবার জন্য পলিগারদের ফলতঃ উৎখাত করেছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস একটি প্রাচীন প্রথার প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন এবং এই ভাবে বঙ্গদেশে এক বিরাট উন্নতিশীল ও সুখী মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি করেছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলীর নীতি মাদ্রাজে ঐ মধ্যবিত্ত সমাজের বিলোপ সাধন করেছিল। বৃটিশ শাসনের এক শত বৎসর পরেও সেই ক্ষতি আর পূরণ করা হয়নি। বিদেশী সরকার ও কৃষকদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক যোগাযোগরক্ষাকারী হিসেবে মাদ্রাজে জোরালো প্রভাবশালী ও উন্নত মধ্যবিত্ত সমাজ বলতে কিছুই নেই।

মাদ্রাজে লর্ড ওয়েলেসলীর সরকারের নীতির সঙ্গে বরং ফরাসী বিদ্রোহের নীতির সাদৃশ্য আছে। ফরাসী বিদ্রোহ কয়েক বৎসর পূর্বে ফ্রান্সের ভূম্যধিকারী অভিজাত শ্রেণীর অধিকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। তথাপি ফ্রান্সে ব্যারণদের যা ক্ষতি হয় ফরাসী জাতির পক্ষে তা লাভই হয়েছিল। আর মাদ্রাজে পলিগাররা

যা হারিয়েছিলেন তার ফলে একটি বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের লাভ হয়েছিল। প্রজাদের কাছ থেকে পলিগাররা যে খাজনা পেতেন তা প্রজাদের মধ্যেই ব্যয়িত হত। বিভিন্ন খাতে তা প্রবাহিত হয়ে শিল্প ফলপ্রসূ করে তুলত। পলিগাররা উৎখাত হবার পর কোম্পানি যে ভূমিরাজস্ব পেতেন, প্রশাসনিক ব্যয় বহনের পর বিদেশী বণিকদের মুনাফা স্বরূপ তার পুরোটাই দেশ থেকে তুলে নেওয়া হত। কোম্পানির জনৈক সুযোগ্য ডিরেকটার বলেছিলেন, "এটা গোপন বা অস্বীকার করা যাবে না যে এই (রায়তোয়ারী) ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল খাজনার আকারে জমি যতটা উৎপাদন করতে পারে সরকারের জন্য তা আদায় করা।"[১৯]

পূর্ব-পৃষ্ঠাগুলিতে ১৮০৭ পর্যন্ত মাদ্রাজের ভূমি বন্দোবস্ত সম্পর্কে আমরা একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি। ১৮০২-১৮০৫ পর্যন্ত উত্তর সরকারে রাজস্ব ব্যবস্থার পর্যালোচনাও আমরা করেছি। বড়মহল, কানাড়া ও ছেড়ে দেওয়া জেলাগুলিতে টমাস মুনরোর বন্দোবস্তের কথা বলেছি। তাঞ্জোরে ও মালাবারে গৃহীত সামরিক তৎপরতার কথা আমরা বর্ণনা করেছি এবং কর্ণাটের কার্যাবলীর বিবরণও আমরা দিয়েছি যার পরিসমাপ্তি কয়েকজন অবশিষ্ট পলিগারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। কিন্তু প্রদেশের বেশীর ভাগ অংশেই বন্দোবস্ত হয়েছিল সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে।

নিম্নস্থ তালিকাতেই এই বন্দোবস্তগুলির ফলাফল সবচেয়ে ভাল দেখানো যেতে পারে :[২০]

চিরস্থায়ীরূপে বন্দোবস্তযুক্ত

মাদ্রাজের চতুষ্পার্শ্বস্থ জায়গীর ...	...১৮০১-২
উত্তর সরকার ...	...১৮০২-৫
সালেম পশ্চিমাঞ্চলের পলিগারদের জমিদারী চিটুরের পলিগারদের জমিদারী দক্ষিণাঞ্চলের পলিগারদের জমিদারী	...১৮০২-৩
রামনদ ...	...১৮০৩-৪
কৃষ্ণগিরি ...	...১৮০৪-৫
ডিণ্ডিগল ...	...১৮০৪-৫
ত্রিবেন্দ্রপুরম জায়গীর গ্রামসমূহ	...১৮০৬-৭

অ-চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

মহীশূর	মালাবার কানাড়া কোয়েম্বাটুর ছেড়ে দেওয়া জেলাসমূহ বালাঘাট
কর্ণাট	পালনাদ নেলোর ও ওন্‌গোলি আর্কট সতীবাদ ত্রিচিনপল্লী মাদুরা টিনাভেলি

পূর্বে যা বলা হল তাতে দেখা যাবে যে মাদ্রাজে জমিদার, পলিগার বা অন্যান্য মুখ্যদের সঙ্গে বন্দোবস্ত ব্যবস্থাকে আর ভালো চোখে দেখা হত না, রায়ত বা কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি বন্দোবস্তই আনুকূল্য লাভ করছিল। মাদ্রাজ প্রদেশে রায়তোয়ারী বন্দোবস্তের চূড়ান্ত অনুমোদনের কথা পরবর্তী দুইটি অধ্যায়ে বলা হবে।

১। Second Report of the Committee of Secrecy, 1782, Appendix V.

২। Fifth Report, 1812, p. 83.

৩। *Ibid* p. 85.

৪। গ্রামীন ব্যবস্থা চালু রাখা সম্পর্কে স্যর টমাস মুনরো ও বোর্ড অফ রেভেন্যু-এর মধ্য একটি কৌতূহলোদ্দীপক বাদানুবাদের কথা পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হবে।

৫। Fifth Report, 1812, p. 114,

৬। *Ibid.*, pp, 93 and 98.

৭। *Ibid.*, p. 113.

৮। Letter, dated 31st January, 1795,

৯। Letter, dated 21st September,1798

১০। Letter, dated 18th July, 1800,

১১। Letter, dated 7th October, 1800.

১২। Letter, dated 5th September, 1802.

১৩। Letter, dated 28th September, 1802.

১৪। Fifth Report, 1812. p, 124

১৫। *Ibid.*, p. 124-127

১৬। *Ibid.*, p, 127.

১৭। *Ibid*,, pp. 143,

৮। *Ibid.*, pp. 146-67.

৯। Henry St, John Tucker, *Memorials of Indian Government* London, 1853, p, 118.

২০। Fifth Report, 1812, p, 163.

অষ্টম অধ্যায়

গ্রামসমাজ অথবা ব্যক্তিগত প্রজাস্বত্ব ?
—মাদ্রাজের বিতর্ক ১৮০৭-১৮২০

পূর্ব অধ্যায়ের শেষে যে সারণীটি দেওয়া হয়েছে তাতে ১৮০৭-এ মাদ্রাজের যে যে জেলাগুলিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছিল এবং যে যে জেলাগুলিতে সে বন্দোবস্ত হয় নি তাই দেখানো হয়েছে। তখন যে প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছিল তা হল শেষোক্ত জেলাগুলির ব্যাপারে কি ধরনের স্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

বঙ্গদেশে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনুরূপ বন্দোবস্ত কি এই সব অঞ্চলে প্রবর্তিত হবে ?

টমাস মুনরো প্রস্তাবিত চিরস্থায়ী রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত কি গ্রহণ করা হবে ?

অথবা, মাদ্রাজের বোর্ড অব রেভেন্যু যে চিরস্থায়ী মৌজাওয়ারী বন্দোবস্ত অর্থাৎ প্রতিটি গ্রামীন সমাজে যৌথ বন্দোবস্তের সুপারিশ করেছিলেন শেষ পর্যন্ত কি সেটাই গ্রহণ করা হবে ?

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছিল ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসে তার চেয়ে আকর্ষণীয় অধ্যায় আর নেই।

হস্তান্তরিত জেলাগুলিতে সাত বৎসর কাজ করার পর ১৮০৭-এ ইয়োরোপ যাত্রার প্রাক্কালে ঐ জেলাগুলিতে চিরস্থায়ী রায়তোওয়ারী বন্দোবস্তের সুপারিশ করে টমাস মুনরো তাঁর বিখ্যাত রিপোর্ট নথীবদ্ধ করেছিলেন। যে বিপুল রাজস্ব তিনি আদায় করেছিলেন তা মোট উৎপাদনের ৪৫ শতাংশ বলে তিনি বর্ণনা করে গেছেন। এই রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ হারে হ্রাসের সুপারিশও তিনি করেছিলেন। তিনি আরও প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে রাজস্বের বন্দোবস্ত এরপর চিরস্থায়ী হওয়া উচিত।

"সুতরাং যেহেতু উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশই হল উচ্চতম হার যাতে ভূ-সম্পত্তি বিনষ্ট না করে সাধারণভাবে রাজস্ব ধার্য করা যেতে পারে, এবং যেহেতু, কোন ক্ষতি স্বীকার না করে যারা কৃষক নন সেই সব ব্যক্তি 'সরকার-জমি' দখল করবার পূর্বেই ঐ হারে রাজস্ব নামিয়ে আনা অবশ্য কর্তব্য, কাজেই এটা পরিষ্কার যে যদি ঐ হারে রাজস্ব হ্রাস না করা হয় তবে সমস্ত শ্রেণীর প্রজারা জমি দখল

করতে পারবে না, জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিও হয়ে উঠবে না। রায়ত্ বা সাধারণের দেয় রাজস্বের অবস্থার উন্নতিকল্পে বিবেচিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তও প্রবর্তন করা যাবে না। সুতরাং আমার মত হল যে হস্তান্তরিত জেলাগুলিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকারী খাজনা হওয়া উচিত মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ। বর্তমানে ধার্য খাজনা হল ৪৫ শতাংশ। নিম্নলিখিত উদাহরণ থেকে দেখা যাবে যে প্রস্তাবিত লক্ষ্যে রাজস্বের হার নামিয়ে আনবার জন্য ২৫ শতাংশ ছাড়ের প্রয়োজন হবে :—

ধরা যাক, মোট উৎপাদন··· ··· ··· ···	১০০
বর্তমান ধার্য হারে সরকারের প্রাপ্য··· ··· ···	৪৫
ধার্য রাজস্বের ২৫ শতাংশ বিয়োগ দিন··· ·· ···	১১$\frac{১}{৪}$
প্রস্তাবিত রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকারের প্রাপ্য··· ··· ··· ··· ···	৩৩$\frac{৩}{৪}$

"এবার আমি কি উপায়ে হস্তান্তরিত জেলাগুলিতে চিরস্থায়ী রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা যেতে পারে সে কথা বলব······

"১ম। বন্দোবস্ত হবে রায়তোয়ারী।

"২য়। কর্ষিত জমির প্রসার অনুসারে বন্দোবস্তের পরিমাণ বাৎসরিক ভাবে হ্রাসবৃদ্ধি পাবে।

"৩য়। রাজস্বের হার ধার্যের হিসাব-নিকাশের সময় সমস্ত জমির ওপর ২৫ শতাংশ রাজস্ব হ্রাস করা হবে।

"৪র্থ। যে সমস্ত জমিতে কুয়ো থেকে বা নদী ও নালা থেকে যন্ত্রের সাহায্যে জল সরবরাহ করা হয় সেই সমস্ত জমির ওপরেই অতিরিক্ত ৮ শতাংশ হারে বা সর্বসমেত ৩৩ শতাংশ হারে রাজস্ব হ্রাস করা হবে ; সর্ত হল যে চাষীরা নিজেদের খরচায় কুয়ো বা বাঁধের (দিরোয়া) সংস্কার করবেন। যে সব জমিতে ছোট ছোট পুকুর থেকে জল সরবরাহ করা হয় সেখানেই চাষীরা সংস্কারের খরচ বহন করতে রাজী থাকলে সে সব জমির ওপর রাজস্বের অনুরূপ হ্রাস করা যেতে পারে।

"৫ম। প্রতি বৎসরের শেষেই পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজ নিজ জমির কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া বা অতিরিক্ত জমি অধিকার করবার স্বাধীনতা প্রত্যেক রায়তেরই থাকবে। কিন্তু তিনি ছেড়েই দিন আর অধিকারই করুন, ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণের সমানুপাতিক অংশ তাঁকে গ্রহণ করতে হবে বা পরিত্যাগ করতে হবে, এ ব্যাপারে কোন বাছাই চলবে না।

"৬ষ্ঠ। যতদিন পর্যন্ত জমির খাজনা দিচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেক রায়তই

জমির নিরঙ্কুশ মালিক বলে বিবেচিত হবেন এবং খাজনার কোনরূপ বাঁধাধরা সীমা ছাড়াই খুশীমত জমি ভাড়া দেওয়া ও বিক্রি করবার স্বাধীনতা তাঁর থাকবে।

"৭ম। শস্যের উৎপাদনের মন্দা বা অন্যান্য বিপর্যয়ের জন্য সাধারণ অবস্থায় খাজনা মকুব করা হবে না। যদি খাজনা প্রদানে অক্ষম ব্যক্তির সম্পত্তি বা জমি থেকে বকেয়া খাজনা পূরণ করা না যায়, তবে যে গ্রামে সেই সম্পত্তি বা জমি অবস্থিত সেই গ্রামের অন্যান্য রায়তদের খাজনার পরিমাণ দশ শতাংশ, কিন্তু তার বেশী নয়, বৃদ্ধি করে তা আদায় করা হবে।

"৮ম। সমস্ত অনধিকৃত জমিই সরকারের হাতে থাকবে এবং খাজনা বা ঐ জমির যে সামান্য অংশই ভবিষ্যতে কর্ষিত হোক না কেন তার আয় সরকারী রাজস্বে যুক্ত হবে।

"৯ম। বাড়ী, দোকান ও আয়ের ওপর সমস্ত কর, সমস্ত শুল্ক, অনুজ্ঞা পত্র (লাইসেন্স) এবং ইত্যাদি একচেটিয়া ভাবে সরকারের মালিকানায় থাকবে! যে রায়তের জমির ওপর গৃহ বা দোকান নির্মিত হবে, যতটুকু জমি তা অধিকার করে থাকবে তার পরিমাপ মতন খাজনার বেশী খাজনা তিনি আদায় করতে পারবেন না!

"১০ম। যে সব জলাধার অতিরিক্ত খাজনা হ্রাস বা দেশবন্দম ইনামের দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা হয় নি, তাদের সংস্কার সরকারী খরচে হবে।

"১১শ। তক্কবি ক্রমশ তুলে দেওয়া হবে।

".২শ। প্যাটেল, কর্ণম এবং অন্যান্য গ্রামসেবকরা পূর্বের মতই সমাহর্তাঃ (Collector) অধীনে থাকবেন।

"১৩শ। যে বেসরকারী পাওনাদাররা রায়তদের সম্পত্তি ক্রোক করতে পারেন, তাঁরা ঐ রায়তদের কাছে সরকারের প্রাপ্য খাজনা পরিশোধ করে দেবেন এবং ক্রোক-আরম্ভ করবার পূর্বেই তাঁরা এ সম্পর্কে নিদর্শনপত্র দাখিল করবেন।"[১]

আমরা এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম, কারণ এর মূল স্থপতি যেমনটি কল্পনা করেছিলেন রায়তোয়ারী বন্দোবস্তের সেই নকশাটি পরিষ্কার করে বুঝবার জন্য তা প্রয়োজন। টমাস মুনরো প্রতিটি রায়তের সঙ্গেই আলাদা বন্দোবস্তে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন একটা চিরস্থায়ী রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত, যাতে কম বা বেশী জমিকর্ষণের আওতায় আনবার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের গভর্ণররূপে লর্ড ক্লাইভের স্থলাভিষিক্ত লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংকও ঠিক একই মত পোষণ করতেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁরই লিপিবদ্ধ এক নথীতে তিনি লিখেছিলেন যে জমিদারী বন্দোবস্ত বাংলাদেশেই মাননসই, কারণ

সেখানে বংশানুক্রমিক জমিদারগণ রয়েছেন, কিন্তু মাদ্রাজের যে সব অঞ্চলে সে ধরনের ভূম্যধিকারীদের কোন অস্তিত্ব নেই সে সব অঞ্চলে জমিদারি বন্দোবস্ত চলে না।

"আমি বেশ বুঝতে পারছি যে জমিদারদের সৃষ্টি এমন একটা পদক্ষেপ যা সরকারের এবং সাধারণভাবে সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী।...চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল নীতিগুলির আমি মোটেই বিরোধী নই। বরং আমি সেগুলির প্রশংসা করি এবং আমি বিশ্বাস করি যে ঐ নীতিগুলি পৃথিবীর এই অংশে এবং প্রতিটি অংশেই প্রযোজ্য।

ঐ বৎসয়ের পরবর্তীকালে লিপিবদ্ধ এক নথীতে গভর্ণর বলেছিলেন :

"যদি রায়তদের সঙ্গে বাৎসরিক বন্দোবস্তটি কতকগুলি স্থির নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হত যে নীতির মূল কথা হল এক বৎসরের জন্য শিল্প থেকে প্রাপ্ত ফল সম্পর্কে রায়তকে নিশ্চিন্ত রাখা, এবং তা বাস্তবক্ষেত্রে এ ধরনের স্থিরীকৃত সুবিধা-গুলিকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়ে থাকে, তবে ঐ একই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রায়তদের সুবিধার জন্য কিছুটা বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রসারিত হলে, তা উন্নততর হাতে সেই একই সুযোগের সৃষ্টি করবে।"[২]

এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে টমাস মুনরো ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক যখন রায়তোয়ারী বন্দোবস্তের সমর্থনে ওকালতি করছিলেন তখন দুজনেরই কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্পনাটাই বড় হয়ে উঠেছিল। ভারতত্যাগের ছয় বৎসর পর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সনদ নবীকরণের অব্যবহিত পূর্বে টমাস মুনরো কমিটি অব দি হাউস অব কমন্স্-এর জেরার উত্তরে যথাসাধ্য জোরালো, স্বচ্ছ ও অভ্রান্তরূপে তাঁর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছিলেন।

"যে হস্তান্তরিত জেলাগুলিতে আপনি সমহর্তা (Collector) ছিলেন সেখানে কি রাজস্বের কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছে ?"

"আমার ভারতত্যাগের সময় পর্যন্ত কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই করা হয়নি। কিন্তু রায়তরা যাতে তাঁদের সম্পত্তি ভোগ করতে পারেন সে সম্পর্কে তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষিত ছিল, সমস্ত জমির ওপরেই পাকাপাকি রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল। খাজনা জমা দিলে প্রত্যেক রায়তই নিজ নিজ খামার বজায় রাখতে পারতেন। জমির খাজনা বৃদ্ধি করা যেত না।"

"রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত বলতে আপনি কি বোঝেন দয়া করে কমিটির কাছে তা ব্যাখ্যা করুন।"

"রায়তোয়ারী বন্দোবস্তের মূল নীতিটি বলতে কি বোঝায় আমি শুধু সে

কথাটাই বলব। এর আনুসঙ্গিক ব্যাপারগুলো খুবই বিশদ। রায়তোয়ারী বন্দোবস্তের মূল কথা হল দেশের সমস্ত জমির ওপরেই একটা রাজস্ব নির্ধারণ করা। এবং এই রাজস্ব হবে চিরস্থায়ী। প্রত্যেক রায়তই যার যে জমি আছে সে জমির চাষবাসের মালিক তিনিই। একটা নির্ধারিত হারে রাজস্বের বিনিময়ে তিনি সে জমি যতদিন খুশী দখলে রাখতে পারেন। কোন অতিরিক্ত রাজস্ব ব্যতীতই তিনি সে জমি চিরদিনের জন্য ভোগ করতে পারেন। যদি তিনি কোন পতিত বা আরও কিছু জমি দখল করেন তবে ঐ জমির ওপর নির্ধারিত রাজস্বই কেবলমাত্র জমা দেবেন, অতিরিক্ত কিছু নয়। তাঁর দেয় খাজনার কোন পরিবর্তন হবে না।"

"কমিটি কি একথাই ধরে নেবে যে চিরস্থায়িত্বের ব্যাপারে রায়তোয়ারী ও বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোন প্রভেদ নেই ?"

"চিরস্থায়িত্বের ব্যাপারে দুটো বন্দোবস্তের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই ঠিকই, কিন্তু রায়তোয়ারী বন্দোবস্তে চাষবাসের অনুপাতে সরকার পতিত জমি থেকে ক্রমবর্ধমান রাজস্ব পেতে পারেন।"[৩]

ভাষার যদি কোন অর্থ থেকে থাকে, তাহলে একথা পরিষ্কার যে মুনরো যে-রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত করেছিলেন এবং যা তিনি মাদ্রাজের অন্যান্য অংশেও প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, সে বন্দোবস্তের শর্ত ছিল যে উদ্ধারকৃত নতুন জমি বাদ দিয়ে, প্রত্যেক রায়তই **কোনরকম অতিরিক্ত রাজস্ব ব্যতীতই** নিজ নিজ জমি চিরদিনের জন্য ভোগ করবেন। শব্দের যদি কোন বিশেষ গুরুত্ব থেকে থাকে, তবে এটা পরিষ্কার যে কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মুনরোর রায়তোয়ারী বন্দোবস্তের **চিরস্থায়িত্বের ব্যাপারে কোন পার্থক্য ছিল না** তবে এর মধ্যে শেষোক্ত বন্দোবস্তে কেবলমাত্র পতিতজমি চাষবাসের আওতায় আনলে তার জন্য খাজনা দিতে হত। এ কথাটা পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করা দরকার, কারণ মাদ্রাজের চাষীদের ঐ একই জমির ওপর স্থিরীকৃত, অপরিবর্তমান ও অপরিমার্জনীয় রাজস্বের দাবী সাম্প্রতিক কালে মাদ্রাজ সরকার উপেক্ষা করেছেন এবং মুনরোর রায়তোয়ারী বন্দোবস্তের প্রথমতম নীতিটিকেই উপেক্ষা করা হয়েছে।

যখন চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্তের নীতি ক্রমশঃ অপছন্দের কারণ হয়ে উঠতে লাগল আর চিরস্থায়ী রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত মুনরোর আনুকূল্য লাভ করল, তখন মাদ্রাজের বোর্ড অব রেভেন্যু একটি তৃতীয় বন্দোবস্তের সুপারিশ করলেন। তা হল চিরস্থায়ী মৌজাওয়ারী বন্দোবস্ত বা প্রত্যেকটি গ্রাম সমাজের

সঙ্গে বন্দোবস্তের পরিকল্পনা। অত্যধিক মাত্রায় স্থিরীকৃত রাজস্ব থেকে ২৫ শতাংশ হ্রাস করবার স্বপক্ষে ১৮০৭, ১৫ই আগষ্টের মুনরোর প্রস্তাবের উল্লেখ করে বোর্ড অব রেভেন্যু এই নতুন পরিকল্পনাটি উত্থাপিত করলেন।

"২৯। এটা হল কর্ণেল মুনরোর পরিকল্পনার রূপরেখা। অর্পিত জেলাগুলি সম্পর্কে এই পরিকল্পনা যতটা প্রযোজ্য যে সব জেলাতে এ বন্দোবস্ত হয়নি সে সব জেলাতেও এই পরিকল্পনা কম প্রযোজ্য নয়। যদি সরকারী প্রয়োজনে বর্তমানে নির্ধারিত রাজস্বের ২৫ শতাংশ অথবা ধরা যাক ১৫ শতাংশই ছাড় দেওয়ার মত একটা বিরাট ত্যাগ অনুমোদন করে থাকতে পারে, তবে আমরা পদক্ষেপটিকে একান্ত গ্রহণযোগ্য ও ভবিষ্যৎ সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরীক্ষিত বলে ধরে নিতে পারি। এ বিষয়ে বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন যে কৃষকের শ্রমের ফসল আমরা যতটা কম গ্রহণ করব, তাঁর অবস্থাও তত‌ই সমৃদ্ধ হবে।

"৩০। কিন্তু যদি সরকারী প্রয়োজনে তাদের এতটা ত্যাগের অনুমতি দিতে না পারে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির আশীর্বাদ যদি এখনই তারা প্রদান করতে না পারে, তবে পত্তনি ব্যবস্থায় (farming system) জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা যতটা ফলপ্রসূরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায় ততটুকু করেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। জমিদারের খাজনার কিছুটা পরিত্যাগ করতে যদি তারা অপারগ হয়ে থাকেন, তবে তাদের অসংযত জমিদার বলাই সঙ্গত।

"৩১। এই পরিস্থিতিতে আমাদের মনে হয় রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত থেকে হগসন প্রস্তাবিত গ্রাম-খাজনা ব্যবস্থায় রূপান্তর রাজ্যের খাজনা আদায় ও দেশের উন্নতির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পন্থা।

"৩৮। প্রত্যেকটি গ্রামই বারটি করে আগাগান্দিয়া নিয়ে গঠিত—যেমন এগুলিকে বলা হয়—মোকদ্দম, প্যাটেল, রাপাদ, রেডিড বা গ্রামমুখ্য নিয়ে এক একটি ক্ষুদ্র কমনওয়েলথ বিশেষ। আর ভারতবর্ষ হল এমন সব কমনওয়েলথের একটি সমাবেশ। গ্রামবাসীরা যুদ্ধের সময় নিজ নিজ গ্রামমুখ্যের দিকেই চেয়ে থাকে। সাম্রাজ্যের পতন ও বিভাজন নিয়ে তারা কিছু ভাবে না যদি গ্রাম থাকে অটুট। কোন শক্তির অধীনে গ্রাম হস্তান্তরিত হল সে নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা অপরিবর্তিত থেকে যায়। গ্রামমুখ্য তখনও রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায়কারী সমাহর্তা, শাসক ও প্রধান কৃষক।

"৩৯। মনুর যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত গ্রামমুখ্যের সঙ্গেই বা গ্রামমুখ্যের মারফৎই বন্দোবস্ত হয়ে এসেছে। যখন রাজস্বের হার যথেষ্ট চড়া বলে মনে হয়েছে এবং গ্রামমুখ্যও তাতে রাজী হয়েছেন, তখন সাধারণত তাকে

রায়তদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে দেওয়া হয়েছে। যদি রাজস্বের হার খুবই কম হত এবং গ্রামমুখ্যগণ হারবৃদ্ধিতে আপত্তি জানাতেন, তবে তাঁর উপস্থিতিতে আমলদাররা রায়তদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতেন। এই ব্যবস্থা কালের বিচারে পরীক্ষিত এবং যেহেতু এই ব্যবস্থায় প্রায়শই যখন সমগ্র প্রদেশসমূহই উন্নত কৃষিব্যবস্থায় স্থাপিত ছিল, তখন চাষবাসের উন্নতির মহান উদ্দেশ্যেই নিশ্চয়ই এটা হিসাব করে করা হয়েছে।"[৪]

উত্তর মাদ্রাজ সরকার বোর্ড অব রেভেন্যু-কে চিরস্থায়ী গ্রাম বন্দোবস্ত প্রবর্তনের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যে সব জেলাতে তখনও বন্দোবস্ত হয়নি সে রকম অনেক জেলার গ্রামেই ত্রৈবার্ষিকী গ্রাম বন্দোবস্তর প্রবর্তনের অনুমতি দিলেন।[৫] কোর্ট অব ডিরেক্টার্সের কাছে লিখিত পত্রে তাঁরা ত্রৈবার্ষিকী বন্দোবস্তের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর দশ বৎসরের বন্দোবস্তের প্রস্তাব দিলেন। এই বন্দোবস্ত যদি ডিরেক্টারগণের অনুমোদন লাভ করে তবে তা চিরস্থায়ী হবে।[৬]

ডিরেক্টারগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভাবনা সম্পর্কে তখন সচকিত হয়ে উঠলেন এবং কোনরকম নির্দেশ ব্যতীতই দশ বৎসরের বন্দোবস্ত প্রবর্তনের জন্য বোর্ড অব রেভেন্যুকে অভিযুক্ত করলেন।

"এই পত্র আপনাদের কাছে পৌছান পর্যন্ত যে সমস্ত প্রদেশে বন্দোবস্ত হয় নি, সেই সমস্ত প্রদেশেই তথাকথিত রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত চালু হবে এবং যে সমস্ত গ্রামে অন্য কোন নীতি অনুসারে খাজনা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, সে সব জায়গায় যে নির্ধারিত সময়ের জন্য তা অনুমোদিত হয়েছে তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই খাজনা-বিলি ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘোষণা করতে হবে।[৭]

ডিরেক্টারদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ সরকার প্রতিবাদ জানালেন।

"কৃষিই ধরা হয়েছে জাতীয় সম্পদ ও উন্নতির ভিত্তি। কৃষির উন্নতি ও প্রসার অপরিহার্য বলে বিবেচিত হওয়ায় ভূ-সম্পত্তির ওপর সরকারের দাবী সঙ্কোচনের প্রয়োজন হয়েছে। এই সঙ্কোচনের ফলে সরকারের ক্ষতি হবে এমন কথা ভাবা যায় না, কারণ ইহা ব্যতীত কৃষির উন্নতি ও প্রসার কোনদিনও ঘটবে না, দেশের সম্পদ সম্ভাবনারও বৃদ্ধি ঘটবে না।...পূর্বোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করবার সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে আমরা সরকারী রাজস্ব-সংক্রান্ত নীতি হিসাবেই ধরে নিয়েছি। কিন্তু এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে আমাদের সরকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার ব্যাপারে কৃষিতে নিযুক্ত জনসাধারণের মনে একটা গভীর ও চিরস্থায়ী আকর্ষণ সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুরুত্ব অপরিসীম।[৮]

পরের বৎসর চিরস্থায়ী গ্রাম বন্দোবস্তের সপক্ষে ও চিরস্থায়ী রায়তোয়ারী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ সরকার কোর্ট অব ডিরেক্টার্সের কাছে আরও জোরালো আপীল করলেন।

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধানতম উদ্দেশ্যই যদি হয় জনসাধারণকে নিজেদের সমস্যাবলীর ব্যবস্থাপনার ভার দেওয়া, তা হলে তাঁরা নিজেদের বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ সরকারী কর্মচারিগণের চাইতে আরও ঢের বেশি অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পরিচালনা করবেন এই বিশ্বাস থেকে এ ধরনের একটা ব্যবস্থায় (রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত) উক্ত উদ্দেশ্যের কতটুকু সিদ্ধ হতে পারে? যাঁদের কাছ থেকে কর্তৃত্বভার হস্তান্তরিত হবার কথা ছিল, এখনও তাঁদের হাতেই কর্তৃত্ব কতটা সামগ্রিক ভাবে রয়ে গেছে। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে জমির মালিকদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য যে বন্দোবস্তের প্রকাশ্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেই বন্দোবস্তেই আকস্মিক বা সাধারণ বিপর্যয়, আলস্য বা বিশৃঙ্খলা হেতু কোন বৎসর চাষ ব্যর্থ হলে সেই জমির সমস্ত অধিকারই জমিদারকে ত্যাগ করতে হবে এবং এ ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সম্পত্তি সরকারের বাজেয়াপ্ত হবে। যেখানে সত্যই ভূ-সম্পত্তির অস্তিত্ব আছে সেখানে নিশ্চিতভাবেই এটা একটা অবৈধ জবরদখলের অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা।......

"যে জমি ছেড়ে দিচ্ছে বা ভোগ করছে সেই জমির মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রতারণাপূর্ণ হিসেবের বিরুদ্ধে সে (কৃষক) নিরাপদ নয়! অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যদি সে জমির সীমানা, কৃষির চলতি অবস্থা, জলসেচের ব্যবস্থা, তাকবির বণ্টন আগের মতই রাখে অথবা বিপর্যয় হেতু খাজনার হ্রাসের চেষ্টা করে, তা হলে সমস্ত কিছুই নির্ধারিত হবে এমন লোকের দ্বারা যাদের তার সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ নেই, নেই সুখদুঃখের প্রতি কোন সহানুভূতি। ব্যক্তিগত স্বার্থ যখন তাকে অপপ্রয়োগের হাত থেকে নিরাপত্তা দেয় তখন তার ওপর আস্থাস্থাপনই কর্তব্য; সরকারী কর্মচারীদের অর্থহীন ও অবিবেচনাপ্রসূত সাহায্যের ঝামেলা ও তাঁদের অত্যাচার ও লোলুপতার ভীতি থেকে মুক্ত অবস্থায় জনসাধারণ নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী দেশের উন্নতি করবে এটাই কাম্য। যাই হোক আমরা স্বীকার করছি যে কর্ণেল মুনরো প্রস্তাবিত রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত কোন দিক থেকেই জমি-রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে অভিহিত হবার যোগ্য নয়। বরং বিপরীত পক্ষে এই বন্দোবস্তে জমিরাজস্ব ও ভূ-সম্পত্তি পূর্বের মতই অনির্ধারিত অবস্থায় পড়ে থাকবে আর সাধারণ লোকেরাও সরকারী কর্মচারীদের সেই অবৈধ ও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের বাধ্যবাধকতায় পড়ে যাচ্ছেন, যার অধীনে কোন বেসরকারী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানই সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না।......

"ভারতবর্ষের ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে বর্তমানে এদেশে এবং ইংলণ্ডে চলতি অভিমতের মধ্যে মূল পার্থক্য হল যে ইংলণ্ডে আশঙ্কা হচ্ছে যে ভারতের সম্পদের ওপর সরকারী দাবী এর সমৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলতে নাও পারে। আবার এখানকার সার্বজনীন মনোভাব হল—এর মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই বলেই বিশ্বাস করি—যে সরকারী দাবীর চাপে দেশের সমৃদ্ধি এতই সংকুচিত যে উদারতম ও সুবিবেচনাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ব্যতিরেকে সম্পদের অবনতির অধিকতর আশঙ্কা থাকবে কিন্তু তার দ্রুত উন্নতির কোন আশাই থাকবে না। এটা এমন একটা মনোভাব যা খুব জোরদার ভাবে আপনাদের মাননীয় কোর্টের কাছে উপস্থাপিত করতে পারি না। এর আবেদন আপনাদের বিচক্ষণতার কাছে। আপনাদের বিচারবোধের কাছে, আপনাদের মানবতার কাছে। এর সঙ্গে আপনাদের সরকারের সফল প্রশাসন তথা অসংখ্য মানুষের মঙ্গল ও সুখ ও একটা বিরাট দেশের সমৃদ্ধির প্রশ্ন জড়িত। সে দেশে প্রকৃতির কৃপাদৃষ্টি আছে, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বৈদেশিক আক্রমণ থেকে সে দেশ মুক্ত, আর যাতে সে সমৃদ্ধ ও উন্নতিশীল হতে পারে তার জন্য প্রয়োজন এর সম্পদের ওপর সরকারী দাবীর শিথিলতা। এই বিরাট পরিণতিলাভের সঙ্গে তুলনা করলে তার জন্য যে ত্যাগসমূহ স্বীকার করা যেতে পারে তার প্রত্যেকটিরই মূল্য কত কম বলে মনে হয়?"[৯]

রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত ও গ্রাম-বন্দোবস্তের প্রশ্নের সিদ্ধান্তটি কিছুদিনের জন্য স্থগিত রইল, কারণ বিচারবিভাগীয় ও প্রশাসনিক সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করাই আশু প্রয়োজন ছিল। সাতাশ বৎসর ভারতবর্ষে কাজ করবার পর টমাস মুনরো সাত বৎসর ইংলণ্ডে অতিবাহিত করলেন। তারপর বিচারবিভাগীয় সংস্কারের জন্য একটি কমিশনের প্রধানরূপে তাঁকে আবার পাঠানো হল এবং ১৮১৪-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর তিনি মাদ্রাজে পৌছলেন। বিচার ব্যবস্থার উন্নতি ও বিচারবিভাগের দায়িত্বশীল পদে ভারতীয়দের গ্রহণ করবার জন্য তিনি কি ভাবে কাজ করেছিলেন তার কথা অন্যত্র বলা হবে। কিভাবেই বা তিনি ভারতীয়দের ওপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করে তথা যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য প্রদর্শন করে শেষ মারাঠা যুদ্ধে নিজেকে চিহ্নিত করেন সেটা এমন একটা বিষয় যা বর্তমান গ্রন্থের পরিধির মধ্যে পড়ে না।[১০] এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর ১৮১৯-এর জানুয়ারীতে আরেকবার বিলেত যাত্রা করেন এবং এইবার ভূমিবন্দোবস্তের প্রশ্নটি সিদ্ধান্তের জন্য গৃহীত হয়।

মাদ্রাজের বোর্ড অব রেভেন্যু তখনও গ্রাম বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পক্ষপাতী

ছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তারা এক নথী লিপিবদ্ধ করেন। ভারতবর্ষে রচিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করা ও স্মরণীয় নথীগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

জমিদারী বন্দোবস্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা লিখেছেন, "বর্দ্ধিত সুযোগ-সুবিধা ও প্রথানুযায়ী এই রাজস্ব আদায় হয়েছে, দেশীয় রাজস্ব কর্মচারীদের দ্বারা এবং সমাহর্তা (Collector) ও সুপারিন্টেণ্ডিং বোর্ডের মারফৎ বার্ষিক বন্দোবস্তের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত বিপুল ব্যয়ভারের হাত থেকে সরকার রেহাই পেয়েছেন, রেহাই পেয়েছেন রাজস্ব-আদায়ে প্রতারণা ও তছরূপের বাৎসরিক অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের হাত থেকে।...লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা গেল—সরকার (Circer) অঞ্চলে জোর করে প্রাপ্য আদায়ের জন্য সরকারের পূর্বতন নিষ্ফল প্রচেষ্টা, দেয় রাজস্ব এড়িয়ে যাবার জন্য জমিদার ও পলিগারদের কৌশল ও প্রচেষ্টা, জমিদারী ও পোল্লাম জমি থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য যে সামরিক বাহিনীকে প্রায়শই নিয়োগ করতে হত সেই সামরিক বাহিনীর পীড়ন ও সাহায্য, দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে পূর্বে প্রচলিত সবরকমের বিভিন্ন আইনের অপব্যবহার যা এখনও সে সমস্ত জেলার পক্ষে লজ্জাকর যেখানে এখনও সাময়িক বন্দোবস্ত রয়েছে......

"প্রাচীন জমিদার ও পলিগাররা প্রকৃত পক্ষে ছিলেন দেশের অভিজাত শ্রেণী এবং যদিও তাঁদের কিছু ভোগদখলের শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তে ভুল প্রমাণিত হতে পারে, তথাপি বলতে হবে যে তাঁরা প্রজাদের সঙ্গে এমন বন্ধনে জড়িত ছিলেন যার ফলে তাঁরা অনেক বেশি সুশাসক, অধিকতর বিচক্ষণ, উদার ও ন্যায্য হতেন যে বন্ধন কখনই দুর্বল হত না। পরবর্তীসময়ে হস্তান্তরিত জেলাগুলি প্রত্যর্পণের সময় আমাদের শক্তি যতটা সবল ছিল 'সরকার' অঞ্চলের প্রদেশগুলি অধিকারের সময় 'সরকার' এলাকায় আমাদের শক্তি যদি ততটা সবল থাকত, তবে শেষোক্ত প্রদেশের পলিগারদের মতন প্রাচীন জমিদারদেরও এদেশ থেকে উৎখাত করে আমাদের দানশীলতার ওপর নির্ভরশীল পেনশনভোগীতে পরিণত করা যেতে পারত। কিন্তু প্রজাদের সঙ্গে দেশীয় শাসকবর্গের সম্বন্ধ ও বহু জমিদারীর স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এ-ধরনের একটা নীতি যতটা অনুদার ততটাই অবিজ্ঞোচিত হবে কিনা সে সম্পর্কে গভীর সন্দেহ থেকে যায়।"

রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁরা লিখেছেন, "রায়তোয়ারী বন্দোবস্তের উদ্ভব ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির কাছে হস্তান্তরিত বড়ামহল ও সালেম জেলায়। এর প্রথম প্রবর্তন করেন কর্ণেল রীড, ঐ অঞ্চল হস্তান্তরিত হবার পর তিনিই তার ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিযুক্ত হন। তৎকালীন লেফটানেন্টগণ—

—পরবর্তীকালের কর্ণেল মুনরো, কর্ণেল ম্যাকলিওড ও কর্ণেল গ্রাহাম—কর্ণেল রীডের সহকারী ছিলেন।……

"আর্কটের উত্তরাঞ্চলে এই সমস্ত অধিকারেরই (মিরাসদার বা হালচাষের বংশানুক্রমিক মালিকদের বিশেষ অধিকার) পুনঃপ্রবর্তন করা হয় ও সরকারী রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে জমির রাজস্ব এত বেশি করে নির্ধারিত করা হয় যাতে জমির মালিকদের কাছে অবশিষ্ট সামান্যতম খাজনাও সরকারী রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। রাষ্ট্র ও প্রকৃত চাষীর মধ্যে কোন মধ্যসত্বভোগীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নি।……

"প্রকৃতপক্ষে বহুক্ষেত্রেই তহশীলদার ও সেরেস্তাদারেরা (স্বল্পবেতনভোগী অধস্তন কর্মচারী) বাৎসরিক রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত করতেন এবং ফসল ঘরে তোলবার পূর্ব পর্যন্ত সাধারণতঃ বন্দোবস্তের পাওনাগণ্ডা ঠিক হত না। তখন ব্যবস্থা ছিল যতটা উচ্চ হারে রাজস্ব আদায় করা সম্ভবপর ততটা উচ্চ হারে রাজস্বের বন্দোবস্ত করা। যদি ফলন ভাল হত তবে জরিপের হারের মধ্যেই রাজস্বের হার ততটা উঁচুতে তোলা হত রায়তগণ যতটা দিতে সমর্থ ছিলেন। যদি ফলন ভাল না হত তবুও শেষ কড়িটি পর্যন্ত আদায় করা হত এবং রায়ত খাজনা দিতে পুরোপুরি অসমর্থ না হলে কোন রকম রেহাই অনুমোদন করা হত না। এ বিষয়ে কঠোরতম তদন্ত অনুষ্ঠিত হত। কেবলমাত্র সমাহর্তার (Collecter) বহু বিস্তৃত প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্মচারীই তাঁর উদ্ভাবিত তদন্তকার্যে নিযুক্ত হতেন না, অধিকন্তু রায়তের সমস্ত প্রতিবেশীই তদন্তকারীতে পরিণত হত। রায়তদের ব্যর্থতার জন্য এই প্রতিবেশীরাই দায়ী থাকত যদি না তারা রায়তের সম্পত্তির মালিকানা দেখাতে পারত।…

"রাজস্ব কর্মচারিগণ চাষীকে যে জমি বণ্টন করে দিতেন, চাষী সেই সব জমিতেই আবদ্ধ থাকত আর সে চাষ করুক বা নাই করুক, শ্রীথ্যাকারে জোর দিয়ে যে কথা বলেছেন, তার স্কন্ধে সমস্ত খাজনার বোঝা চাপানো হত। বেলারির সমাহর্তা শ্রীচ্যাপলিন ছিলেন কর্ণেল মুনরোর পূর্বতন সহকারী এবং এখনও তিনি রায়তোয়ারী বন্দোবস্তের একজন মহা উৎসাহী প্রবক্তা। তাঁর ভাষায় বলতে হয় এই বন্দোবস্তের রীতিই ছিল বর্তমান "প্রতিবিধানের সঙ্গে যার কোন সামঞ্জস্য নেই, কর্তৃত্বের এমন যথেচ্ছ প্রয়োগের দ্বারা অধিবাসীদের নিজ নিজ সামর্থানুযায়ী কিছুটা পরিমাণ জমি চাষ করতে বাধ্য করা। এর ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন যে সমাহর্তা (collector) ও তাঁর দেশীয় রাজস্ব কর্মচারিগণ তাদের আটকে রেখে শাস্তি দেবার জন্য কর্তৃত্বের ব্যবহার করেই এ কাজটা করতেন। এবং তিনি

পরিষ্কার ভাবে আরও বলেছেন যে রায়ত যে জমি চাষ করতেন অত্যাচারের ফলে তিনি যদি সে জমি থেকে বিতাড়িত হতেন তবুও প্রচলিত রীতি ছিল 'পলায়নকারী যেখানে যেতেন সে পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করা, খেয়াল খুশী মত তার খাজনা ধার্য করা ও বাসস্থান পরিবর্তনের জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা তিনি আশা করতে পারতেন তার থেকে তাকে বঞ্চিত করা'……

"নবলব্ধ দেশের প্রকৃত সম্পদ তথা জমির ভোগদখলের আসল গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ বৈদেশিক বিজেতাদের একটি ক্ষুদ্র দলকে দেখছি ভাষা রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারে পরস্পরের থেকে পৃথক বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত এক বিরাট এলাকার অধিকার নেবার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা চরম শ্রমসাধ্য কাজের জন্য প্রচেষ্টা করলেন যা ইয়োরোপের সর্বাপেক্ষা সুসভ্য দেশেও বরং একটা কাল্পনিক প্রকল্প বলে মনে হবে, যার সম্পর্কে আমাদের সবরকমের পরিসংখ্যানগত তথ্য হাতে আছে এবং যার সম্পর্কে সরকার প্রজাদের সঙ্গে একমত, অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদেশ, জিলা, বা গ্রাম জমিদারী বা খামারের ওপর খাজনা ধার্য না করে তাদের অধীনস্থ প্রত্যেকটি কৃষিক্ষেত্রের ওপর পৃথক খাজনা ধার্য করা। দেখতে পাচ্ছি এই কল্পিত উন্নতিলাভের চেষ্টায় তাঁরা পুরনো বন্ধনগুলি অনিচ্ছাকৃত ভাবে ছিন্ন করেছেন—যে পুরনো রীতিনীতিগুলি প্রতিটি হিন্দু গ্রামের প্রজাতন্ত্রকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। এক নতুন ভূ-সম্পত্তির পুনর্বণ্টন-গত আইনের মারফৎ যে জমি যা স্মরণাতীত কাল হতে যৌথভাবে গ্রাম সমাজের অধিকারে ছিল, সেই জমি যা কেবলমাত্র সুবিধাভোগী শ্রেণীর (মিরাসদার ও কাদিম) প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই নয় নিম্নতর প্রজাবর্গের (পাইকারী) মধ্যেও বণ্টিত ছিল, যেগুলির নতুনভাবে বণ্টন ও কর ধার্য করে তারা অজ্ঞভাবে পুরনো রীতিনীতিগুলিই অগ্রাহ্য করেছেন এবং এই অগ্রাহ্যকরণের দ্বারা জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ করেছেন, যা সরকারী সংস্থার অধীন ছিল (গ্রামমণ্ডিয়ম) তারই পুনরুদ্ভব ঘটেছে। পরিবর্তে একজন ব্যক্তিকে আর্থিক বৃত্তি দান করা হয়েছে। তারা প্রতিটি কৃষিক্ষেত্রের ওপর নিজেদের দাবী সীমিত করবার ভান করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দাবী প্রতিষ্ঠা করে খেয়ালখুশী মত রায়তের ওপর আকাশছোঁয়া খাজনা ধার্য করেছেন। তাদের পূর্ববর্তী মুসলমান শাসকদের মতই জোর করে রায়তকে লাঙলের সঙ্গে জুতে দেওয়া হয়েছে, অতিরিক্ত করভার সাপেক্ষ জমি চাষ করতে তাকে বাধ্য করা হচ্ছে, বেপাত্তা হলে তাকে টেনে আনা হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত তার ফসল না পাকে ততদিন তাদের দাবী স্থগিত থাকে, আর

তারপর তার কাছে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে নেওয়া হয়। আর রায়তের কাছে পড়ে থাকে শুধুমাত্র তার বলদজোড়া আর শস্যবীজ; আসল কথা, চাষী চাষ নিজের জন্য না করে তাদের জন্যই চাষ পুনরারম্ভের বিষাদময় কাজটি করাবার জন্য ঐ জিনিসগুলি সরবরাহ করতে তাকে বাধিত করা হয়।"

রায়তোয়ারী বন্দোবস্তে এই ছিল চাষীর অবস্থা। মুনরো যা সুপারিশ করেছিলেন সেই চিরস্থায়ী ও মাত্রাবদ্ধ রাজস্ব ব্যবস্থায় কোন রক্ষাকবচ ছিল না। 'মানুষপ্রতিম জন্তুর খামার'-এর এরকম একটা জোরালো চিত্র এর আগে আর অঙ্কিত হয় নি।

পরিশেষে, গ্রামীন ব্যবস্থা সম্পর্কে বোর্ড লিখেছেন: "যদিও এই বন্দোবস্ত প্রতিটি জেলায় সমানভাবে সফল হয় নি, তথাপি যেখানে (যেমন বেলারি জেলায়) এটি বিন্দুমাত্র সাফল্যলাভ করেছে, সমাহর্তাদের (Collectors) সর্বজনসম্মত অভিমত হল যে সেখানে এই ব্যবস্থায় দেশের কৃষক সাধারণের সবচেয়ে বেশী আর্থিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। কেবলমাত্র যে ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তারাই নয়, রায়তদের বিরাট সঙ্ঘও এই গ্রাম-বন্দোবস্তে প্রধানত লাভবান হয়েছিল। প্রায় সর্বত্রই রায়তোয়ারী তিরাওয়াগণ উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত হয়েছে এবং অধস্তনদের ওপর পীড়নকারী মুখ্যরায়তদের পরিবর্তে প্রায় প্রত্যেক সমাহর্তাই তাদের ক্ষয়িষ্ণু কর্তৃত্ব তহশীলদারদের হাতে জোরদার করতে পেরেছেন।" কোন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ভিন্ন এই হল তাঁদের সমস্ত রিপোর্টের সার্বজনীন ভাষা। এই ফলাফলকে বিশ্বস্তভাবেই এই সিদ্ধান্তের চরম প্রমাণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই বন্দোবস্তটি যাঁরা প্রবর্তন করেছিলেন তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পেরেছে। কিন্তু যেখানে এই বন্দোবস্ত সবচাইতে ভালো ভাবে পরিচালিত হয়েছে যেমন কুদাপ্পা ও আর্কটের উত্তরাংশে সেখানে সমৃদ্ধির যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই প্রদেশের সমস্ত রাজস্বসংক্রান্ত নথীর মধ্যে তার তুলনা খোঁজা নিষ্ফল হবে।"[১১]

শেষ আবেদনটিও নিষ্ফল হয়েছিল। রায়তোয়ারী বন্দোবস্তের মহান স্রষ্টা, এখনকার স্যর টমাস মুনরো কে. সি. বি. মাদ্রাজের গভর্ণর হিসেবে তৃতীয় ও শেষবারের মতন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। যে সমস্ত জায়গায় জমিদার ও পলিগারদের সঙ্গে এর মধ্যেই জমিদারী বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল, সে সমস্ত জায়গা ভিন্ন ঐ প্রদেশের সর্বত্রই রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হয়। আশি বৎসরেরও পরে এই স্মরণীয় বিতর্কের পর্যালোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র একটা বিষণ্ণ আগ্রহে সমস্ত ব্যাপারটি চিন্তা করেন

এবং স্যর টমাস মুনরোর ব্যক্তিগত বিরাট চরিত্র সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধাও এই ধারণা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারবে না যে এই বিতর্কে বোর্ড অব রেভেনিউই সঠিক কথা বলেছিলেন। বিচক্ষণ সরকার আধুনিক প্রগতির সঙ্গে খাপ খায় দেশের এমন কোনো একটা সুপ্রাচীন সংস্থাকে বড় করে তোলবার ও তার উন্নতি বিধানেরই চেষ্টা করেন, তার বিলোপ সাধন করেন না। এটা অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষের গ্রামের আভ্যন্তরীণ সংস্থাগুলিকে তহশীলদার, সেরেস্তাদার বা পুলিশী ব্যবস্থার পরিবর্তে গ্রামবাসীরা নিজেরাই আরও সাফল্য ও সন্তোষের সঙ্গে পরিচালিত করতে পারতেন। যেখানে সম্ভবপর সেখানে জনসাধারণকে নিজেদের সংগঠন পরিচালিত করতে দেওয়া সমগ্র মানবিকতার পক্ষেই একটা বিরাট লাভ। মুনরো যদি বন্দোবস্ত-কার্যের প্রথম যুগে বড়ামহল, কানাড়া ও হস্তান্তরিত জেলাগুলিতে গ্রামীন সমাজকে কার্যকরী অবস্থায় দেখতে পেতেন তবে তিনি নিজেই ঐ বন্দোবস্তের প্রধানতম প্রবক্তা হয়ে উঠতেন। কিন্তু ঐ সব জায়গায় চাষীদের সঙ্গে সরাসরি বন্দোবস্ত করে, মাদ্রাজ সরকার ও হাউস অব কমন্সের কাছে ঐ বন্দোবস্ত সালিশি করে, প্রদেশের যে সমস্ত জায়গায় বন্দোবস্ত হয় নি সে সমস্ত জায়গায়ই বন্দোবস্তের জন্য কোম্পানির ডিরেক্টরদের অনুমোদন লাভ করে, জীবনের শেষদিকে তাঁর মতামত আর পরিবর্তন করতে পারেন নি. ১৮১২ থেকে ১৮১৮-এর মধ্যে বোর্ড অব রেভেনিউ যে গ্রাম সমাজের উন্নতবিধান করেছিলেন সেই গ্রাম সমাজের মারফৎ ভূমি প্রশাসনের অধিকতর আকাঙ্ক্ষিত রূপটিকেও তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। মাদ্রাজের গভর্ণর হিসাবে টমাস মুনরো গ্রামীন প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির জন্য তাঁর পক্ষে যা সম্ভবপর ছিল তা সবই করেছিলেন। তিনি পঞ্চায়েত সংগঠন করে তাদের ওপর বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করেছিলেন এবং অতীতে যে রকম ছিল সেইভাবে তিনি ভারতবর্ষের গ্রাম সমাজগুলিকে কর্মশীল ও সংগঠিত সংস্থা হিসাবে চালু রাখবার প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। পুরনো সংস্থাগুলির সমস্ত মূল ক্ষমতা যখন কেড়ে নেওয়া হয়, তখন কর্তৃত্বের প্রয়োগ তাদের সক্রিয় থাকতে দেয় না। রাজস্ব বিভাগের ক্ষুদে অফিসার ও দুর্নীতিগ্রস্থ শান্তিরক্ষীদের হাতে হয়রান হয়ে গ্রামবাসীরা অতীতের মত যৌথ সংস্থারূপে আর একত্রে কাজ করতে পারেন নি। বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বহু পরিবর্তন ঘটেছে, তার মধ্যে অনেকগুলি প্রগতি ও প্রাগ্রসরতার লক্ষ্যাভিমুখী, আর কতগুলি পরিতাপজনক। কিন্তু সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক পরিবর্তন হল স্বায়ত্ত-

শাসনের অতীত ব্যবস্থার কার্যতঃ বিলোপসাধন ও অতীতের গ্রাম সমাজের অবলুপ্তি। পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে ভারতবর্ষেই প্রথম এই গ্রামসমাজের অভ্যুদয়।

বোর্ড অব-রেভেন্যু কর্তৃক সমর্থিত গ্রামীন বন্দোবস্তের চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যানের ইতিহাসের প্রতি আধুনিক পাঠকবর্গের কেবলমাত্র একটা তত্ত্বগত আকর্ষণ থাকতে পারে। যে ব্যাপারটার কার্যকরী গুরুত্ব আছে তা হল যে টমাস মুনরো কর্তৃক অনুমোদিত রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত সামগ্রিকভাবে কখনোই চালু হয়নি। ১৮০৭ ও ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে টমাস মুনরো যতখানি সম্ভব বলিষ্ঠ ও জোরালো ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে রায়তোয়ারী বন্দোবস্তের সারকথা হল রাজস্বের চিরস্থায়িত্ব - পতিত জমি ব্যতীত রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের জমিদারী বন্দোবস্তের মতনই চিরস্থায়ী। ১৮২০-তে মাদ্রাজের যে সমস্ত অঞ্চলে পূর্বে বন্দোবস্ত করা হয় নি সে সমস্ত অঞ্চলেই রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত চূড়ান্তভাবে প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু সে সময় থেকেই, ১৮৬২ পর্যন্ত মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি ও অনুমোদিত রাজস্ব বন্দোবস্তের চিরস্থায়িত্বের প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রতিটি বন্দোবস্তের সময় সরকারী দাবীর হেরফের ঘটছে যার কারণ সাধারণ লোকের কাছে দুর্বোধ্য। সরকারী দাবীর এই অনিশ্চয়তা মাদ্রাজের কৃষিজীবী জনসাধারণকে একটি শাশ্বত অনিশ্চিতাবস্থা ও দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে দিয়েছে।

১। Report dated 15th August 1807.

২। Minutes dated 29th April and 25th November 1806,

৩। Minutes of Evidence taken before the Committee of the whole House and the Select Committee on the affairs of the East India Company. 1818 p.p, 149, 170, and 173,

৪। Letter dated 25th April 1808.

৫। Letter dated 25th May 1808,

৬। Letter dated 29th February 1812,

৭। Letter dated 16th December 1812.

৮। Letter dated 5th March 1813.

৯। Letter dated 12th August 1814.

১০। স্যর জন ম্যালকম ছিলেন একজন বিশিষ্ট সৈনিক ও ভারতীয় জনসাধারণের সুহৃৎ। মুনরোর কার্যপ্রণালীর প্রতি তাঁর পরমশ্রদ্ধা ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮১৮-এর পত্রে

পরিস্ফুট—"স্যর টমাস হিসলপের অবগতির জন্য 'টম মুনরো সাহেব' যে সরকারী পত্র পাঠিয়েছিলেন তার একটা প্রতিলিপি আপনাকে পাঠাচ্ছি। আমার মনে এই পত্র যে ছাপ ফেলেছে, আপনার মনেও যদি সেই ছাপই পড়ে তবে এই অসাধারণ ব্যক্তিটি যখন এগিয়ে আসবেন তখন আমরা সবাই পিছে সরে যাব। আমরা অশালীন উপায় অবলম্বন্ করি এবং যথেষ্ট আগ্রহ, সক্রিয়তা ও সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হই। কিন্তু নাটকে তাঁর ভূমিকা কি বিচিত্র! কোন রকম সামরিক অবলম্বন ছাড়াই (নিয়োগযোগ্য পাঁচ কোম্পানী সৈন্য কিছুই নয়) শত্রুর এলাকায পবিবেষ্টিত হয়ে তিনি সে দেশ অধিকার করবার পরিকল্পনা করলেন। যে সৈন্যবাহিনী সে দেশ অধিকার করে আছে তাদের সরিয়ে দিলেন। যে রাজস্ব শত্রুবাহিনীর প্রাপ্য সে রাজস্বই তিনি আদায় করলেন অধিবাসীদের মারফৎ। সাহায্য করল কেবলমাত্র কিছু অনিয়মিত পদাতিক। ঐ উদ্দেশ্যে তাদের তিনি সন্নিহিত প্রদেশ থেকে এনেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা একই সঙ্গে সহজ তথা বিরাট এবং তার সাফল্যের পরিব্যাপ্তি একমাত্র তাঁর মত ব্যক্তিই অনুমান করতে পেরেছিলেন। সর্বাপেক্ষা বৈধ উপায়েই দেশটি তাঁর করতলগত হয়। দেশীয় লোকেরা তাঁর শাসনাধীনে আসবার জন্য ও তাঁর সরকারের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করবার জন্য ব্যগ্র ও উৎসাহী, তাঁর মত ব্যক্তি যখন কোন সরকারের প্রশাসক হন তখন জগতে তা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সরকারে পরিণত হয়।

১১। Board's Minute, dated 5th January 1818,

নবম অধ্যায়

মুনরো ও মাদ্রাজের রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত (১৮২০-১৮২৭)

স্যর টমাস মুনরো মে ১৮২০-তে মাদ্রাজে আসেন সেই প্রদেশের গভর্ণর হিসাবে; এবং সেই মাসেই রায়তোয়ারি ব্যবস্থা সাধারণ ভাবে প্রবর্তন করা হল বলে ঘোষণা করা হয়। বকেয়া উপলক্ষে, বা ক্রয়ের সাহায্যে জমিদার ও মুটাগুলি, এবং অন্য যে সমস্ত দখলী স্বত্বে রায়তোয়ারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে সেগুলিকে ফিরে পাওয়ার সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করা হয়, এবং গ্রামের ইজারা দ্রুত পরিত্যাগ করা হয়। যেখানে যেখানে মিলিত-স্বত্ব আছে, সেখানে সেগুলিকে পৃথক করে প্রজাদের সঙ্গে আলাদা-আলাদা ভাবে চুক্তিবদ্ধ হবার জন্য কলেক্টরদের উৎসাহ দেওয়া হয়। জমির উচ্চ মূল্য নির্ধারণের ফলে রাষ্ট্রের দাবি ক্ষেতে-উৎপন্ন দ্রব্যের ৪৫ শতাংশ, অথবা ৫০ শতাংশ, অথবা ৫৫ শতাংশতে নির্দিষ্ট ছিল। করের এই উচ্চ হারের ফলে অন্তহীন নিপীড়ন চলত; স্যর টমাস মুনরোর সুবিবেচক প্রশাসনাধীনে এই কর সাধারণভাবে হ্রাস করা হয়।

বর্তমান অধ্যায়ে মাদ্রাজের প্রতিটি জেলায় রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের ইতিহাস অনুসরণই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং বিশালাকৃতি তৎকালীন রাষ্ট্রীয় নথীপত্র থেকে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত অংশই এই কয়েক বছরের কর্মতৎপরতার উপরে এবং মাদ্রাজের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে যথেষ্ট আলোকপাত করবে।

নেলোর

১৮১৮ সালেই, নেলোরের কলেক্টর জমির জরিপ, শ্রেণীবিভাগ ও মূল্য-নির্ধারণের পর পরীক্ষামূলক ভাবে রায়তোয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কোভুর গ্রামটিকে নির্বাচিত করেন; এবং বোর্ড অব রেভিনিউর কর্মবিবরণী থেকে দেখা যায় এই মূল্য নির্ধারণ প্রথমে কী ভাবে করা হয়েছিল এবং পরবর্তী কালে কীভাবে তা সংশোধন করা হয়।

জলা জমি।—দানা শস্যের মূল্য গড় বিক্রয়-মূল্য অনুযায়ী ক্যাণ্ডি পিছু ২০৲ টাকা হওয়ায়, তা থেকে পাওয়া যায় ৩৪,৩৭৪৲ টাকা; তা থেকে প্রচলিত কালাবাসুম, বা ৬½ শতাংশ অথবা ২২৩৪৲ টাকা বাদ দিলে সরকার-রাজ্য

(Circar State) ও কৃষকদের মধ্যে ভাগ করে দেবার মতো অবশিষ্ট থাকে ৩১,১৩৯৲ টাকা।"[1]

"কৃষকদের প্রদেয় আনুপাতিক হার কুড়িতে নয় ভাগ অথবা ৪৫ শতাংশ হওয়ায় ১৪,৪৬২৲ টাকায় এসে দাঁড়ায়; এবং ফলতঃ সরকারের (Circar State প্রাপ্য হিসেবে যে অংশটি অবশিষ্ট থাকে তা হল ১৭,৬৬৭৲ টাকা।"

শুষ্ক জমি।—"শুষ্ক জমি ও বাগিচাজাত পণ্যের হিসাবও অনুরূপ নীতিতে স্থির হওয়ায়, এবং ক্যাণ্ডি পিছু ২৮৲ টাকা মূল্য নির্ধারিত হওয়ায় সরকারের জন্য যা বাকি থাকে, তা হল-- শুষ্ক জমির জন্য ৬৭৮৲ টাকা, এবং বাগানের জন্য ২০৫৲ টাকা।"

কলেক্টরের হিসাব এবং তিনি দানা শস্যের যে-বিক্রয় মূল্য ধরে নিয়েছেন সে-সম্পর্কে কৃষকরা আপত্তি জানায়। কিছু বাদ-সাদ দিতে দেওয়া হয় এবং বোর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে "কোভুরের বার্ষিক রাজস্বের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী পরিমাণ হবে প্রায় ১৫,৬০০৲ টাকা।" ভাষান্তরে, নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী রাষ্ট্র গ্রামের আনুমানিক উৎপন্ন সামগ্রির প্রায় অর্ধেক দাবি করে।"[2]

ত্রিচিনোপল্লী

ত্রিচিনোপল্লীর কলেক্টর তেরতালুর গ্রামটিকে বেছে নেন, এবং জমির শ্রেণী-বিভাগের পর গ্রামটির পরিমাপ গ্রহণ করা হয় এবং মূল্য স্থির করা হয়। সাধারণ বাদ-সাদ দেবার পর আনুমানিক মোট উৎপন্নের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮১৬ কুল্লাম।[3]

"স্বাভাবিক ওয়ারুমের হারে, ৫০ শতাংশ হারে সরকার (circar) ও অধিবাসীদের মধ্যে ভাগ হওয়ায়, সরকারের ভাগে থাকে ২৯০৮ কুল্লাম, কলেক্টরের সুপারিশ অনুযায়ী গত তিন বছরের গড় মূল্যের হিসাবে তাকে পরিবর্তিত করলে দাঁড়ায় ৩২৩২৲ টাকা।"[4] আরো কিছু যোগ বিয়োগ করা হয়, এবং যে রাজস্ব নির্ধারিত হয় তা হল ৩২১১৲ টাকা। জমিতে উৎপন্ন সামগ্রার অর্ধেক ভূমিকর রূপে ধার্য করা দারিদ্র্য ঘটাবার মতোই করভার, কিন্তু মাদ্রাজের বোর্ড তাঁদের দাবি এমন কি এক-তৃতীয়াংশতেও নামিয়ে আনার ব্যাপারে অত্যন্ত শ্লথগতি ছিলেন, অথচ তবু তাঁরা পরিমিতির কথা বলতেন! তাঁরা বলতেন, "মোট উৎপন্ন সামগ্রীর এক-তৃতীয়াংশকে যদিও অর্থে নিরূপিত ও প্রদেয় সাধারণ মূল্য নির্ধারণের মান হিসেবে বিবেচনা করা যায় না, তবুও তা কলেক্টরকে পরিমিতির দিকে যাবার নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করতে পারে।"

কোয়েম্বাটুর

কোয়েম্বাটুর জেলায় স্থূল দুর্নীতির দোষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নির্মম অতিরিক্ত ধার্য-করের একটা দোষ। এই সমস্ত দোষত্রুটি সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। তাঁরা রিপোর্ট দেন যে কোষাধ্যক্ষ কজি চিট্টি দৃশ্যপটে প্রথম আবির্ভাবের সময় থেকেই "দেশের প্রতিটি মানুষকে এবং সব কিছুকে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসার উপকারে লাগাবার ব্যাপারেই তাঁর মনোযোগকে ক্রমাগত ও উদগ্রীবভাবে চালিত করেছিলেন।" কলেক্টর মিঃ গ্যারোও সম-পরিমাণে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে সন্দেহ করা হয় এবং কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ১৮২১ সালে মাদ্রাজের তদানীন্তন গভর্ণর স্যর টমাস মুনরোকে ক্ষোভের সঙ্গে চিঠি লেখেন ঃ

"আমাদের ব্যবস্থার ত্রুটির উদাহরণ রূপে স্বতই গুরুতর, এই দোষত্রুটিগুলির কথা চিন্তা করলে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক অনুভূতিকে জাগ্রত করে। আমরা এরূপ আশ্বাসের কোনো ভিত্তি দেখতে পাই না যে, কোয়েম্বাটুরে যা ঘটেছে তা অন্য কোনো জেলায় ঘটবে না ; কোনো কালেক্টর বোর্ড অব রেভিন্যুর অবস্থা অর্জন করবেন না এবং একজন ধূর্ত ও প্রতারক দেশীয় ব্যক্তির শিকার অথবা সহচর হয়ে গোটা প্রদেশকে এক সরকারের ক্ষমতাবলে বলীয়ান কয়েকজন মানুষের মৃগয়াভূমিতে পরিণত করে তার কু-ব্যবস্থাপনায় ঠেলে দেবেন। কলেক্টরের দুর্বলতার অথবা দুর্নীতি যদি কোয়াম্বাটুরে প্রদর্শিত দৃশ্যের মতো দৃশ্যের অবতারণা করে এবং অধিবাসীদের সম্পত্তি তথা সরকারি রাজস্বকে সাত বছর ধরে যে ভাবে সরকারের বিশদ কাজকর্মের তত্ত্বাবধানের জন্য এবং ক্ষমতার অপব্যবহার আকর্ষণ না করেই সরকারের নিম্নতম প্রতিনিধির দয়ার উপর ছেড়ে রাখা হয় সেই রকম ঘটনা ঘটে, তবে এই পাপের ব্যাপক অস্তিত্ব আশঙ্কা না-করা অসম্ভব এবং অধিকতর কার্যকর নিরাপত্তা-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত না-হওয়া অসম্ভব। মিঃ গ্যারোর মৃত্যুর ফলে তাঁকে আমাদের চাকরি করতে দেওয়ার যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, তাঁর কর্তব্য অবহেলার ধরন ও মাত্রা নির্ণয়ও এখন অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। একথা অবশ্য স্থিরনিশ্চিত যে একজন সরকারি অফিসারের অধীনে প্রচুর ও দীর্ঘদিনের অন্যায়ের অস্তিত্ব, যে-অন্যায়ের সঙ্গে জড়িত আছে তাঁর নিকটতম পোষ্যদের বিরাট লাভ, এবং সাধারণ কিছুটা সতর্কতা থাকলেই যে-অন্যায় তিনি বন্ধ করতে সক্ষম হতেন, সেরূপ অন্যায়ের অস্তিত্ব কিয়ৎপরিমাণে দুর্নীতিপূর্ণ অংশ গ্রহণেরই সাক্ষ্য।"[৫]

পরের বছরে লেখা আরেকটি চিঠিতে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স দুর্নীতিপূর্ণ উদ্দেশ্যে নিপীড়ন ছাড়াও কোয়েম্বাটুরের অতিরিক্ত কর নির্ধারণের বিশদ বর্ণনা আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন।

"প্রথা অনুযায়ী বাগিচা ছাড়া সমস্ত কর্ষণযোগ্য জমির উপরে অর্থাৎ অকর্ষিত ও পতিত এবং সেই সঙ্গে যেখানে ফসল ফলে সেই জমিতে 'সম্পূর্ণ খাজনা' নামে এক খাজনা বসানো হয়, ঘাস-জমির জন্য বসানো হয় সম্পূর্ণ খাজনার এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ, এবং বাগিচার জমির জন্য সম্পূর্ণ খাজনার চেয়ে কিছু বেশি।...

"৭ সেপ্টেম্বর ১৮১৬ তারিখের চিঠিতে তিনি [কলেক্টর, মিঃ সালিভান] বলেছেন: "একজন রায়ত যখন দুই বছরের জন্য জমি দখল করে থাকেন এবং খাজনা দেন, তখন তাঁকেই মালিক বলে গণ্য করা হয় এবং বস্তুত যতদিন তিনি দিতে পারেন ততদিন পর্যন্ত এর খাজনা তাঁর উপরই চাপানো হয়।' অতএব মনে হয় যে সরকার তার নিজের সুবিধার জন্য রায়তের উপরে মালিকের মর্যাদা চাপিয়েছেন, তার সুবিধার্থে নয়, অর্থাৎ যাতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনার জন্য তাকে দায়ী করা যায়।...

"কূপসেচিত জমি বা যেখানে বাগিচা-পণ্যের চাষ হয় সেই জমির উপর অতিরিক্ত করকে কলেক্টর যথার্থই উন্নয়ন বাবদ কর বলে অভিহিত করেছেন। কূপ তৈরির কাজকে তিনি সবদিক দিয়েই সবচেয়ে বড় উন্নয়ন বলে বর্ণনা করেছেন,—ভারতের সেই অংশের জমি এর উপযুক্ত। ভারতে যে-ঋতু এত পরিবর্তনশীল ও প্রায়শই এত মারাত্মক, কূপ সেই ঋতুর দুর্ঘটনা থেকে তার পর্যাপ্ত জল সেচ দিয়ে জমির ফসলকে নিরাপদ রাখে। অতএব, কূপখননের কাজে উৎসাহদানের চেয়ে বেশী উপযোগী আর কিছু হতে পারে না। যে উৎসাহ তাদের প্রয়োজন তা হল জনসাধারণকে তাঁদের নিজেদের শ্রমের ফল ভোগ করতে দেওয়া; কারণ কলেক্টর তাদের বর্ণনা করেছেন এই বলে যে তারা কূপ খননে ইচ্ছুক, কিন্তু করের ফলে সে-কাজে তারা বাধাগ্রস্ত।"[৬]

এই কয়বছরের সমস্ত চিঠিপত্র অতিরিক্ত কর-নির্ধারণের অভিযোগে পূর্ণ; কিন্তু তা সত্ত্বেও ডিরেক্টররা মৃত মিঃ গ্যারোর যত পাপ সম্পর্কে মুখর হয়েও তাঁদের নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধনের ব্যাপারে খুব একটা তৎপর ও স্পষ্ট ছিলেন না। উপরে উদ্ধৃত চিঠিটির মাত্র তিন সপ্তাহ আগে লেখা একটি চিঠিতে ডিরেক্টররা এই কথা বলেন:

"তিনি [ত্রিচিনোপল্লীর কলেক্টর] আরো বলেছেন 'বলপূর্বক আদায় করা

খাজনার সঙ্গে যে দুঃখদুর্দশা ও দারিদ্র্য জড়িত থাকে সেই লক্ষণগুলি ত্রিচিনো-পল্লীতে একান্তভাবেই চোখে পড়ে এবং ভূ-সম্পত্তির মূল্যহ্রাসের মধ্যে সমস্ত কৃষি-উন্নয়নের বিনাশ প্রকট। যে মিরাসদাররা ইতিপূর্বে প্রায় যে কয় হাজার কাউনি পরিমাণ জমিতে চাষ করত, তাদের হাতে এখন বড়জোর সেই হিসাবে কয়েকশো কাউনি জমি আছে; এবং নির্ধারিত করের যদি পরিবর্তন ঘটানো না হয়, কিংবা বকেয়া করের অবশিষ্ট অংশটুকু যদি আপাতত বাকি রাখতে না-দেওয়া হয় তবে এই বছর কিংবা আগামী বছরের মধ্যেই এই জমিও বিক্রি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি প্রধানত যে জিনিসটি বোর্ডকে বোঝাতে চাইছি তা হল বর্তমান রাজস্ব ব্যবস্থা চালিয়ে যাবার অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে আমার দৃঢ় প্রত্যয়।'……

"যে-দোষগুলি এখনই সংশোধন করা দরকার তার জন্য আপনারা (মাদ্রাজ সরকার) ইজারাগুলিকে বাতিল না করে এক-একটি ক্ষেত্রে যতখানি ছাড় কলেক্টরের কাছে প্রয়োজন বলে মনে হবে সেই অনুপাতে ছাড় মঞ্জুর করা যথাযথ মনে করেছেন। এটা তাই বস্তুতপক্ষে বার্ষিক বন্দোবস্ত; এবং এর ফলে অ-যথাযত বার্ষিক বন্দোবস্তের ফলাফলের হাত থেকে একে রক্ষা করতে আপনাদের কষ্ট পেতে হবে; অন্য কথায় কষ্ট পেতে হবে কলেক্টরের অত্যুৎসাহ বা মানবতা, গাফিলতি বা কঠোরতা অনুযায়ী কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাজনাদারদের উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া থেকে, কোনো ক্ষেত্রে সরকারের স্বার্থ অতিরিক্ত মাত্রায় বিসর্জন দেওয়া থেকে।"[৭]

অন্য ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, কর-নিরূপণের পরিমাণ একটা অসম্ভব হারেই বজায় রাখতে হবে, এবং চাষীরা যতখানি নিংড়িয়ে দিতে পারে ততখানিই তাদের কাছ থেকে নিতে হবে বছরের পর বছর। আর এটাকেই ডিরেক্টররা জনগণের অবস্থার উন্নতিবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ বলে মনে করেছিলেন!

তাঞ্জোর

একদা সমৃদ্ধিশালী তাঞ্জোর রাজ্যেও সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি।

"তাঞ্জোরের ইজারা বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হয় ফজলি ১২২৯-এ [১৮২০] এবং উৎপন্ন সামগ্রীর আর্থিক মূল্য প্রচুর কমে যাওয়ায় ও এই মন্দার স্তরেই অব্যাহত থাকবে বলে মনে হওয়ায়, অর্থে প্রদেয় করের হার যেরূপ করা হবে বলে চিন্তা করা হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি অর্থ ধার্য করা হয়, এবং এই ধার্য

কর হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণও যুক্তি হিসাবে উপস্থিত করা হয়।…

"আপনারা (মাদ্রাজ সরকার) যা করেছেন, অর্থে ধার্য নির্দিষ্ট করের নীতি মেনে চলাই নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত ছিল, উৎপন্ন সামগ্রী ভাগ করার পুরনো পদ্ধতির প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ সত্ত্বেও। ··

"এরূপ ঘটনার জন্য আপনারা যে নীতি নির্ধারণ করেছেন তাকে আমরা যথার্থ বলে মনে করি—'দানাশস্যের দাম যদি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি না পায় তা হলে ধার্য-করের সঙ্গে কিছু যোগ করা হবে না, মূল্য যদি ৫ শতাংশ হ্রাস পায় তবে কিছু বাদ দেওয়া হবে',—যোগ করা বা বাদ দেওয়ার মাত্রা মূল্যের পরিবর্তন অনুযায়ী হবে।"[৮]

আরকট

আরকটেরও সেই একই দুঃখজনক কাহিনী।

"কলেক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী বোর্ড আরেকটি প্রস্তাব করেছেন, বা আপনাদের ভাষায়, 'সনির্বন্ধ পরামর্শ' দিয়েছেন— নির্ধারিত কর হ্রাস। এই বিষয়টি অদ্ভুত ভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কলেক্টর ও বোর্ড অব রেভিন্যু আমাদের নির্ধারিত হার স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। তাঁরা ঘোষণা করেছেন যে এই কর 'দেশের নিঃশেষিত অবস্থায় বহনযোগ্যতার অতীত', কিন্তু তাঁরা এই আস্থাপূর্ণ প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছেন যে এই কর আদায় করা যেতে পারে। তাঁরা অবশ্য অনুযোগ করেছেন যে এরূপ কর-নির্ধারণে দেশের উন্নতি হবে না এবং তাকে উন্নতির সামর্থ্য যোগাবার জন্য তাঁরা ৭ থেকে ১০ শতাংশ কর-হ্রাসের প্রস্তাব দিয়েছেন।

"এই ব্যাপারে আপনারা [মাদ্রাজ সরকার] মাত্রাতিরিক্ত কর নিরূপণ থেকে উদ্ভূত দোষগুলি সম্পর্কে কঠোর মত প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন একথা আপনাদের মনে হয়নি যে আরকটের উত্তর ডিভিশনে বন্দোবস্তের হার হ্রাস করার কোনো যুক্তি আছে, এই হার অন্যান্য জেলায় সমতায় নেই। বস্তুত, আপনারা বলেছেন যে একই প্রয়োজন দেশের প্রতিটি অংশে বিদ্যমান। তারপরে আপনারা সাধারণ কর হ্রাসের সুপারিশ করেছেন এবং প্রস্তাব দিয়েছেন, যে-মান অনুযায়ী তা নিয়ন্ত্রিত হবে তা হল এই যে মোট উৎপন্ন দ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ হবে সরকারের অংশ…

"আমরা অবশ্য সন্দেহ প্রকাশ করছি, উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ অথবা

অন্য কোনো আনুপাতিক হারকে কর-নিরূপণের অপরিবর্তনীয় মান বলে গণ্য করা যায় কি না।"[৯]

এই উদ্ধৃতিগুলিই যথেষ্ট। স্থানীয় অফিসারদের নিষ্করুণতা ও কোর্ট অব ডিরেক্টর্স-এর লোভের দরুন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছর দক্ষিণ ভারতের জনসাধারণ যে-দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্য ভোগ করেছেন, প্রতিটি পাঠকই এ-থেকে তার ইঙ্গিত পাবেন। স্যর টমাস মুনরোর কৃতিত্বের বিষয় এই যে তিনি তাঁর সাত বছরের প্রশাসন কাল ধরে নির্ধারিত কর হ্রাস করবার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং সারা প্রদেশে তা হ্রাস করার কাজে সফল হয়েছিলেন।

তিনি তাঁর নিজস্ব প্রাঞ্জল ও জোরালো ভঙ্গিতে ৩১ ডিসেম্বর ১৮২৪ তারিখে লিপিবদ্ধ তাঁর 'মিনিটে' তাঁর লক্ষ্য ও প্রচেষ্টার বর্ণনা দিয়েছেন। এই 'মিনিট'টি সম্ভবত লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় থেকে ভারতে যত 'মিনিট' লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুচিন্তিত ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞসুলভ। এই দলিলটি দীর্ঘ, ঈস্ট ইণ্ডিয়া পেপারস্-এর ত্রিশটি ফোলিও পৃষ্ঠারও বেশি।"[১০]

এই মূল্যবান দলিলটির সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আমাদের এই সীমাবদ্ধ পরিসরে অসম্ভব। তাই, 'মিনিটে'র মধ্যে জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কিত অংশগুলি থেকে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি আমরা দিচ্ছি।

জমির নির্দিষ্ট ও পরিমিত কর নিরূপণ

"জমিকে বিক্রয়যোগ্য করার জন্য, রায়তদের সেই জমির উন্নয়নে উৎসাহিত করার জন্য, এবং তাকে এক চিরস্থায়ী সম্পত্তিরূপে গণ্য করার জন্য, নির্ধারিত কর অবশ্যই নির্দিষ্ট করে দিতে হবে এবং এখানকার চেয়ে সাধারণ ভাবে আরো বেশী পরিমিত করতে হবে; এবং সর্বোপরি তাকে এমন পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে যাতে অজ্ঞতাবশত অথবা খামখেয়ালির ফলে তা না বাড়ানো যায়।...

"রায়তই প্রকৃত মালিক, কারণ যে-জমি রাষ্ট্রের খাস জমি নয়, সে জমির মালিক রায়ত। সরকারি রাজস্ব বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে বেশি ও অথবা কম হয়, সরকারি রাজস্বের দাবি তদনুযায়ী তার অংশকে প্রভাবিত করে; কিন্তু এর ফলে তাঁর হাতে তাঁর সম্ভারের নিছক মুনাফাটুকুই থাক, অথবা জমিদারের খাজনা হিসেবে তার উপরে কিছু উদ্বৃত্তই থাক, তিনিই হলেন আসল মালিক, এবং রাষ্ট্র যা রাজস্ব হিসেবে দাবি করে না সে-সমস্ত জিনিসেরই মালিক তিনিই।...

"চির-পরিবর্তনশীল ভূমিরাজস্ব নির্ধারণই জমিকে মূল্যবান সম্পত্তি হয়ে ওঠায় বাধা দিয়েছে, এবং যতদিন এটা চলবে ততদিন বাধা দেবেও; কারণ যেখানে এই কর নিম্নতম, সেখানেও যে-কোনো সময়ে তা বাড়ানো হতে পারে—এই ধারণা জমিকে বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী হয়ে ওঠার মতো মূল্য অর্জনে বাধা দেয়। যে-মূল্য তার থাকা উচিত তাকে সেই মূল্য আমরা প্রদান করতে পারি না, কিংবা সহজে বিক্রয় যোগ্য বা বন্ধক রাখার মতো ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করতে পারি না, যদি তার প্রতিটি অংশের উপরে সরকারি নির্ধারিত কর পূর্বেই নির্দিষ্ট না হয়। কর নির্দিষ্ট হলে সমস্ত অনিশ্চয়তা দূর হয় এবং যে-সমস্ত জমির উপর মাত্রাতিরিক্ত কর ধার্য হয়নি, তা এমন এক মূল্য লাভ করে, যেটা সেই জমি থেকে উদ্ভূত সমস্ত মুনাফা ভোগ করার নিশ্চয়তার ফলে সংঘটিত উন্নয়নের দ্বারা প্রতিদিন বৃদ্ধি লাভ করে।"

প্রশাসনিক কাজে ভারতীয়দের নিয়োগ

"আমরা যদি তাদের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে বাদ দিয়ে রাখি এবং অতি সম্প্রতিও যে-কথা বলতাম সেভাবে যদি বলি যে ১ কোটি ৫০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত এক দেশে এক-ঘা বেত মারার শাস্তির হুকুম দেবার মতো ক্ষমতা একজন ইয়োরোপীয় ছাড়া অন্য কোনো লোকের উপর অর্পণ করা যাবে না, তবে কোন্ মুখে আমরা আমাদের পিতৃবৎ সরকারের কথা বলতে পারি? এরূপ এক নিষেধাজ্ঞামূলক ব্যবস্থার অর্থ একটা গোটা জাতির উপর সম্মানহানিসূচক দণ্ডাজ্ঞা, কোন উপকারেই কোনো কালে যার ক্ষতিপূরণ হয় না। পৃথিবীতে এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই যেখানে কোনো জাতির উপর কোনোকালে এরূপ অবমাননাকর দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। দুর্বল ও বিভ্রান্ত মনুষ্যকুলই যে এর লক্ষ্য, এ কথা ঐ দেশবাসীরা তাদের উপর কৃত অপমানের উপযুক্ত কারণ বলে মেনে নিতে পারে না, যেহেতু নিজদেশবাসীর অতিসামান্য অপরাধের বিচার করার কাজেও তাদের যোগ্য বলে বিশ্বাস করা হয় না। আমরা তাদের উন্নতি চাই, এমন কথা বলি অথচ এমন ব্যবস্থার প্রস্তাব করি যা সাফল্যের ব্যাপারে সবচেয়ে প্রতিকূল। উন্নয়নের প্রবক্তারা বোধ হয় যে স্থিতিস্থাপকতার উপর তা নির্ভর করে সেটা লক্ষ্য করেননি; তাঁরা দেশীয়দের উপর কোনো আস্থা স্থাপন করতে চান না, কোনো কর্তৃত্ব ক্ষমতা দিতে চান না, এবং যথাসম্ভব সমস্ত পদ থেকে তাঁদের বাদ দিতে চান; অথচ বিচ্ছুরিত জ্ঞানে তাদের আলোকপ্রাপ্ত করার উৎসাহে তাঁরা প্রদীপ্ত!

"এর চেয়ে অদ্ভুত ও অবাস্তব আত্মাভিমান অন্ধকারতম যুগেও কখনো জন্মলাভ করেনি, কারণ যুগে-যুগে দেশে-দেশে খ্যাতি, বা সম্পদ, বা ক্ষমতা অর্জন করা ছাড়া আর কী মানুষকে জ্ঞানান্বেষণে উদ্দীপ্ত করে? মহৎ গুণাবলীর মূল্যই বা কী যদি সেগুলি তার মহত্তম উদ্দেশ্যে, মানবসম্প্রদায়ের সেবায় নিয়োজিত না হয়, যারা সেই গুণের অধিকারী তাদের নিজ নিজ গুণগত যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের সরকারি প্রশাসনের বিভিন্ন কর্তব্যের ক্ষেত্রে যদি নিযুক্ত করা না হয়?······

"শুধু আমাদের গ্রন্থরাজি সামান্যই কাজ করবে অথবা কিছুই করবে না; নীরস সহজ সাহিত্য কখনোই একটি জাতির চরিত্রকে উন্নত করবে না। এই ফললাভের জন্য তাকে সম্পদ ও সম্মানের পথ এবং সরকারি কর্মে নিযুক্তির পথ উন্মুক্ত করতে হবে। এরূপ এক পুরস্কারের সম্ভাবনা ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো কৃতিত্বই কোনকালে জনগণের চরিত্রের উন্নতিবিধান করবে না।

"একথা প্রত্যেক জাতির পক্ষে সত্য, ভারতের পক্ষেও; আমাদের জাতির পক্ষেও একথা সত্য। আগামীকাল বৃটিশ একটি বিদেশী শক্তির অধীনস্থ হোক, সরকারে সমস্ত অংশ থেকে, সরকারি সম্মান থেকে উচ্চ আস্থাপূর্ণ বা উচ্চ বেতনের সমস্ত পদ থেকে জনসাধারণকে বাদ দেওয়া হোক, এবং সকল অবস্থায় তাঁরা বিশ্বাসের অযোগ্য বলে বিবেচিত হোন, তাহলে তাঁদের সমস্ত পবিত্র ও অপবিত্র জ্ঞান, তাঁদের সমস্ত সাহিত্য—সব কিছু—আর দু-এক পুরুষের মধ্যে তাঁদের নীচ, প্রতারণাপূর্ণ ও অসৎ জাতিতে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

"এমন কি আমরা যদি মনেও করি যে, একজনও দেশীয় ব্যক্তির সাহায্য ছাড়াই উচ্চতর পদে তথা নিম্নতর সমস্ত পদে দেশের সমস্ত কাজ চালানো সম্ভব, তাহলেও তা করা উচিত নয়, কারণ রাজনীতিগত ভাবে ও নৈতিক ভাবে—উভয়তই তা ভুল হবে। যে-বিরাট সংখ্যক সরকারি দপ্তরে দেশীয় ব্যক্তিরা কর্মে নিযুক্ত আছেন সেটাই আমাদের সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্যের অন্যতম শক্তিশালী কারণ। এগুলি থেকে যে-অনুপাতে আমরা তাদের বাদ দিই, সেই অনুপাতেই আমরা তাদের উপর আমাদের প্রভাব হারাই, আর এই বর্জন যদি সামগ্রিক হত, তবে তাদের আনুগত্যের পরিবর্তে আমরা লাভ করতাম তাদের ঘৃণা, তাদের অনুভূতি সঞ্চারিত হত সমগ্র জনসমষ্টিতে ও দেশীয় ফৌজের মধ্যে এবং তা এমন প্রচণ্ড অসন্তোষের মনোভাব জাগ্রত করত যা দমন করা বা প্রতিরোধ করা আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত হত।

কিন্তু এটা যদি সম্ভবও হত যে তারা নীরবে ও নির্বিরোধে বশ্যতাস্বীকার করবে, তাহলে ব্যাপারটা হত আরো খারাপ, তাদের চরিত্রের অবনতি ঘটত, সরকারি পদ ও সম্মানসূচক বৈশিষ্ট্যের আশা হারাবার সঙ্গে সঙ্গে হারাত সমস্ত প্রশংসনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং নিছক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি ছাড়া উচ্চতর কোনো অভীষ্ট অর্জনে অক্ষম শ্রমবিমুখ ও নিতান্ত হীন এক জাতিতে তারা অধঃপতিত হত। আমাদের সরকারের ব্যবস্থার ফলস্বরূপ একটা সমগ্র জাতির অধঃপতন ঘটবে, তার চেয়ে দেশ থেকে আমাদের একেবারে বহিষ্কৃত হওয়াটাই নিশ্চয় অধিকতর বাঞ্ছনীয় হবে।"

কর ও আইন

"জনসাধারণের শুধু নিজেদের সম্মতি অনুযায়ীই করের বোঝা নেবার অধিকার সর্বদা, সকল মুক্ত দেশেই সমস্ত সুবিধাভোগীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলে উচ্চমূল্য লাভ করেছে; এই বিষয়টি নিয়েই মানুষের মনে সবচেয়ে বেশি চর্চা করা হয়েছে এবং মুক্তির পক্ষ সমর্থকরা এই অধিকার প্রায়শই প্রতিষ্ঠা করেছেন। এমন কি যে-সমস্ত দেশে কোনো স্বাধীনতা নেই, সেখানেও কর-নির্ধারণ হল সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কারণ এই জিনিসটিই সবচেয়ে সর্বজনীন ভাবে জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে প্রভাবিত করে, এবং এই বিষয়টি প্রায়শই মানুষকে প্রতিরোধে প্রবৃত্ত করেছে; তাই এর উপযোগিতা তথা বিপদ সবচেয়ে স্বৈরাচারী সরকারের অধীনেও, তার প্রশাসনব্যবস্থায় দেশের যোগ্যতম ব্যক্তিদের নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়েছে।...

"অন্যান্য দেশে, সরকার ও তার কর্মকর্তারা সেই সেই দেশের জনগণেরই অংশ এবং তাঁরা অবশ্যই প্রতিটি সরকারী ব্যবস্থার প্রভাব ও সে-সম্পর্কে দেশের মতামতের সঙ্গে পরিচিত; কিন্তু এখানে সরকার এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত, সে আইন প্রণয়ন করে এমন জনসাধারণের জন্য এ-বিষয়ে যাদের কোনো বক্তব্যের সুযোগ নেই, এবং যাদের সম্পর্কে তার জ্ঞান সামান্য; এবং তাই একথা স্পষ্ট যে জনসাধারণের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে সে তার আইনগুলিকে তৈরি করতে পারে না, যদি না সে সক্রিয় ও বুদ্ধিমান সেই সমস্ত স্থানীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এই বিষয়ে সঠিক তথ্য পায়, যাদের কর্তব্য হল অধিবাসীদের অবস্থা ও মতামত সযত্নে অনুধাবন করা ও সে-সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া। কিন্তু এই সমস্ত কর্মকর্তারাও এই তথ্য পেতে পারেন একমাত্র

অভিজ্ঞ দেশীয় কর্মচারীদের এক প্রতিষ্ঠান মারফৎ, অন্য যে কোনো লোকের তুলনায় তাঁদের সরকারি কর্তব্যের প্রকৃতির দরুনই তাঁরা এই তথ্য সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ উপায়ের অধিকারী।”

বৃটিশ শাসকদের সুবিধা ও অসুবিধা

“আমাদের সরকারের কাছ থেকে দেশীয় ব্যক্তিরা যে সমস্ত সুবিধা ও অসুবিধা লাভ করেছে, আমরা যদি তার তুলনা করি, তবে তার ফল যতটা সরকারের অনুকূলে হওয়া উচিত ততটা আদৌ হবে না বলেই আমার আশঙ্কা। বৈদেশিক যুদ্ধ তথা আভ্যন্তরিক বিক্ষোভ থেকে অনেক বেশি নিরাপদ; তাদের জীবন ও সম্পত্তি হিংস্রতার হাত থেকে অনেক বেশি নিরাপদ; ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের হাতে তারা যথেচ্ছভাবে শাস্তিলাভ করে না বা তাদের সম্পত্তি তারা কেড়ে নিতে পারে না; এবং সামগ্রিক ভাবে তাদের করের বোঝা অপেক্ষাকৃত হালকা। কিন্তু বিপরীত পক্ষে, নিজেদের জন্য আইন প্রণয়নে তাদের কোনো অংশ নেই, অতি নিম্নপদে ছাড়া সেই আইন প্রয়োগেও। তারা অসামরিক তাদের অংশ নেই। বা সামরিক কোনো উচ্চ পদেই উন্নতি লাভ করতে পারে না; সর্বত্র তাদের গণ্য করা হয় নীচ জাতি হিসেবে এবং প্রায়শই দেশের পুরনো মালিক ও প্রভু হিসেবে গণ্য না-করে বরং অনুগত ও ভৃত্য হিসাবেই গণ্য করা হয়।

“তাদের চরিত্রের উন্নতিবিধানের চেষ্টা না-করা পর্যন্ত দেশীয় ব্যক্তিদের ন্যায্য আইন ও পরিমিত করের সুবিধা দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়; কিন্তু একটি বিদেশী সরকারের অধীনে চরিত্রের অবনতি ঘটাবার মতো এতো কারণ আছে, যে সেই অবনতি রোধ করা সহজ নয়। একটা পুরনো কথাই আছে, যে-ব্যক্তি তার স্বাধীনতা হারায় সে তার অর্ধেক গুণকেই হারায়। একথা জাতি তথা ব্যক্তির সম্পর্কেও সত্য। কোনো সম্পত্তি না থাকাটা ততটা চরিত্রহানি ঘটায় না, যতটা ঘটায় বিদেশী সরকারের হাতে সম্পত্তি থাকাটা, যাতে আমাদের কোনো অংশ নেই। দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ জাতি একটি জাতির সুযোগসুবিধা-গুলিকে হারায়, যেমন একজন ক্রীতদাস হারায় মুক্ত মানুষের সুযোগসুবিধা-গুলিকে; সে নিজের উপর কর আরোপ করার সুবিধা হারায়, নিজের আইন প্রণয়ন করার, সেই আইন প্রয়োগে কোনো রূপ অংশ লাভের অথবা দেশের সাধারণ শাসনকার্যের অংশ গ্রহণের সুযোগ হারায়। বৃটিশ শাসিত ভারতে এর একটি সুবিধাও নেই।…

"ভারতে আমাদের সরকারের সবচেয়ে বড় অসুবিধাগুলির মধ্যে অন্যতম হল সমাজের উচ্চতরদের নিচে টেনে আনা অথবা ধ্বংস করার, তাদের সকলকে অতিরিক্ত মাত্রায় একই স্তরে নিয়ে আসার প্রবণতা, এবং তাদের পূর্বতন গুরুত্ব ও প্রভাব থেকে বঞ্চিত করে দেশের আভ্যন্তরিক প্রশাসনে তাদের কম প্রয়োজনীয় হাতিয়ারে পরিণত করার প্রবণতা। দেশীয় সরকারগুলিতে অপেক্ষাকৃত ধনী এক সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ছিল; এই শ্রেণী ছিল জায়গীরদার ও এনামদার এবং সমস্ত উচ্চতর সামরিক ও অসামরিক অফিসারদের নিয়ে গঠিত। এঁরা, এবং এদের সঙ্গে প্রধান প্রধান বণিক ও রায়তরা মিলে ছিলেন একটা বিরাট গোষ্ঠী; তাঁরা বিত্তশালী ছিলেন, অন্তত স্বচ্ছল ছিলেন। একজন রাজন্যের জায়গীর বা এনাম প্রায়শই অন্যলোকের হাতে যেত, এবং সামরিক ও অসামরিক অফিসাররাও ঘন-ঘন অপসারিত হতেন, কিন্তু যেহেতু তাঁদের জায়গায় অন্যরা আসতেন এবং নতুন নতুন জায়গীর ও এনাম যেহেতু নতুন নতুন দাবিদারদের দেওয়া হত, সেই জন্য এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে দেশে একদল লোক ক্রমাগতই থাকতেন যাঁদের সম্পদ সেখানে চাষ-আবাদে ও শিল্প উৎপাদনে উৎসাহ যোগাতে সাহায্য করত। আমাদের সরকারের অধীনে এই সমস্ত সুবিধা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই শেষ হয়ে গেছে। কোনো রূপ গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত অসামরিক ও সামরিক পদ এখন অধিকার করে আছেন ইয়োরোপীয়রা, তাঁদের সঞ্চিত অর্থ যায় তাঁদের নিজেদের দেশে।"

ভারতের ভবিষ্যৎ

"আমাদের সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে আরেকটি বড় প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে: জনসাধারণের চরিত্রের উপর এই সমস্ত ব্যবস্থার চূড়ান্ত ফলাফল কী হবে? তার কি উন্নতি হবে, না অবনতি হবে? নিছক আমাদের ক্ষমতাকে জোরদার করে এবং অধিবাসীদের রক্ষা করে, বর্তমানের চেয়েও চরিত্রগতভাবে ক্রমে ক্রমে নিচে নিমজ্জিত হতে দিয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকব, না তাদের চরিত্রের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করব, তাদের দেশের ব্যবস্থাপনায় উচ্চতর পদগুলিতে অধিষ্ঠিত হবার এবং দেশের উন্নয়নের উপায় বার করার যোগ্যতা তাদের অর্জন করাব? নিঃসন্দেহে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশীয়দের মানসিকতার উন্নতিবিধান, এবং এবিষয়ে যত্নবান হওয়া যে আমাদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের যদি অবসানও হয় তখনও যেন এটা মনে না হয় যে, সেখানে আমাদের সাম্রাজ্যের একমাত্র ফল হয়েছে জনসাধারণকে আরো শোচনীয়

অবস্থায় রাখা এবং আমরা তাদের যে-অবস্থায় দেখেছিলাম, নিজেদের শাসনকার্য পরিচালনায় তার চেয়েও কম যোগ্য করে রাখা। তাদের চরিত্রের উন্নতিবিধানের জন্য বহুবিধ পরিকল্পনা উত্থাপিত হতে পারে, কিন্তু তার একটিও সফল হতে পারে না, যদি না আমাদের কর্মনীতির প্রধান নীতি হিসেবে এই কথাটা প্রথমেই বলা হয় যে উন্নতিবিধান অবশ্য করতে হবে। এই নীতিটি একবার প্রতিষ্ঠিত হলে তার অভীষ্ট অর্জনের জন্য সময় ও অধ্যবসায়ের উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব। দেশীয়দের সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা এত কম, তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এত অকিঞ্চিৎকর যে কোন উপায়গুলি তাদের উন্নয়নের কাজকে সহজতর করবে, সেটা পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগ না করে আমরা স্থির করতে পারব না। বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা বলা যেতে পারে, সম্ভবত তার সবগুলিই অল্পবিস্তর কাজে লাগবে, কিন্তু সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য তাদের প্রতি আরো বেশি আস্থা স্থাপন করে, গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে তাদের নিযুক্ত করে, এবং সম্ভবত সরকারের অধীনস্থ প্রায় প্রতিটি পদের জন্যই তাদের যোগ্য করে তুলে তাদের নিজেদের সম্পর্কে আরো উঁচু মতামত পোষণ করানোর চেষ্টা করার মতো এত সুবিবেচনাপূর্ণ বলে আমার আর কোনোটাই মনে হয় না। তাদের কাজে নিযুক্ত হবার যোগ্যতা কতদূর পর্যন্ত হবে সেই যথাযথ সীমা এখনই নির্ধারিত করার দরকার নেই, কিন্তু যে সমস্ত পদের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা তাদের আছে এমন যে-কোনো পদ থেকে তাদের বাদ দেওয়া হবে কেন, তার কোনো যুক্তি আছে বলে মনে হয় না—অবশ্য আমাদের নিজেদের প্রাধান্য রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বিপদ যদি না থাকে।...

"আমরা যখন চিন্তা করি, সরকারসমূহের চরিত্রের দ্বারা জাতিসমূহের চরিত্র কিভাবে সর্বদাই প্রভাবিত হয়েছে, এবং যারা একদা ছিল সবচেয়ে কৃষ্টিবান তারা নিমজ্জিত হয়েছে বর্বরতায়, আবার অন্যরা যারা আগে ছিল সবচেয়ে রুক্ষ ও কঠোর তারা অর্জন করেছে সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখর, তখন এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ দেখিনা যে, আমরা যদি অবিচল ভাবে সঠিক ব্যবস্থাগুলি অনুসরণ করি তবে যথাসময়ে আমাদের ভারতীয় প্রজাদের চরিত্রের এত উন্নতি ঘটাবো যাতে তারা নিজেদের শাসনকার্য চালাতে পারবে, নিজেদের রক্ষা করতে পারবে।"

স্যর টমাস মুনরোর মৃত্যুর পর এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ অতিবাহিত হয়েছে। টমাস মুনরোর মতো প্রশাসক দুর্লভ এবং মাদ্রাজ প্রদেশের প্রতিটি জেলায় ১৫০,০০০ জন ইজারাদারের কাছ থেকে ন্যায়বিচারপূর্ণ ভূমি-কর আদায়

করার দুরূহ কাজ সন্তোষজনকভাবে সমাধা করা হয়নি। মুনরোর মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরে আরেকজন বিশিষ্ট স্কচ ভারতীয় প্রশাসকরূপে উচ্চ সম্মান অর্জন করেছিলেন। তিনি মাদ্রাজের ব্যবস্থা সম্পর্কে এই কথা লিখেছেন :

"শুধু কল্পনা করুন—একজন কলেক্টর ১৫০,০০০ জন ইজারাদারকে সামলাচ্ছেন, তাদের একজনেরও পাট্টা নেই ; প্রত্যেকেই যেমন যেমন চাষ করে ও ফসল তোলে তদনুযায়ী এবং তার 'গবাদি পশু, ভেড়া ও সন্তানসন্ততির' সংখ্যা অনুযায়ী খাজনা দেয় ; আর যদি যথেষ্ট সন্তোষজনক কারণ দেখাতে পারে তবে প্রত্যেকেই কিছুটা মকুব পায়। এরকম একটা ব্যবস্থা থাকলে ইংল্যাণ্ডে অথবা অন্য যে কোনো দেশে কৃষির দুর্দশা ও বৃহৎ পরিবার নিয়ে কী কান্নাকাটিই না পড়ে যেত ! কোনো চাষী কি কোনো কালে স্বীকার করবে যে তার খামারে কোনো ফসল ফলেছে, তার গবাদি পশুর বাচ্চা হয়েছে, কিংবা তার স্ত্রী সন্তান প্রসব করেনি ? কলেক্টর যদি অবতারদের একজন হতেন, এবং সেই জেলাতেই মিথিউজেলার মতো দীর্ঘায়ু হয়ে বাস করতেন, তাহলেই তিনি এই কর্তব্য পালনের যোগ্য হতেন না ; এবং যেহেতু তিনি সাধারণ মানুষ মাত্র তায় বিদেশী এবং ক্রমাগতই বদল হচ্ছেন, সেই জন্য দেশীয় প্রজারা যদি যথা-ইচ্ছা না করত এবং ক্ষমতা পেয়ে তার অপব্যবহার না-করত তবে সেটাই হত আশ্চর্যের বিষয়। তদনুযায়ী, একথা সাধারণ ভাবে স্বীকৃত যে সমগ্র ব্যবস্থাটির, বিশেষত কর মকুবের ব্যবস্থাটির অপব্যবহার ভয়াবহ ; সবপ্রকার প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র সীমাহীন ; আর তথ্য পরিবেশকদের উপর মাদ্রাজের কলেক্টরের নির্ভরতা কোনোমতেই অবস্থার সংশোধন ঘটায় না।"[১১]

স্যর টমাস মুনরো মাদ্রাজের চাষীর জন্য নির্দিষ্ট খাজনার হার ঠিক করার উদ্দেশ্যে সারা জীবন পরিশ্রম করেছেন, যাতে তাঁর করা সমস্ত উন্নয়নব্যবস্থায় তার লাভ হয়। কোনো অ্যাক্ট বা ঘোষণাপত্রের দ্বারা এরূপ নির্দিষ্ট খাজনা ঘোষণা করা না হলেও টমাস মুনরোর কার্যকালের চল্লিশ বছর পরে মাদ্রাজ সরকার তাকে বাস্তব ঘটনা বলে মেনে নিয়েছিলেন। ১৮৫৫-৫৬ সালের প্রশাসনিক রিপোর্টে বলা হয়েছে মাদ্রাজের রায়তকে "সরকার উচ্ছেদ করতে পারেন না, যতদিন পর্যন্ত সে তার নির্দিষ্ট কর দেয়... এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রায়ত হলেন কার্যত একটা সহজ ও ত্রুটিহীন স্বত্বে মালিক, এবং তিনি চিরস্থায়ী পাট্টার সমস্ত সুবিধা ভোগ করেন।" ১৮৫৭ সালে বোর্ড অব রেভিনিউ বলেছেন, "মাদ্রাজের একজন রায়ত কোনোরূপ কর বৃদ্ধি ছাড়াই চিরকাল তাঁর জমির দখল রাখতে পারেন।" মাদ্রাজ সরকার ১৮৬২ সালে ভারত সরকারকে

জানিয়েছিলেন, "এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না যে রায়তোয়ারি ব্যবস্থার একটি মূল নীতি হল এই যে জমির উপর সরকারের দাবি চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট।"[১২]

বার বার দেওয়া এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি এখন উপেক্ষা ও বাতিল করা হয়েছে। ১৮৫৫ সালে আয়োজিত জরিপের কাজের পর থেকে প্রতিটি জোতের উপরে নির্ধারিত ভূমি-কর স্থির হয় প্রতিবারের বন্দোবস্তের সময়ে রাজস্ব অফিসারদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী। মাদ্রাজের রায়তের খাজনায় কোনো স্থিরতা নেই, বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কোনো নিরাপত্তাব্যবস্থা নেই, উন্নয়নের কোনো উপযুক্ত উদ্দেশ্য নেই। ভূমিকরের অনিশ্চয়তা তার মাথার উপর ঝুলে থাকে ডেমোক্লিসের তরবারির মতো।

ভূমি কর কী? ১৮৫৬ সালে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ঘোষণা করেন যে, চাষের খরচ দেবার পর এবং কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের মুনাফা দেবার পর সমস্ত উদ্বৃত্ত দ্রব্য নিয়ে যে-খাজনা, সরকারের অধিকার সেটা নয়, তার অধিকার শুধু একটা ভূমি-রাজস্ব।[১৩] এর দু-বছর পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তুলে দেওয়া হয়, এবং সাম্রাজ্ঞীর অধীনে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রসচিব স্যর চার্লস উড, পরবর্তী কালে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স, ঘোষণা করেন যে খাজনার একটিমাত্র অংশকে, সাধারণভাবে অর্ধেক অংশকে, তিনি ভূমি কর হিসেবে নিতে ইচ্ছুক।[১৪]

এই হার অতি উচ্চ হলেও একটা পরিষ্কার ও বোধগম্য সীমা নির্দিষ্ট করে। কার্যত, এই উচ্চ সীমা পর্যন্ত ছাড়িয়ে যাওয়া হয়; এবং মাদ্রাজে ভূমি কর হিসেবে যা আদায় হয় তা প্রায়শই সমগ্র অর্থনৈতিক খাজনাকে দূরে সরিয়ে রাখে। এখন সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমা হল ক্ষেতে উৎপন্ন দ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশ; এবং বস্তুত এটাই হল সমগ্র অর্থনৈতিক খাজনা। কারণ ছোট ছোট খামারে, যেখানে বছরে প্রায় ১২ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য উৎপন্ন হয়, সেখানে চাষের ব্যয় ও কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের মুনাফা দাঁড়ায় আনুমানিক ৭ অথবা ৮ পাউণ্ড, এবং ভূমি কর হিসেবে সরকারের ৪ পাউণ্ড দাবি কার্যত অর্থনৈতিক খাজনার ১০০ শতাংশ দাবি, ৫০ শতাংশ নয়।

বছরের পর বছর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অনিশ্চিত রাষ্ট্রীয় দাবির দোষগুলি বাড়তে থাকে; মাদ্রাজের চাষীরা থাকেন সম্পদহীন অবস্থায়; ১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তারা ছিল অসহায়, এই দুর্ভিক্ষ সেই প্রদেশ থেকে ৫০ লক্ষ মানুষের অস্তিত্ব মুছে দিয়েছিল। তিন বছর পরে মার্কুইস অব্ রিপন

ভাইসরয় রূপে ভারতে আসেন, এবং অবশেষে তিনি মাদ্রাজের ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্নটির মোকাবিলা করেন।

মাদ্রাজ সরকার ১৮৫৬ ও ১৮৬২ সালে ভূমি করের যে-নির্দিষ্টতাকে চাষীর অন্যতম অধিকার বলে স্বীকার করেছিলেন, মাদ্রাজের চাষীকে সেই চূড়ান্ত নির্দিষ্টতা না-দিয়েই লর্ড রিপন এই নিয়ম নির্ধারণ করেন যে, যে-সমস্ত জেলায় একবার জরিপ ও বন্দোবস্ত করা হয়েছে, সেখানে মূল্যবৃদ্ধির যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে ভূমি-কর বাড়ানো হবে না।[১৫] এর ফলে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত থাকে, সেই সঙ্গে ক্ষেতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এধরনের করবৃদ্ধি সম্পর্কে চাষীদের আশ্বাসও দেওয়া হয়। চূড়ান্তরূপে নির্দিষ্ট খাজনার অধিকার উপেক্ষিত হবার পর এটাই ছিল সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত আপস; এবং এই ব্যবস্থা মাদ্রাজের কৃষিজীবী জনসমষ্টিকে কিছু নিরাপত্তা দিয়েছিল, যে-নিরাপত্তা ছাড়া পৃথিবীর কোথাও কৃষির উন্নতি হতে পারে না।

মার্কুইস অব্ রিপন ভারত ত্যাগ করেন ডিসেম্বর ১৮৮৪-তে, এবং জানুয়ারী ১৮৮৫-তে ভারতের রাষ্ট্রসচিব তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই যুক্তিসঙ্গত নিয়ম বাতিল করেন। এইভাবে ইণ্ডিয়া অফিস ভারতীয় চাষীদের কাছে পুরনো কোর্ট অব ডিরেক্টর্স-এর মতোই নিজেকে অনুদার ও কঠোর বলে প্রমাণিত করেছেন। এবং আজকের (১৯০১) মাদ্রাজের চাষীর অনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় দাবি ও অন্যায় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো নিরাপত্তা নেই এবং তাই তাঁদের সঞ্চয় করার কোনো প্রেরণা নেই, নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার কোনো ক্ষমতা নেই।

১। টাকার ভগ্নাংশগুলি এই সকল সারাংশে বর্জন করা হয়েছে।

২। Proceedings of the Board of Revenue, dated 18th September 1818.

৩। ভগ্নাংশগুলি বর্জিত।

৪। Proceedings of Board of Revenue, dated 26th November 1818.

৫। Revenue Letter from the Court of Directors to the Governor in Council at Madras, dated 31st October 1821.

৬। Revenue Letter from the Court of Directors to Madras, dated 2nd January 1822.

৭। Ibid, dated 12th December 1821.

৮। Revenue Letter from the Court of Directors to Madras, dated 18th August 1824.

৯। Ibid, dated 12th December 1821-

১০। Vol. iii. London, 1826, pp, 602-682,

১১। *Modern India* by George Campbell, London, 1852.

১২। Letter of 18th February 1862.

১৩। Despatch of 17th December 1856.

৪। Despatch of 1864.

১৫। Despatch of 17th October 1882.

দশম অধ্যায়

লর্ড ওয়েলেসলী ও উত্তর ভারত জয় (১৭৯৫-১৮১৫)

যে প্রদেশটিকে বর্তমানে 'নর্থ ওয়েষ্টার্ন প্রভিন্সেস এ্যাণ্ড আউধ' বলা হয়, সে প্রদেশটি বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে বৃটিশ শাসনাধীনে এসেছিল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীর সঙ্গে এক সন্ধির বিনিময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস বারাণসী ও সন্নিহিত জেলাগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ১৮০১-এ লর্ড ওয়েলেসলীর চাপে পড়ে অযোধ্যার নবাব এলাহাবাদ ও আরও কয়েকটি জেলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মারাঠা যুদ্ধে লর্ড লেক আগ্রা ও গঙ্গাযমুনা উপত্যকা জয় করেছিলেন। অযোধ্যার অবশিষ্ট অঞ্চল ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী অধিকার করেছিলেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে যে জমিদারী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছিল, কর্ণওয়ালিস ও শোর বারাণসী পর্যন্ত সেই বন্দোবস্তের প্রসারে আগ্রহী ছিলেন। ১৭৮৭ থেকে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বারাণসীর রাজার সঙ্গে কথাবার্তা চালানো হয়েছিল এবং ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। যে ক্ষুদ্র অঞ্চল তাঁর বংশের পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, সেই অঞ্চলের অধিকার বজায় রেখে বারাণসীর রাজা সমগ্র রাজ্যে এতদিন পর্যন্ত যে অধিকার ভোগ করে এসেছেন তা তিনি বৃটিশদের হাতে ছেড়ে দেন। এই চুক্তি সম্পাদনের পর ভারতবর্ষের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল স্যর জন শোর পরিত্যক্ত অঞ্চলে গ্রামের জমিদারদের সঙ্গে ভূমি-রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। সরকার ও কৃষকের মধ্যে শস্যের ভাগ-বাঁটোয়ারার ভিত্তিতেই ভূমি-রাজস্বের আইন নির্ধারিত হত। এই ভাগ-বাঁটোয়ারার মধ্যেও আবার দেশের বিভিন্ন স্থানে সামান্য তফাৎ থাকত। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বারাণসীতেই ভূমি-রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়।[১] বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জন্য রচিত 'কোড অব রেগুলেশনস্' বারাণসী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় এবং প্রচলিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনগুলি সর্বত্রই এক ছিল।

এর ছয় বৎসর পরে অযোধ্যার নবাব এলাহাবাদ ও অন্য জেলাগুলি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ছেড়ে দেন। এই জেলাগুলিকে সাধারণভাবে বলা হয় 'হস্তান্তরিত জেলা' (Ceded Districts)। এই ঘটনা সম্পর্কে নবাব

ও লর্ড ওয়েলেসলীর মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা, ভয় দেখিয়ে যে ভাবে আর্থিক বৃত্তির বিনিময়ে জেলাগুলি ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং এই সব কাজের জন্য গুরুতর অপরাধ ও বেআইনী কার্যকলাপের যে অভিযোগ পরে লর্ড ওয়েলেসলীর বিরুদ্ধে গঠিত হয়েছিল—সেগুলি সবই রাজনৈতিক ইতিহাসের বিষয়ীভূত এবং বর্তমান গ্রন্থের পরিধির মধ্যে তা আসে না।[২]

যে চুক্তির বলে কোম্পানি হস্তান্তরিত জেলাগুলি পেলেন—যে দিন সে চুক্তি বলবৎ হল সেদিনই লর্ড ওয়েলেসলী ঐ জেলাগুলির প্রশাসন ও বন্দোবস্তের জন্য এক কমিশন গঠন করলেন। একটি বোর্ড অব কমিশনার্স গঠনে তিনজন বেসামরিক কর্মচারীকে নিযুক্ত করা হল। গভর্ণর জেনারেলের ভ্রাতা হেনরি ওয়েলেসলী নতুন রাজ্যের লেফ্‌টানেণ্ট গভর্ণর ও বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের পদে মনোনীত হলেন। হেনরি ওয়েলেসলী জমিদার ও পত্তনিদারদের সঙ্গে তিন বৎসরের জন্য ভূমি-রাজস্বের বন্দোবস্ত করলেন। ১৮০৩-এর ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁর প্রথম বন্দোবস্তের রিপোর্টে ভারতবর্ষের প্রতিটি নবলব্ধ এলাকায় কোম্পানির কর্মচারিগণ যে অতিরিক্ত ভূমি-রাজস্ব ধার্য করেছিলেন সেই একই ভূমি-রাজস্বের কথা আছে।

"৩। পূর্বে নবাব উজীর যা নির্ধারিত করেছিলেন, আমার বেরিলী আগমনের আগেই সমাহর্তারা (Collectors) এই প্রদেশের ভূমি-রাজস্বের বন্দোবস্ত তারই সমপরিমাণ জমাতে (ধার্য কর) ধার্য করেছিলেন। যদিও আমার আশঙ্কা ছিল যে এই বন্দোবস্ত দেশে মজুত সম্পদের ভুল হিসাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং অর্থ আদায় করাও হবে অত্যন্ত কঠিন, তবুও সমাহর্তাগণ সম্প্রতি যে চুক্তি সম্পাদিত করেছেন তা আমি রদ করিনি। কারণ আমার ভয় ছিল যে আমার দিক থেকে এক্ষুনি তাঁদের কাজে হস্তক্ষেপের ফলে তাঁদের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যেতে পারে। এই সংকটজনক মুহূর্তে তাঁদের কর্তৃত্বকে সমর্থন জানানোই আমার কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।

"১৮। মুঘল শাসনে এই সব প্রদেশের বাৎসরিক রাজস্ব সংক্রান্ত যে সব নথিপত্র আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি তার থেকে মনে হয় যে রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় আড়াই কোটী টাকা (পঁচিশ লক্ষ স্টার্লিং)।......এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে নরমপন্থী ও নিরপেক্ষ বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থায় কৃষিকার্য পূর্ণাঙ্গ হলে এই প্রদেশগুলির ভূমিরাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াবে দু'কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা (পঁচিশ লক্ষ স্টার্লিং)।.........

"২৪। সম্প্রতি প্রবর্তিত প্রবিধানের বলে আবগারী বা চোলাই মদ

বিক্রয় বাবদ ধার্য শুল্ক থেকে আহৃত রাজস্বের পরিমাণ বিবরণে যে হিসাব দাখিল করা হয়েছে অন্ততপক্ষে তার সমান হবে।”……

“৩০। লবণ ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত একচেটিয়া সুযোগসুবিধা কোম্পানির হাতে রাখবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি মহামান্য সরকার বাহাদুরের কাছে আমি এখন সে কথাই উপস্থাপিত করছি।”[৩]

এই রিপোর্টের সঙ্গে প্রদত্ত বিবরণে নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানটি দেওয়া হয়েছে :

	টাকা
নবাবের ভূমিরাজস্বের পরিমাণ	১৩,৫২৩,৪৭৪
বৃটিশ ধার্য রাজস্বের পরিমাণ প্রথম বৎসর	১৫,৬১৯,৬২৭
বৃটিশ ধার্য রাজস্বের পরিমাণ দ্বিতীয় বৎসর	১৬,১৬২,৭৮৬
বৃটিশ ধার্য রাজস্বের পরিমাণ তৃতীয় বৎসর	১৬,৮২৩,০৬৩

এই পরিসংখ্যানে দেখা যাবে যে বাংলা ও বিহার প্রদেশ অধিকার করবার পর সেখানে যে ভুল করা হয়েছিল উত্তর ভারতে সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। অনবরত যুদ্ধের ফলে পীড়িত, ও দুর্বহ করের বোঝায় দরিদ্র হয়ে পড়া দেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এক বিরাট ও সুসভ্য শক্তির শাসনাধীনে এসেছিল। শান্তিকামী ও পরিশ্রমী লোকেদের স্বস্তি ফেলবার এটাই ছিল একটা লাগসই সময়। তাদের বোঝা কমিয়ে দেবার ও সম্পদ বৃদ্ধি করবার এই ছিল সুযোগ। কিন্তু হেনরি ওয়েলেসলীর শাসনের প্রথম বৎসরেই হস্তান্তরিত জেলাগুলি থেকে কোম্পানির দাবী নবাবের দাবীর পরিমাণের ওপরেও দু কোটি টাকা বা দু লক্ষ পাউণ্ড বেশী ছিল। তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হবার আগেই আরও এক কোটি টাকা দাবীর সঙ্গে যোগ করা হয়। নবাবের দাবী ছিল নামে মাত্র—উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনুযায়ী। কিন্তু দাবী যে কঠোরতার সঙ্গে আদায় করা হত, ভারতবর্ষের লোকেরা সে রকমটি আগে আর দেখে নি। শ্রীডাম্বলটন বলে জনৈক সমাহর্তা অভিযোগ করেছিলেন যে ১৮০২ খৃষ্টাব্দের বন্দোবস্তে “যুক্তিযুক্ত দাবীর মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল”, এবং বৃটিশ সরকার নবাবী সরকারের চড়া রাজস্বের হার বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে “আদায়ের ব্যাপারে সেই স্থিতিস্থাপকতা ছিল না।’

অন্যদিক দিয়ে নবলব্ধ এলাকাটিকে সুসংগঠিত সরকারের অধীনে আনবার সমস্ত প্রচেষ্টাই করা হয়েছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে ঐ অঞ্চলে বেঙ্গল রেগুলেশনস্ প্রবর্তিত হয় এবং সমগ্র প্রদেশটিকে সাতটি জেলায় ভাগ করা হয়। প্রতিটি জেলায় বিচারক ও জেলাশাসকের ক্ষমতাবিশিষ্ট একজন করে অসামরিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। আর একজন কর্মচারী থাকতেন সমাহর্তার কাজের জন্য। বেরিলীতে আপীল কোর্ট ও সারকিট প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাকাতদের গ্রেপ্তার ও নিজ নিজ এলাকায় শান্তি রক্ষার জন্য তহশীলদার ও জমিদারদের ক্ষমতা দেওয়া হয়।[৪]

ভূমি-রাজস্বের ত্রৈবার্ষিক বন্দোবস্ত স্বীকার করে নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবিধান বিধিবদ্ধ করা হয়।[৫] প্রবিধানে বলা হয় যে নির্দিষ্ট কাল শেষ হয়ে গেলে তিন বৎসরের জন্য আরও একটি বন্দোবস্ত করা হবে। এর পর হবে চার বৎসরের বন্দোবস্ত এবং তারও স্থিতিকাল শেষ হলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হবে।

হাউস অব কমন্সের সিলেকট কমিটি বলেছেন[৬] যে 'এই সব বন্দোবস্তের দ্বারা' হেনরি ওয়েলেসলীর প্রথম বন্দোবস্তের পর সর্বসমেত দশ বৎসর শেষ হলে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের জন্য সুপ্রীম সরকার ভূম্যধিকারীগণের নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন"।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জেনারেল ওয়েলেসলী (গভর্ণর জেনারেলের আর এক ভ্রাতা ও পরে ডিউক অব ওয়েলিংটন বলে পরিচিত) আসাই-এর স্মরণীয় যুদ্ধে দক্ষিণে মারাঠা শক্তি বিধ্বস্ত করলেন। লর্ড লেক ঐ শক্তিকেই উত্তরে লাসওয়ারীর যুদ্ধে ধ্বংস করলেন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ অন্তর্ভুক্ত হল। দুই বৎসর পূর্বে অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে পাওয়া হস্তান্তরিত জেলাগুলির (Ceded Districts) থেকে পৃথক করবার জন্য এগুলিকে বলা হল 'বিজিত প্রদেশসমূহ' (Conquered Provinces)। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ড ও কটকও অন্তর্ভুক্ত হল।

বিজিত প্রদেশগুলিকে প্রথমে লর্ড লেকের শাসনাধীনে রাখা হল। কিন্তু ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বিচার ও রাজস্ব বিভাগীয় অফিসারদের অধীনে প্রদেশগুলিকে পাঁচটি জেলায় ভাগ করা হল এবং হস্তান্তরিত জেলাগুলির মতই কলকাতায় সর্বোচ্চ কর্তৃত্বাধীনে রাখা হল। হস্তান্তরিত জেলাগুলিতে সম্প্রতি প্রবর্তিত প্রবিধানগুলি বিজিতপ্রদেশেও চালু হল এবং পূর্বোক্ত জেলাগুলির জমিদারদের কাছে যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল শেষোক্ত প্রদেশের জমিদারদের কাছেও সেই অঙ্গীকারই করা হল। বলা হল যে পর পর বাৎসরিক, ত্রৈবার্ষিক ও চতুর্বার্ষিক

বন্দোবস্ত করা হবে এবং জমিদারগণ রাজী হলে শেষ বন্দোবস্তটি হবে চিরস্থায়ী।[7] দুই বৎসর পর পুনরায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল, কিন্তু এবার শর্ত হল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তি কোর্ট অব ডিরেক্টার্স-এর অনুমোদন সাপেক্ষ।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মারাঠা যুদ্ধের ফলে উত্তর ভারত বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং কোম্পানির কর্মচারিগণ কর্তৃক গুরুভার রাজস্ব ধার্যের ফলে সাধারণ লোকেরা নিজেদের অবস্থা উন্নত করবার কোনই অবকাশ পেল না। ফল—১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ব্যাপক দুর্ভিক্ষ। সরকার তখন ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করতে বাধ্য হলেন। ভূম্যধিকারীদের ঋণও আগাম দেওয়া হল। বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর ও ফতেগড়ে প্রেরিত শস্যের জন্য প্রচুর মূল্য দেওয়া হল। চালু প্রবিধান অনুযায়ী চার বৎসরের যে বন্দোবস্তটি চিরস্থায়ী হবার কথা ছিল তার তত্ত্বাবধানের জন্য ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে একটি বিশেষ কমিশন নিয়োগ করা হয়।

উত্তর ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্নে যে স্মরণীয় আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল আমরা এখন সে কথায় আসছি।

বিশেষ কমিশনারদ্বয় আর. ডব্লু. কক্স ও হেনরি সেণ্ট জর্জ টুকার প্রদত্ত রিপোর্টে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগসুবিধার কথা স্বীকার করলেন কিন্তু ছেড়ে দেওয়া ও বিজিত প্রদেশে আবলম্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের তাঁরা বিরোধী বলে ঘোষণা করলেন।

"২৩০। জমির ওপর জনসাধারণের দাবীর মাত্রা বেঁধে দেবার ফলে যে বিপুল সুযোগ সুবিধা আশা করা যেতে পারে সে সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। আমরা জানি যে সাময়িক বন্দোবস্ত জনসাধারণের পক্ষে হয়রানিকর। তাতে প্রতারণা ও অত্যাচারের অবকাশ থাকে। এ প্রশ্ন যথার্থই উত্থাপিত হয়েছে যে যেখানে জনসাধারণের দেয় রাজস্বের হার দিন দিন বেড়েই চলে এবং যেখানে বৃহত্তর শিল্প রূপায়ন থেকে ব্যক্তিকে কোন সুযোগসুবিধাই ভোগ করতে দেওয়া হয় না সে দেশ উন্নতির দিকে উল্লেখযোগ্য-ভাবে এগিয়ে যেতে পারে কি না। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নীতির সমর্থনে গৃহীত পূর্ববর্তী প্রতিটি ব্যবস্থা সম্পর্কে কাউন্সিলের হুজুরকে আমাদের সুচিন্তিত ও নিঃশর্ত মতামত নিবেদন করছি যে সাধারণভাবে ছেড়ে দেওয়া ও বিজিত প্রদেশগুলির ব্যাপারে যে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে তা এই মুহূর্তে সময়োচিত নয়। এই বন্দোবস্ত প্রবর্তনের যে কোন রকম অকালোচিত প্রচেষ্টার ফলে জনসাধারণের সম্পদের বিরাট ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী এবং ক্ষেত্র বিশেষে সেই সব লোকেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে যাদের সম্পত্তিকে

একটা দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করাই এই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রধানতম উদ্দেশ্য।"[৮]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে উত্তর ভারতে এটাই ছিল প্রথম বিপদ সঙ্কেত। "জনসাধারণের প্রদত্ত রাজস্বের আর্থিক অপচয়ের" ভয় এই বিপদ-সঙ্কেতকে উচ্চকিত করে তুলেছিল। এইচ. কোলব্রুক অবশ্য বিশেষ কমিশনারদ্বয়ের যুক্তির চূড়ান্ত উত্তর দিলেন।

"৩। ১৮০২-এর ৪ঠা জুলাই ও ১৮০৫-এর ১১ই জুলাই-এর ঘোষণা অনুযায়ী সেখানে উল্লেখিত নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পর, যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত চুক্তিতে যে সব জমি যথেষ্ট উন্নত চাষের দ্বারা এই পদক্ষেপের ন্যায্যতা প্রমাণ করে সেই সব জমির জন্য সরকার ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে চুক্তিবদ্ধ। বিষয়টি আনুপূর্বিক বিবেচনা ও অধুনা আলোচিত পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ থেকে এই সময়গুলির পূর্বাভাস করা জরুরী হয়ে পড়ল; সেই অনুসারে ১৮০৭-এর জুনে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ১০নং রেগুলেশন অনুযায়ী গভর্ণর জেনারেল জমিদার ও অন্যান্য স্বত্বাধিকারিগণের কাছে বিজ্ঞপ্তি পাঠালেন যে তাঁরা যদি রাজী থাকেন তবে চলতি বন্দোবস্তের জন্য গত বৎসরে ধার্য জমা চিরস্থায়ীরূপে অপরিবর্তিত থাকবে এবং এই ব্যবস্থা কোর্ট অব ডিরেক্টারসের অনুমোদন লাভ করবে।

"৪। যে অঙ্গীকার এই ভাবে আনুষ্ঠানিকরূপে চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছে জনসাধারণের আস্থা হারাবার মত প্রতিজ্ঞার জলন্ত লঙ্ঘন ব্যতীত সে অঙ্গীকার অস্বীকার করা যায় না।

"৯। পূর্ববর্তী কমিশনারগণ যে যুক্তিটির উপর মূলত বিশ্বাস স্থাপন করতেন তা হল যে ভবিষ্যৎ উন্নতির অংশীদার হবার অধিকার কদাচ ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ সরকার এক হিসেবে এক বিরাট জমিদারীর ভূম্যধিকারী ও স্বত্বাধিকারী।

"২৬। বাংলা, বিহার ও করমণ্ডল উপকূলবর্তী অঞ্চল সমূহে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্যে এবং বহু আলোচনার পর পতিত জমির উন্নতিতে অংশগ্রহণের অধিকার ত্যাগ করা হয়েছিল। ছেড়ে দেওয়া ও বিজিত প্রদেশসমূহে প্রাক্তন বোর্ড অব কমিশনার্স ঐ অধিকার যতটা ত্যাগ করেছিলেন তার চেয়ে এর পরিমাণ ছিল অনেক বেশী।......

২৭। এই পদক্ষেপের সুখাবহ ফলাফল বঙ্গদেশে অধুনা প্রত্যক্ষ। এই অঞ্চলের পুনরুজ্জীবিত সমৃদ্ধি, সম্পদবৃদ্ধি ও দ্রুত উন্নতি নিঃসন্দেহে চিরস্থায়ী

বন্দোবস্তের ফলস্বরূপ! এই বন্দোবস্তের মূলনীতি এতই সুচিন্তিত ছিল যে এই পরিকল্পনার খসড়া তৈয়ারীতে যে মারাত্মক ভুল করা হয়েছিল তাতেও শেষ পর্যন্ত এর উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় নি।

"৩২। কোন রকম অনুমান সাপেক্ষ যুক্তির পরিবর্তে আমি এই অভিজ্ঞতারই দোহাই দিচ্ছি।··· আশা করা গিয়েছিল যে পতিত জমির উদ্ধারের ফলে জমিদারীর উন্নতিতে ভূম্যধিকারীর আয় বৃদ্ধি হবে, ফলে তিনি আরও ধনবান হয়ে উঠবেন এবং রাজস্ব হ্রাসের প্রয়োজন ছাড়াই ভূম্যধিকারী অনাবৃষ্টি ও বন্যাজনিত সাময়িক বিপর্যয়ের ফলে বিভিন্ন ঋতুতে আয়ের পরিমাণের যে তারতম্য ঘটে তা পূরণ করতে সক্ষম হবেন।

"৩৩। এই প্রত্যাশাগুলি বাস্তবায়িত হয়েছে ··

"৩৪। একটি খুবই প্রচলিত মত মনে হয় যে বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা আমাদের ভারতীয় প্রজাদের কাছে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এই মতবাদকে ভিত্তিহীন নয় বলে স্বীকার করলেও বলতে হবে যে তারা কেবলমাত্র এই ব্যবস্থার অরুচিকর অংশগুলিরই স্বাদ গ্রহণ করেছে এবং ভূম্যধিকারীদের কাছে যে একমাত্র শুভদিকটি গ্রহণযোগ্য তা ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে, ফলে যে পরিমাণে তারা প্রত্যাশা করেছিল এবং যে হতাশার অভিজ্ঞতা তারা লাভ করবে সেই পরিমাণেই ক্রমশ জমির স্বত্বাধিকারী ও প্রজাবৃন্দ একই সঙ্গে সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

"৬৩। কমিশনারদের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হয়ে এই বলে আমি শেষ করছি যে স্থৈর্য, সংযম ও ন্যায়বিচারই সরকারী শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। কিন্তু বহু আলোচনার পর যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং যা আমাদের প্রজাদের পক্ষে মঙ্গলজনক সে ব্যবস্থাকে পরিহার করে আমাদের স্থৈর্য প্রমাণ করবার দরকার নেই। উচ্চতম রাজস্ব আদায় করে এবং আমাদের কৃষকদের কাছ থেকে যতটা পরিমাণে পাওয়া যায় ততটা খাজনা নিঙরিয়ে নিয়ে আমাদের সংযমের প্রমাণ দেব না। ছোট ছোট ভূম্যধিকারীদের সন্তানদের তাদের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আমাদের ন্যায়বিচারও প্রদর্শন করব না।"[৯]

তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড মিণ্টো এই নথিটি এবং এর সঙ্গে কাউন্সিলের অপর সদস্য লাম্‌সডেনের অনুরূপ একটি নথি কোর্ট অব ডিরেক্টার্সের কাছে পেশ করেন। লর্ড মিণ্টো নিজেও আপন মতামত সম্পর্কে তেমনি স্পষ্ট ভাষী।

"বাংলা বিহার, উড়িষ্যা ও বারাণসী প্রদেশ ও সেন্ট জর্জ ফোর্ট প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সমগ্র অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন সম্পর্কিত সমস্ত দলিল এবং হস্তান্তরিত ও বিজিত প্রদেশ সমূহে প্রস্তাবিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ক সমস্ত বিবরণ ও নথির পূর্ণাঙ্গ বিবেচনার পর তিনি এই বিচক্ষণ নীতি বা বলতে গেলে এর জরুরী প্রয়োজন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন।"[১০]

কিন্তু ডিরেক্টারগণ তাঁদের মন স্থির করে ফেলেছিলেন। একবার তাঁরা পরিস্থিতির চাপে একটি জাতির কল্যাণের জন্য নিজেদের সম্ভাবনাপূর্ণ মুনাফা-বৃদ্ধি ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু এখন লর্ড কর্ণওয়ালিস আর বেঁচে ছিলেন না, আর ডিরেক্টারগণও কদাপি পুনরায় অনুরূপ উদারতার অপরাধে অপরাধী হন নি। এখন তাদের নীতি হল "যত বেশী পারা যায় রাজস্ব আদায় করা আর যতটা পরিমাণে পারা যায় কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা নিঙরিয়ে নেওয়া।"

তাঁরা উত্তর দিলেন, "যতদিন পর্যন্ত এ সম্পর্কে প্রস্তুতিমূলক সমস্ত কার্যবিবরণী আমাদের কাছে না পেশ করা হচ্ছে এবং যতদিন পর্যন্ত ঐ কার্য বিবরণী সম্পর্কে আপনার প্রস্তাব আমাদের অনুমোদন ও মতৈক্য না লাভ করছে ততদিন পর্যন্ত কটকে বা অন্য কোন প্রদেশেই কোন রকম বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা চলবে না।" নয় মাস পর তাঁরা আবার লিখলেন। "বর্তমান পত্রের উদ্দেশ্য হল বঙ্গদেশে প্রবর্তিত স্থায়ী ধার্য আমাদের নবলব্ধ এলাকাগুলিতে প্রসারে আমাদের অঙ্গীকারাবদ্ধ করানোর বিরুদ্ধে আপনাকে বিশেষভাবে সাবধান করে দেওয়া।"[১১]

এই বার্তা পেয়ে গভর্ণর জেনারেল কিছুটা বিস্মিত হলেন। ভারতবর্ষের জনগণের কল্যাণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় একটি পদক্ষেপ পরিত্যাগই নয়, অধিকন্তু জনসাধারণকে দুই বার নিঃসর্তভাবে প্রদত্ত এবং ১৮০৩ ও ১৮০৫ এর রেগুলেশনের অন্তর্ভুক্ত একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনেরও তাঁরা আদেশ দিলেন। যে ঘোষণাটি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ২৫ নং প্রবিধানের ২৯ নং ধারার (হস্তান্তরিত প্রদেশগুলি সম্পর্কে) অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাতে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি ছিল :

"এই দশ বৎসরের পর সেই একই ব্যক্তিদের সঙ্গে (যদি তাঁরা রাজী হন, অথবা যদি কেউ রাজী না থাকেন তবে যাঁদের অধিকতর দাবী আছে, তাঁরাই এগিয়ে আসবেন) এবং যে জমির উন্নত কর্ষণ ব্যবস্থা বর্তমান পন্থার উপযোগিতা প্রমাণ করবে সেই সব জমির ওপর সরকার যে চুক্তি সুষ্ঠু ও ন্যায্য মনে করবেন সেই চুক্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হবে।"

১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ৯নং প্রবিধানে (বিজিত প্রদেশগুলির জন্য) যে ঘোষণাটি অন্তর্ভুক্ত ছিল তাতেও এই অঙ্গীকার এই সর্তে পুনরুল্লেখিত ছিল :

"এই দশ বছরের পর, ১২২২ ফজলী বছরের শেষে, সেই একই ব্যক্তিদের সঙ্গে (যদি তাঁরা রাজী হন, অথবা যদি কেউ রাজী না থাকেন তবে যাঁদের অধিকতর দাবী আছে, তাঁরাই এগিয়ে আসবেন) এবং যে জমির উন্নত কর্ষণ ব্যবস্থা বর্তমান পন্থার উপযোগিতা প্রমাণ করবে, সেই সব জমির ওপর সরকার যে চুক্তি সুষ্ঠু ও ন্যায্য মনে করবেন সেই চুক্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হবে।"

কোম্পানির দায়িত্বশীল কর্মচারী ও এজেণ্টরা ভারতবর্ষের জনসাধারণকে নিঃসর্ত ভাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কাজেই কোম্পানির একটা বাধ্য-বাধকতা ছিল। ১৮০৭-এ ১৮০৭-এর ১০নং প্রবিধানে (হস্তান্তরিত ও বিজিত প্রদেশসমূহের ব্যাপারে) প্রতিশ্রুতিটি পুনরায় দেওয়া হয়েছিল এবং এই প্রথম যে সর্তটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তা হল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হবে যদি "সেই বন্দোবস্ত মাননীয় কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের অনুমোদন লাভ করে।"

১৮১১-তে ডিরেক্টর্সদের প্রচারিত আদেশবলে এই প্রতিশ্রুতিগুলি কি ভাবে লঙ্ঘন করা যেতে পারে ? ১৮১২-তে ভারত সরকার লিখলেন, "১৮০৩ ও ১৮০৫-এর প্রবিধান বলে যে বন্দোবস্তগুলি প্রবর্তিত হয়েছে মাননীয় কোর্টের সে সম্পর্কিত আপত্তি যদি ঐ প্রবিধানগুলি কার্যকর হবার অব্যবহিত পরেই প্রকাশ করতেন, তবে এই আপত্তির স্বপক্ষে কোর্টের যে সহজাত নিয়ন্ত্রণাধিকার আছে তা উদ্ধৃত করা যেত, যদিও প্রবিধানে কোর্টের সম্মতির কোন অপেক্ষা রাখা হয় নি। কিন্তু অধুনা যখন হস্তান্তরিত জেলাসমূহে ও বিজিত প্রদেশসমূহের দুই-তৃতীয়াংশে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তখন আমাদের আশংকা, যার কথা এর মধ্যেই আমরা জানিয়ে দিয়েছি, যে এতদিন বাদে ঐ প্রবিধান বাতিল করা নীতি বা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।"[১২]

লর্ড মিণ্টো নিজ লিখিত একটি নথীতে ডিরেক্টরদের সাম্প্রতিক নির্দেশ সমূহ সীমিত অর্থে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ "ভূম্যধিকারীদের নিকট এতটা প্রকাশ্যে ও আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে সরকারের আস্থা রক্ষা করবার কাজের সঙ্গে" তিনি ঐ নির্দেশাবলীর আক্ষরিক অর্থকে খাপ খাওয়াতে পারেন নি।[১৩]

১৮১৩-তে ভারতবর্ষ ত্যাগের পূর্বে ডিকেক্টরদের নির্দেশের বিরুদ্ধে লর্ড মিণ্টো আরও একটি প্রতিবাদ পেশ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন

যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে রাজস্ব খোয়াবার কোন সম্পর্ক নেই; এ্যাডাম স্মিথও তাঁর *Wealth of Nations* গ্রন্থে দেশের উন্নতির পরিপন্থী হিসাবে পরিবর্তনশীল ভূমি-রাজস্বের নিন্দা করে গেছেন; পতিত জমির অন্তর্ভুক্তি ছাড়াই উত্তর ভারতে জমিদারীর প্রকৃত মালিকদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা যেতে পারে; এবং শেষ কথা হল যে "দেশের মূল অধিবাসীদের অবস্থার সর্বস্তরে উন্নতিবিধানই" যদি সুষ্ঠু প্রশাসনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, "তবে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় হল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন ভিন্ন অন্য কোন বন্দোবস্ত বা পদক্ষেপই ঐ গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য দ্রুততর ও অধিকতর কার্যকর হয়ে উঠবে না।"[১৪]

কিন্তু কোম্পানির ডিরেক্টররা ছিলেন পাষাণ। ভারতের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য তাঁদের ঘোষিত ইচ্ছা নিজেদের মুনাফা ত্যাগে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ১৮০৩ ও ১৮০৫-এ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির থেকে কি ভাবে রেহাই পাওয়া যায় তাঁরা সেই পরিকল্পনাই ফাঁদছিলেন। এড়িয়ে যাবার জন্য তাঁরা এমন একটা ফন্দা আঁটলেন যা কোন বিচারালয়ই বৈধ বলে স্বীকার করবে না এবং যা কোন সাধু বণিকেরই উপযুক্ত ছিল না, একটা সাম্রাজ্যের শাসকদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে সরকার যে চুক্তির উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন "ত্রৈবার্ষিকী পাট্টার সময় নিরবিচ্ছিন্ন ভোগদখল ও সরকারী পাওনা যথাসময়ে জমা দেওয়া তার একটা অংশমাত্র ছিল। চুক্তিতে আরও একটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ ছিল যে এই সময়ের মধ্যে জমির কর্ষণ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটাতে হবে যাতে জমি থেকে আমাদের দাবীর একটা চিরস্থায়ী হার বেঁধে দেওয়া যায়। উন্নতির যে যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হলে এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ১৮০৩ ও ১৮০৫-এর প্রবিধানে তা উল্লেখ করা হয় নি এবং এমন কোন প্রবিধানও চোখে পড়ছে না যাতে এই লক্ষ্য নির্দিষ্ট হবে। এই প্রশ্নটি পুরোপুরি ভাবে ভবিষ্যৎ সরকারী বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত। এই প্রবিধানগুলির মধ্যেও এমন কিছুই নেই যাতে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।"

এই যুক্তি যদি সরল বিশ্বাসে ও সততার সঙ্গে দেখানো হত তবে কতগুলি বিকশিত জমিদারীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবিলম্বেই প্রবর্তিত হত, আর কতগুলিতে তা ব্যাহত হত। কিন্তু যুক্তিটি প্রতিশ্রুতি এড়াবার জন্য সুকৌশলে ব্যবহৃত হয়েছিল আর প্রতিশ্রুতি এড়ানোও গিয়েছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোন

জমিদারীতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয় নি কিংবা তারপর থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর করাই হয় নি।

লর্ড মিণ্টোর পর ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হন পরবর্তীকালের মারকুইশ অব হেষ্টিংস, লর্ড ময়রা। নেপাল যুদ্ধ, পিণ্ডারী যুদ্ধ, এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে যার ফলে বোম্বাই-এর অন্তর্ভুক্তি ঘটে সেই শেষ মারাঠা যুদ্ধের জন্ম লর্ড ময়রার শাসনকাল ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই সব বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যে লর্ড হেষ্টিংস উত্তর ভারতে বন্দোবস্তের প্রতি কিছু সময়ের জন্ম মনোযোগ দিতে পারেন নি।

১। Fifth Report. 1812. Pp, 45-48.

২। "লর্ড টেইনমাউথের সন্ধি অনুযায়ী ইতিমধ্যে উজির [আউধের নবাব] কর্তৃক যে ক্ষতিপূরণ (সাহায্য) প্রদত্ত হয়েছিল তার পরিমাণ ৭,৬০০,০০০ টাকা। অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনীর জন্য যে বাৎসরিক ব্যয়ের ভার তাঁর উপরে বর্তায় তা হল ৫,৪১২,৯২৯ টাকা। সর্বসমেত টাকার পরিমাণ হল ১৩,০১২,৯২৯ টাকা। নবাবকে ইংরেজদের হাতে চিরস্থায়ী সার্বভৌম অধিকার সহ এমন এক রাজ্যাংশ ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন হল যার রাজস্ব আয় এমন কি তার বর্তমান অনুৎপাদক অবস্থাতেও, এবং তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় উন্নতির কথা বাদ দিয়ে, রাজস্বের সংগ্রহের খরচ বাদ দিয়েও যার অঙ্ক হবে এই পরিমাণ। এই পরিমাণ বাদ দেওয়ার পর উজিরের যে রাজস্ব থাকবে তা হল ১০,০০০,০০০ টাকা। সুতরাং যে রাজ্যাংশ থেকে তাঁকে বঞ্চিত হতে হবে তা তাঁর সমগ্র রাজ্যের অর্ধেকেরও অধিক এবং দুই-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা বিশেষ কম নয়।...

"অপর দিকে যদি ব্যবস্থা দুঃখজনক কারণে তাঁর অনুমোদন লাভ না করে, তবে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী রাজ্যাংশ গ্রহণ এমন এক ব্যবস্থা যা প্রয়োজন হলে সামরিক শক্তির প্রয়োগেও নিতে হবে।"—Mill's *British India,* Book, VI. Chap. IX

লর্ড ওয়েলেসলীর শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত সরকারী দলিল (State Papers) দেখুন। অতীব সৌভাগ্যক্রমে আমি সেই চারখণ্ডের State Papers-এর অধিকারী হয়েছি যে খণ্ডগুলি ছিল লর্ড ওয়েলেসলীর নিজস্ব এবং যেগুলি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে বিক্রয় করে দেওয়া হয়েছিল। এই খণ্ডগুলিতে মারকুইসের নিজের হাতের টিপ্পনী ও দাগ দেওয়া আছে। তাঁর শান্তিপ্রিয় উত্তরসূরী কর্ণওয়ালিস ও বার্লে, যাঁরা তাঁর কোনো কোনো কাজের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, তাঁদের নীতি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলি বেশ মজার। তাঁদের সম্পর্কে মারকুইস যে টিপ্পনী করেছেন তার মধ্যে আছে, "most infamous", "an abrogation in itself iniquitous" ইত্যাদি।

৩। Paper 1 of Papers relating to East India Affairs, 1806 P 34 *et seq.*

৪। Regulation XXXV, of 1803.

৫ । Regulation XXV. of 1803.

৬ । Fifth Report, 1812, p. 51.

৭ । Regulation IX. of 1805.

৮ । Regulation X, of 1807.

৯ । Report dated 13th April 1808.

১০ । Colebrooke's Minute 1808.

১১ । Letter dated 15th September 1808.

১২ । Despatches of 1st February 1811 and 27th November 1811

১৩ । Letter dated 9th October 1812.

১৪ । Minute dated 11th July 1812.

১৫ । Letter dated 17th July 1813,

১৬ । Letter dated 16th March 1813.

একাদশ অধ্যায়

লর্ড হেস্টিংস ও উত্তর ভারতে মহলওয়ারি বন্দোবস্ত

(১৮১৫-১৮২২)

শেষ মারাঠা যুদ্ধের তখন অবসান হয়েছে; এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষতম পেশোয়া বন্দী হয়েছেন; লর্ড হেস্টিংস এই সময়ে ভারতে এক উপযুক্ত ভূমি-প্রশাসনের সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য হন। পিণ্ডারীদের বড় বড় দল বা মারাঠাদের সেনাবাহিনীর চেয়ে এ সমস্যা ছিল অনেক বেশি তুরূহ। রণক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী যখন বিশৃঙ্খল ভীড়কে সম্মুখে পায়, সে অবস্থায় দেশ বিজয় ও অন্তর্ভুক্তির কাজটি যথেষ্ট সহজসাধ্যই ছিল। কিন্তু এ রকম বিজয়ের কাহিনীই ভারতের ইতিহাস নয়; প্রশাসনের কাহিনী, নতুন শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের অবস্থার কাহিনীই দেশের প্রকৃত ইতিহাস।

স্যর এডওয়ার্ড কোলব্রুক ও মিঃ ট্রান্টকে নিয়ে গঠিত 'অধিকৃত ও অন্তর্ভুক্ত প্রদেশসমূহের (উত্তর ভারত) কমিশনার পর্ষৎ' বিভিন্ন জেলায়—মোরাদাবাদ বেরিলী, শাহজাহানপুর ও রোহিলখণ্ডে জমির বন্দোবস্ত সম্পর্কে তাঁদের বিবরণী পেশ করেন; এবং তাঁরা আরেকবার জোর দিয়ে বলেন, যে ভূমিবন্দোবস্ত করা হবে সেটা চিরস্থায়ী করা উচিত।

"বিচ্ছিন্ন ও বিজিত প্রদেশগুলির ব্যাপক জনসমষ্টি এত কাল উদ্বেগের সঙ্গে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রত্যাশা করেছে তার সুফলগুলিকে আরো বেশিদিন আটকে রাখলে ব্রিটিশ সরকারের দখলাধীন এই অঞ্চলে তার স্বার্থের পক্ষে বৃহত্তম ক্ষতি না-ঘটে পারেনা—আমাদের এই সুনিশ্চিত অভিমত উপস্থিত করা থেকে আমরা যদি নিবৃত্ত থাকি তবে সরকার আমাদের যে পদে অধিষ্ঠিত করেছেন, সেই পদের কর্তব্য আমরা পালন করব না।

"রাজকোষ সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যবস্থার সুবিধাগুলি সম্পর্কে কোনো আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হব না, যদিও আমরা সে-সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপেই সন্তুষ্ট; কারণ আমরা মনে করি উপরোক্ত তুটি নিয়ম জারি করার দ্বারা সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন; এবং যে নিয়মগুলি, আমরা যতদুর জানি, মহামান্য কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্ন নিয়ে পূর্ণ আলোচনার পর চালু করার ফলে তাকে এই দেশে তথা ইয়োরোপে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত ও নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্ত বলে বিবেচনা করা উচিত…

"সেই সঙ্গে আমরা পুনরায় ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে আমাদের এই প্রত্যয় ব্যক্ত করার স্বাধীনতা গ্রহণ করছি যে এই প্রদেশগুলির সর্বত্র বন্দোবস্তের এক সাধারণ চিরস্থায়িত্ব ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থাই ভূস্বামীদের প্রত্যাশা পূরণ করবে না, যে বন্দোবস্তের বনিয়াদ হবে, তাঁদের মতে, সরকারের এক পবিত্র প্রতিশ্রুতি।"[১]

তার পরের বছর, ১৮১৯ সাল, মিঃ ডাউডেসওয়েল দীর্ঘ ও কৃতিত্বপূর্ণ চাকরির পর ভারত থেকে অবসরগ্রহণের প্রাক্কালে একই বিষয়ে একটা 'মিনিট' নথিবদ্ধ করেন। এবং তাঁর বক্তব্যেও কোনো দোদুল্যমানতা ছিল না।

"আমার মতে, তাহলে অবস্থা এই যে জনসাধারণের বিরাট অংশের কাছে সরকার পরিবর্তনাতীতভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে উপরোক্ত সীমাবদ্ধ ব্যতিক্রম সহ, যথাক্রমে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ও বিজয়ের সময় থেকে হিসাব করে দশ বছর মেয়াদ শেষ হবার পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফলগুলিকে তাঁদের কাছে নিয়ে আসা হবে।…

"আমার পক্ষে এটা বেদনাদায়ক যে আমাকে এমন সমস্ত ঘটনা ও মতামত ব্যক্ত করতে হচ্ছে যেগুলি প্রধানত যাঁদের বিবেচনার জন্য তাঁদের কাছেই মুখরোচক হতে পারে না—তা আমি বুঝি; কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে মাননীয় কোর্ট (অব ডিরেক্টর্স), যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আমি একথা বলছি, তার প্রতি সুবিচার করবেন। আমার যদি বেছে নেবার অধিকার আছে বলে আমি মনে করতাম, তবে বর্তমানে আমি যে কর্তব্যে নিযুক্ত আছি তা থেকে স্বতঃই নিবৃত্ত হতাম। কিন্তু আমার মনোভাব প্রকাশকে অসাধারণ জরুরী মনে করি বলেই আমি তা নথীবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছি…

"প্রতিটি বিষয়েই সদুত্তর দেওয়া সম্ভব, যদি আমি দেখাতে পারি যে দেশের কৃষির উন্নতিবিধানে এবং সাধারণ সম্পদের কোনরূপ অস্বাভাবিক হানি না ঘটিয়েই বৃটিশের নাম ও ক্ষমতার প্রতি জনগণের সদ্ভাবকে দৃঢ় করার কাজে সরকারের স্বার্থের পক্ষে এই ব্যবস্থা অনুকূল হবে। আমার সন্দেহ নেই, যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির অংশ ইতিমধ্যেই চাষের আওতায় আসা জমির সঙ্গে পরস্পর বিজড়িত অবস্থায় আছে; অথবা, ভাষান্তরে পরগণা, মৌজা বা বন্দোবস্ত করা যায় এমন ভূসম্পত্তির অন্যান্য বিভাগের সীমার মধ্যে আছে, সেগুলিকে ক্রমে ক্রমে পুনরুদ্ধার করে তাঁদের জীবিকার উপায়কে উন্নত করতে পারলে ভূস্বামীরা সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হবেন; পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে দেখানো হয়েছে, বাকী অংশ থাকবে আইন মোতাবেক সরকারের অধিকারে।…

"অন্যদিকে, জমি যতখানি ভূমিরাজস্ব দিতে পারে ততখানি দেবার জন্য ক্রমে ক্রমে বন্দোবস্তের পাওনা বাড়িয়ে তোলা সরকারের পক্ষে আমি সুবিবেচনাপ্রসূত বা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক বলে মনে করি না।

"আমি এখন এই বিষয়টি পরিত্যাগ করছি, সম্ভবত চিরকালের জন্য। আমার পক্ষে এ কথা চিন্তাকরা একাধারে গর্ব ও সন্তোষের কারণ যে দেশের আভ্যন্তরিক শান্তি ও সুশৃঙ্খলার প্রতি আমার কিছু অবদান আছে; দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারের উন্নয়ন ও প্রয়োগের জন্য আমি আমার যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছি; এবং সাধারণ সম্পদের ব্যবস্থাপনায় আমার যে-অংশ ছিল তাতে সেই সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তাই, পরিধিটা যেহেতু ব্যাপক, সেই হেতু এই দেশ ছেড়ে যাবার আগে পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিষ্ঠা দেখে যেতে পারতাম, তবে আমার কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকত না।"[২]

এঁর চেয়েও বিশিষ্ট অফিসার, স্যার এডওয়ার্ড কোলব্রুক এদেশে বিয়াল্লিশ বছরের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের পর তখন ভারত ত্যাগ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এবং তিনিও, তাঁর অবসরগ্রহণের প্রাক্কালে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের ক্রমবর্ধমান দাবির বিরুদ্ধে দেশের জনগণের জন্য সম্পদের কিছু সম্ভাবনা এবং জমি থেকে কিছু ভবিষ্যৎ লাভের সম্ভাবনার ব্যবস্থা করার আরো একটি চেষ্টা করেছিলেন। ১৮২০ সালে নথীবদ্ধ তাঁর 'মিনিট'-এ তিনি এক বিবৃতি পেশ করেন; তাতে তিনি দেখান ১৮০৭ থেকে ১৮১৮ সাল এই বারো বছরে সমর্পিত ও অধিকৃত প্রদেশগুলির ভূমিরাজস্ব কিভাবে ক্রমাগত বেড়েছে; এবং তিনি ভূমি রাজস্বের দাবির প্রতিশ্রুতি সীমাবদ্ধতার সুপারিশ করেন, যার ফলে "ভূস্বামীরা তাদের উন্নত শ্রমের ফল" পাবে।[৩]

একই বছরে নথিবদ্ধ পরবর্তী একটি বিবরণীতে স্যার এডওয়ার্ড কোলব্রুক যাদের মধ্যে তিনি এতকাল থেকেছেন ভারতের সেই জনগণের সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করবার জন্য তাঁর শেষ সুপারিশটি করেন।

"যে দেশে আমি বিয়াল্লিশ বছর বাস করেছি এবং সেই ১৭৮০ সালের গোড়াতেই প্রয়াত ওয়ারেন হেস্টিংসের পক্ষপাতিত্বের ফলে আমাকে সরকারের পারস্য বিষয়ক সেক্রেটারি রূপে নিযুক্ত করায় যে কাজে আমি ১৮ বছর বয়স থেকে এক যোগ্য ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি, সেই দেশ এবং সেই কাজ চূড়ান্ত ভাবে ছেড়ে যাবার প্রাক্কালে আমি সত্যকার সন্তোষ অনুভব করব যদি আমার সরকারি অস্তিত্বের সর্বশেষ কাজের দ্বারা, ব্রিটিশ এলাকার যে অংশে একটি সক্রিয় জীবনের শেষ বারোটি বছর ব্যয়িত হয়েছে সেখানে এক সীমাবদ্ধ রাজস্ব

নির্ধারণের আশীর্বাদ নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমার অবদান রাখার গৌরব আমি পেতে পারি।...আমি অবশ্য একথা ভুলতে পারি না যে উক্ত প্রদেশগুলির ভূস্বামীদের সাধারণ চরিত্রের কাছেই আমার শ্রমের যাবতীয় সাফল্যের জন্য আমি ঋণী, এবং এই ব্যবস্থার শোভনতা সম্পর্কে আমার প্রত্যয় যদি আরো কম বলিষ্ঠ হত তাহলেও, সাধারণ কৃতজ্ঞতাবশেই এই প্রতিদান দেওয়া যেতে পারে।"

[নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি স্যর এডওয়ার্ড কোলব্রুকের বিবৃতি থেকে নেওয়া হয়েছে ; এতে দশ টাকাকে এক পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের সমান ধরা হয়েছে।]

অধিকৃত ও সমর্পিত প্রদেশসমূহ, উত্তর ভারত

বছর	ভূমি রাজস্ব	মোট রাজস্ব
	পাউণ্ড	পাউণ্ড
১৮০৭	২,০০৮,৯৫৫	২, ৬৫,৩৯৬
১৮০৮	২,০৪২,৩৪৭	২,৩০৪,০০৪
১৮০৯	২,২৫৪,৭৯১	২,৫৭৯,৯৪৯
১৮১০	২,৩৯২,৮৫২	২,৭৮২,৬৪৩
১৮১১	২,৪১৪.৭৩৭	২,৭৪১,৭২৮
১৮১২	২,২৭৪,৭০৯	২,৬৪৬,৮৫৮
১৮১৩	২,৫০৮,৬৮১	২,৯৩১,৯০৬
১৮১৪	২,৫০২,২২৩	২,৮১৫,৫৭৯
১৮১৫	২,৪৮৩,১৩৩	২,৮৯১,০৪৫
১৮১৬	২,৬৬৫,৬৬৭	৩,১৩০,৮৫৩
১৮১৭	২,৬২৬,৭৬১	২,৯২৬,৯২৩
১৮১৮	২,৮৯২,৭৮৯	৩,২৬২,৩৬৬

এই মনোভাব মহৎ হলেও ব্যর্থ হলো। ভারতীয় জনগণের অনুগত ও শান্তিপূর্ণ চরিত্র সরকারকে কখনোই তার নিজের আর্থিক দাবিগুলিকে কমাতে

উদ্বুদ্ধ করেনি; বরং এর বিপরীত ফল হয়েছে; ব্রিটিশ শাসন যে শান্তি ও নিরাপত্তা এনে দিয়েছিল তা সত্ত্বেও এবং জনগণের মিতব্যয়িতা ও শ্রম, তাদের জমির উচ্চমান ও উর্বরতা সত্ত্বেও জনগণ দরিদ্র ও সম্পদ শূন্য হয়ে পড়া পর্যন্ত সরকার তার দাবি বাড়িয়ে চলেছে।

বোর্ড অব কমিশনার্স, মিঃ ডাউডেসওয়েল ও স্যার এডওয়ার্ড কোলব্রুক, তথা মিঃ স্টুয়ার্ট, মিঃ অ্যাডাম ও মিঃ কেনডালের রিপোর্ট ও 'মিনিটস্'-এর বলে বলীয়ান হয়ে গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতিপ্রদত্ত এবং জনগণের সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের কাছে তাঁর চূড়ান্ত আবেদন করেন।

"আমাদের সর্ববাদিসম্মত অভিমত এই যে ভূমিরাজস্বের এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা—এক নির্দিষ্ট জমার নীতিতে অথবা এক নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় হারে নির্ধারিতব্য করের ভিত্তিতে—সমর্পিত ও বিজিত প্রদেশগুলিতে প্রসারিত করা উচিত।"[৪]

এক সাম্রাজ্যের মালিক, একটি ব্যবসায়িক কোম্পানির ডিরেক্টররা তখন এমন ভাবে এক কথায় লর্ড হেস্টিংসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, যা থেকে প্রকাশ পায় যে যেখানে তাঁদের আর্থিক স্বার্থ জড়িত সেখানে জনগণের সুখের জন্য তাঁদের চিন্তা প্রকৃতই কত কম ছিল।

"আমরা আবার আপনাকে সুনির্দিষ্ট ভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, 'ভূমিরাজস্বের এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা—এক নির্দিষ্ট জমার নীতিতে অথবা এক নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় হারে নির্ধারিতব্য করের ভিত্তিতে—সমর্পিত ও বিজিত প্রদেশগুলিতে প্রসারিত হওয়া উচিত'—এই মর্মে আপনারা যে সর্ববাদিসম্মত মতে উপনীত হয়েছেন বলে বলছেন, তাতে আমরা সম্মতি দিতে প্রস্তুত নই; এবং আমরা আমাদের এই বিভাগের ১৫ জানুয়ারী ১৮১৯ তারিখের চিঠির ৮৬তম অনুচ্ছেদে বর্ণিত ভূমি-রাজস্বের কোনোরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে পুনরাবৃত্তি করি; এবং আমরা চাই আপনি শুধু যে এরূপ কোনো বন্দোবস্ত করা থেকে বিরত থাকবেন তাই নয়, এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণেও বিরত থাকবেন যার ফলে এমন প্রত্যাশা জাগ্রত হতে পারে যে এরপরে চিরকালের জন্য একটা বন্দোবস্ত হবে।"[৫] এই ভাবে বিতর্কটি চল্লিশ বছরের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

বোর্ডের তৎকালীন সেক্রেটারি হোল্ট ম্যাকেনজি ইতিমধ্যে তাঁর বিখ্যাত ১৮১৯ সালের 'মিনিট' নথিবদ্ধ করেন। এতে তিনি উত্তর ভারতে গ্রাম-সমাজের

অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করেন এবং যেখানে তাদের অস্তিত্ব আছে সেখানে সুষ্ঠু সমীক্ষা ও অনুসন্ধানের পর এই সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটা বন্দোবস্তের সুপারিশ করেন।[৬] 'মিনিট'-এ বিভিন্ন জেলার পর্যালোচনা করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয় যে, গ্রামগুলি এখন জরিপ করা উচিত, অধিকারসংক্রান্ত নথি প্রস্তুত করা উচিত, এবং গ্রাম-সমাজগুলির প্রতিনিধিত্ব করানো উচিত মোড়লদের দিয়ে, যাদের নাম হবে 'লম্বরদার' অর্থাৎ রাষ্ট্রকে ভূমি-রাজস্ব প্রদানে বাধ্য ব্যক্তি হিসাবে কলেক্টরের রেজিস্টারে যাদের একটি 'নম্বর' আছে। এই পরামর্শও দেওয়া হয় যে কর নির্ধারণের হার বাড়ানোর বদলে বরং সমান করা উচিত; এবং রাজস্ব প্রদানকারীদের অধিকারের নিরাপত্তা পূর্বের মতোই থাকা উচিত।

১৮২১ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমস্ত চিন্তা পরিত্যক্ত হয়েছিল বলে, হোল্ট ম্যাকেঞ্জির 'মিনিট'কে বন্দোবস্তের ভিত্তি রূপে গ্রহণ করা হয়। চিন্তাটা এই ছিল যে যেখানে জমিদার আছেন, সেখানে তাঁদের সঙ্গে বন্দোবস্ত হবে, এবং যেখানে গ্রাম-সমাজ সাধারণ প্রজাবিলিতে জমির মালিক ছিলেন, সেখানে তাদের সঙ্গে। এবং এই বাসনা বিশেষভাবে প্রকাশ করা হয় যে ভূমিকর এক পরিমিত হারে নির্দিষ্ট করতে হবে। ১৮২২-এর সরকারি সিদ্ধান্তে এর উপরে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়।

"৮৭। বস্তুতই দেখা যায় যে প্রাচীন হিন্দু আইনে সার্বভৌম রাজাকে উৎপন্ন দ্রব্যের একটা নির্দিষ্ট ও পরিমিত অংশ দেওয়া হত। কিন্তু আমরা যদি সমকালীন হিন্দু নৃপতিদের কাজ থেকে প্রাচীন কালের কাজের বিচার করি তবে আপাতভাবে এটা অনুমান করা যায় যে চাষীদের কাছ থেকে আদায় করা প্রকৃত অর্থ কোনো-মতেই যৎসামান্য হারে সর্বদা সীমাবদ্ধ থাকত না...

"৮৮। মিঃ গ্র্যাণ্ট যেভাবে বর্ণনা করেছেন, মোগল ব্যবস্থাতেও এই একই কথা বলা যায়। তিনি বলেছেন যে সাধারণ অর্থের হার স্থির হত উৎপন্ন ফসলের এক চতুর্থাংশের গড় মূল্য-নিরূপণের সাহায্যে।...

"৯৩। মোটের উপর কাউন্সিল স্থিত মহামান্য লর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান যে আমরা যে সমস্ত দেশীয় সরকারের ক্ষমতায় এসেছি তারা যদিও প্রাচীন প্রথার প্রতি—এমন কি তাদের আর্থিক দাবি ঠিক করার ব্যাপারেও—যথেষ্ট গুরুত্ব দিত, এবং যদিও, বিশেষত পরবর্তী কালে, তারা এত দুর্বল ছিল যে যাকে তারা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য বলে মনে করত, তার সবগুলিকেই তারা বলবৎ করতে পারত না, তবুও (রায়তদের বিষয় আলোচনা করার সাধারণ দায়দায়িত্ব-

সাপেক্ষে) শাসক শক্তির দাবির হার নির্ধারণের অধিকার সম্পর্কে কখনো প্রশ্ন তোলা হয়নি…

"১০১। সরকারের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত দাবির বিরুদ্ধে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ প্রয়োজন ; কারণ এমন একটা বড় বিপদ সর্বদাই থাকতে পারে যেখানে আমরা যখন মনে করছি যে আমরা শুধু নীট খাজনার একটা অংশ মাত্র গ্রহণ করি, তখন আসলে আমরা শ্রমের ন্যায্য মজুরি ও মালের মুনাফার উপরে হস্তক্ষেপ করছি।…

"১২৯। চাষীদের প্রদেয় খাজনার হার যখন স্থির করা হয়, তখন মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপক ও অন্যান্যদের (জমিদারদের) প্রদেয় সুযোগ-সুবিধার প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণ করা দরকার, এবং সরকারের দাবীর সীমাবদ্ধতার ফলে উদ্ভূত নীট খাজনা ও মুনাফা কিভাবে এবং কোন আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে, তা নির্ধারণ করা দরকার…

"৩৭৩। কাউন্সিলস্থিত মহামান্য লর্ড অন্যান্য অবকাশে প্রাপ্ত এই সাক্ষ্য থেকে যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করেছেন যে দেশীয় রাজস্ব কর্মচারীদের নির্বেতন মর্যাদার প্রতি এক জীবন্ত আগ্রহ আছে। এই মনোভাবকে লালিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এবং যে কোনো শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে সরকারের কখনোই এমন ভ্রান্ত মিতব্যয়িতা প্রয়োগের ইচ্ছা থাকতে পারে না, যার ফলে ব্যাপক আস্থা ও দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসারদের সামনে দুটি বিকল্প দেখা দেয়—দারিদ্র্য অথবা অসম্মান।"[৭]

এই সিদ্ধান্তের তারিখের এক সপ্তাহ পরে ১৮২২ সালের ৭নং নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, তাতে "কটক, পটাশপুর ও তার অধীনস্থ অঞ্চলগুলি সহ সমর্পিত ও বিজিত প্রদেশগুলিতে যে-নীতি অনুযায়ী ভূমি-রাজস্বের বন্দোবস্ত এখন থেকে করা হবে, তা ঘোষণা করা" হয়।

বন্দোবস্তের সংশোধন করার কথা হয় একটি একটি করে বিভিন্ন গ্রামে ও ভূসম্পত্তির এলাকায় এবং ভারতীয় ভাষায় ভূসম্পত্তির এলাকাকে যেহেতু 'মহল' বলে, সেই জন্য উত্তর ভারতে যে-বন্দোবস্ত হয়, তা **মহলওয়ারি বন্দোবস্ত** নামে পরিচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত একথা পরিষ্কার না-হয় যে জমিদারদের মুনাফা রাজস্বের দাবির এক-পঞ্চমাংশকেও ছাড়িয়ে যায়, ততক্ষণ কোনো মহলেই রাজস্বের দাবি বাড়ানো হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে "বন্দোবস্ত এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে ভূস্বামীদের হাতে এবং পূর্বোক্ত অন্যান্যদের হাতে জমার (বা রাজস্বের দাবির) পরিমাণের ২০ শতাংশ নীট মুনাফা থাকে।" এই ভাবে ১২০০ পাউণ্ড

খাজনার একটি মহলে, রাষ্ট্রের দাবি বাড়ানো হবে ১০০০ পাউণ্ডে, যাতে জমিদারের হাতে থাকে ২০০ পাউণ্ড, যা রাষ্ট্রের দাবির এক-পঞ্চমাংশ। রাষ্ট্রের দাবি এই ভাবে হবে মহলগুলির খাজনার ৮৩ শতাংশের কিছু বেশি।

রাজস্ব সংগ্রাহকদের চাষীদের পাট্টা দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাদের প্রদেয় খাজনা নির্দিষ্ট করে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে জমির মালিকানা ভূস্বামীদের নয়, সাধারণ খাজনায় সব চাষীরাই যার মালিক, সেখানে রাষ্ট্রের দাবি খাজনার ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে অর্থাৎ "মালিকানা বাবদ ৫ শতাংশ অথবা সরকারের নির্ধারণ সাপেক্ষে অন্যূন ৫ শতাংশ অন্য কোন হারে বাদ দিয়ে" সমগ্র খাজনার পরিমাণ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে রাজস্ব সংগ্রাহককে গ্রামের জমি নতুন করে ভাগ করার ক্ষমতা, অথবা প্রতিটি চাষীর প্রদেয় রাষ্ট্রীয় দাবির আনুপাতিক হার ভাগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

রাজস্ব সংগ্রাহকরা জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে মামলা বিচার করার, তাদের মধ্যে হিসাবনিকাশ ঠিক করার এবং জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে জমি, খাজনা, ঠিকা ও নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় নিষ্পত্তি করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে পারতেন। কলেক্টরের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বোর্ডে এবং শেষ পর্যন্ত দেওয়ানি আদালতে নিয়মিত মামলার সাহায্যে আপীল করতে দেওয়া হত।[৮]

বৃটিশদের হাতে উত্তর ভারত সমর্পিত হবার অথবা তাদের দ্বারা বিজিত হবার ২০ বছর পরে পাশ হওয়া উত্তর ভারতের প্রথম সর্বাত্মক ভূমি আইন ছিল এইরূপ। এর ধারাগুলি সতর্কভাবে পরীক্ষা করলে এর ত্রুটিগুলি প্রকাশ পায়। রাজস্ব সংগ্রাহকের রায় ব্যতীত চাষীদের প্রদেয় খাজনার কোনো ন্যায়বিচারপূর্ণ মান এই আইনে স্থির করা হয়নি। খাজনার সামান্য ১৭ শতাংশ ছাড়া ভূস্বামীদের কোনো ন্যায়বিচারপূর্ণ মুনাফা স্থির করা হয়নি। "অতিরিক্ত চাহিদার বিরুদ্ধে রক্ষা করা" এবং "নীট খাজনার শুধু একটি অংশ নেবার" কথা ঘন ঘন ঘোষণার বিপরীতরূপে তা কার্যত দেশের সমস্ত খাজনাকে নিঃশেষে গ্রাস করেছে, জমিদার ও চাষীদের সমানভাবে দরিদ্র করে রেখেছে। এর ফলে সম্পদের সঞ্চয় এবং জনগণের বৈষয়িক অবস্থার কোনো উন্নতি অসম্ভব হয়েছে, এবং তা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের দাবির কোনো সীমা নির্দিষ্ট করেনি এবং স্বল্পকালীন প্রথম বন্দোবস্ত শেষ হয়ে যাবার পরে পৌনঃপুনিক বন্দোবস্তের কোনো সীমা নির্দিষ্ট করেনি।

এই ব্যবস্থা তার নিজস্ব কঠোরতার দরুনই শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে। শেষ পর্যন্ত, ১৮৩৩ সালে উত্তর ভারতের জনগণকে কিছুটা স্বস্তি দেন কোম্পানির গভর্ণর জেনারেলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম

বেণ্টিঙ্ক। ভবিষ্যতে আর একটি অধ্যায়ে আমরা ১৮৩৩ সালের জমির বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বর্ণনায় ফিরে আসব।

১। Report dated 27th October 1818.

২। Minute dated 7th October 1819,

৩। Minute dated 17th March 1820.

৪। Revenue Letter to the Court of Directors, signed by the Governor-General, Lord Hastings. and members of his Council Messrs, Stuart, Adam, and Fendall, dated 16th September 1820.

৫। Revenue Letter from the Court of Directors to the Governor-General in Council, dated Ist August 1821,

৬। Minute, dated Ist July 1819.

৭। Resolution of Government dated Ist August 1822.

৮। Regulation vii of 1822.

দ্বাদশ অধ্যায়

দক্ষিণ ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা (১৮০০ খৃঃ)

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা বঙ্গ, মাদ্রাজ ও উত্তর ভারতে জমি বন্দোবস্তের ইতিহাস আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে সর্বত্রই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভূমি রাজস্বের এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য চাপ দিয়েছিলেন। বঙ্গে ১৭৯৩ সালে এক চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত হয়, এবং তাকে বারাণসী পর্যন্ত প্রসারিত করা হয় ১৮৯৫ সালে। মাদ্রাজে এক চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত করা হয় উত্তরাঞ্চলের সরকারগুলিতে ও অন্যত্র, ১৮০২ ও ১৮০৫ সালের মধ্যে। কিন্তু তারপরে ডিরেক্টরদের নীতির পরিবর্তন ঘটে। টমাস মুনরো এক চিরস্থায়ী রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত সুপারিশ করেন, আর বোর্ড অব রেভিন্যু সুপারিশ করেন এক চিরস্থায়ী গ্রামীণ বন্দোবস্তের ; রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত করা হয়, কিন্তু তাকে চিরস্থায়ী ঘোষণা করা হয় না। উত্তর ভারতে লর্ড ওয়েলেসলী চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত সম্পন্ন করার জন্য ১৮০৩ ও ১৮০৫ সালে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেন, এবং লর্ড মুনরো ও লর্ড হেস্টিংস ডিরেক্টরদের এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য চাপ দেন। ডিরেক্টররা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এক মহলওয়ারি বন্দোবস্তের নির্দেশ দেন, সে-বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী নয়।

ভারতে বৃটিশ শাসনের দ্বিতীয় কালপর্বে ভারতে জমি বন্দোবস্তের এই হল ইতিহাস। বৃটিশ শাসকদের প্রথম প্রজন্ম—ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রজন্ম —কিছুই বন্দোবস্ত করেন নি ; তাঁরা জমির প্রশ্ন নিয়ে বিভ্রান্ত ছিলেন, এবং তাঁদের কঠোর ও চির-পরিবর্তনশীল পদ্ধতিগুলি শেষ হয় নিপীড়ন ও ব্যর্থতার মধ্যে। দ্বিতীয় প্রজন্ম—কর্ণওয়ালিস, ওয়েলেসলি ও লর্ড হেস্টিংসের প্রজন্ম—বঙ্গদেশ, বারাণসী ও উত্তরাঞ্চলের সরকারগুলিকে **চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত** প্রদান করেন ; মাদ্রাজে নবতর দখলি-এলাকাগুলিকে দেন **রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত, চিরস্থায়ী ঘোষণা না করে ;** উত্তর ভারতের বিচ্ছিন্ন ও বিজিত প্রদেশগুলিকে দেন **মহলয়ারি বন্দোবস্ত, চিরস্থায়ী নয়।**

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করার জন্য আমরা এখন আমাদের এই ইতিবৃত্তের মাঝখানে কিছুক্ষণ থামব। ভারতের জনসাধারণ কিভাবে জীবনধারণ করতেন, তাঁদের জমি চাষ করতেন

এবং তাঁদের শ্রমজাত শিল্পসামগ্রী তৈরী করতেন, পুরুষদের কী আয় ও মজুরি ছিল, মেয়েরা কোন কাজে নিযুক্ত হতেন—এগুলি কিছুটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। যুগে যুগে জনগণের বৈষয়িক অবস্থা অধ্যয়নের চাইতে অধিকতর কৌতুহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ পর্যালোচনা জাতিসমূহের ইতিহাসে আর কিছু নেই। এবং সৌভাগ্যবশত ভারতে বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রথম পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত অনুসন্ধানকারী ডাঃ ফ্রান্সিস বুকানানের অমূল্য রচনার মধ্যে আমরা ভারতের জনসাধারণের বৃত্তি ও কর্ম সংক্রান্ত কিছু বিশদ তথ্য পাই।

২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮০০ তারিখে ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি জনসাধারণের অবস্থা ও তাদের কৃষি ও পণ্য উৎপাদন সম্পর্কে অর্থ-নৈতিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকুরিরত মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ ফ্রান্সিস বুকানানকে নির্দেশ দেন। ডাঃ বুকানান মাদ্রাজ অঞ্চল থেকে ভ্রমণ শুরু করে কর্ণাটক, মহীশূর, কোয়েম্বাটুর, মালাবার ও কানাড়া পর্যন্ত যান এবং তাঁর সফরের রোজনামচা ও অনুসন্ধানের ফলাফল লণ্ডনে ১৮০৭ সালে তিন খণ্ড গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বর্তমান অধ্যায়ে ১৮০০ সালে দক্ষিণ ভারতের জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর এই গ্রন্থটি এখানে আমাদের নির্দেশিকার কাজ করবে। পরবর্তী কালে উত্তর ভারতে ডাঃ বুকানানের অনুসন্ধান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

মাদ্রাজের জাগীরসমূহ

২৩শে এপ্রিল, ১৮০০ তারিখে ডাঃ বুকানান তাঁর পরিসংখ্যানগত অনুসন্ধান-মূলক সফরে মাদ্রাজ ত্যাগ করেন। মাদ্রাজের একেবারে কাছাকাছি অঞ্চলে পতিত জমি ছিল সামান্যই, এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথেষ্ট হলে জমিতে ভালো ফসল ফলত। কতকগুলি স্থানে লোকেরা পুরনো পুকুর ও জলাধার থেকে তাদের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করত, এবং সমস্ত ক্ষেত ছিল ধানে পরিপূর্ণ। দানশীল ব্যক্তিরা ভ্রমণকারীদের বিনামূল্যে থাকার জন্য পথের পাশে চৌলট্রি বা সরাইখানা নির্মাণ করে রেখেছিলেন।

আরো এগিয়ে গিয়ে, পশ্চিমাভিমুখী পথটি গিয়েছিল যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে, যা "বর্তমানে নিরাভরণ," কিন্তু নারিকেল গাছের বাগিচার মধ্যে যেখানে উন্নতির কিছু চিহ্ন দেখা যায়। কোণ্ডাতুরুতে অঞ্চলটি এক ভিন্ন ও মনোরম রূপ পরিগ্রহ করে, এবং দক্ষিণ ভারত চিরকাল যে হিন্দু সেচ ব্যবস্থার জন্য বিখ্যাত, ডাঃ বুকানান

তার একটি প্রত্যক্ষ করেন। জমির দুটি স্বাভাবিক ঢলের মধ্যেকার ফাঁককে একটি কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে বন্ধ করে একটি বিরাট জলাধার তৈরী হয়েছে। সঞ্চিত জল রয়েছে দৈর্ঘ্যে সাত-আট মাইল ও প্রস্থে তিন মাইল জায়গা জুড়ে; সেই জল ছাড়া হচ্ছে অসংখ্য ছোট ছোট খালের মধ্যে দিয়ে, শুষ্ক ঋতুতে ক্ষেতে জলসেচের জন্য। বর্ষার সময় এই জলাধার নতুন করে ভর্তি হয় চির্ নদী থেকে; বিভিন্ন স্থানে বিশ-ত্রিশ ফিট চওড়া স্লুইস গেট; এই স্লুইসগুলি পাথর দিয়ে দৃঢ় করা হয়েছে, পাথরগুলি রাখা হয়েছে ঢালু অবস্থায়, যাতে বাড়তি জল বার করে দেওয়া যায়। এই জলাধারটি আঠারো মাসব্যাপী খরার সময়েও ৩২টি গ্রামের জমিতে জলসেচ করতে পারত। ডাঃ বুকানান লিখেছেন, "যে দেশে বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ হতে পারে, সেখানে এটির মতো জলাধারের মূল্য অপরিমেয়।

আরো পশ্চিমদিকে, কোণ্ডাটুরু ও শ্রীপারমাটুরুর মধ্যে গ্রামাঞ্চল ছিল দরিদ্র এবং কণ্টকাকীর্ণ ছোট ছোট ঝোপঝাড়ে পরিকীর্ণ। চাষবাস ছিল সামান্যই, এবং অধিকাংশ স্থানেই ফসল যা হত তাতে বীজের দাম পোষাত না। তবে জমিতে তালগাছ ও বুনো খেজুর গাছ জন্মাত প্রায় আপনা হতেই, এবং প্রথমোক্ত গাছ থেকে তাড়ি ও জাগরি নামক পানীয় উৎপন্ন হত।

শ্রীপরামাটুরুতে আরেকটি জলাধার ছিল। এই জলাধার দুই হাজার একরেরও বেশী সরেশ জমি-সমন্বিত গ্রামের খেতগুলিতে জলসেচ করত। এই স্থানটি ছাড়িয়ে জমি আবার ছিল নিষ্পত্র ও উষর এবং ডাঃ বুকানান প্রাচীন হিন্দু রাজধানী কাঞ্চি, বর্তমানে কঞ্জিভেরমে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত স্থানগুলিতে দেখলেন অতি যৎসামান্য চাষবাস।

কঞ্জিভেরমে ছিল বিশাল একটি প্রাচীন জলাধার। ধানের প্রচুর ফসলে-ভরা বহু ক্ষেতে এই জলাধার জলসেচ করত। নবাব মহম্মদ আলির দেওয়ানও একটি চমৎকার দিঘি তৈরী করেন। তার চারপাশে কাটা গ্রানাইট পাথরের সারি ধাপে ধাপে দিঘির তল পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। পুষ্করিণীগুলির পাশে পাশে যাত্রীদের জন্য আশ্রয়ের গ্রানাইট পাথরের চৌলট্রি বা সরাইখানাও নির্মিত হয়েছিল এবং তার স্তম্ভগুলির গায়ে বিশদভাবে খোদাই-করা কাজ ছিল।

কঞ্জিভেরম ছিল সুষ্ঠুভাবে নির্মিত এক বৃহৎ শহর। কিন্তু তা জনাকীর্ণ ছিল না। বহু বাড়ি খালি পড়ে ছিল, বাড়িগুলি ছিল মাত্র একতলা। সেগুলির হত মাটির দেওয়াল, তার চাল ছিল টালি দিয়ে ছাওয়া। বাড়িগুলি তৈরী ছিল চতুষ্কোণাকৃতিতে, মাঝখানে একটি উঠোন। পথগুলি ছিল প্রশস্ত ও পরিষ্কার, পথসন্ধিগুলি ছিল সমকোণের, এবং পথের দুপাশে ছিল সারি সারি নারকেল গাছ।

এখানকার অধিকাংশ ব্রাহ্মণই ছিলেন হয় শংকরাচার্য, না-হয় রামানুজাচার্যের অনুগামী। প্রথমজন ছিলেন নবম শতাব্দীর মানুষ, গোঁড়া বেদান্তবাদী, যাঁর মতে সমগ্র-বিশ্বই এক পরমাত্মায় লীন। শেষোক্তজন ছিলেন একাদশ শতাব্দীর মানুষ। ইনি ছিলেন অধিকতর জনপ্রিয় বেদান্তবাদী, ব্যক্তিগত ঈশ্বরবাদের প্রবক্তা। আধুনিক কালে, শঙ্করের মতবাদকে প্রায়শই শিব-তন্ত্রের সঙ্গে এক করে দেখা হয় আর রামানুজের মতবাদ বিষ্ণু-তন্ত্রের সঙ্গে মিশে যায়।

কঞ্জিভেরম ছেড়ে আসার পর ডাঃ বুকানান মাদ্রাজের জাগীরের সর্বশেষ গ্রাম দামেরলুতে আসার আগে পর্যন্ত আবার দেখতে পান যে গ্রামাঞ্চল মরুভূমির মতোই। পালার নদী থেকে আসা একটি খাল দামেরলু ও ওউলুর-এর মধ্যে প্রচুর মূল্যবান ধানী জমিতে জলসেচ করত। ওউলুরের জমি ভালো ছিল বটে, কিন্তু তা ছিল শুধু শুষ্ক শস্যের উপযোগী। মাঠের মাঝে মাঝে ছিল ঝোপ-ঝাড় ও গাছপালা।

মোটের উপর, অর্ধশতাব্দীকাল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দখলাধীন মাদ্রাজের জাগীরটি সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল না। ঘনঘন যুদ্ধবিগ্রহ, অতিরিক্ত জমিকর এবং সম্ভাব্য স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজ থেকে রাজস্বকে কোম্পানির লগ্নী-ক্রয়ের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাবার ফলে দেশ হয়ে পড়েছিল দরিদ্র, জনসংখ্যাও ছিল কম। কোণ্ডাটুরুতে কলেক্টর মিঃ প্লেস তাঁর প্রশাসন কালে পুরনো জলাধারটি মেরামত করেছিলেন এবং জমি-কর যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু ঐ স্থানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল জলসেচহীন, অকর্ষিত ও অতি কম জনবসতিবিশিষ্ট—ডাঃ বুকানানের ভাষায় "মরুভূমি"।

কর্ণাটক

ডাঃ বুকানান যখন ঐ দেশের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছিলেন, তখন পর্যন্ত লর্ড ওয়েলেসলি কর্ণাটক দখল করেননি, তাই তখনও পর্যন্ত তা ছিল নামত আরকটের নবাবের অধীনে, যদিও কার্যত তা ছিল কোম্পানির কর্মচারীদের প্রশাসনাধীনে।

আরকট যাবার পথে ডাঃ বুকানান কাবেরী-পাক নামে আরেকটি চমৎকার প্রাচীন হিন্দু জলাধার দেখতে পান। জলাধারটি "প্রায় আট মাইল লম্বা ও তিন মাইল চওড়া, এবং তা ঐ দেশের বিস্তৃত অঞ্চলে জলসেচ করে। এত সন্তোষের সঙ্গে কোনো জন-পূর্তকর্ম আগে আমি কখনো দেখিনি; এক বিরাট জনসমষ্টি তার বৈষয়িক অবস্থা অনুযায়ী যতটা স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারে, এটি তাদের সেই সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যই যোগায়।"

কাবেরী-পাক থেকে আরকট যাবার পথের অবস্থা খারাপ ছিল, চাকা-লাগানো কোনো যানের পক্ষে তা আদৌ উপযুক্ত ছিল না। লোকে অবশ্য গোরুর গাড়িতে যাতায়াত করত এবং মুসলমান নারীরা সাদা চাদরে শরীর ঢেকে মাঝে মাঝে বলদের পিঠে চেপে যাতায়াত করত। আরকট শহরটি ছিল বিস্তৃত, সেখানে মোটা সুতির কাপড় তৈরী হত। বাড়িগুলি ছিল মাদ্রাজ জাগিরের অন্যান্য শহরের মতোই। আশেপাশের ছোট পাহাড়গুলি পত্রশূন্য ছিল, সেগুলি ছিল দ্রুত ক্ষীয়মান গ্রানাইট পাথরে তৈরী। আরকট ও পশ্চিম পর্বতমালার মধ্যেকার গ্রামাঞ্চলে কিছু ভালো জমি ছিল, যেগুলিতে বাগান করা যেত এবং শুষ্ক শস্য ফলানো যেত। আবার অন্য জমি ছিল একেবারে ঊষর।

আরকট থেকে ভেলোর, এবং ভেলোর থেকে পালিগোণ্ডা পর্যন্ত পশ্চিমাভিমুখী পথটি ছিল পালার নদী বরাবর, এবং গ্রামাঞ্চলটি ছিল উর্বর ও তৃণশ্যামল। ভেলোরের দুর্গটি ছিল বিশাল ও মনোরম, শহরটিও ছিল বিরাট, হিন্দু কায়দায় তৈরী। পথের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি অবশ্য ছিল দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত, তার কতকগুলি ছিল বিধ্বস্ত। পালিগোণ্ডার লোকেরা পালার নদী থেকে জল সংগ্রহ করত বালির মধ্যে ছ-সাত ফুট গভীর খাল খনন করে। তারপর সেই জলকে অন্যান্য খালের সাহায্যে ক্ষেতে জলসেচের জন্য চালিয়ে দেওয়া হত। এই ভাবে ভেলোর উপত্যকাকে কর্নাটক অঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দর গ্রামাঞ্চলে পরিণত করা হয়েছিল।

বড়ামহল

ডাঃ বুকানান এর পরে পূর্ব-ঘাট পর্বতমালায় আরোহণ করেন এবং ৪ঠা মে তারিখে বড়ামহলের ভেঙ্কটগিরিতে এসে পৌছান। কয়েক বছর আগে টমাস মুনরো এই অঞ্চলে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন, এবং এখানকার উঁচু নিচু জমি দেখে ডাঃ বুকানানের ইংলণ্ডের কথা মনে পড়েছিল। তিনি যতদূর বুঝতে পেরেছিলেন, দেশের অর্ধেক অঞ্চলে চাষবাস হত, বাকি অংশটি ছিল ঝোপ-ঝাড়ে আবৃত জমি, গোচারণ ভূমি হিসেবে তা ব্যবহার হত। লোহা গলানো হত আকরিক লোহা ও কালো বালি থেকে, এবং দেশের বহু অংশেই সাধারণ লবন পাওয়া যেত। জমি ছিল লোহার মর্চে ধরা রক্তাভ রঙের মাটিতে তৈরী, তার সঙ্গে মেশানো ছিল স্ফটিক ও গ্রানাইট পাথর। সহর ও গ্রামের কুটিরগুলির দেয়াল তৈরী হত এই কাদামাটি দিয়ে এবং সাদা ও লাল রঙের চওড়া খাড়াখাড়ি দাগ দিয়ে তার গায়ে আঁকা হত এবং তাকে মসৃণ করা হত। কোনো কোনো জায়গায় বাড়িগুলির সমতল ছাতও এই কাদা দিয়ে তৈরী।

পূর্ব মহীশূর

ডাঃ বুকানান এরপর প্রবেশ করেন মহীশূরের রাজার এলাকায়। পূর্ববর্তী বছরে টিপু সুলতানের পতনের পর লর্ড ওয়েলেসলি-কর্তৃক ইনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ডাঃ বুকানান দেখতে পান ওয়ালুরু একটি বড় শহর, সেখানে সপ্তাহে একবার মেলা বসে; সেখানে মোটা সুতিবস্ত্র তৈরী হয়, এবং তার অনেকটাই রপ্তানি হয়। আশপাশের গ্রামগুলিতেও 'কম্‌লি' নামে পরিচিত মোটা কম্বল প্রচুর তৈরি হয়। কর্ষণযোগ্য জমির সাত-দশমাংশ, এবং সম্ভবত তার কুড়িভাগের এক ভাগ ছিল সেচযুক্ত। পেন্নার নদীর দুই তীরে ধান হত। মাঠে সার দিত মেয়েরা। তারা ঝুড়িতে করে এই সার নিয়ে আসত এবং জমি চাষ করানো হত মহিষ ও ষাঁড় দিয়ে।

১০ মে তারিখে ডাঃ বুকানান এসে পৌছন বাঙ্গালোরে। বাঙ্গালোর শহর নির্মাণ করেছিলেন হায়দার আলি সীমান্তের দুর্গ হিসাবে, মুসলমান সামরিক স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ শৈলী অনুসরণে। তাঁর পুত্র টিপু সুলতান তা ধ্বংস করে দেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন বৃটিশ ফৌজের শৌর্যের বিরুদ্ধে তা আদৌ কার্যকর নয়। বাগানগুলি ছিল বিস্তৃত এবং চতুষ্কোণ অংশে বিভক্ত, সাইপ্রেস ও আঙুর গাছ সেখানকার জলবায়ুতে প্রচুর পরিমাণে হত, আপেল ও পীচ গাছে ফল হত এবং উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে আনা কিছু পাইন ও ওক গাছের চারা তখন সুপুষ্ট হয়ে বড় হয়ে উঠছিল। বাঙ্গালোরের কাছাকাছি অঞ্চলে কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ মোট জমির চার-দশমাংশের বেশি ছিল না। পূর্বে চাষের অধীন ক্ষুদ্র আনুপাতিক হারে সেচযুক্ত জমি, সাম্প্রতিক যুদ্ধের সময়ে জলাধারগুলির প্রতি অবহেলার দরুন, প্রধানত ছিল পতিত জমি। টিপু সুলতান হায়দার আলির কাছ থেকে এই রাজ্য পেয়েছিলেন সুসমৃদ্ধ অবস্থায়। ডাঃ বুকানানকে সকলেই হায়দার আলি সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসাসূচক ভাষায় বলেছিলেন। কিন্তু টিপু সুলতানের অত্যাচার অথবা যুদ্ধ প্রচুর দুঃখ দুর্দশা ডেকে এনেছিল এবং চাষীদের দশভাগের চার ভাগকে তাদের ঘরবাড়ি ও দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল।

১৮ মে তারিখে ডাঃ বুকানান মহীশূরের রাজার তৎকালীন রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টমে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেন। তার পরের দিন তিনি বিখ্যাত হিন্দু মন্ত্রী পুর্ণিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পুর্ণিয়ার প্রশাসন জেনারেল ওয়েলেসলির (পরে ডিউক অব ওয়েলিংটন) এবং ভারতস্থ অন্য যে সমস্ত ইংরাজ তাঁর [illegible] প্রশংসা লাভ করেছে। টিপুর অধীনেও

পূর্ণিয়া যথেষ্ট কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন, এবং টিপু যদি তাঁর উপদেশ শুনতেন তবে তাঁকে হয়তো তিনি বাঁচাতেও পারতেন। টিপুর পতনের পর, কার্যত তিনিই হন নতুন রাজার অধীনে মহীশূরের শাসক।

টিপু সুলতানের অধীনে শ্রীরঙ্গপট্টমের জনসংখ্যা ছিল সম্ভবত ১৫০,০০০; যুদ্ধের ফলে সেই শ্রীরঙ্গপট্টম তখন এক মর্মান্তিক দুরবস্থায় পতিত, সেখানে তখন বড় জোর ৩২০০০-এর কিছু বেশি মানুষের বাস। কাবেরী নদীর উত্তর তীরের জেলাটির নাম ছিল পট্টন-অষ্টগ্রাম, আর দক্ষিণ তীরের জেলাটির নাম ছিল মহাসুর অষ্টগ্রাম। এই অঞ্চলটি নদীর দুই তীরে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে উঠেছে, জমি ছিল স্বাভাবিক ভাবেই উর্বর, এখানে সেচ হত ব্যাপক খালের ব্যবস্থার সাহায্যে, মধ্যবর্তী স্থানগুলিতে জলসেচ করার জন্য এই খাল থেকে শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে গিয়েছিল। কাবেরী নদীর জল বাঁধ দিয়ে ও খাল কেটে জোর করে নিয়ে আসা হত এই সমস্ত খালের উৎসমুখে। বাঁধগুলি তৈরি হত বহুব্যয়ে, বড় বড় গ্রানাইট পাথরের চাঙরের সাহায্যে। এই সমস্ত দরকারি ও মহৎ কাজ হায়দার আলি করেছিলেন, না তাঁর পূর্ববর্তী হিন্দু রাজারা নির্মাণ করেছিলেন সে কথা ডাঃ বুকানান আমাদের বলেন নি। কিন্তু টিপু সুলতানের যুদ্ধগুলির সময়ে প্রচুর ক্ষতি হয়; মন্দির, গ্রাম ও বাঁধগুলি ভেঙে পরে খালগুলির মুখ বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ণিয়ার প্রশাসনাধীনে অবশ্য কৃষি ও নানা শিল্প পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। "সব কিছুতেই পুনরুদ্ধারের একটা ছাপ দেখা যায়। গ্রামগুলি নতুন করে গড়ে উঠেছে, খালগুলি পরিষ্কার হচ্ছে, এবং কৃষ্ণসারমৃগ ও বনরক্ষীর জায়গায় আমরা দেখছি শান্ত বলদ তার প্রয়োজনীয় শ্রমে ফিরে আসছে।"[১]

মহীশূরে ফসল তোলা ও ধান-সংরক্ষণের পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ফসল কাটার এক সপ্তাহ আগে ধানক্ষেত থেকে জল বাইরে ছেড়ে দেওয়া হয়, তারপর ধান কাটা হয় জমি থেকে প্রায় চার ইঞ্চি উপর থেকে, এবং ধানের শীষ ভিতরের দিকে করে গাদা করা হয়। এক সপ্তাহ বাদে সেগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয় শস্য-মাড়ানোর জায়গায় এবং বলদের সাহায্যে তা মাড়াই হয়। তারপর তা ৬০ কণ্ডুক বা ৩৩৪ বুশেল করে এক একটি গাদায় রাখা হয়। প্রতিটি গাদাই মাটির চিহ্ন দিয়ে খড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। এই ভাবে রেখে দেওয়া হয় বিশ-ত্রিশ দিন, যতক্ষণ পর্যন্ত চাষী ও সরকারের মধ্যে বাঁটোয়ারা না-হয়। তারপর চাষীরা তাঁদের অংশ বিভিন্ন উপায়ে মজুত রাখতেন। কেউ রাখতেন শক্ত পাথুরে জমিতে প্রায় ২৪ ফুট গভীর সংকীর্ণ খাদ তৈরী করে; তার মেঝে, দেয়াল ও ছাদ ঢাকা থাকত খড়ে, এবং প্রতিটি খাদে থাকত ৮৪ থেকে ১৬৮ বুশেল

ধান। কেউ বা তা রাখত গুদাম ঘরে, তার মেঝে শক্তভাবে বাঁধানো থাকত কাঠের তক্তা দিয়ে। অন্যেরা আবার রাখত মাটির তৈরী সিলিণ্ডারের মত পাত্রে, তার মুখটা ঢাকা থাকত উল্টো করে বসানো একটি পাত্র দিয়ে এবং দরকার হলে তলার ফুটো দিয়ে চাল বার করে আনা হত। সবশেষে, কিছু চাষী তাঁদের চাল রাখতেন খড়ের তৈরী এক ধরনের থলের মধ্যে। শ্রীরঙ্গপত্তনমের কাছে ধান ছাড়াও ফলানো হত মুগ, তিল এবং আখ। শুক্ক ক্ষেতগুলিতে 'রাগি'র চাষ হত ব্যাপকভাবে এবং সেটাই নিম্নশ্রেণীর মানুষকে তাদের খাদ্য যোগাত ; এর পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শুষ্ক শস্য ছিল জোয়ার এবং বজরা।

শ্রীরঙ্গপত্তনমের কাছে প্রতিটি খামার হত সাধারণত দুটি অথবা তিনটি লাঙল নিয়ে। একটি লাঙল ছিল অতি দরিদ্রদশার পরিচায়ক, আর চারটি কি পাঁচটি লাঙলের মালিক ছিলেন বেশ বড় চাষী। পাঁচটি লাঙল দিয়ে একজন প্রায় ১২½ একর আর্দ্র জমি এবং ২৫ একর শুষ্ক জমি চাষ করতেন। সম্পন্ন কৃষক অথবা চাষীকে তার জমি থেকে বিতাড়িত করা হত না "যতদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রচলিত খাজনা দিতেন। এমন কি টিপুর শাসন কালেও, এ ধরনের কাজকে দেখা হত বিস্ময়কর এক ক্ষতি বলে।" অপর পক্ষে খাজনা-প্রাপক সরকার "খাল ও জলাশয়গুলিকে মেরামত রাখতে বাধ্য থাকতেন।"[২] শ্রীরঙ্গপত্তনমের কাছে ক্ষেত মজুরদের মজুরি ছিল মাসিক ৬ শিলিং ৮½ পেন্স, আর শহর থেকে দূরে মজুরি ছিল মাসিক ৫ শিলিং ৪ পেন্স। নারীরা প্রায়শই মাঠে কাজ করত এবং মাথায় ঝুড়িতে করে সার বহন করত। সাধারণত তাদের পরিচ্ছদ ভালো থাকত, এবং তাদের চেহারা ছিল সৌষ্ঠবপূর্ণ। ডাঃ বুকানান বলেছেন, "এমন কি সে দেশের শ্রমজীবী মেয়েদের মধ্যেও প্রায়শই যে-সৌষ্ঠব দেখা যায়, তার চেয়ে ভালো চেহারা আমি কখনো দেখিনি। বিশেষ করে তাদের ঘাড় এবং বাহু উল্লেখযোগ্য ভাবে সুগঠিত।"[৩]

৬ জুন তারিখে ডাঃ বুকানান বাঙ্গালোর প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীরঙ্গপত্তনম ত্যাগ করেন। মুণ্ডিয়ামে তিনি দেখতে পান যে সেখানকার ধানী জমি সম্পূর্ণভাবে পুষ্করিণী ও জলাধার থেকে সেচ করা হয়েছে। মাদুরুতে তিনি এক বিশাল জলাধার দেখেন। কথিত আছে সাতশো বছর আগে বিষ্ণুবর্ধন রায় এটি নির্মাণ করেন। একটি বাঁধ ও একটি খালের সাহায্যে এই জলাধারটি নিকটবর্তী নদী থেকে জল পায় ; এবং এটি যখন উপযুক্ত মেরামত করা অবস্থায় থাকে তখন তার পারের উচ্চতার চেয়ে নীচু নিকটবর্তী সমস্ত জমিকে সারা বছর ধরে জল সেচ করতে পারে। পূর্বে জয়দেব রায় নামক এক পলিগার পরিবারের বাসস্থান,

চিনাপট্টমে ব্যাপক উৎপাদন হত কাঁচ ও অলঙ্কৃত আংটি, বাদ্যযন্ত্রের জন্য ইস্পাতের তার, বিশুদ্ধ শাদা চিনি এবং অন্যান্য বহু সামগ্রী। পথিমধ্যে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল রামগিরি। কিন্তু ১৭৯২ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিসের মহীশূর আক্রমণের পর এই স্থানটি প্রচণ্ড কষ্টভোগ করেছে এবং এখানকার অধিবাসীদের একটি বিরাট অংশ অনাহারে ধ্বংস হয়েছে। মাগদিতে পথটি চলে গিয়েছিল ছোট ছোট পাহাড় এবং শুষ্ক শস্যের চাষে ভরা উপত্যকায় তৈরী এক বন্য ও সুন্দর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে। সাবনদুর্গ-র কাছে মূল্যবান কাঠ ও বাঁশ জন্মাত। লর্ড কর্ণওয়ালিস এই স্থানটিকে আক্রমণ করে দখল করেছিলেন, কিন্তু তার পর থেকে জায়গাটি পরিত্যক্ত। নিকটবর্তী পাহাড়গুলিতে লোহা গলানো হত এবং গৃহস্থালির উপকরণ তৈরী করার জন্য সেগুলিকে বারংবার ঢালাই-পেটাই এবং বিশুদ্ধ করা হত; ইস্পাত তৈরী হত অস্ত্রশস্ত্রের জন্য। আশপাশের এলাকায় চন্দন কাঠ ও অতি মূল্যবান কাঠ উৎপন্ন হত। যে-বিখ্যাত রঞ্জন সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের অন্যতম সুবিদিত পণ্য ছিল, তার জন্য লাক্ষা কীট পালন করা হত। ২১ জুন তারিখে ডাঃ বুকানান বাঙ্গালোরে গিয়ে পৌছন।

হায়দার আলির অধীনে বাঙ্গালোরে বিরাট ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিস্তীর্ণ পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। টিপু সুলতান নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে নিজামের রাজ্য এবং কর্নাটকের সঙ্গে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করেন, এবং তার ফলে বাঙ্গালোরের বাণিজ্য নিম্নগামী হয়; কিন্তু হিন্দু বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর স্থানটি গুরুত্বের দিক দিয়ে আবার উন্নত হচ্ছিল। পুণার বণিকরা কাশ্মীর থেকে আনতেন শাল, জাফ্রান আর কস্তুরী এবং সুরাট থেকে মণিমুক্তা; বারহানপুরের বণিকরা আমদানি করতেন রঙিন ছিট কাপড় ও সোনার লেস, কাপড় ও সুতো; নিজামের রাজ্যগুলি থেকে আসত' সোনা ও রূপার ফুলের কাজ-করা লাল সুতিবস্ত্র, নুন, টিন, সীসা, তামা ও ইয়োরোপীয় মাল আসত কর্নাটক থেকে। বাঙ্গালোর থেকে রপ্তানি-করা পণ্য ছিল প্রধানত সুপারি, চন্দন কাঠ, গোলমরিচ, এলাচ ও তেঁতুল। কম্বল ও সুতি-পশমও প্রচুর পরিমাণে আমদানি করা হত।

মালপত্র লেনদেন হত গবাদি পশুর উপর বোঝাই করে। এক বছরে আমদানি হয়েছিল ১৫০০ বলদ-বোঝাই তুলার-পাঁজ, ৫০ বলদ-বোঝাই সুতো, ২৩০ বলদ-বোঝাই কাঁচা রেশম, ৭০০০ বলদ-বোঝাই নুন এবং ৩০০ বলদ-বোঝাই বিদেশী পণ্য; আর রপ্তানি হয়েছিল ৪০০০ বলদ-বোঝাই সুপারি ও ৪০০ বলদ-বোঝাই গোলমরিচ। তাঁতিরা ঘরোয়া ব্যবহারের জন্য কাপড় তৈরী করত, এবং রেশম-তাঁতীরা বর্ণাঢ্য মজবুত কাপড় তৈরী করত। রেশমের কাপড়কে লাল রঙে

রাঙানো হত লাক্ষা দিয়ে, অথবা কমলা রঙে রাঙানো হত কাপিলি-পোড়ি দিয়ে, কিংবা হলুদ রঙ করা হত হলুদ দিয়ে। যে সমস্ত কারিগর রেশমের পাড় বসানো সুতিবস্ত্র তৈরী করত, তারা দিনে ৮পেন্স রোজগার করত, এবং যারা রেশমবস্ত্র তৈরী করত তারা রোজগার করত দিনে ৬পেন্স। তাঁতিরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অগ্রিম পেত, এবং তাদের তৈরী পণ্য বিক্রি করত ব্যবসায়ীদের কাছে, না হয় ব্যক্তিগত ক্রেতাদের কাছে, কখনও সাধারণ বাজারে বয়ে নিয়ে যেত না। নানা ধরনের সাদা মসলিন-তৈরী হত, বিক্রিও হত যথেষ্ট। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সব জাতের মেয়েরা সাপ্তাহিক বাজার থেকে তুলোর পাঁজ কিনত এবং ঘরে বসে তা থেকে সুতো তৈরী করে তাঁতিদের কাছে বিক্রি করত। এই ভাবে সকল শ্রেণীর মানুষ—স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই সুতো কাটা ও তাঁতের কাজ লাভজনক পেশা ছিল।

রঙ করার কাজে নীল প্রচুর ব্যবহৃত হত; চামড়ার ট্যানিং লাভজনক শিল্প ছিল; রেড়ীর তেল, নারকেল তেল, তিল তেল ও অন্য নানা ধরনের তেল প্রচুর তৈরী করা হত এবং বিক্রি হত।

বাঙ্গালোরের কাছে একটি গ্রামে ডাঃ বুকানানকে জানানো হয় যে চাষীরা যাতে খাজনা দিতে পারে সেজন্য বণিকরা তাদের অগ্রিম দাদন দিত, এবং পরে সেই অগ্রিম ও তার সুদ বাবদ ফসলের অর্ধেক পেলেই সন্তুষ্ট হত। একটি গ্রাম-সমাজে ফসল ভাগের যে-ব্যবস্থা ডাঃ বুকানান বর্ণনা করেছেন তা কৌতূহলোদ্দীপক। গড়ে কুড়ি কণ্ডুক বা ২৪০০ সেরের (প্রায় ৪৮০০ পাউণ্ড) এক-পাঁজা শস্য ভাগ করা হত এই ভাবে:

	সের
গ্রামের পুরোহিত	৫
গ্রামের দাতব্য কারণে	৫
গ্রামের গণৎকার	১
গ্রামের ব্রাহ্মণ	১
গ্রামের নাপিত	২
গ্রামের কুমোর	২
গ্রামের কামার	২
গ্রামের ধোপা	২
গ্রামের ওজনদার	৪
গ্রামের চৌকিদার	৭

	সের
গ্রামের মোড়ল	৮
গ্রামের ওজনরক্ষক	১০
গ্রামের প্রহরী	১০
গ্রামের হিসাবরক্ষক	৪৫
গ্রামের মোড়ল	৪৫
সেচ ব্যবস্থা রক্ষী	২০
	১৬৯

এই ভাবে ক্ষেতের ফসলের ৫¾ শতাংশ দিয়ে গ্রামবাসীদের জন্য নাপিত, কুমোর, কামার, পুরোহিত ও গণৎকারের পেশাদারি কাজের ব্যবস্থা করা হত। অবশিষ্ট অংশ থেকে দেশমুখ বা জমিদার নিতেন ১০ শতাংশ; এবং বাকিটা সমানভাবে ভাগ করা হত সরকার ও চাষীর মধ্যে। হায়দার আলি যখন দেশমুখদের উচ্ছেদ করেন, তখন তিনি তাঁদের প্রাপ্য ভাগও সরকারের জন্য দাবি করেছিলেন।[৪]

উত্তর মহীশূর

৩ জুলাই তারিখে বাঙ্গালোর পরিত্যাগ করে ডাঃ বুকানান মহীশূরের উত্তর অংশের মধ্য দিয়ে ঘোরাপথে দীর্ঘ সফর করেন। কোলারের চারপাশের গ্রামে তিনি দেখেছেন যে সেখানকার জমিতে জল সেচ হয় সম্পূর্ণরূপে জালাধারগুলির সাহায্যে। এই সব জলাধার প্রায়শই ব্যক্তিবিশেষের তৈরী। আর বৃহত্তর জলাধারগুলি তৈরী হয়েছিল সরকারী ব্যয়ে। প্রাচীন আইনপুস্তকে নির্ধারিত পুরনো হিন্দু রাজস্ব-হার ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠমাংশ অথবা এক-অষ্টমাংশ অথবা এক-দ্বাদশাংশ; আর দক্ষিণ ভারতের শাসক ও সামন্ত প্রভুরা যখন উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশের মতো বিরাট ভাগ দাবি করতেন, তখন তাঁরা চাষের কাজকে সম্ভব করতেন নিজ ব্যয়ে বিরাট বিরাট সেচ-ব্যবস্থা খনন করে এবং সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে। তাঁরা তাঁদের অংশ নিতেন ফসলে, অর্থে নয়।

কোলারের আর্দ্র জমিতে ফলানো হত ধান, আখ, পান ও শাক-সব্জী, এবং উৎপন্ন ধানের পরিমাণ ছিল শুষ্ক ফসল জোয়ারের প্রায় সমান। পোস্ত বা আফিম গাছের চাষও প্রচুর করা হত—আফিম তৈরীর জন্য এবং মিষ্টি পিঠায় ব্যবহৃত পোস্তদানার জন্য। উৎপন্ন গমের পরিমাণ ছিল ধানের প্রায় অর্ধেক। খামারের ভৃত্যরা পেত বছরে ২৯¾ বুশেল শস্য ও ১৩ শিলিং ৫ পেন্স করে;

এবং দিন-মজুরের মজুরির হার ছিল পুরুষদের জন্য ৩ পেন্স, মেয়েদের জন্য ২ পেন্স।

টিপু সুলতানের স্বৈরাচারী শাসন ও ঘন ঘন যুদ্ধের দরুন কোলার ও সিলাগুট্টা উভয়ই প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল; কিন্তু টিপুর পতনের পর সেখানে পুনরুজ্জীবন ঘটছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তৈরী পণ্য ছিল বিভিন্ন ধরনের সুতিবস্ত্র। আরো পশ্চিমদিকে গিয়ে, ডাঃ বুকানান এসে পৌছন বিখ্যাত নন্দী-দুর্গায়। এরই নিকটবর্তী অঞ্চলে মাথা তুলে আছে উত্তর পেন্নার, পালার ও দক্ষিণ পেন্নার পাহাড়। এই পাহাড়গুলির ওপারের গ্রামাঞ্চল ছিল জনহীন; আগে যেসব জমিতে চাষ হত, তার এক-তৃতীয়াংশ তখন পতিত এবং লর্ড কর্ণওয়ালিসের আক্রমণের পর থেকেই গ্রামগুলি পরিত্যক্ত। লোকেরা বলত তারা পাঁচটি বিরাট দুর্দৈবে ভুগেছে—অনাবৃষ্টি, তিনটি হানাদার সেনাবাহিনী এবং মহীশূরের প্রতিরক্ষামূলক সেনাবাহিনী!

১৮ জুলাই তারিখে ডাঃ বুকানান এসে পৌছন বিখ্যাত বালাপুরায়। ষোড়শ শতাব্দীতে বিজয়নগর রাজ্যের ভাঙনের পর বালাপুরা তার পলিগার নারায়ণ স্বামীর শাসনাধীনে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য রাজ্যটি মোঘল ও মারাঠা শক্তির, নিজাম ও হায়দার আলির ক্ষমতাধীনে চলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত যায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু বংশের প্রশাসনাধীনে। বালাপুরা আমদানি করত রঙিন ছিট কাপড় ও মসলিন, রপ্তানি করত চিনি।

আরো পশ্চিমে ছিল মধুগিরি। বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর এটিও এক স্বাধীন পলিগারের শাসনকেন্দ্র ছিল, কিন্তু তারপরে তা চলে এসেছে মহীশূরের শাসনাধীনে। হায়দার আলি পাহাড়টির দুর্গব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিলেন এবং তাকে এক শত তাঁতি পরিবার বিশিষ্ট বড় একটি বাজারে পরিণত করেছিলেন। টিপু সুলতানের অধীনে স্থানটির অবনতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয় মারাঠা ও লর্ড কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে মহীশূরের যুদ্ধে। ডাঃ বুকানান যখন এখানে যান তখন এখানে ধান ও জোয়ার, আখ, গম, তুলা, ডাল, তিল ও নানা ধরনের রান্নার শাকসব্জি ফলানো হত। জোয়ার চাষের উপযোগী শুষ্ক জমির জন্য খাজনা দিতে হত একর প্রতি ১ শিলিং ১ পেন্স থেকে ৩ শিলিং ৪ পেন্স। সেচ যুক্ত হলে দিতে হত একর প্রতি ৯ থেকে ১১ শিলিং। চাষীর জমির উপরে অধিকার ছিল, এবং কয়েক বছর অনুপস্থিত থাকার পরেও সেই জমি পুনরায় দাবি করতে পারত। ইতিমধ্যে যদি সাময়িক ইজারাদার কোনো উন্নয়ন করে থাকে, তবে আসল চাষীকে তার জন্য খরচ দিতে হত। একজন পুরুষ মজুর আয় করত

মাসে ৪ শিলিং, একজন নারী শ্রমিক করত ৩ শিলিং ৪ পেন্স। অনাবৃষ্টির জন্য এই অঞ্চলে প্রায়শই অভাব দেখা দিত বটে কিন্তু প্রাণহানি ঘটাবার মতো দুর্ভিক্ষ দেখা দিত না বললেই চলে। "যখন অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ যুক্ত হয়, এবং শস্যের চালানকে ব্যাহত করে, তখনই দুর্ভিক্ষ তার সমস্ত ভয়াবহতা নিয়ে দেখা দেয়। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আক্রমণের সময়ে তা যত ভয়ানক ভাবে এখানে অনুভূত হয়েছিল, তেমনটি আর কখনো হয়নি; তখন চারিদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে, এবং সব দিক থেকে শত্রু সৈন্যবাহিনী কিংবা সামান্য কিছু কম ধ্বংসাত্মক প্রতিরক্ষামূলক সেনাবাহিনী প্রবেশ করার ফলে, সেখানকার অন্তত অর্ধেক অধিবাসীর চরম অভাবে মৃত্যু ঘটেছে।"[৫]

৩১ জুলাই তারিখে ডাঃ বুকানান গিয়ে পৌছন সিরা শহরে। মোঘলদের অধীনে শহরটি ছিল বিরাট ও সমৃদ্ধিশালী। সেখানে ৫০,০০০ বাসগৃহ ছিল, এবং সুতরাং তার জনসংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষ। তার পর শহরটি যায় হায়দার আলির শাসনাধীনে এবং শহরটি ধ্বংস হয় মারাঠা আক্রমণ ও টিপু সুলতানের অত্যাচারে। এখানকার প্রধান উৎপন্ন ফসল ছিল ধান ও বজরা, গম ও আখ, ডাল ও তুলো। খাজনা দেওয়া হত কখনো অর্থে, কখনো ফসলের ভাগে। সিরায় আমদানি করা হত সুপারি, গোলমরিচ, চন্দনকাঠ ও মশলাপাতি, এবং রপ্তানি করা হত কম্বল, কাপড়, তেল, মাখন, আদা ও নারকেল। প্রধান তৈরী-পণ্যের মধ্যে ছিল পাতলা অমসৃণ মসলিন ও কয়েক ধরনের মোটা কাপড়।

কিছু দূরে মধুগিরিতে গিয়ে ডাঃ বুকানান সেখানকার বিখ্যাত গবাদি পশু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং দেখতে পান যে সেই পার্বত্য এলাকার প্রতিটি শহর ও গ্রামেই ভালো জাতের গবাদি পশুর পাল আছে। গোয়ালারা বসবাস করত জঙ্গলের প্রান্তে, অল্প জমি চাষ করত এবং তাদের ডেয়ারি জাত পণ্য শহরে বিক্রি করত। প্রত্যেক পরিবার সরকারকে, কিংবা বরং বলা যায় বেণি-চবেদি বা মাখন-অফিসারকে বছরে চার শিলিং কর দিত এবং বেণি-চবেদি সরকারকে দিত বার্ষিক রাজস্ব। মধুগিরিতে এবং নিকটবর্তী বহু গ্রামেই লোহা গলানো হত এবং ইস্পাত তৈরী করা হত।

আরো দক্ষিণে গিয়ে ডাঃ বুকানান তাভিনা-কারেতে জমির সুকর্ষিত অবস্থা দেখেন, কিন্তু তুমকুরুতে প্রচুর পতিত জমি দেখতে পান। সমস্ত গ্রামই সুরক্ষিত ছিল। এখানে প্রধানত রাগির চাষ হত, কিন্তু বহু ধানক্ষেতও ছিল। আরো দক্ষিণে গুবি নামক স্থানটি ছিল কিছুটা গুরুত্বসম্পন্ন বাজার। এখানে ১৫৪টি

দোকান ছিল, সপ্তাহে একবার হাট বসত। এই বাজারে চার পাশের এলাকা থেকে আসা সাদা ও রঙিন দু-ধরনেরই মোটা সুতিবস্ত্র, কম্বল, চট, সুপারি, নারকেল, তেঁতুল, খাদ্যশস্য, লাক্ষা, লোহা ও ইস্পাত বিক্রি হত।

ডোরা-গুডাতে ছিল লৌহখনি, এবং তানিভা-কারে ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, তার বহির্ভাগ ও অন্তর্ভাগে ছিল দুর্গ এবং উন্মুক্ত উপকণ্ঠ অঞ্চলে ছিল ৭০০টি বাড়ি। স্থানটি ইতিপূর্বে ছিল এক ক্ষমতাবান পলিগার পরিবারের; তাদেরই একজন তৈরী করেছিলেন চারটি মন্দির এবং জমির সেচের জন্য চারটি বড় বড় জলাধার। চারপাশের গ্রামাঞ্চল একদা সম্পূর্ণরূপে কর্ষিত হত, কিন্তু পরশুরাম ভাওয়ের অধীনে মারাঠা-আক্রমণের পর থেকে স্থানটি জনহীন। আরো দক্ষিণে ছিল বেলুরু। সেখানে ছিল উন্নতধরনের প্রচুর ধানের জমি, সেই সঙ্গে চমৎকার একটি জলাধার। উত্তরে বেলুরু এবং দক্ষিণে শ্রীরঙ্গপট্টনমের মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চলটি—দূরত্ব সোজাসুজি চল্লিশ মাইল—১৭৯২ সালে কর্ণওয়ালিসের আক্রমণের সময়ে পতিত হয়ে থাকে এবং টিপু সুলতান লোকেদের জোর করে খোলা গ্রামাঞ্চল ছেড়ে বনে চলে যেতে বাধ্য করেন। সেখানে তাঁরা কুঁড়ে ঘরে বাস করতেন এবং তাঁদের সাধ্যমতো খাদ্যাদি সংগ্রহ করতেন। এদের একটা বড় অংশের মৃত্যু হয় অনাহারে এবং ডাঃ বুকানান যখন সেখানে যান, সেই ১৮০০ সালেও সেখানকার অর্ধাংশেই শুধু জনবসতি ছিল।

বেলুরুর অদূরেই ছিল নাগ-মঙ্গলা জেলা। এখানে প্রত্যেক গৌড় বা গ্রামের মোড়ল তাঁর গ্রামকে আংশিকভাবে খাজনায় দিতেন এবং আংশিক-ভাবে সরকারি তহবিলের জন্য ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। চাষীদের জমির উপরে একটি নির্দিষ্ট মালিকানা ছিল, এবং যতদিন পর্যন্ত তারা পুরনো হার অনুযায়ী খাজনা দিত ততদিন তাদের মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করা যেত না। ধানী জমির খাজনা উঠত ফসল ভাগের মধ্য দিয়ে আর শুষ্ক জমির খাজনা দিতে হত অর্থে।

শ্রীরঙ্গপত্তনমের প্রায় পনেরো মাইল উত্তরে ছিল মেইল-কোটে। স্থানটি অবস্থিত ছিল উঁচু এক পাহাড়ে। সেখান থেকে সুন্দর ভাবে দেখা যেত দক্ষিণে কাবেরীর উপত্যকা ও মহীশূরের পর্বতমালা, দক্ষিণে 'ঘাট' এবং পূর্বদিকে সাভন-দুর্গা ও শিব-গঙ্গা। এটি ছিল হিন্দুদের এক বিখ্যাত পূজার স্থান। সেখানে স্তম্ভশ্রেণীতে ঘেরা বিশালাকার একটি মন্দির ছিল; এবং বিরাট সুন্দর পুষ্করিণীটির চারপাশে ছিল তীর্থযাত্রীদের বাসস্থানের ব্যবস্থার জন্য বহু আবাসগৃহ। কথিত আছে যে টিপু সুলতান পর্যন্ত এই মন্দিরের রত্নরাজি গ্রাস করতে ভয়

পেতেন ; এই রত্ন রাখা ছিল শ্রীরঙ্গপত্তনমের কোষাগারে ; এবং বৃটিশ সৈন্যবাহিনী যখন উক্ত রাজধানী দখল করে তখন তারাও তাতে হাত দেয়নি।

মেইল-কোটের দক্ষিণে তোন্নুরুতে ডাঃ বুকানান যাদব-নদীর চমৎকার জলাধারটি দেখেন। একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ধর্মসংস্কারক রামানুজ এটির নির্মাতা বলে কথিত আছে। "পাহাড় থেকে নেমে আসা দুটি জলধারা এখানে মিলিত হয়েছে, এবং দুটি পাথুরে পাহাড়ের মধ্যেকার একটি ফাঁকের ভিতর দিয়ে সবলে পথ করে নিয়েছে। রামানুজ একটি ঢিবির সাহায্যে এই ফাঁকটি বন্ধ করেন। কথিত আছে এই ঢিবির বাঁধটি ছিল উচ্চতায় ৭৮ হাত, দৈর্ঘ্য ১৫০ হাত এবং ভিতের দিকে ২৫০ হাত পুরু। প্রয়োজনাতিরিক্ত জল বার করে দেওয়া হয় একটি খালের সাহায্যে। খালটি একটি পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বহু পরিশ্রমে কাটা হয়েছে ; এর দৈর্ঘ্য এমন যাতে তিন-চার মাইল বিস্তৃত নিচু সমতল ভূমির বেশির ভাগ স্থানই জল পেতে পারে। জলাধারটি যখন পূর্ণ থাকে, তখন তাতে যে-পরিমাণ জল থাকে তা দিয়ে চাষীদের দু বছর জল সরবরাহ করা যায়।"[৬]

১ সেপ্টেম্বর তারিখে ডাঃ বুকানান শ্রীরঙ্গপত্তনমে প্রত্যাবর্তন করেন।

দক্ষিণ মহীশূর

৫ সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীরঙ্গপত্তনম ত্যাগ করে ডাঃ বুকানান মহীশূরের দক্ষিণাংশের মধ্য দিয়ে সফর করেন। সাম্প্রতিক যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত পালহাল্লির কাছে তিনি কাবেরী নদী থেকে দুটি খাল দেখতে পান। এই খাল দুটি মহাসুর-অষ্টগ্রাম্ জেলসেচ করত। এর একটা খালে ছিল চমৎকার স্রোতধারা। এটি কখনোই সম্পূর্ণ শুষ্ক হত না ; এবং এর সাহায্যে চাষীরা শুষ্ক ঋতুতেও ধান ফলাতে পারত।

কাবেরীর একটি শাখা নদী লক্ষণ-তীর্থর উৎপত্তিস্থল কুর্গ পাহাড়। গ্রামাঞ্চলে জলসেচের জন্য এই নদী থেকে ছ-টি খাল তৈরী করা হয়েছিল, এবং খালে জল পাঠাবার জন্য তৈরী বাঁধগুলিও ছিল চমৎকার, সেগুলি সুন্দর জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছিল। এই সমস্ত খালের সাহায্যে পূর্বে সেচপ্রাপ্ত সমগ্র জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৮০০০ একর।

এই সব অঞ্চলে পুরুষানুক্রমিক কোনো গৌড় বা গ্রাম-প্রধান ছিল না ; যারা খাজনায় জমি দিত তারাই রাজস্ব আদায় করত এবং পুরনো মহীশূর রাজাদের দ্বারা প্রবর্তিত প্রথা অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারের চেয়ে বেশি তারা চাষীদের কাছ থেকে

নিতে পারত না। হায়দার আলি নিযুক্ত করেছিলেন হরকরা বা ভূমি-রাজস্ব তত্ত্বাবধায়কদের ; খাজনায় যারা জমি খাটাত, এঁরা তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতেন এবং জনসাধারণের অভিযোগ শুনতেন। টিপু সুলতান হরকরাদের উচ্ছেদ করেন, তার ফলে জনসাধারণ নিপীড়িত হন এবং সরকার হন প্রবঞ্চিত।

আরো পশ্চিমে, গ্রামাঞ্চল জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল প্রথমে ১৭৬১ সালে বাজী রাও ও তার মারাঠা বাহিনীর আক্রমণে, এবং তারপরে ১৭৯২ সালে কর্ণওয়ালিসের আক্রমণে। ইংরেজী মানচিত্রগুলিতে যাকে 'পেরিয়াপাতম' নামে অভিহিত করা হয়েছে সেই প্রিয়-পত্তন প্রাচীন কালে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি ছিল নন্দীরাজ নামে এক পলিগার পরিবারের। উত্তরে কাবেরী নদী এবং পশ্চিমে কুর্গ সীমান্ত—এই সীমানাবিশিষ্ট অঞ্চলটির মালিক ছিলেন এই পরিবার। এখান থেকে কুর্গের রাজা বছরে ৯৩৬১ পাউণ্ড রাজস্ব পেতেন। কথিত আছে যে আনুমানিক ১৬৪০ সাল নাগাদ এই পরিবারের একজন পলিগার রাজপুত্র মহীশূরের বিরুদ্ধে শৌর্যের সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করেন এবং আর প্রতিরোধ করা অসম্ভব বুঝতে পেরে তাঁর পরিবারস্থ নারী ও শিশুদের হত্যা করে শত্রুদের মধ্যে তরবারি হাতে প্রাণ বিসর্জন দেন। এর পরেও প্রিয়-পত্তন ছিল কুর্গ ও মহীশূরের মধ্যে বহু সীমান্ত-যুদ্ধের ক্ষেত্র। টিপু সুলতান যখন কুর্গ অধিকার করেন তখন প্রিয়-পত্তন কষ্টভোগ করে এবং বৃটিশের সঙ্গে টিপুর যুদ্ধের পর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। ডাঃ বুকানান লিখেছেন, "ব্যাঘ্র এখানকার ধ্বংসাবশেষের সব কিছুর অধীশ্বর হয়েছে, কয়েকদিন আগেও যে-ঘোড়াটি রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেটি নিহত হয়েছে ; এমনকি বেলা দ্বিপ্রহরেও একাকী কোনো ব্যক্তির এখানে প্রবেশ বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়। আমার পিছনে বহু লোক আসছিল, তাদের মতে কোনো একটি মন্দিরেও প্রবেশ করা আমার পক্ষে অবিবেচকের কাজ; কারণ মন্দিরগুলি দিনের উত্তাপের হাত থেকে বাঘেদের আশ্রয়স্থল স্বরূপ ছিল।"[৭]

প্রিয়-পত্তনের নিকটবর্তী সমস্ত সিক্ত জমিতে জলাধারগুলি থেকে সম্পূর্ণভাবে জলসেচ করা হত, কিন্তু জেলার দক্ষিণাংশে চাষীদের জন্য সেচের জল যোগাত লক্ষ্মণ-তীর্থ নদী থেকে বার হওয়া খালগুলি। এই জেলায় ফলানো হত হাইমু বা সিক্ত জমির ধান, করু বা শুষ্ক জমির ধান, আখ, জোয়ার, ঘোড়ার খাদ্য চানা, ডাল, তিল ও অন্যান্য ফসল। ক্ষেত মজুররা পেত দিনে একবার খোরাকি সহ বছরে ১ পাউণ্ড থেকে ১ পাউণ্ড ৭ শিলিং ; এবং মেয়ে মজুররা পেত দিনে দুবার

দুটি লাঙল, এবং অপেক্ষাকৃত ধনী চাষীর পনেরোটি! যার দুটি লাঙল থাকত তার প্রায়শই থাকত চল্লিশটি বলদ ও পঞ্চাশটি গাই, ছ-সাতটি মহিষ এবং একশো ভেড়া বা ছাগল। সিক্ত জমির উৎপন্ন ফসল গ্রামের প্রাপ্য প্রদানের পর সমানভাবে ভাগ হত সরকার ও চাষীর মধ্যে। যুদ্ধের আগে বহু বিস্তীর্ণ এলাকায় তালগাছের বাগান ছিল, গোচারণ ভূমিও উৎকৃষ্ট ছিল। জঙ্গলের প্রান্তে চন্দন গাছ জন্মাত।

প্রিয়-পত্তমের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, হানাগোড়ুর কাছে ডাঃ বুকানান লক্ষণতীর্থ নদীর একটি বাঁধ দেখেছিলেন। "খালের মধ্য দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে যাওয়া সংকীর্ণ শৈলশিরাগুলির সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এবং ফাঁকগুলি ভরাট করার জন্য তার মধ্যে পাথর দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্তটা মিলে এখন একটি চমৎকার বাঁধ হয়েছে, তার উপর দিয়ে ছুটে চলেছে প্রায় ১০০ ফিট দীর্ঘ ও ১৪ ফিট উঁচু জলধারা, তৃণশ্যামল ও বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত এই অঞ্চলে যাকে অসাধারণ সুন্দর দেখায়। এই বাঁধটি থেকে খাল বেরিয়ে গেছে পূর্বদিকে···সেচযুক্ত জমির আয়তন হবে প্রায় ২৬৭৮ একর।"[৮]

হানাগোড়ুর দক্ষিণ-পূর্বদিকে ছিল হেগোড়ু দেব-এর পুরনো রাজ্যসীমা। কথিত আছে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি এই অঞ্চলটি পরিষ্কার করেন এবং জনবসতি স্থাপন করেন। হায়দার আলির সময় পর্যন্ত এই শহরে ছিল এক হাজার বাড়ি; ডাঃ বুকানান যখন সেখানে যান তখন ছিল মাত্র আশিটি। এই জেলা চন্দনকাঠের জন্য বিখ্যাত ছিল, আর আরো কিছু পূর্ব দিকে মোটা-বেটা বিখ্যাত ছিল তার সমৃদ্ধ আকরিক লৌহের জন্য।

১ অক্টোবর তারিখে ডাঃ বুকানান কাবেরীর একটি উপনদী কাম্পিনি নদীর তীরে তাইউরুতে গিয়ে পৌঁছন। এই জেলার কতকগুলি গ্রামে গৌড়রা বা গ্রাম-প্রধানরা ছিলেন পুরুষানুক্রমিক এবং সরকার ও জনসাধারণ উভয়েই নিছক যারা খাজনায় জমি খাটাত তাদের চেয়ে এঁদেরই বেশি পছন্দ করতেন। খাজনায় যারা জমি খাটাত তারাও গৌড় নামেই অভিহিত হত। পুরুষানুক্রমিক গৌড়রা চাষীদের সঙ্গে অধিকতর পরিচিত ছিলেন, তাঁদের তাঁরা হাসিমুখে মান্য করতেন এবং পরিশোধের নির্দিষ্ট হারে তাঁদের খাজনা পোষাবার জন্য মহাজনদের কাছে অপেক্ষাকৃত সহজে তাঁরা ঋণ পেতেন। খাজনা দিতে না-পারলে সরকারী হিসাব-রক্ষক ফসল বাজেয়াপ্ত করতেন। খাজনা হিসাবে সংগৃহীত ফসলের সরকারের অংশ বিক্রি করাও হিসাবরক্ষকের কাজ ছিল। তাইউরু ও নরসিংপুর উভয় স্থানের গ্রামাঞ্চল ছিল সুন্দর, প্রতিটি ক্ষেত ছিল গুল্মের বেড়া দিয়ে ঘেরা ও সুকর্ষিত। সমস্তটাই ছিল উঁচু জমি, কিন্তু ধানী জমি নয়।

নরসিংহপুর ছিল কাবেরী নদীর তীরে। সেখানে ছিল দুটি মন্দির ও প্রায় দু-শো বাড়ি। এর কাছেই ছিল উর্বর কৃষ্ণমৃত্তিকার জমি, সেখানে বিস্তীর্ণভাবে তুলোর চাষ হত। গম ও ওমুন ফলানো হত সমপরিমাণে এবং জোয়ার ফলানো হত তার চাষের উপযোগী লাল জমিতে।

কয়েম্বাটুর

অক্টোবরের গোড়ার দিকে ডাঃ বুকানান মহীশূর ত্যাগ করেন এবং কয়েম্বাটুর যাবার পথে বৃটিশ শাসিত অঞ্চলে প্রবেশ করেন। কোলেগালা জেলায় ভালো চাষবাস হত, সেখানে সেচের জন্য ছিল ৪০-৫০টি জলাধার। মহীশূরের কর্তৃপক্ষ আশি বছর আগে এগুলি মেরামত করেছিলেন এবং জেলাটি কোম্পানির দখলে আসার পর কতকগুলি জলাধারকে কোম্পানির কর্মচারীরা পুনরায় মেরামত করেছিলেন। এখনও মেরামত না-করা ক্ষয়প্রাপ্ত জলাধারগুলি জমির ভিতর দিয়ে যাবার সময়ে ডাঃ বুকানান সেখানকার জমিকে সম্পূর্ণরূপে পতিত অবস্থায় দেখেছেন। বোঝা যায় এই অঞ্চলে চাষের কাজ সেচের উপরে কতখানি নির্ভর করত। কলেক্টর মেজর ম্যাকলিয়ড গৌড়দের বা গ্রাম-প্রধানদের কর্তৃত্ব বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং শুধু চাষীদের কাছ থেকে ভূমি-রাজস্ব আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট বেতনে তাঁদের নিযুক্ত করেছিলেন। সন্দেহ নেই, এই কর্মনীতি ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়েছিল, কিন্তু তা ভারতের প্রাচীন গ্রাম-ব্যবস্থাকে দুর্বল করেছিল।

গঙ্গানা-চুকির সুন্দর জলপ্রপাত ও শিবন-সমুদ্রের দ্বীপ ডাঃ বুকানানকে চমৎকৃত করে বিরাচুকির দক্ষিণের প্রপাতটি বিশেষভাবে তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি শুনলেন, শিবন-সমুদ্র রাজ্যটি ১২০০ খৃস্টাব্দে গঙ্গা রাজা প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য তাঁর মতে তারিখটি ১৫১৩ হওয়ারই বেশী সম্ভাবনা। তিনজন রাজপুতের শাসনের পর প্রতিবেশী রাজাদের যুগ্ম আক্রমণে এই রাজত্বের পতন ঘটে।

কোলেগালা ও সাতেগালার নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল ছিল এর ঠিক পশ্চিমে, সেখানে পূর্ব-ঘাট পর্বতমালার উচ্চতা ছিল গ্রামাঞ্চলের উচ্চতর অংশের স্তর থেকে ২০০০ ফুট। পাল্লিয়া পর্যন্ত জমি সুকর্ষিত ছিল কিন্তু তারপর থেকে অর্ধেকেরও বেশী জমি ছিল অকর্ষিত এবং পুকুরগুলির ছিল জীর্ণদশা। আরো পূর্বদিকে গিয়ে ঘাট অঞ্চলে ডাঃ বুকানান প্রবেশ করেন মাথুলির পার্বত্য পথে এবং পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ঘুরে ঘুরে গিয়ে পৌঁছন কাবেরী নদীতীরের কাবেরীপুরা নামক স্থানে। সেখানকার গিরিপথ রক্ষার জন্য সীমান্তের একজন পলিগার সেখানে [illegible] দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন।

কাবেরীপুরায় একটি পুরনো সেচের জন্য ব্যবহৃত জলাধার ছিল। এখান থেকে ৫০০ একরেরও বেশী জমিতে জলসেচ হত ; কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে এটি বিদীর্ণ হয়ে যায়, এবং তারপর সেটিকে আর কখনো মেরামত করা হয়নি। কাবেরীপুরা দিয়ে সেই অঞ্চলের উঁচু ও নিচু অংশের মধ্যে যথেষ্ট বাণিজ্য চলত। ডাঃ বুকানান প্রতিদিনই চল্লিশ পঞ্চাশটি করে মালবাহী গোরু-মহিষ দেখতে পেয়েছেন। কাবেরীর উপনদী তুম্বুলার গতিপথ বরাবর পাঁচটি পুরনো জলাধার ছিল। এর সবকটিই পঞ্চাশ বছর আগে ফেটে গেছে, তা আর মেরামত করা হয়নি।

আগেই বলা হয়েছে, কোম্পানির শাসনে গ্রাম প্রধানদের বাতিল করা হয়েছিল এবং মেজর ম্যাকলিয়ডের অধীনে এই গ্রামাঞ্চল ভূমি-রাজস্ব দিত বছরে ১০,২৯৩ পাউণ্ড থেকে ১৬,৫৪৫ পাউণ্ড। এই রাজস্ব আদায় করা হত বেতনভুক তহসিলদারদের মারফৎ ; তাঁরা একাধারে রাজস্ব সংগ্রাহক, দেওয়ানি ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিসের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ক্ষেতমজুররা চাষীদের কাছ থেকে মজুরিবাবদ বছরে ৫ শিলিং থেকে ৬ শিলিং ৮ পেন্স, বাসস্থান, মাসে বুশেলের ১⅔ অংশ শস্য ; তাদের স্ত্রীরা কর্মক্ষম হলে দৈনিকমজুরী পেত। পার্বত্য অঞ্চলে চাষ-আবাদের যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হত, তার তুলনায় সমতলভূমিতে ব্যবহৃত উপকরণ-গুলির অবস্থা ছিল শোচনীয় এবং সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম।

১৯ অক্টোবর তারিখে ডাঃ বুকানান এসে পৌছান ভবানী নদীর পারে নল-রায়ন নামক স্থানে। তিনি এখানে এসে পৌছান এমন এক অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যার তিন-চতুর্থাংশই তাঁর পতিত জমি বলে মনে হয়েছিল। ভবানী নদীর একটি বাঁধ থেকে নদীর দুপাশেই একটি করে খাল বেরিয়ে এসেছিল। এই দুটি খালের জলে সেচযুক্ত সামান্য কিছু জমিতে দুবার ফসল হত, কিন্তু জল-সরবরাহ অনিশ্চিত ছিল। কোম্পানির শাসনে, চাষীরা যে-জমি চাষ করতেন তার পুরো খাজনা তাঁদের দিতে হত, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ যাই হোক না কেন। একে তাঁরা কষ্টসাধ্য বলে মনে করতেন, এবং আগেকার মতো ব্যবস্থা চাইতেন।

আনা-কোদাবরীতে ধান ফলানো হত ভবানী নদী থেকে টানা খালের সাহায্যে জল-সেচ দেওয়া জমিতে। বাঁধটি একশো কুড়ি বছর আগে নূনজয় রাজা নির্মাণ করেছিলেন। যে সব জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা ছিল না, তার এক-ষষ্ঠমাংশেও চাষবাস হত না। জমি ভালো ছিল, কিন্তু জেনারেল মিডোসের আক্রমণের ফলে চাষ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ; গ্রামবাসীরা পাহাড়ে চলে গিয়েছিল এবং প্রচুর লোক মারা গিয়েছিল।

ডাঃ বুকানানের আগমনের কয়েকমাস আগে কোম্পানির সালেমস্থিত কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট এই সব অঞ্চল পরিদর্শন করেছিলেন এবং কোম্পানির লগ্নীর জন্য তাঁতীদের অগ্রিম দিয়েছিলেন। যে কাপড়ের বায়না দেওয়া হয়েছিল তার নাম শালামত্র, বঙ্গদেশের বাফতার মতো। এই কাপড় দৈর্ঘ্যে ৩৬ হাত ও প্রস্থে ২২/৪ হাত মাপে তৈরী হত।

প্রচুর অকর্ষিত গ্রামাঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিয়ে ডাঃ বুকানান ২৮ অক্টোবর তারিখে পৌছান গুরুত্বপূর্ণ কোয়েম্বাটুর শহরে। এখানকার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন শহরটির প্রথম প্রতিষ্ঠাতার বংশের দ্বাদশতম পুরুষ। পরিবারটি প্রথমে নজরানা দিত মাদুরার রাজাদের, পরবর্তীকালে মহীশূরের শাসনাধীনে যায়। মহীশূর যুদ্ধের সময়ে স্থানটিকে বহু ক্ষয়ক্ষতি ভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু সে-আঘাত সে সামলে উঠছিল, তখন সেখানে ছিল দুহাজার বাড়ি।

নিকটবর্তী এলাকায় প্রচুর ধানী জমি ছিল। নোয়েল নদী থেকে টানা খালের সাহায্যে ভর্তি করা জলাধারগুলি থেকে এখানে জল সেচ হত। শুষ্ক জমিতে জোয়ার ও অন্যান্য ফসল ফলানো হত; কোনো কোনো স্থানে তুলা ও তামাক ফলানো হত; ধনী কৃষকরা সুপারি ও নারকেলের চাষ করত; লোহা গলানো হত কোয়েম্বাটুর থেকে পাঁচ মাইল দূরের তোগান বেটা নামক স্থানে এবং জেলায় ৪৫৯টি তাঁত কাজ করত; নিম্নবর্ণের সমস্ত চাষীদের স্ত্রীরা ছিল পটু সুতা-কাট্‌নী; সুতার রঙ প্রয়োজনমত লাল বা নীল রঙে রাঙানো হত। সালেমস্থিত কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট কোয়েম্বাটুরের তাঁতীদের দুবার অগ্রিম দাদন দিয়েছিলেন। পূর্বে তাঁতীরা তাঁত পিছু বার্ষিক প্রায় ৪ শিলিং শুল্ক দিতেন, কোম্পানির শাসনে তার স্থলে আসে স্ট্যাম্প ডিউটি। চাষীরা একে আগের তুলনায় বেশি কষ্টকর মনে করতেন এবং কলেক্টরকে কর-নিরূপণের পুরনো পদ্ধতি পুনরায় চালু করতে অনুরোধ জানিয়েও তাঁরা তাতে সফলকাম হননি।

কোয়েম্বাটুরের পূব দিকে ত্রিপুরা শহরটিতে ছিল ৩০০টি বাড়ি। এখানে সপ্তাহে একবার বাজার বসত। নিকটবর্তী অঞ্চলের ধানী জমিতে একটিই ফসল হত। এই জমিতে জলসেচ হত অংশত জলাধারগুলি থেকে অংশত নোয়েল নদী থেকে টানা খালগুলি থেকে। পূর্বে চাষবাস হত এমন জমির এক তৃতীয়াংশেরও বেশি যত্নের অভাবে অকর্ষিত অবস্থায় ছিল। নিকৃষ্টতম জমিগুলিকে গোচারণের জন্য পৃথক করে রাখা হত, সেখান থেকে খাজনা আসত সামান্যই। আরো পূব দিকে চীনা মালি নামক স্থানে লোহা গলানো

হত এবং সরকারকে শুল্ক হিসেবে দেওয়া হত জ্বালানির জন্য কাঠ কাটার বাবদ শুল্ক ছাড়াও, গলানো লোহার এক-ত্রিংশতম অংশ। চীনা মালিতে ছিল মাত্র ১২৫টি বাড়ি। সেখানে তখন বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। এই জেলার জমিতে জলসেচ হত কাপেলি নদী থেকে, কিন্তু ধান ফলানো হত না।

চীনা মালির উত্তরে পেরেণ্ডুরুতে ছিল ১১৮টি বাড়ি। যে-জেলায় ছিল ৮০০টি তাঁত। হায়দার আলির সময়ে কাবেরী নদীতীরস্থ এরোডু নামক স্থানে ছিল ৩০০০টি বাড়ি, কিন্তু টিপু সুলতানের আমলে অধঃপতন ঘটে। জেনারেল মিডোসের আক্রমণের সময়ে স্থানটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়, কিন্তু শান্তি স্থাপনের পর তখন তা আবার আঘাত সামলে উঠছিল। এরোডুর পার্শ্ববর্তী খালটি ছিল চমৎকার, কথিত আছে চারশো বছর আগে জনৈক কলিঙ্গ রায় এটি তৈরী করেন। এই খাল এখনও ৩৪৫৯ একর জমিতে সেচের জল যোগায়।

কাবেরী নদীর আরো ভাঁটির দিকে ছিল গুরুত্বপূর্ণ শহর কোডোমুডি। এখানে আছে একটি প্রাচীন মন্দির এবং ১১৮টি বাড়ি। কাবেরী নদী থেকে আনা একটি খালকে নোয়েল নদীর উপর দিয়ে টেনে আনা হয়েছিল পাগোলুর গ্রামে, এবং সেই খাল এক বিশাল জমিতে জল-সেচ করত। এই সমস্ত অঞ্চলে টিপু সুলতান যে খাজনা নির্দিষ্ট করেছিলেন তা হল, উৎপন্ন ফসলের চার-দশমাংশ। বৃটিশ সরকার ১৭৯৯ সালে একে রূপান্তরিত করেন অর্থে প্রদেয় খাজনায়—প্রতি একরে ৩ শিলিং ৫$\frac{3}{4}$ পেন্স হারে; ১৮০০ সালের খাজনা তখন পর্যন্ত ঠিক হয়নি।

কোয়েম্বাটুরের উত্তর বিভাগের কলেক্টর মেজর ম্যাকলিয়ড ডাঃ বুকানানকে জানান যে দেশের প্রথা অনুযায়ী, একজন প্রজা যতদিন পর্যন্ত তাঁর দেয় খাজনা দেন, ততদিন তাঁকে জোতজমি থেকে উচ্ছেদ করা যায় না। মেজরের মতে অত্যধিক তছরূপের সম্ভাবনার দ্বার খোলা না রেখে ফসলে ভূমি-রাজস্ব লাভ করা বৃটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কোম্পানি যখন সালেমের দখল পান, তখন কাবেরী নদী থেকে আসা চমৎকার খালগুলির দ্বারা সেচ-কৃত ধানী জমি থেকে রাজস্ব পাওয়া যেত ফসলে। কোম্পানির কর্মচারীরা জনসাধারণের মৃদু প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাকে অর্থে পরিবর্তিত করেছিলেন, চাষের কাজকে বিস্তৃত করেছিলেন এবং ভূমি-রাজস্ব বাড়িয়েছিলেন। জমিদারী প্রথা থেকে রায়তোয়ারী প্রথা শ্রেয় ছিল, কারণ তা থেকে বেশী রাজস্ব আসত। "রাজস্ব আদায়ের জন্য কর্ণেল রীড প্রবর্তিত নিয়মগুলি জমিদারের কাছ থেকে

যতখানি সংগ্রহ করা সম্ভব তার চেয়েও বেশী অর্থ নিয়মিতভাবে আদায় করার পক্ষে যথেষ্ট বলেই আমার মনে হয়; এবং আমাকে একথা বলতেই হবে যে কোন দোষত্রুটি দেখা দিতে পারে হয় কর্তব্যে অবহেলার দরুন, না হয় কলেক্টরদের অসাধুতার দরুন। আমি এখানে পুরুষানুক্রমিক জমিদারদের উল্লেখ করছি শুধু রাজস্বের উপর এবং দেশের রাজনৈতিক অবস্থার উপরে প্রভাববিস্তারকারী হিসেবেই নয়, কৃষির উন্নয়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলেও তাঁদের গণ্য করা উচিত।"[৯]

কারুর ছিল বেশ বড় শহর। অমরাবতী নদী নামে কাবেরীর একটি শাখানদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটিতে ছিল ১০০০ বাড়ি। কিন্তু এখানকার বণিকরা ছিল ছোট ছোট ব্যবসায়ী, তাঁতীর সংখ্যাও বেশী ছিল না। কাবেরী থেকে দুটি খাল এবং অমরাবতী থেকে অনেকগুলি খাল এই জেলায় জল-সেচের ব্যবস্থা করত। এখানে ফলানো হত আখ, ধান ও শুষ্ক শস্য।

১৭ নভেম্বর তারিখে ডাঃ বুকানান গিয়ে পৌছান কোয়েম্বাটুরের দক্ষিণ বিভাগের কলেক্টর মিঃ হুরডিসের সদরদপ্তর দারাপোরম-এ (ধর্ম-পুর)। কলেক্টর ছিলেন সক্রিয়, বুদ্ধিমান, ও সহানুভূতিশীল তরুণ অফিসার, তিনি জনসাধারণের সঙ্গে মিশতেন, তাদের বর্ণগত বিবাদের মীমাংসা করতেন এবং তাদের ভালোভাবে চিনতেন। "মিঃ হুরডিস মনে করেন যে বর্তমান খাজনার হার অত্যন্ত উঁচু; এবং সন্দেহ নেই, এখানকার কৃষকসমাজ, ভারতের প্রায় প্রতিটি অংশের মতোই, শোচনীয় দরিদ্র……বস্তুত চাষীদের দারিদ্র্যের, এবং তার ফলস্বরূপ ভারতের বহু অংশেই ফসলের দৈন্যদশার একটি বড় কারণ হল—যাদের জমি চাষ করার কোনো সংগতি নেই তাদের উপর জমি চাপিয়ে দেবার প্রথা। তাই আপাতভাবে সব জমি অধিকৃত বটে, কিন্তু অর্ধেক জমি পতিত থাকার চেয়েও তা ছিল ঢের অনুৎপাদক।"[১০] এর কারণ অন্যত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোম্পানি সমগ্র কর্ষণোপযোগী জমি থেকে রাজস্ব পেতে চাইতেন, সে-জমি যথোপযুক্তভাবে চাষ করা যাক আর নাই যাক। খাজনা ছিল অত্যধিক বেশী; পানের জমির উপর খাজনা নির্ধারণ করা হয়েছিল একর পিছু ৩ পাউণ্ড ১৬ শিলিং ৯ পেন্স, ধানী জমির জন্য একর পিছু ১ পাউণ্ড ১৫ শিলিং ৯½ পেন্স থেকে ১ পাউণ্ড ৫ শিলিং ২ পেন্স পর্যন্ত।

আরো পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করতে করতে ডাঃ বুকানান ২৪ নভেম্বর তারিখে পালাচিতে গিয়ে পৌছন। এইখানে খনন করে একটি পাত্রে রোমান মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল, তার দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাবে যে অগস্টাস ও টাইবেরিয়াসের

সময়ে রোমের সঙ্গে এই প্রাচীন পাণ্ড্য দেশটির বাণিজ্য হত। এই জেলার নিকৃষ্টতম জমিগুলি রাখা হত গোচারণের জন্য ; সেখান থেকে কোনো খাজনা পাওয়া যেত না, এবং প্রতি গ্রামের অবশিষ্ট জমিকে ধরা হত কর্ষণযোগ্য জমি বলে, তার জন্য গড়পড়তা হারে কর নির্দিষ্ট ছিল। সেই কর ছিল একর প্রতি ২ শিলিং ১০¼ পেন্স থেকে ৭ শিলিং ৩ পেন্স। "চাষীরা অভিযোগ করে যে জমি তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং যতটা চাষ করার মতো সংগতি তাদের আছে, তার চেয়ে বেশী তাদের খাজনায় নিতে হয়। যে সতেরো 'বুল্লা' জমি (এক বুল্লা = ৪½ থেকে ৬ একর জমি) খাজনায় নেয় সে মাত্র নয় বুল্লা জমি চাষ করতে পারে, আর তার যদি পুরো সংগতি থাকত, তাহলে সে চাষ করতে পারত এগারো থেকে বারো বুল্লা, এক-তৃতীয়াংশ ফেলে রাখত অকর্ষিত ভূমি হিসেবে। অবশ্য, এই ভাবে জমি খাজনায় নেওয়ার ফলে, যেখানে সম্পূর্ণ জমি চাষ করার মতো যথেষ্ট সংগতি নেই, সেখানে চাষীদের যে ক্ষতি হয় তা পূরণ করার জন্য খাজনা কমানো হয়েছে—কোনো কোনো গ্রামে এক-পঞ্চমাংশ, কোথাও এক-তৃতীয়াংশ। এ-ধরনের দখলের শর্ত মনে হয় অত্যন্ত ক্ষতিকর।"[১১]

মালাবার

২৯ নভেম্বর তারিখে ডাঃ বুকানন মালাবারে প্রবেশ করেন। মাত্র কয়েক-মাস আগেই বোম্বাই সরকারের হাত থেকে মালবারকে দেওয়া হয়েছিল মাদ্রাজ সরকারের হাতে। তিনি তামুরী রাজার এলাকায় প্রবেশ করেন। ইয়োরোপীয় লেখকদের কাছে তামুরী রাজা জামোরিন নামে পরিচিত। সুউচ্চ পর্বতমালার উপর থেকে নেমে আসত ধাপে ধাপে অরণ্যানি এবং উঁচু জঙ্গল আর ফল গাছের বাগিচার সঙ্গে মিশে ছিল শস্যক্ষেত। কিন্তু শুষ্ক জমি অবহেলিত ছিল, ধানী জমির পরিমাণও বেশী ছিল না। কোলাংগোড়ু শহরে ছিল এক হাজার বাড়ি, তার অনেকগুলিতেই বসবাস করত তাঁতীরা। তারা তুলো আমদানি করত কোয়েম্বাটুর থেকে। পালিঘাট ছিল ডাঃ বুকানানের দেখা সুন্দরতম স্থান, অনেকটা বঙ্গের সবচেয়ে সুন্দর অংশগুলির মতো, কিন্তু উঁচু জমির চাষ ছিল অবহেলিত। এখানকার দুর্গটি হায়দার আলি তৈরী করেছিলেন তাঁর মালাবার বিজয়ের পরে। পুরনো রাজাদের শাসনাধীনে কোনো ভূমিকর ছিল না, কিন্তু হায়দার আলি নিচু ও উর্বর জমির উপর 'নগদী' নামে এক ভূমিকর বসিয়েছিলেন, উঁচু জমিগুলিকে করের আওতা

থেকে বাদ দিয়েছিলেন। টিপু সুলতানের অত্যাচারের ফলে বহু মালিকই দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুরে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ডাঃ বুকানান যখন পালিঘাটে যান, সে সময়ে ধানের গড় উৎপাদন বপনকৃত বীজের ৭২/৩ গুণ এবং খাজনা ছিল ৪৩/৪ গুণ অথবা, উৎপন্ন ফসলের ৬০ শতাংশেও বেশী। মিঃ স্মী-র মূল্যনির্ণয় অনুযায়ী, জমিদারদের ধার্য ভূমিকর ছিল তাঁদের খাজনার উপর ৮৪ শতাংশ হারে।[১২] বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ধানের একটি ফসলকেই বাড়াবার মতো ছিল, আর জমিদারদের ব্যয়ে নির্মিত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা জলাধারগুলি দ্বিতীয় ফসলের জল যোগান দিত। গবাদি পশুর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত অল্প, দেশের চাহিদার পক্ষে তা অপ্রচুর ছিল। কোলাংগোড়ুতে লোহা ঢালাই পেটাই হত।

৬ ডিসেম্বর ডাঃ বুকানান প্রবেশ করেন কোচিনের রাজার এলাকায়। কোচিনের রাজা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বার্ষিক কর বা সেলামী দিতেন, কিন্তু তাঁর নিজের রাজ্যে সম্পূর্ণ অসামরিক ও সামরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। "পূর্ণতর মাত্রায় কোম্পানির কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলের তুলনায় তাঁর রাজ্য এত ভালভাবে শাসিত, যে মোপলা বা নায়াররা কোনরূপ গোলযোগ করার ভরসা করে না।"[১৩] কাকাড়ুতে পাহাড় অঞ্চলগুলি প্রধানত অকর্ষিতই ছিল, কিন্তু গোচারণ-ভূমি ছিল চলনসই, গবাদি পশু ছিল ভালো অবস্থায় এবং ফলের গাছের বীথিকার ছায়ায় ঢাকা সেখানকার অধিবাসীদের বাড়ি দিয়ে ঘেরা উপত্যকা ছিল শস্যপূর্ণ। নিকটেই একটি খৃষ্টান গ্রাম ছিল এবং সেখানকার পাদ্রী ডাঃ বুকানানকে জানান যে সেখানে খৃষ্টধর্মের প্রবর্তন করেন সন্ত টমাস, তিনি মাদ্রাজে এসেছিলেন ৬০ খৃষ্টাব্দে।

মালাবারের মোপলারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধনী বণিক ছিল, এবং তারা বাণিজ্যপোতের অধিকারী ছিল। এই বাণিজ্যপোতগুলি পাড়ি জমাত সুরাট, মোচা ও মাদ্রাজে। ডাঃ বুকানান দেখেছেন যে তারা তটভূমিতে বেশ শান্ত ও পরিশ্রমী, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরভাগে "ভয়ঙ্কর, রক্তপিপাসু ও ধর্মান্ধ দুর্বৃত্ত।" তাদের ধর্মীয় নেতা দাবি করতেন, তিনি মহম্মদের কন্যা ফতিমার বংশধর।

কোচিন থেকে মালাবারে প্রত্যাবর্তন করে ডাঃ বুকানান উত্তর দিকে যাত্রা করেন এবং ২২শে ডিসেম্বর তারিখে এসে পৌছান ভেঙ্কট-কোটেতে। এখানকার উপত্যকাগুলি মনোরম ছিল, পাহাড়ের ঢালু অংশগুলিকে চাষের জন্য চত্বরের মতো করা হয়েছিল, কিন্তু শৈলশ্রেণীর শিখরগুলি পতিত ছিল। চাষীরা

ভূমিকর সম্পর্কে অনুযোগ করেন ; "মালাবারে সমস্ত দোষের মূল এবেই বলা হয়।"[১৪] ত্রিকুবল ও পারুর্প-নদ-এর মধ্যবর্তী স্থানে কৃষি অত্যন্ত অবহেলিত ছিল এবং এর কারণ ছিল লোকাভাব এবং সেখানকার লোকেদের দারিদ্র্য। শেষোক্ত স্থানটির সমুদ্রতীর অবশ্য পরিপূর্ণ ছিল উচ্চ ফলনশীল নারিকেল বাগিচায়। ডাঃ বুকানান মালাবারের পুরনো রাজধানী কালিকটে গিয়ে পৌছান বড়দিনের দিন।

সেইখানে কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট মিঃ টোরিন তথন চেষ্টা করছিলেন লংক্লথ তৈরীর ব্যবস্থা চালু করতে। থানগুলি হত ৭২ হাত লম্বা, এবং তাঁতীদের মূল্য দেওয়া হত থান প্রতি ১৮ শিলিং ৬ ৩/৪ পেন্স থেকে ১৬ শিলিং ৪ ১/২ পেন্স। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন থেকে নিয়ে আসা ৩৪৪ জন তাঁতী এখানে ২৩৭টি তাঁত চালাত এবং মাসে ৪৬৮ থান কাপড় তৈরী করত। মিঃ টোরিন পালিঘাটে একটি কারখানাও স্থাপন করেছিলেন। এটির কাজ ছিল উন্নতর ও অপেক্ষাকৃত শস্তা।

ডাঃ বুকানান এই অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য, খাজনা ও ভূমিকরের একটি হিসেব করেছেন। তার ফল নিম্নরূপ :

অনুর্বর ধরনের জমির জন্য

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
ভূমিকর··· ··· ··· ··· ·	0	১২	৯ ১/২
আদায় বাবদ ব্যয় ·· ··· ···	0	১	৩ ১/২
বীজ ··· ··· ··· ··· ···	0	৯	৪ ১/২
চাষের খরচ ··· ··· ···	0	৯	৪ ১/২
জমিদার··· ··· ··· ··· ···	0	১	১১
দাদনের সুদ ··· ··· ··· ···	0	১	0 ৩/৪
চাষী··· ··· ··· ··· ···	0	৭	৮
	২ পা.	৩ সি.	৫ ১/২ পে.

অথবা, আনুমানিক ভাবে মোট ভূমিকর ছিল ১৪ শিলিং ; চাষের খরচ ছিল ১৯ শিলিং ; জমির মালিক রাখতে পারতেন মাত্র ১০ শিলিং।

শ্রেষ্ঠ ধরনের জমির জন্য

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
ভূমিকর ও আদায় বাবদ ব্যয় ...	0	১৬	১০
বীজ	0	৯	৪½
চাষের খরচ	0	৯	৪½
স্থদ	0	১	0¾
জমিদার...	0	৮	৬¼
চাষী	১	৫	৬¾
	৩ পা.	১০ সি.	৮¼ পে.

অথবা আনুমানিক ভাবে ভূমিকর ছিল ১৭ শিলিং; চাষের খরচ ১৯ শিলিং; জমির মালিক পেতেন ১ পাউণ্ড ১৪ শিলিং।

১লা জানুয়ারি, ১৮০১ তারিখে ডাঃ বুকানান এসে পৌছান তামারাচেরিতে। এখানকার সমস্ত জমি মোপলা বন্ধকগ্রহীতাদের হস্তগত হয়েছিল। টিপু স্থলতান কর্তৃক হিন্দুদের নিগ্রহ ও মোপলাদের যুদ্ধ বিগ্রহের দরুন কুরম্বর-র ধানী জমির এক-চতুর্থাংশই ছিল পতিত ও জঙ্গলের কাছে আবৃত। কিছু কিছু বড় চাষীর হাতে ছিল দশটি লাঙল, কুড়িটি বলদ, কুড়ি জন ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী, দশটি চাকর, ও পঁচিশটি দুধেলা গাই, কিন্তু এরূপ চাষীর সংখ্যা ছিল অল্প। ক্রীতদাস বিক্রি হত সস্তায়—৯ শিলিং ৬½ পেন্স থেকে ২৮ শিলিং ৮ পেন্স দরে; ক্রীতদাসী বিক্রি হত তার অর্ধেক দামে।

এখানকার কলেক্টর মিঃ কাওয়ার্ড তাঁর জেলায় সফরের সময় ডাঃ বুকানানের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর মতে, জেলার এক-চতুর্থাংশ স্থানে সেচ ও ধান চাষ সম্ভব, অর্ধেক জমি ছিল শুষ্ক শস্য বা বাগিচার উপযোগী উঁচু জমি এবং বাকিটুকু খাড়াই ও পাথুরে। "মিঃ কাওয়ার্ড মনে করেন, ভূমিকর এত বেশী যে তা কৃষিকে ব্যাহত করে।"[১৫]

৫ জানুয়ারি তারিখে মিঃ কাওয়ার্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডাঃ বুকানান ক্যাপ্টেন অসবার্ণের সঙ্গে যাত্রা করেন রাজার বাসস্থান কুটিপোরম অভিমুখে। রাজা কোম্পানিকে নজরানা দিতেন এবং তাঁর এলাকায় তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল। এখানে ভূমিকর ছিল উৎপন্ন ফসলের ৪০ শতাংশ, জমিদার রাখতেন ২৭ শতাংশ এবং চাষী ৩৩ শতাংশ। ক্যাপ্টেন অসবার্ণ সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও এই বিশিষ্ট পর্যটক গ্রামের নারীদের নিকট থেকে সাদর সম্ভাষণ লাভ করেন নি।

"ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে শত্রুতা থাকায় নায়াররা তাদের নারীসমাজকে বুঝিয়েছে যে আমরা হলাম এক ধরনের লম্বা লেজওয়ালা জুজু" এবং তাই তাঁদের আসতে দেখলেই মেয়েরা ছুটে পালাত।[১৬]

"অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ ভদ্রলোক" মিঃ স্ট্যাচির ব্যবস্থাপনায় তেল্লিচেরি, মাহে ও ধর্মপতম ছিল একটি সার্কেল। মিঃ স্ট্যাচি মনে করতেন এই সমস্ত সার্কেলেই চাষ করা যায় অথবা ফলের গাছ রোপন করা যায়, কিন্তু এর অনেকখানিই পতিত ছিল। ধানী জমির কর ছিল খাজনার ২৫ শতাংশ। এই সার্কেলের বাণিজ্য বিরাট গুরুত্বসম্পন্ন ছিল, এবং প্রধান পণ্য ছিল গোলমরিচ, চন্দন কাঠ ও এলাচ।

মালাবারের উত্তরাঞ্চলের কলেক্টর মিঃ হজসন কানানোরে ডাঃ বুকানানকে স্বাগত জানান। 'বিবি' উপাধিধারিণী জনৈকা মোপলা মহিলা এক সাড়ম্বর ভোজে ডাঃ বুকানানকে আপ্যায়িত করেন। ওলন্দাজদের কাছ থেকে যাঁরা প্রথমে কানানোর ক্রয় করেছিলেন, ইনি ছিলেন তাঁদেরই বংশোদ্ভূতা। বিবি কোম্পানিকে ভূমিকর হিসাবে ১৪০০০ টাকা দিতেন। তিনি ছিলেন কানানোর ও লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জের অধীশ্বরী। উত্তরাধিকার বর্তাত নায়ারদের মত মেয়েদের দিক থেকে।

চেরিকল ছিল পর্বতসঙ্কুল, সেখানে চাষ হত খুবই কম। কানানোর ও চেরিকলে বাড়ির সংখ্যা ছিল ১০,৩৮৬। জানুয়ারির মাঝামাঝি ডাঃ বুকানান মালাবার পরিত্যাগ করেন এবং উত্তরদিকে কানাড়া অভিমুখে যান।

কানাড়া

টমাস মুনরো ছিলেন তৎকালের বিশিষ্টতম ও সফলতম প্রশাসক। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, বড়ামহলে তাঁর বন্দোবস্তের পর ১৭৯৮ সালে তাঁকে কানাড়ায় বন্দোবস্ত করতে পাঠানো হয়েছিল। কানাড়ার রাজা তখন অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভাগিনেয় বা উত্তরাধিকারী মুনরোর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। মুনরো তাঁকে সতর্কতার সঙ্গে জানিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রের কাছে তাঁর দাবি কোম্পানির সামনে উপস্থিত করা হবে। ইতিমধ্যে, সেই স্থানটিকে তহসিলদারদের ব্যবস্থাপনাধীনে আনা হয়, রাজাকে তাঁর ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং তাঁর ভরণপোষণের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির উপরে ভূমিকর কিছুটা রেহাই দেওয়া হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থায় নায়াররা বৃটিশ অফিসারদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব সম্পর্কে অভিযোগ করেন।[১৭] টিপু সুলতানের শাসনাধীন

যেখানে দাবি ছিল ৩২,০০০ টাকা তার জায়গায় মুনরো ভূমিকর ধার্য করেন ২৪০০০ টাকা। কিন্তু এই হ্রাস প্রাপ্ত করটুকু প্রদানের ক্ষমতাই সেখানকার ছিল, এই হ্রাসপ্রাপ্ত করেই জমির সমস্ত খাজনা খেয়ে যেত। তহসিলদার ত্রিমূলা রাওয়ের মতে এই কর ছিল আয়কটের তুলনায় অত্যধিক।

ডাঃ বুকানান একসপ্তাহ কাল ম্যাঙ্গালোরে থাকেন। ম্যাঙ্গালোর একটি হ্রদের তীরে অবস্থিত। সমুদ্র থেকে হ্রদটিকে পৃথক করে রেখেছে একখণ্ড বালুকাবেলা। স্থানটি একদা একটি পোতাশ্রয় ছিল: কিন্তু তার মুখের গভীরতা হ্রাস পেয়েছে এবং বুকানানের সফরের সময়ে, নিচের দিকে দশ ফুটের বেশী কোনো জাহাজ প্রবেশ করতে পারত না। ম্যাঙ্গালোরের বন্দরটিকে টিপু সুলতান ধ্বংস করেছিলেন।

ইমাম বা মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রদত্ত জমি টিপু পুনরুদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু কিছু গোপন রাখা হয়েছিল। টমাস মুনরো ও তাঁর উত্তরসূরি র‍্যাভেনশ সব কিছু আগের মতোই থাকতে দিলেন। প্রধান হিন্দু মন্দিরটির বার্ষিক আয় ছিল ১৯৩ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৩ পেন্স। মুনরোর ধার্য কর অত্যন্ত বেশী বলে অনুভূত হল, যথেষ্ট অভিযোগ দেখা দিল। “মালিকরা অনুযোগ করছেন যে করের পরিমাণ খাজনার চাইতেও বেশী, এবং বাধ্য হয়ে তাঁদের অর্থ ঋণ করতে হচ্ছে, অথবা তাঁদের নিজেদের সম্ভার দিয়ে চাষ-করা জমি থেকে প্রাপ্ত মুনাফার অংশ দিতে হচ্ছে, সরকারের দাবি মেটাবার জন্য…অবশ্য ভারতের প্রতিটি অংশে যে দারিদ্র্যের সর্বজনীন হাহাকার বিদ্যমান এবং দীর্ঘকালের নিপীড়নের দরুন, সবকিছু যেভাবে সযত্নে গোপন রাখা হয়, তার ফলে চাষীর প্রকৃত অবস্থা বোঝা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। অবশ্য কানাড়ায় সর্বপ্রকার ভূসম্পত্তির জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে আমরা নিরাপদেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি প্রত্যেক জমির মালিকেরই তার সংগতি অনুযায়ী চাষের জন্য প্রাপ্য পুরস্কার ছাড়াও, জমিতে যথেষ্ট আগ্রহ আছে। বস্তুতই ঐকান্তিক ভাবে আশা করা যায় যে এই সম্পত্তি আরো বহুকাল অক্ষুন্ন থাকুক, কারণ কোন দেশই, জমির নিরঙ্কুশ মালিকানা রাষ্ট্রে ন্যস্ত হলে উন্নতি করতে পারে না।”[১৮] ডাঃ বুকানান জানতেন না যে ভারতে জমির জন্য এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার, এমন কি যে জমির উপর মাত্রাতিরিক্ত কর ধার্য হয় তার জন্যও, কারণ হল এই যে জমিই কার্যত জাতির গ্রাসাচ্ছাদানের একমাত্র উপায়; চাষীকে যেকোনো শর্তে তার জমি রাখতেই হবে অন্যথায় তাকে থাকতে হবে অনাহারে।

নিচু উপত্যকাভূমির ধানী জমিতে জলসেচ করা হত নদী থেকে টানা খালের সাহায্যে এবং উঁচু জমিতে জলাধারের সাহায্যে; আর অত্যন্ত উঁচু জমিতে ফসলের চাষ পুরোপুরি বৃষ্টির উপরে নির্ভর করত। আখের চাষ করত প্রধান খৃষ্টান সম্প্রদায় এবং সুপারি ও গোলমরিচ ফলানো হত বাগিচায়। লোকে নুন তৈরী করত মালাবারের অনুরূপ প্রক্রিয়ায়, কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যথেষ্ট ছিল না। চাল, সুপারি ও গোলমরিচ ছিল প্রধান রপ্তানি সামগ্রী; সুতি ও রেশমী বস্ত্র, চিনি ও নুন আমদানি করা হত।

ম্যাঙ্গালোরের দশ মাইল দূরে ছিল আরকোলা। স্থানটিকে ফিরিঙ্গি পাট্টা নামেও অভিহিত করা হত, কারণ এর পূর্বে এখানে বসবাস করতেন কোঙ্কান খৃষ্টানরা। সমগ্র স্থানটি দেখতে মালাবারেরই মতো এবং পাহাড়ের চারপাশে চাষের জন্য চত্বরের মতো করা হয়েছিল, অবশ্য একাজটি মালাবারের মতো তত শ্রমসাপেক্ষ ছিল না। সাম্প্রতিক যুদ্ধে টিপু সুলতান ও কুর্গের রাজা এই অঞ্চলের প্রচুর ক্ষতি করেছেন। টিপু যেসব কামানকে ম্যাঙ্গালোর থেকে শ্রীরঙ্গপত্তমে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন, ডাঃ বুকানান পথপার্শ্বে এমন বহু কামান দেখতে পান। বমলা নদীর একটি বাঁধ নির্মিত হয়েছিল, এই বাঁধের ফলে চাষের জন্য বিশাল এক জলাধার তৈরী হয়েছিল।

৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ডাঃ বুকানান এইন্নুরু শহরে আসেন। এখানে তিনি আটটি জৈন মন্দির এবং প্রকাশ্য স্থানে রক্ষিত একখণ্ড নিরেট গ্র্যানাইট পাথর দিয়ে তৈরী একটি বিশাল জৈন মূর্তি দেখেন। হায়দার আলির সময়ে জৈন মন্দিরগুলির স্বত্বাধীনে যে-পরিমাণ জমি ছিল, টিপু সুলতান তা কমিয়ে দিয়েছিলেন; টমাস মুনরো সে-জমি ফিরিয়ে দেন, কিন্তু তাঁর উত্তরসূরি র‍্যাভেনশ পুনরায় জমির পরিমাণ হ্রাস করেন। কারকুল্লায় গৌতম রাজার (বুদ্ধ) মূর্তিটি ছিল এক খণ্ড নিরেট গ্র্যানাইট পাথরে তৈরী, ৩৮ ফুট উঁচু এবং উৎকীর্ণ লিপি অনুযায়ী, মূর্তিটি তৈরি হয়েছিল বুকানানের আগমনের ৩৬৯ বছর আগে, অর্থাৎ প্রায় ১৪৩২ সালে।

আরো পশ্চিমে হরিয়াডিকা নামক স্থানে ডাঃ বুকানান গিয়ে পৌছান ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে। সেখানে তিনি ভূমিকরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন যে ভূমিকর ছিল খাজনার অর্ধেক। কিন্তু "এরা বলে যে ধান যখন সস্তা হয়, তখন সমস্ত খাজনা ভূমিকরের সমান হয় না।"

তার পরদিন তিনি উদিপু-তে এসে পৌছন, সেখান থেকে আরব সাগর আবার তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে চতুর্দশ শতাব্দীর মহান হিন্দু পণ্ডিত ও

সংস্কারক মাধবাচার্যের নামকে তখনও লোকে শ্রদ্ধা করত এবং তাঁর অনুগামী সম্প্রদায়টি সমৃদ্ধ ছিল। সন্ন্যাসীদের অধিকারে ছিল তিনটি মন্দির ও চৌদ্দটি মঠ। এঁরা ছিলেন ধর্মীয় গুরু। উদিপু থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ধানের চাষ হত। "এই অঞ্চলের পাঁচটি গ্রামের মূল্য-নিরূপণ অনুযায়ী, আমি দেখতে পাচ্ছি যে চাষ'রা তাঁদের উৎপন্ন ফসলের মোট মূল্য ২০৪৮ প্যাগোডার মধ্য থেকে রাখেন ১২৯৫ প্যাগোডা। সরকারের ভাগ সাধারণত মোট উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ, আর এই সব গ্রামে আছে ৬৭১ প্যাগোডা যার মধ্যে ৩৭ প্যাগোডা পৃথক করে রাখা আছে ইনামের মধ্যে বা দাতব্য জমিতে। জমিদারদের হাতে থাকে ৮২ প্যাগোডা।"[১৯]

উত্তর দিকে ভ্রমণ করতে করতে ডাঃ বুকানান এসে পৌছান কুন্দপুর-এ এবং নদী পার হয়ে প্রবেশ করেন কানাড়ার উত্তর বিভাগে। স্থানটি তখন ছিল মিঃ রীড-এর ব্যবস্থাপনাধীনে। মিঃ রীড ছিলেন "মিঃ র‍্যাভেনশ-র সঙ্গে একই ধারায় মানুষ এক তরুণ ভদ্রলোক।" আরো উত্তরে ছিল বেইতুরু তার শিবের নামে মন্দিরটিসহ। আর ছিল ৫০০ গৃহবিশিষ্ট বাতুকুল্লা নামে অপেক্ষাকৃত বড় একটি শহর। আরো উত্তরদিকে গিয়ে তিনি সমুদ্র ও নিচু পাহাড়ের মধ্যবর্তী আধ মাইল থেকে দেড় মাইল পর্যন্ত প্রস্থবিশিষ্ট সমতলভূমি দেখতে পান। এখানে ধানের চাষ হত। মুরোদেশ্বর মন্দিরটি ছিল একটি উঁচু নিরাপদ শৈলান্তরীপের উপরে। এর অদূরেই পারাবত দ্বীপ, এখানে বুনো পায়রারা প্রায়ই আসত, এছাড়া আসত প্রবাল-সন্ধানী বহু নৌকা। স্থানটিতে প্রচুর প্রবাল পাওয়া যেত। ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ডাঃ বুকানান এসে পৌছান বিরাট হ্রদে ও ওনোর শহরে।

আগে ওনোর ছিল একটি বড় শহর এবং প্রধান ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান। যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের জন্য হায়দার আলি এখানে একটি ডক তৈরি করেছিলেন। তাঁর নির্বোধ ও স্বৈরাচারী পুত্র ম্যাঙ্গালোরের চুক্তির সাহায্যে এই বিরাট বাজারটি উদ্ধার করার পরে ধ্বংস করে ফেলেন। ডাঃ বুকানান যখন সেখানে যান তখন শহরটি নির্জন। বাণিজ্যের জন্য গোয়া থেকে নৌকা আসত, হ্রদের তীরের কাছে বণিকরা বাস করত ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে এবং তারা রপ্তানির জন্য ক্রয় করত চাল, গোলমরিচ, নারিকেল, সুপারি ও নোনা-মাছ। অধিকাংশ কর্ষিত জমিই ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কিন্তু পাহাড় ও জঙ্গলের মালিক ছিলেন সরকার। প্রত্যেকেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির জন্য একটি ভূমিকর দিতেন, এবং তাঁর ইচ্ছামত উপায়ে জমি চাষ করতেন। মাঝারি অবস্থার চাষীদের ছিল

চারটি থেকে ছটি পর্যন্ত লাঙল, কিন্তু অধিকাংশেরই ছিল একটি মাত্র লাঙল এবং তারা দরিদ্র ছিল। চাষীরা চার থেকে দশ বছরের জন্য লিজ পেতেন এবং মালিকদের খাজনা দিতেন। মালিকরা সরকারকে দিতেন ভূমিকর।

"ভূমিকর প্রদানের জন্য মালিকের জামিন পাওয়া প্রয়োজন হত। তিনি যদি তা না পারেন, তাহলে ফসলের তত্ত্বাবধান করার জন্য, উৎপন্ন ফসল বিক্রির জন্য এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে রাজস্ব কেটে নেবার জন্য একজন রাজস্ব অফিসারকে পাঠানো হয়। এটি অতি শোচনীয় প্রথা, সত্যকার একটি হিন্দুস্থানী উদ্ভাবন; কারণ ফসল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ব্যক্তিটি চাষীর কাছ থেকে একটি ভাতা পেতেন এবং এই ভাবে মহৎ ব্যক্তির কলরবপূর্ণ অনুচরবৃন্দের অংশস্বরূপ কোনো নিষ্কর্মা হা-ঘরে কিছু কালের জন্য তার লুব্ধ রসনাকে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছে। একজন লোক জামিন দেওয়ার পর যদি যথাসময়ে প্রদেয় অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হয়, তাহলে মেয়াদ শেষ হবার তৃতীয় দিনে সেই জামিনকে ডেকে রাজস্ব না-দেওয়া পর্যন্ত আটক রাখা হয়।"[২০]

ভূমিকর হিসেবে কুড়ি প্যাগোডা দেয় এমন একটি ভূসম্পত্তি বিক্রি হত একশো প্যাগোডায় এবং তা বন্ধক রাখা যেত পঞ্চাশ প্যাগোডায়। পুত্ররা তাদের পিতার ভূসম্পত্তি নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিত, কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্রই সমস্ত ব্যবস্থাপনা চালাত এবং তারা সকলে একত্রে বসবাস করত। অনেক সম্পর্কিত ভাইয়ের মধ্যে যখন ভাগ হত, তখন সেই ভূসম্পত্তিকে একসঙ্গে ভাড়া দেওয়া হত এবং প্রাপ্ত খাজনা ভাগ করে নেওয়া হত। ভালো ক্ষেতে একর প্রতি ২০ থেকে ৩৩ বুশেল ধান উৎপন্ন হত, আর খারাপ ক্ষেতে হত ৬ থেকে ১৬ বুশেল। আখ, গোলমরিচ, চন্দনকাঠ, এলাচ, সুপারি, ও নারিকেল ছিল বাণিজ্যদ্রব্য।

ওনোরের উত্তরে গোকর্ণ নামক স্থানটি বিখ্যাত ছিল মহাবালেশ্বর নামে অভিহিত বিখ্যাত শিবমূর্তির জন্য। সেখানে এই মূর্তিটি পূজিত হত। কথিত আছে যে লঙ্কার রাজা রাবণ উত্তরের পাহাড় থেকে এই মূর্তিটিকে বহন করে নিয়ে আসছিলেন। বিশ্রাম নেবার জন্য মূর্তিটি তিনি এখানে রাখেন, কিন্তু পরে আর তা তুলতে পারে না। এই শহরে ৫০০টি গৃহ ছিল। তার অর্ধেকেই ব্রাহ্মণরা বসবাস করতেন। একটি বিরাট পুকুর ছিল, তার কাছে ছিল একটি মঠ এবং একটি মন্দিরে শঙ্করনারায়ণের মূর্তি, "এবং পুরনো এই প্রচলিত মতবাদের এটি একটি জোরালো প্রমাণ যে···শিব ও বিষ্ণু একই ঈশ্বরের পৃথক নাম।"

আনকোলা রাজস্ব দিত ২৯,০০০ প্যাগোডা, আর ওনোর দিত ৫১,০০০ প্যাগোডা. কুন্দাপুরা ৫০,০০০ প্যাগোডা। ভালো জমির এক-তৃতীয়াংশই ছিল পতিত। আনকোলা শহরের বাজারটিকে ডাকাতরা বহুবার পুড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে বাজারটি আবার গড়ে উঠছিল। টমাস মুনরোর ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ টিপু সুলতানের চেয়ে নামতঃ হাল্কা ছিল, কিন্তু তাঁর আদায় ছিল প্রকৃতপক্ষে বেশী। "রাজস্ব অফিসারদের বিবরণ অনুযায়ী মেজর মুনরো ভূমি-করের হার যথেষ্ট হ্রাস করেছিলেন, কিন্তু আদায়ের ব্যাপারে তাঁর যত্ন ও কড়াকড়ির দরুন, তিনি যে-রাজস্ব আদায় করতেন তা আগেকার যেকোন সময়ের আদায়ের তুলনায় অনেক বেশী।"[২১] ভারতের অধিকাংশ স্থানে ঠিক এই জিনিসটিই ঘটেছিল। কোম্পানির কর্মচারীরা পুরনো রাজস্বকে কখনো বজায় রাখতেন অথবা বাড়াতেন, কখনও বা কমাতেন, কিন্তু তাদের আদায় এতই কঠোর ছিল যা ভারতের মানুষ আগে কখনও দেখেনি।

উত্তরের তিনটি জেলা—কুন্দাপুরা, ওনোর ও আনকোলার অধিকাংশ স্থানই ছিল পাথুরে ও অনুর্বর এবং চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত। মিঃ রীড বিভিন্ন ধরনের জমির হিসেব করেছিলেন এইভাবে:

	কর্ষিত জমি	চাষের উপযুক্ত	অনুর্বর
কুন্দাপুরা…	০·৩২	০·০৮	০·৬০
ওনোর …	০·২৬	০·১২	০·৬২
আনকোলা…	০·২০	০·২০	০·৫৯

"এত পতিত জমি থাকা সত্ত্বেও, বলা হয় রাজস্ব নাকি মেজর মুনরোর ব্যবস্থাপনার প্রথম বছরে আগেকার যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। মিঃ রীড এর কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন প্রকৃতই চাষের অধীন জমির উপর খাজনা বৃদ্ধি, কিন্তু এ-ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"[২২]

ডাঃ বুকানানের মহীশূরের মধ্য দিয়ে মাদ্রাজ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তনের কথা বর্ণনা করা আমাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। তিনি মাদ্রাজে পৌছান ৬ জুলাই, ১৮০১ তারিখে। পূর্ব থেকে পশ্চিমের সমুদ্র পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের মধ্য দিয়ে তাঁর যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত আমরা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে উপস্থিত করেছি, সেটি হল পুরনো শাসনাধীন এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নতুন শাসনে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের হাতে সবচেয়ে মূল্যবান দলিলগুলির অন্যতম।

কোম্পানির শাসনের সম্প্রসারণের অর্থ সর্বত্রই হয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ ও গোলযোগের অবসান এবং শান্তির প্রত্যাবর্তন। কোম্পানির প্রশাসন তার সমস্ত আশীর্বাদ সত্ত্বেও জমির অতিরিক্ত-কর নির্ধারণের মতো মারাত্মক ভুলটি করেছিল; আর তাই কোম্পানির শাসনে জনগণের অবস্থা ছিল আশাহীন দারিদ্র্যের অবস্থা—দেশীয় মন্ত্রী পূর্ণিয়ার অধীনে দেশীয় মহীশূর রাজ্যে যে-অবস্থা তাদের ছিল, তার চাইতেও খারাপ।

১। Buchanan's *Journey from Madras*, &c, (London 1807) Vol. ., p. 83

২। ঐ, Vol, i., p, 124.

৩। ঐ, Vol. i., p. 135

৪। ঐ, Vol. i., p. 265 *et seq.*

৫। ঐ, Vol, i,, p. 390

৬। ঐ, Vol. ii., pp. 82, 83.

৭। ঐ, Vol. ii,, p, 96.

৮। ঐ, Vol. ii,. p. 119

৯। ঐ, Vol, ii., p. 296.

১০। ঐ. Vol, ii., p. 309,

১১। ঐ, Vol. ii., pp. 319, 320,

১২। ঐ, Vol: ii., p. 369-

১৩। ঐ, Vol, ii., p. 388.

১৪। ঐ, Vo . ii. p, 468.

১৫। ঐ, Vol. ii., p. 502.

১৬। ঐ, Vol. ii., p, 514,

১৭। ঐ, Vol. iii , p. 12.

১৮। ঐ, Vol, pp., 33-35.

১৯। ঐ, Vol. iii,. p. 103.

২০। ঐ, Vol, iii,, p, 140.

২১। ঐ Vol. iii., p. 180.

২২। ঐ, Vol., iii,, p. 191

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা

(১৮০৮-১৮১৫)

কোর্ট অব ডিরেক্টর্স দক্ষিণ ভারতে ডাঃ ফ্রান্সিস বুকানানের অর্থনৈতিক সমীক্ষার মূল্য স্বীকার করেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন যে উত্তর ভারতেও উক্ত বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কর্তৃক অনুরূপ সমীক্ষা করা হোক। তদনুসারে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বুকানান বঙ্গদেশ ও উত্তর ভারতের জেলাগুলিতে পরিসংখ্যানগত নিরীক্ষা চালাবার জন্য আদিষ্ট হলেন। সাত বৎসর ধরে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। এজন্য খরচ হয়েছিল ৩০,০০০ পাউণ্ড।

এইভাবে সংগৃহীত মূল্যবান তথ্যসামগ্রী ভারত সরকার ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে তা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। ডাঃ বুকানান এক বিরাট সম্পত্তি পেয়ে স্কটল্যাণ্ডে চলে আসেন। সম্পত্তি-লাভের পর তিনি হ্যামিল্টন নাম পরিগ্রহণ করেন এবং অবসরকালীন জীবনেই মারা যান। তখনও তাঁর পরিশ্রমের ফসল প্রকাশিত হয় নি।

এই সময়েই বৃটিশ উপনিবেশ সমূহের ইতিহাস রচয়িতা ও ভারতীয় প্রজা সম্পর্কে একজন চিন্তাশীল ও যত্নশীল লেখক মণ্টগোমারি মার্টিন ডাঃ বুকানানের পাণ্ডুলিপিগুলি দেখবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং সে অনুমতি তিনি লাভও করেন। বহু পরিশ্রমে সংগৃহীত তথ্য থেকে একটা সুনির্বাচিত অংশ ১৮৩৮-এ লণ্ডন থেকে তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং এই খণ্ডগুলিতেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো ও বিশ্বাসজনক বিবরণ পাই। বর্তমান গ্রন্থের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ঐ খণ্ডগুলির পরিসংখ্যান সমৃদ্ধ অংশগুলির একটা সংক্ষিপ্ত-সার আমরা এই অধ্যায়ে দিচ্ছি।

পাটনা শহর ও বিহার জেলা

(আয়তন ৫৩৫৮ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা, ৩,৩৬৪,৪২০)

সমগ্র জেলাতেই ধানই ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফসল। ধানের গড়পরতা বিক্রি ছিল এক টাকায় ৭০ সের বা প্রতি শিলিং-এ প্রায় ৭০ পাউণ্ড।

গম ও যব ছিল দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ফসল। কখনও কখনও দুটো একসঙ্গেই বপন করা হত। আটা দিয়ে রুটি হত অথবা রোদে শুকিয়ে ছাতু করা হত। মারুয়া পুরোপুরিই গ্রীষ্মকালীন ফসল হিসাবে উৎপন্ন হত; ভুট্টা ও জনার বেশীর ভাগই গঙ্গার তীরে জন্মাত।

খেসারি, বুঁট, মটর, মসুর, অরহড়, মুগ ও অন্যান্য সবজি ও তরিতরকারী খাদ্য হিসাবে জন্মাত আর তিল ও অন্যান্য উদ্ভিদ তেলের জন্য উৎপন্ন হত। ইয়োরোপ থেকে আলুর আমদানি আগে থেকেই চালু ছিল। ৮০০০ একর জমিতে তুলোর চাষ হত। এর তিন-চতুর্থাংশ জমিতেই অন্য কোন শস্য জন্মাত না। ৭০০০ একর জমিতে আখের চাষ হত। গ্রামের সন্নিকটস্থ বাগিচায় আফিমের চাষ হত। তামাকের জন্য ছিল ১৬০ একর জমি। বিহারের পান ছিল সবচাইতে ভাল। কলকাতা, বারাণসী ও লখনৌতে তা চালান হত। নীলের চাষের অবনতি ঘটেছিল। কারণ জমিদাররা এর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কুসুম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত।

কৃষকেরা জমির মালিককে যে খাজনা দিতেন তার পরিমাণ ছিল ফসল তোলবার খরচ বাদ দিয়ে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক। কিন্তু অন্যদিকে জমির জল-সেচের জন্য নালা ও জলাধার নির্মাণ ও সংস্কারের যাবতীয় খরচই জমিদারগণ বহন করতেন।[১]

এক মাইল বা তার বেশী দীর্ঘ বিরাট জলাধার খননের জন্য খরচ ছিল প্রায় ৫০০ টাকা (৫০ পাউণ্ড) কিন্তু ছোট ছোট জলাধার খননের জন্য খরচ ছিল ২৫ থেকে ১০০ টাকা। এইগুলিরই সংখ্যাধিক্য ছিল। অনেক নালারই দৈর্ঘ্য ছিল কয়েক মাইল। খরার সময় নদীর খাতে যে পরিমাণ জল থাকত তার চেয়ে অনেক বেশী জল এই সময় নালাগুলি বহন করত। শীতকালের বেশীর ভাগ শস্য, শাকসবজি ও আখের জন্য কুয়োর থেকে সেচ হত। চারণ-ভূমির মধ্যে ছিল ২৭ বর্গমাইল প্লাবিত জমি, ৩৮৪ মাইল বন বা বিক্ষিপ্ত ঝোপঝাড়, ৬৪০ মাইল বাগিচা জমি, ২০৫ মাইল উঁচু জমি এবং ৪১৭ মাইল পাড়ভাঙ্গা জমি, নদীতীর ও পতিত জমি। পাটনা ও গয়া শহর ব্যতীত, কৃষকেরা যে জমির ওপর তাদের ঘরবাড়ী ছিল তার জন্য কোন খাজনা দিত না। "খামারের জন্য খাজনা দেন এমন কোন ব্যক্তিই বাড়ীর খাজনা দেন না।" কারিগর, বণিক ও শ্রমিকগণ টাকা বা শ্রমের মাধ্যমে জমির একটা খাজনা দিতেন।[২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ফসল তোলবার খরচ বাদ দিয়ে কৃষকের খাজনা

ছিল উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক এবং বসবাসের জন্য জমির খাজনা, সেচের খরচ ও নিষ্কর চারণভূমি সমস্তই ঐ খাজনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক খাজনাও তেমন একটা কড়াকড়ি ভাবে ধার্য করা হত না। "ভাগ বাঁটোয়ারাটা এতই গোলমেলে যে নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করবার পরিবর্তে, শস্য যখন পাকে তখন জমির মালিক ও প্রজা উভয়েই সাধারণতঃ এই সর্তে রাজী হত যে একপক্ষ নেবে আর আরেকপক্ষ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য বা আর্থিক মূল্য দেবে।" "জমিদারের কাছে প্রজাদের বকেয়া খাজনার পরিমাণ নিতান্তই নগন্য। এর ব্যতিক্রম মাত্র একটি জমিদারী। সেখানে ভূ-স্বামী প্রচুর টাকা আগাম দিয়ে থাকেন।…যাতে প্রজা চাষ করতে পারে সেজন্য প্রজাকে ভূম্যধিকারীর আগাম (তকবী) দেবার রীতিটি সচরাচর চালু নয়, যদিও কিছু ক্ষেত্রে এর অস্তিত্ব আছে।"[৩] ডাঃ বুকানানের তথ্যানুসন্ধানের সময় যে সাধারণ পরিবর্তনটি ঘটতে শুরু করেছিল তা হল আর্থিক খাজনার পরিবর্তে দ্রব্যের মাধ্যমে খাজনা দেওয়া।

হলকর্ষণের জন্য নিযুক্ত শ্রমিকের বাৎসরিক মজুরী বছরে ১৭ টাকা থেকে ২২ টাকার মধ্যেই ছিল বা মাসে তিন থেকে চার শিলিং। কোদাল দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করবার জন্য বা ধানের চারা রোপন অথবা শীতকালীন শস্যে জল সেচনের জন্য দিন-মজুরদের দিনে তিন বা চার পয়সা (দুই পেন্স) দেওয়া হত। আর আগাছা পরিষ্কার ও ধানের চারা রোপণের জন্য স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সমান পারিশ্রমিকই পেত এবং তারা ফসল কাটবার সময় পুরুষদের সাহায্য করত।

কৃষির পরেই ভারতবর্ষের বৃহত্তম জাতীয় শিল্প ছিল সুতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন। সমস্ত সুতাকাটনীই ছিল স্ত্রীলোক। এই জেলায় তাদের সংখ্যা ৩৩০,৪২৬ বলে ডাঃ বুকানান অনুমান করেছেন। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই নিঃসন্দেহে অপরাহ্ণের কয়েক ঘণ্টা সুতো কাটে, এবং গড় হিসেব অনুযায়ী প্রতিটি স্ত্রীলোক বৎসরে যতটা পরিমাণ সুতো কাটে তার মূল্য ৭ টাকা ২ আনা ৮ পাই। সমগ্র পরিমাণ সুতোর বাৎসরিক মূল্য দাঁড়াবে ২,৩৬৭,২৭৭ টাকা। ঐ একই হিসেব অনুযায়ী খুচরা হারে সমগ্র কাঁচা মালের মূল্যের পরিমাণ হবে ১,২৮৬,২৭২ টাকা; আর সুতাকাটনীদের মুনাফা থাকে ১,০৮১,০০৫ টাকা বা প্রত্যেকের জন্য ৩১/৪ টাকা (বৎসরে ৬ শিলিং ৬ পেন্স)।…এইজন্য যেহেতু কয়েক বছর ধরে সরেশ মালের চাহিদা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে, সেহেতু স্ত্রীলোকদেরও প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে।"[৪]

সুতিবস্ত্র বয়নকারীদের সংখ্যাও প্রচুর। চাদর বা টেবল ক্লথ তৈরীর জন্য নিযুক্ত তাঁতের সংখ্যা ৭৫০। বাৎসরিক উৎপাদনের মোট মূল্য ৫৪০,০০০ টাকা। সুতোর খরচ বাদ দিয়ে মুনাফার পরিমাণ ৮১,৪০০ টাকা। এইভাবে প্রতিটি তাঁতের লাভ হয় ১০৮ টাকা। এক একটি তাঁত চালায় তিন জন করে লোক বা অন্যভাবে বলতে হয় প্রতিটি ব্যক্তির বাৎসরিক উপার্জন ৩৬ টাকা (৭২ শিলিং)। কিন্তু বেশীর ভাগ সুতিবস্ত্র উৎপাদকেরাই গ্রামের লোকেদের জন্য মোটা কাপড় তৈরী করত যার বাৎসরিক মূল্য ছিল ২,৪৩৮,৬২১ টাকা। সুতোর খরচ বাদ দিয়ে লাভ থাকত ৬৬৭,২৪২ টাকা। এতে প্রতিটি তাঁতের মুনাফা হত ২৮ টাকা (৫৬ শিলিং)।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুসৃত বন্দোবস্ত এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : "প্রতিটি লোক কোম্পানির কাজে আটক (আসামী) থেকে দু'টাকা করে পেত এবং যতদিন পর্যন্ত কোম্পানি যতটা চাইতো ততটা পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন না করত ততদিন পর্যন্ত সে অন্য কোন ব্যক্তির কাজও করতে পারত না। আবাসিক বাণিজ্য-ব্যবস্থাপকরাও কোনদিন কোন রকম আগাম দিতেন না। কোম্পানির দালালরা প্রতিটি তাঁতীকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নানা ধরনের বস্ত্র উৎপাদন করতে বলে এবং প্রতিটি বস্ত্র সরবরাহ করবার পর বাঁধা দর অনুযায়ী তাকে টাকা দেওয়া হয়।"[৫]

যে সব তাঁতীরা পুরোপুরি বা অংশত তসর সিল্কের কাপড় তৈরী করে তাদের বেশীর ভাগই ফতুহা, গয়া ও নাওয়াদায় বাস করে। উৎপাদনের মোট বাৎসরিক মূল্য ছিল ৪২১,৭১০ টাকা। প্রতিটি তাঁতের মুনাফা থাকত বছরে ৩৩ থেকে ৯০ টাকা আর প্রতিটি তাঁতের জন্য প্রয়োজন হত একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্পের মধ্যে ছিল কাগজ উৎপাদন, চামড়ার কাজ, গন্ধদ্রব্য, লৌহ দ্রব্য, সোনা ও রূপোর কাজ, পাথরের কাজ, মৃৎপাত্রের কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ ও চুন উৎপাদন, বস্ত্র-রাঙানো, কম্বল তৈরী এবং সোনা ও রূপোর জরি ও বস্ত্র উৎপাদন। এই জেলার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বেশীর ভাগই চালাতেন বলদিয়া-ব্যাপারী বা যেসব বণিকের মালবাহী বলদ আছে। একটা বলদ আর ৫ টাকার মূলধন নিয়েই ব্যাপারী বাণিজ্য আরম্ভ করতে পারতেন প্রতিমাসে তিনি ৫০ টাকার মাল বিক্রি করতেন, লাভ থাকত শতকরা ৬ টাকা থেকে ১২ টাকা। এই ভাবে বছরে ৩২ টাকা (৬৪ শিলিং) মুনাফা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত থাকতেন। পাটনা থেকে কলকাতায় মাল চালান যেত

নৌকায়। ১০০ মণ (৮০০০ পাউণ্ড) শস্য বহন করার জন্য মাসুল ছিল ১২ থেকে ১৫ টাকা (২৪ থেকে ৩০ শিলিং)। গরুর গাড়ীতে গাড়োয়ানরা স্বল্প দূরত্বে মাল বহন করত। পাটনা থেকে গয়া (৭২ মাইল) পর্যন্ত ১২ থেকে ১৫ মণ (৯৬০ থেকে ১২০০ পাউণ্ড) মাল বহন করার জন্য একটা গরুর গাড়ীর ভাড়া ছিল ৩ টাকা বা ৬ শিলিং।

একশত বৎসর পূর্বের ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বাণিজ্য ও বৃত্তির এই তালিকায় নজর বোলালে দেখা যাবে যে এই সময়ের মধ্যে আয়ের উৎসগুলি কি ভাবে বিশেষরূপে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। সুতা-কাটা ও বয়ন শিল্প বলতে গেলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ লোকেরা যে সুতো ও বস্ত্র ব্যবহার করেন তার সরবরাহ হয় ল্যাঙ্কাশায়র থেকে। কাগজ উৎপাদনের অবনতি ঘটেছে। উন্নত ধরনের চামড়ার কাজের জন্য সমস্ত চামড়াই ইয়োরোপ পাঠানো হয়। সমস্ত রঙের কাজের পরিবর্তে এসেছে রাসায়নিক রঞ্জকের কাজ। ব্যাপারী ও তাঁদের মালবাহী বলদ এখন অতীতের বিষয়বস্তু। বাণিজ্যসম্ভার বয়ে নিয়ে যাবার জন্য যে লাভ হয় সেটা আর মাঝিরা পায় না, পায় রেলপথের মালিক বিদেশী পুঁজিপতিরা। বহু বাণিজ্য ও শিল্প হারাবার পর এখন প্রকৃতপক্ষে কৃষিই হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশের লোকের জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায়।

সাহাবাদ জেলা

(আয়তন ৪০৮৭ বর্গ মাইল; লোকসংখ্যা ১,৪১৯,৫২০)

ধানের উৎপাদনই ছিল সবচাইতে বেশী। কিন্তু নিজ নিজ জমিদারীতে স্থিত জলাধারগুলির সংস্কার সাধনে জমিদারের অবহেলার ফলে ধান চাষের অবনতি ঘটেছে। জেলার অর্ধেক অঞ্চলেই ধানের চাষ হত। সেচের বিস্তার ঘটলে সাহাবাদ জেলা পাটনা ও গয়া জেলার মতই উৎপাদনশীল হয়ে উঠত। কিন্তু সাহাবাদের চাল ততটা সরু নয়।

ফসল তোলবার জন্য দিন-মজুরদের ন্যূনতম পারিশ্রমিক হল মোট উৎপাদনের ৩$\frac{1}{8}$ শতাংশ আর উচ্চতম পারিশ্রমিক ছিল ৮$\frac{1}{8}$ শতাংশ। গড় হিসেবে একজন মজুর প্রতিদিন ১৯৫ পাউণ্ড ফসল কাটত, দিন মজুর হলে তার জন্য সে পেত ৬ শতাংশের বেশী আর খেতি মজুর হলে তাকে দেওয়া হত ৭$\frac{1}{2}$ শতাংশের কম। বীজের জন্য শস্য মাটির পাত্রে মজুত থাকত। বেশীর ভাগ শস্যাগারের ভেতরে থাকত অনেকগুলি খোপের মতন। সাধারণতঃ এই

শস্যাগারগুলি হত খড়ের দড়ি পাকিয়ে তৈরী ঝুড়ি দিয়ে এবং এগুলি দেখতে ছিল স্কটল্যাণ্ডে যে ধরনের মৌচাক দেখা যায় সেই রকম। এই শস্যাগারগুলিতে ২৯,৩৬০ পাউণ্ড ধান মজুত করা যেত। বড় বড় শস্যাগারগুলি গোলাবাড়ীতে স্থাপিত হত এবং মাটির চত্বরে ঢাকা থাকত। ছোট ছোট শস্যাগারগুলি কুটীরের পাশেই থাকত।

"এই জেলার যে সমস্ত জমিদারীর খাজনা ধার্য করা হয়েছে তাদের প্রায় সমস্ত মালিকই অভিযোগ করে থাকেন যে (কোম্পানি সরকার কর্তৃক ধার্য) খাজনার হার খুবই গুরুভার। তাঁদের নিজেদের মুনাফা থাকে খুবই সামান্য অথবা একেবারেই থাকে না। প্রমাণস্বরূপ তাঁরা উল্লেখ করেন যে বহু জমিদারীই নিলামে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন ডাক ওঠে নি। বকেয়া খাজনা না পেয়ে সরকার স্বল্পমূল্যে জমি ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁদের আরও অভিযোগ যে রাজস্বের হার এতই চড়া যে মালিকের আর কিছুই থাকে না। জলাধারগুলির সংস্কারের ব্যয়ভার বহন করবার ক্ষমতা আর তাঁদের নেই এবং নিঃসন্দেহ দেশের লোক রাজস্ব জমা দিতে দিন দিনই অসমর্থ হয়ে পড়ছেন।"[৬]

উঁচু মালভূমি বাদ দিয়ে, সাহাবাদ জেলার ৩১৫১ বর্গমাইল বিস্তৃত কর্ষণযোগ্য জমির বাবদ সরকারের প্রাপ্য ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ১,১৩২,৬৭৭ টাকা। আর, পাটনা ও বিহারে ৩০৫১ বর্গ মাইল পরিমিত কর্ষণযোগ্য জমি বাবদ ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৪১২,২৬৯ টাকা।

সুতাকাটা ও বয়নশিল্প ছিল সাহাবাদ জেলার বিরাট জাতীয় শিল্প। ১৫৯,৫০০ স্ত্রীলোক সুতো কাটবার কাজ করতেন এবং বছরে তারা ১,২৫০,০০০ টাকা মূল্যের সুতো উৎপাদন করতেন। তুলোর খরচ বাদ দিয়ে প্রতিটি স্ত্রীলোক বছরে ১½ টাকা বা ৩ শিলিং উপার্জন করত। এটা খুবই সামান্য, কিন্তু এই সামান্য উপার্জনই স্ত্রীলোকদের নিজ নিজ পরিবারের আয়ের সঙ্গে যুক্ত হত।

তাঁতীরা সুতির কাজই করতেন, কারণ সাহাবাদে মাত্র সামান্য-সংখ্যক সিল্ক-বোনা তাঁতী ছিল। এই জেলায় সুতির কাজে নিযুক্ত ৭০২৫টি তাঁতী পরিবারের জন্য ছিল ৭৯৫০টি তাঁত। তাঁত-পিছু বাৎসরিক আয় হত ২০¾ টাকা বা ৪১ শিলিং ৬ পেন্স। প্রতিটি তাঁতে কাজ করত একজন তাঁতী, তার স্ত্রী ও একজন বালক বা বালিকা। ডাঃ বুকানান সন্দেহ করেছিলেন যে উপরে তাঁত-পিছু যে আয় দেখানো হয়েছে সেটা কম করে বলা হয়েছে, কারণ বছরে ৪৮ টাকা বা ৪ পাউণ্ড ১৬ শিলিং এর কম আয়ে কোন পরিবারের চলতে পারত না।

কাগজ, গন্ধদ্রব্য, তেল, লবণ ও মদ সাহাবাদে তৈরী হত। আমদানী ও রপ্তানীর জন্য চাল ছিল উল্লেখযোগ্য সামগ্রী। যব বারাণসীতে চালান যেত আর অরহড়ের ডাল যেত মুর্শিদাবাদে। তামাক আমদানি হত ছাপড়া থেকে, চিনি আসত মীর্জাপুর থেকে, লোহা রামগড় থেকে আর দস্তা, তামা, সিসা ও টিন আসত পাটনা থেকে। কাঁচা রেশম, বস্ত্র, লবণ ও সৌখীন দ্রব্য সামগ্রী রতনপুরের মারাঠা এলাকায় রপ্তানি হত।

সাপ্তাহিক হাটের সংখ্যা বিহারের চাইতে কম ছিল। যদিও প্রায় সমস্ত বেচাকেনাই সেখানে চলত। তখনো মুদ্রা হিসেবে ব্যাঙ্ক নোটের প্রচলন হয় নি এবং "বিহারে যে কারণে সোনা বিলুপ্ত হয়েছিল এখানেও সে কারণেই সোনা প্রায় অদৃশ্য হয়ে পড়েছে।" চার ধারে খাঁজকাটা কোম্পানির তাম্রমুদ্রা কেবলমাত্র আরা শহরেই প্রচলিত ছিল। গোরক্ষপুর থেকে ভেতরের দিকে অনুন্নত শ্রেণীদের মধ্যে তাম্রমুদ্রার এবং মধুশাহী ও শেরগাজীর ভেতরের দিকে পয়সার প্রচলন ছিল। তাম্রমুদ্রার বিনিময়ে কড়ির ব্যবহার ছিল।

নৌকার সংখ্যা বিহারের থেকে কম ছিল। বিন্ধুলিয়া থেকে বারাণসী এই ১৪০ মাইল দূরত্বে একশ মণ (৮০০০ পাউণ্ড) মাল বহন করবার জন্য ভাড়া লাগত ১২ টাকা বা ২৪ শিলিং। এই জেলার ওপর দিয়ে দুটো রাস্তা ছিল। সরকারের নিজের রক্ষণাবেক্ষণে একটি ছিল কলকাতা থেকে বারাণসী পর্যন্ত সামরিক যান চলাচলের পথ। আরেকটি পথ ছিল গঙ্গার পুরনো তীর ধরে। তার জন্য জেলার সমগ্র ভূমির ওপর ধার্য করের শতকরা একভাগ খাজনা দেয় ছিল। বর্ষাকালে দুটো পথই অব্যবহার্য ছিল।

ভোজপুরের কায়স্থ রাজা হরদার সিং, মুসলমান জমিদার আবদুল নাসার, বিবি আসমাৎ নামে জনৈকা মুসলমান মহিলা, লালা রাজরূপ ও লালা কাননগো নামে দু'জন কায়স্থ আরো অনেকের মধ্যে বিদেশী ও ভিক্ষুকদের অন্নদান করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। গরীবদের প্রতি আতিথেয়তার এই প্রাচীন আচার হিন্দুদের কাছে সদাব্রত বা ভগবানের প্রতি নিরন্তর ভক্তি বলে পরিচিত ছিল।

ভাগলপুর জেলা

(আয়তন ৮২২৫ বর্গ মাইল ; লোকসংখ্যা ২,০১৯,৯০০)

ধানই ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শস্য। ৬০ সের ধানে ৩৭½ সের চাল হত। ধানের পরেই উল্লেখযোগ্য ফসল ছিল গম। মটর কলাই-এর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে যব বপন করা হত। উঁচু জমিতে ভুট্টা চাষ হত এবং পরের

তৃণকাণ্ডমুক্ত ফসল (খরিফ) হল মারুয়া। খেরি, কোদো, চীনা, জনার ও বাজরার চাষও হত।

কলাই, অরহড় ও খেসারি ছিল উল্লেখযোগ্য শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ। তিল ও অন্যান্য বহু তৈলদা উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। আদা, আনাজ, সবজি ও মসলা জেলার লোকেদের ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন হত।

৪০০০ একর জমিতে তুলোর চাষ হত। এ বাদেও, পাহাড়ী উপজাতিরা নিজ নিজ এলাকাস্থিত পাহাড়ে যথেষ্ট পরিমাণ তুলো উৎপন্ন করত। আখ প্রধানত নদীতীরের কাছেই জন্মাতো। খাল কেটে সেখানে সহজেই ক্ষেতে সেচের কাজ চলত। জেলার প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপন্ন তামাক যথেষ্ট পরিমাণ ছিল না। মোট উৎপাদনের অর্ধেক চাষের খরচ তুলে আনতো এবং ভূম্যধিকারীকে প্রদত্ত খাজনার পরিমাণ বাকি অর্ধেকের সমানও হত না।[৭] যেহেতু অগ্রিম দেবার রীতি বিশেষ প্রচলিত ছিল না, প্রজারাও ঋণে আবদ্ধ হত না। অর্থের মাধ্যমে খাজনা কিস্তি হিসেবে আদায় হত আর শস্যের মাধ্যমে খাজনা আদায় হত যখন ফসল তোলা হত। "ভাগ-বাঁটোয়ারার আগে উৎপন্ন শস্য থেকে বিভিন্ন বাবদে শস্য বাদ দেওয়া হত, বিশেষ করে ফসল তোলবার পুরো খরচ। সমস্ত যোগ বিয়োগের পর জমিদার পান কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক, কোথাও বা $\frac{২২}{৪০}$ ভাগ। কিন্তু যে-কথা বলেছি. এরপর খালের ও সেচের জন্য নির্মিত জলধারের সমস্ত খরচই জমিদারের বহন করতে হত। আর অন্যতম বড় খরচ, ফসল তোলাতেও ছিল দখলদার প্রজারই সুবিধা।"

উত্তরাঞ্চলে যে সব হালচাষী মরশুমের সময় কাজে নামত তারা ৫ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত অগ্রিম হিসেবে পেত। যতদিন না ঐ টাকা শোধ হয়ে যেত ততক্ষণ তারা মনিবের কাজ করে যেত। দক্ষিণাঞ্চলে শস্যের একটা বিচিত্র ভাগ-বাঁটোয়ারা হত। জমির মালিক প্রথমেই বীজের দ্বিগুণ পরিমাণ শস্য নিয়ে নিত এবং তারপর অবশিষ্টাংশের দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ গ্রহণ করত। মজুর বাকি এক-তৃতীয়াংশ পেত।

হিন্দু চাষীদের চেয়ে পার্বত্য উপজাতিরা কৃষির ব্যাপারে অনেক কম যত্নশীল অনেক কম পরিশ্রমী ছিল। মদ্যপানেই তারা বেশী আসক্ত ছিল। এই পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে আবার উত্তরাঞ্চলের উপজাতিরা দক্ষিণাঞ্চলের উপজাতিদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিশ্রমী ও শিষ্ট ছিল, যদিও তাদের মধ্যেও নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রায়শই অত্যধিক মদ্যপান চলত। পার্বত্য

উপজাতিদের মধ্যে ফসল তোলবার প্রথাও ছিল বিচিত্র। খাড়া পাহাড়ের পাথরের ফাঁকে ফাঁকে দু'তিন আঙুল গভীর গর্ত খোঁড়া হত। বিচিত্র সংমিশ্রণ থেকে যা হাতে ওঠে তেমন দশ বারটি করে বীজ ঐ গর্তগুলির মধ্যে ফেলে দেওয়া হত। যে যে ফসল হত তা মাসের পর মাস তোলা হত। উত্তরাঞ্চলের উপজাতিরা তুলার চাষ করত, কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের উপজাতিরা করত না।

সমস্ত বর্ণের লোকেরাই সুতো কাটতে অধিকারী ছিল। ১৬০,০০০ মত স্ত্রীলোক সুতো তৈরী করত বলে মনে করা হত। তুলোর খরচা বাদ দিয়ে প্রতিটি স্ত্রীলোক বছরে ৪১/২ টাকা বা ৯ শিলিং আয় করত। এই টাকাটা পারিবারিক আয়েই যোগ হত।

সামান্য কয়েকজন তাঁতী কেবলমাত্র রেশমের কাজ করত। ভাগলপুর শহরের উপকণ্ঠে বহু তাঁতী রেশম আর তুলো সংমিশ্রিত করে তসরের কাপড় উৎপন্ন করত। ৩২৭৫টি তাঁতে এই রকম কাজ হত। বাফ্‌তা ও নমুনা বলে পরিচিত কাপড় উৎপাদনের জন্য কোম্পানির বাণিজ্যিক রেসিডেণ্ট ১০,০০০ টাকা অগ্রিম দিতেন। স্ত্রীলোকদের আয় বাদ দিয়ে মিশ্রিত রেশম ও তুলা-শিল্পে নিযুক্ত প্রতিটি তাঁতীর বাৎসরিক লাভ ৪৬ টাকা বা ৯৮ শিলিং বলে ধরে নেওয়া হত।

তুলাজাত বস্ত্রের উৎপাদনের জন্য ছিল ৭২৭৯টি তাঁত। প্রতিটি তাঁত থেকেই বছরে ২০ টাকা বা ৪০ শিলিং আয় হত। আর একটি হিসেব অনুসারে এই শিল্পে নিযুক্ত একজন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মোট বাৎসরিক লাভ ছিল ৩২ টাকা বা ৬৪ শিলিং। তুলোর কার্পেট, ফিতে, তাঁবুর দড়ি, ছিট-কাপড় এবং কম্বলও এই জেলায় উৎপন্ন হত।

এই জেলার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্পসামগ্রীর মধ্যে বলা যেতে পারে কাঁচের চুড়ি, চামড়া পাকা করবার কাজ, লোহার কাজ এবং ছুতোরের কাজ, মৃৎশিল্প, পাথর কাটা, সোনা-রূপার কাজ ও দস্তার কাজ। ইয়োরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ নীলের চাষ করত এবং উৎপন্ন শোরা কোম্পানি কিনে নিত।

এই জেলার লোকেরা বাংলাদেশের লোকদের মতন ততটা হাটেবাজারে যেত না। দোকানদার ও সওদাগরদের সঙ্গেই তাদের বেচাকেনা চলত। সোনা প্রায়ই পাওয়াই যেত না। কলকাতার কুলদার টাকার প্রচলনই ছিল সবচাইতে বেশী। বিভিন্ন ধরনের তাম্রমুদ্রাও বেশ ব্যবহৃত হত। "এই জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মুদ্রা প্রায় দেখাই যায় না এবং বেশীর ভাগ বাণিজ্যিক লেনদেনই ঘটে পণ্যসামগ্রীর বিনিময় মারফৎ।"[৯]

এই জেলায় নৌচলাচল, তেমন একটা ছিল না। মুঙ্গের থেকে কলকাতা (৩০০ মাইল) পর্যন্ত ১০০ মণ (৮০০০ পাউণ্ড) মালবহনের মাসুল ছিল ১০ থেকে ১৪ টাকা বা ২০-২৮ শিলিং। দেশের বেশীর ভাগ স্থলবাণিজ্যের সামগ্রীই গরুর গাড়ীতে বা বলদের পিঠে বহন করা হত। কলকাতা থেকে পাটনা হয়ে যে পথ বারাণসী গেছে সেটাই ছিল এই জেলার একমাত্র উল্লেখযোগ্য সড়ক। বলদিয়া ব্যাপারী বা মালবাহী বলদ নিয়ে যারা বাণিজ্য করত তাদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। পরিব্রাজকেরা সাধারণতঃ পায়ে হেঁটেই ভ্রমণ করত এবং প্রতি রাত্রের জন্য এক বা দু'পয়সার (এক পেনি) বিনিময়ে মুদি বা মেঠাই-এর দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করত। এই খরচের মধ্যে রন্ধনের জন্য খরচও ধরা হত। কিন্তু খাবার প্রস্তুত করবার জন্য যে জিনিস লাগত তার জন্য আলাদা খরচ দিতে হত। মুসলমান পরিব্রাজকেরা ঘর ও রান্নার জন্য দ্বিগুণ ভাড়া দিত। কারণ তাদের জন্য ভাতিয়ারাদের আলাদা রান্না করে দিতে হত।

গোরক্ষপুর জেলা

(আয়তন ৭৪২৩ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ১,৩৮৫,৪৯৫)

যদিও কোন কোন অংশে অল্পপরিমাণ ধান উৎপন্ন হত, তবুও সামগ্রিক-ভাবে ধানই ছিল উল্লেখযোগ্য শস্য এবং যেখানে কৃত্রিম সেচের প্রয়োজন হত না সেখানেই ধানের চাষ হত। গম ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শস্য এবং জেলার বহু অঞ্চলেই ধানের উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যেত। গম ও যবের সংমিশ্রণ একটা চলতি প্রথা ছিল। কিছু গম তৈলবীজের সঙ্গে মিশিয়েও বপন করা হত। কিছু যব আবার মটরের সঙ্গে মিশিয়ে বপন করা হত।

শুঁটি জাতীয় শস্যের মধ্যে ছিল অরহড়, চানা, মাস, মসুর, ভৃঙ্গি ও মটর চূর্ণ করা যায় এমন বহুপ্রকার শস্যেরও চাষ হত। তেলের জন্য তিসি, তিল ও রাই-এর চাষ হত। তুলার চাষ সামান্যই হত। শর্করাযুক্ত রসের জন্য খেজুর ও মহুয়ার উৎপাদন হত। আখের চাষ হত প্রায় ১৬০০ একর জমিতে। তামাক ও পান প্রচুর পরিমাণে জন্মাত। আফিং-এর চাষ কোম্পানির সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।

দড়ির ঝোলানো ঝুড়ির সাহায্যে নদী, নালা, পুকুর ও জলাভূমির জলে ক্ষেতে সেচের কাজ হত। দশ জন লোক একদিনে তিন থেকে পাঁচ হাজার বর্গফুট এলাকা সিঞ্চিত করতে পারত। কোন কোন ক্ষেতে আবার কুয়ো থেকে চামড়ার থলিতে গরু-মোষের সাহায্যে জল তুলে সেচ হত। খাজনার বেশীর

ভাগ অংশই টাকার মাধ্যমে জমা দেওয়া হত, যদিও অঞ্চল বিশেষে ফসলের ভাগ বাঁটোয়ারার মারফৎ খাজনা জমা নেওয়া চলত। যেখানে শেষোক্ত প্রথাটি চালু ছিল সেখানে হাল দেওয়া, বোনা, ফসল তোলা এবং অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে জমিদার ফসলের এক চতুর্থাংশ পেতেন।[১০]

অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলার অধীনে যে কয়েকটি জেলায় সমৃদ্ধি ঘটেছিল, গোরক্ষপুর সেই জেলাগুলিরই একটি। আসফ্-উদ্-দৌলার অধীনে কর্নেল হ্যানির ওপর যখন খাজনার ভার দেওয়া হয়েছিল তখন এই জেলাগুলিতে নিপীড়ন, বিদ্রোহ ও লোকহানি দেখা দিয়েছিল এবং মারকুইস অব ওয়েলেসলির বন্দোবস্ত অনুসারে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ঐ জেলাগুলি কোম্পানির কাছে হস্তান্তরিত হয়েছিল। পূর্বতন অধ্যায়গুলিতে আমরা এই ঘটনাগুলি উল্লেখ করেছি এবং দেখিয়েছি যে হস্তান্তরিত ও বিজিত প্রদেশ সমূহে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত করবার জন্য লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০৩ ও ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি কখনোই পালিত হয় নি। হস্তান্তরিত জেলাগুলিরই একটি গোরক্ষপুর সম্পর্কে ডাঃ বুকানানের বিবরণ কৌতূহলজনক। হস্তান্তরিত হবার দশ বছর পর তিনি গোরক্ষপুর পরিদর্শন করেছিলেন।

"সুজা-উদ্-দৌলার শাসনকালে এই জেলার অবস্থা বর্তমান অবস্থা থেকে অনেক ভাল ছিল। কর্ণেল হ্যানিকে যখন খাজনার ভার দেওয়া হল, তখন এই ভদ্রলোক আদায়ের জন্য এমন হিংস্র পন্থা অবলম্বন করলেন যে দেশটাই জনহীন হয়ে পড়ল—এ কথা ঠিকই বলা হয়ে থাকে। চাষবাসের বহু চিহ্নই আমি নিশ্চিত ভাবে প্রত্যক্ষ করেছি যেখানে এখন শুধু পতিত জমি ও জঙ্গল।..."

"অঞ্চলটি যখন ইংরেজদের কাছে হস্তান্তরিত হল, তখন ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত মেজর রুডলেজ্ প্রচুর উদ্যম ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। আমাদের পরিচিত শৃঙ্খলার শক্তি তাঁকে কর্তৃত্ব দিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিটি ঘাঁটি ভেঙ্গে দিয়ে আইনের অপ্রতিরোধী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা এতে নিরাপদ বোধ করেছিল—পূর্বে যা ভাবাই যেত না। বসবাসকারীরাও চারদিক থেকে ফিরে এসেছিল। তাঁর দাবী প্রথমদিকে খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর প্রধানতম ভুল হয়েছিল অত্যল্প কালের জন্য বন্দোবস্ত করা।"

"সামগ্রিক ভাবে বলতে পারি যে আমার মনে হয় এই জেলার সম্পত্তির অধিকারীদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করা হয়েছে। যে সমস্ত অঞ্চল পুরোপুরি অধিকৃত—যেমন ঘোগরা নদীর দক্ষিণ দিক—সে সব অঞ্চলে আমি বাংলা, বিহার ও বারাণসীর অনুকরণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরই অনুমোদন করব।"[১১]

এখানে আমরা সেই পুরনো গল্পেরই পুনরাবৃত্তি পাচ্ছি। যেখানেই কোম্পানির মালিকানা বিস্তৃত হয়েছে, সেখানেই অশান্তির পরিবর্তে শান্তি এসেছে। বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে আইনের শাসন প্রতিস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সমস্ত দেশই অতিরিক্ত ও ক্রমবর্ধমান করের নিয়ন্ত্রণে আসে এবং উত্তর ভারতের কর আদায়কারীদের শক্তি বহু দশকব্যাপীই পূর্বতন বৈদেশিক আক্রমণকারী ও জলদস্যুদের সাময়িক দৌরাত্ম্য অপেক্ষা অধিকতর গুরুভার মনে হয়েছে।

একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার ছয়শ স্ত্রীলোক সুতো বোনার কাজে নিযুক্ত ছিল এবং মাথাপিছু তারা বছরে ২½ টাকা বা ৫ শিলিং উপার্জন করত। ৫৪৩৪টি তাঁতী পরিবারের ৬১১৪টি তাঁত ছিল। প্রতিটি তাঁত থেকে বাৎসরিক আয় হত ২৩½ টাকা বা ৪৭ শিলিং। ডাঃ বুকানানের মতে এই হিসেবটি প্রকৃত হিসেব থেকে অনেক কম এবং তাঁর বিশ্বাস প্রতিটি তাঁত থেকে বাৎসরিক আয় হত ৩৬ টাকা বা ৭২ শিলিং। নবাবগঞ্জে ছিট-কাপড় তৈরী হত আর স্থানীয় চাহিদা মেটাবার জন্য কম্বল বোনা হত।

ছুতোররা লোহার কাজ করত অথবা দরজা, জানলা, ঠেলা গাড়ী, চাষের যন্ত্রপাতি, পাল্কী, বাক্স এবং অনেক সময় নৌকা তৈরী করত। প্রতি বছর ২০০ থেকে ৪০০-এর মতন নৌকা তৈরী হত। পিতলের কারিগরেরা কাঁসার পাত্র তৈরী করত। ছ'জন লোক তিন মাসে ২৪০ টাকা মূল্যের জিনিস উৎপাদন করতে পারত যাতে তাদের লাভ থাকত ৫৬ টাকা। এই ভাবে প্রতিটি ব্যক্তির মাসিক আয় হত ৩ টাকা বা ৬ শিলিং। পিতলের অলংকারও অনেক তৈরী হত। এই জেলায় চিনি ও লবণের উৎপাদন হত।

যে রাজ্যাংশ তখনও অযোধ্যায় নবাবের হাতে সেখান থেকেই বেশীর ভাগ শস্য আমদানি হত। নেপালের অন্তর্গত উপত্যকা থেকেও শস্য আমদানি হত। সারাণ জেলা ও অন্যত্র থেকে চিনি ও তামাকের আমদানি হত। হাতী আর তামার পাত্র আসত নেপাল থেকে। পিতল ও কাঁসার পাত্র আসত পাটনা থেকে। বাণিজ্য বহন করত হয় আবাসিক বণিকগণ, বা মালবাহী বলদের ব্যাপারীগণ অথবা যে কৃষকদের গরুর গাড়ী থাকত তারা। কাপাড়িয়া বণিকেরা বস্ত্র আমদানি করত। বাঁজরা বণিক লবণ আমদানি করত ও কুনিয়া বণিক তা বিক্রয় করত। বেনিয়ারা শস্যের খুচরো বিক্রেতা ছিল। তুলোর ব্যাপারীরা তুলো আমদানি করত। আর মহাজনেরা খাজনা জমা দেবার জন্য কৃষকদের এবং সরকারের কাছে ভূমি-কর জমা দেবার জন্য জমিদারদের টাকা ধার দিত।

সাপ্তাহিক হাটও বসত, যেমন ছিল সাহাবাদ, লখনৌ ও বারাণসীতে।

টাকার ব্যবহার সাধারণভাবে চালু ছিল। কিন্তু কলকাতা-রূপি কদাচিৎ দেখা যেত। স্থানীয় তাম্রমুদ্রাঙ্কণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নেপালী তামার মুদ্রা সাধারণভাবে চালু ছিল এবং মুদ্রা হিসেবে কড়িরও ব্যবহার ছিল।

জনৈক সাধু আপন শহরবাসীদের জন্য গোরক্ষপুরে কয়েকটি চমৎকার সেতু তৈরী করে দিয়েছিলেন। গোরক্ষপুরে চারটি সদাব্রত বা দানশালা ছিল, দুটি ছিল ভেওয়াপুরে, আর একটি করে দানশালা ছিল লালগঞ্জ ও মগাহারে।

দিনাজপুর জেলা

(আয়তন ৫৩৭৪ বর্গ মাইল ; লোকসংখ্যা ৩০,০০,০০০)

ধানই ছিল এই জেলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শস্য। কোন কোন জমিতে দু'টো ধানের ফলন হত। একটা ফসল তোলা হত গ্রীষ্মের শেষে এবং অন্য ফসলটি তোলা হত শীতের শেষে। বোরো বলে পরিচিত তৃতীয় রকমের ধানের সামান্যই চাষ হত এবং বসন্তকালে সেই ফসল তোলা হত।

উঁচু জমিতে যেখানে গ্রীষ্মকালীন ধানের চাষ হত সেখানে কিছুটা সারের প্রয়োজন হত এবং সেখানে সরষের মত শীতকালীন ফসলও ফলত। কিন্তু যে নীচু জমিতে আমন ধানের চাষ হত সেখানে কোন সারের প্রয়োজন হত না এবং সেখানে একটাই মাত্র ফলন হত। ছ ফুট লম্বা একটা কাঠের দণ্ডবিশেষের সাহায্যে মেয়েরা ধান ভানত। একে বলা হয় ঢেকি। ৪০ সের ধানে ২৮ সেরের কিছু বেশী চাল হত।

গম ও যব দিনাজপুরে সামান্যই ফলত। অনুর্বর জমিতে মারুয়ার ফলন হত। শুঁটি জাতীয় শস্যের মধ্যে কলাই, খেসারি ও মসুরই ছিল প্রধান এবং মটর প্রধানতম ডাল। তেলের জন্য সরষে, রাই ও মসিনার উৎপাদন হত।

প্রায় ৩৭,০০০ একর জমিতে আম, কাঁঠাল, তেঁতুল প্রভৃতির বাগান ছিল এবং ৮৩,০০০ একর জমি ছিল রন্ধনোপযোগী সবজির জন্য। ১৩,০০০ একরে পাটের চাষ হত, ৮,০০০ একর জমিতে তুলো, ৫,০০০ একর জমিতে ধান ও ৮,০০০ একর জমিতে আখের উৎপাদন হত। তামাকের জন্য ছিল ৫০০ একর এবং পানের জন্য ২০০ একর জমি।

রং-এর জন্য নীল ও লোধ্রের উৎপাদন হত। নীলের চাষ ৫০০০ একর জমিতে। ডাঃ বুকানান যে প্রথার প্রচলন দেখেছিলেন তা এখনও বাংলার অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত প্রথারই অনুরূপ। প্রত্যেক চাষীকেই নিজস্ব জমির কিছুটা অংশে ইয়োরোপীয় প্ল্যাণ্টারের জন্য নীলের চাষ করতে হত।

মহানন্দা নদীর এক মাইলের মধ্যে ভেরশ একর উর্বর জমিতে এবং, আম, বট ও পিপুল গাছের অভিজাত কাননে রেশমকীটের জন্য তুঁত জন্মাত। কোম্পানির বাণিজ্যিক রেসিডেন্ট রেশমগুটির বিরাট অংশের জন্য দাদন দিতেন।

ক্ষেতে সেচের ব্যবস্থা ছিল, তবে তা যথেষ্ট ছিল না। এই জেলায় কৃত্রিম হ্রদের সংখ্যা ছিল প্রচুর এবং প্রায় সব কটি হ্রদের সঙ্গেই ঝর্ণা ছিল, ফলে জলের সরবরাহ সাধারণভাবে যথেষ্ট ছিল। যখনই অনাবৃষ্টি হত, তখনই এই জলাশয়-গুলির সাহায্য নিতে হত।

এই জেলায় ৪৮০,০০০টি হাল ছিল, যার অর্থ ৯৬০,০০০টি হালের বলদ ও গরু। এ ছাড়াও ছিল ৩৩৬,০০০টি গাভী। গোচারণভূমি ছিল ২৬১ বর্গ মাইল জলা জমি। খরার সময় এই জমি বড় বড় ঘাসে ছেয়ে যেত। ২২১ মাইল বনভূমি, প্রায় ৩০০ মাইল পতিত জমি এবং প্রায় ৬৫০ মাইল জমি ছিল। ৬৫০ মাইল জমিতে মাঝে মাঝে চাষ হত কিন্তু এর পাঁচভাগের চারভাগ জমিতে কোনদিনই চাষ হত না। গোচারণের জন্য কোন খাজনা চাপানো হত না। অনাবাদি যে কোন জমিতেই পশু চরানো যেত।[১২]

৫৫ একর জমির জোতই খুব বড় বলে ধরা হত। ১৫ থেকে ২০ একর পর্যন্ত জমির জোত ছিল স্বাচ্ছন্দ্যকর ও সহজ। কিন্তু যে গরীব চাষীরা তাদের পরিবার-বর্গ সহ মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশ ছিল, তাদের দখলে থাকত ৫ থেকে ১০ একর পর্যন্ত জমি। চাষের খরচ মোট উৎপাদনের অর্ধেকের বেশী ছিল না। খাজনার পরিমাণ উৎপাদনের এক চতুর্থাংশের অধিক ছিল না এবং এই খাজনা সবসময়েই নগদ টাকায় জমা দেওয়া হত।[১৩] জেলার বেশীরভাগ অঞ্চলেই চাষীদের চিরস্থায়ী ইজারা দেওয়া হত। ক্ষেত্র বিশেষে যদি তারা "কোন খামার দশ বৎসর ধরে অধিকার করে থাকে, তবে নির্ধারিত খাজনার হারে সেই খামারের উপর তারা মৌরুসী পাট্টা দাবী করে।"

সুতো কাটাই ছিল প্রধানতম শিল্প-উৎপাদন। "সমস্ত উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকেরা এবং বেশীরভাগ চাষীদের স্ত্রীরা অবসর সময়ে সুতো কাটতে ব্যস্ত থাকত।" বিকেলবেলায় সুতো কেটে প্রতিটি স্ত্রীলোকের সাধারণ বাৎসরিক উপার্জন হত ৩ টাকা বা ৬ শিলিং। এই জেলায় যারা সুতো কাটত তারা যে পরিমাণ কাঁচা তুলো ক্রয় করত তার মোট মূল্য ২৫০,০০০ টাকা। কাটা সুতোর মূল্য ছিল ১,১৬৫,০০০ টাকা। সুতরাং স্ত্রীলোকদের মোট লাভ থাকত ৯১৫,০০০ টাকা বা প্রায় ১০০,০০০ পাউণ্ড।

মালদাই বস্ত্রে থাকত রেশমের টানা সুতো আর তুলোর পড়েন সুতো বা

বুনন। মালদহতে তৈরী হত বলেই এই নাম। এই কাজের জন্য চার হাজার তাঁত নিযুক্ত থাকত এবং বলা হত যে প্রতিটি তাঁত মাসে ২০ টাকা মূল্যের বস্ত্র উৎপাদন করত। ডাঃ বুকানান এই হিসেবটাকে বেশ চড়া বলেই মনে করেছেন। বড় আকারের বস্ত্রখণ্ড উৎপাদনের জন্য নিযুক্ত এলাচি পরিমাপের ৮০০ তাঁত কোম্পানির মুৎসুদ্দিদের কাছ থেকে অগ্রিম পেত।

পুরোপুরি রেশমের বস্ত্র উৎপাদন মালদহের আশেপাশে ৫০০ তাঁতী পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মোট উৎপাদনের মূল্য ছিল ১২০,০০০ টাকা বা ১২,০০০ পাউণ্ড।

বিশুদ্ধ তুলাজাত বস্ত্র উৎপাদনই অধিকতর উল্লেখযোগ্য। জেলায় উৎপন্ন মোট তুলাজাত বস্ত্রের মূল্য ছিল ২,৬৭৪,০০০ টাকা বা ১৬৭,৪০০ পাউণ্ড।

কোচ, পুলিয়া ও রাজবংশী এই নিম্নবর্ণের হিন্দুরা নিজেদের পরিধানের জন্য পাট বুনে কাপড় তৈরী করত। বেশীর ভাগ পরিবারেরই তাঁত ছিল, আর বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকেরাই বিকেলবেলায় কাজ করত।

ছুঁচের সাহায্যে ফুলতোলা কাপড় মালদহের মুসলমান স্ত্রীলোকদের একটা বড় উপজীবিকা ছিল। ফুলগুলি তোলা হত হয় কোসিদা বা প্রবহমান চিকন নকশাতে অথবা খণ্ড খণ্ড ফুল বা বুটিতে। কিছু মুসলমান স্ত্রীলোক আবার ট্রাউজার, গলায় হার বা ব্রেসলেট বাঁধবার জন্য রেশমের ফিতে তৈরী করত।

তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল রং-এর উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য। নীল, লাক্ষা, লোধ ও হলুদ, মস্কি, হরিতকী, মঞ্জিষ্ঠা এবং নানা রকমের ফুল রং-এর উপাদান ছিল। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্পের মধ্যে ছিল গৃহনির্মাণ, মৃৎশিল্প, মাতুর, ব্রেসলেট, চামড়ার কাজ, ছুতোরের কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ, তামা, টিন ও লোহার কাজ, চিনি ও নীল উৎপাদন। শেষোক্ত শিল্পটি ইতোমধ্যেই ইয়োরোপীয় প্লাণ্টারদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সৃষ্টি করেছিল। প্লাণ্টারদের দুর্নামের প্রতি আরোপিত কারণগুলিকে ডাঃ বুকানান আটটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথমতঃ প্লাণ্টার ভাবত যে চাষী "তার দাস, অসন্তুষ্ট হলেই চাষীকে সে মারধোর করে ও আটকে রাখে"; দ্বিতীয়তঃ চাষীরা "জমি ও আগাছা উভয় পরিমাপেই বঞ্চিত হয়", তৃতীয়তঃ, ক্ষেতের সামগ্রিক উৎপাদন খাজনার বেশী হত না; চতুর্থতঃ, প্লাণ্টারগণ "উদ্ধত ও উগ্র ছিল।" পঞ্চমতঃ খাজনা আদায়ের ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করত; ষষ্ঠতঃ তারা "শাসক শ্রেণীর" অন্তর্ভুক্ত; সপ্তমতঃ তারা জমিদারদের পাওনাগণ্ডায় বাধা দিত; এবং অষ্টমতঃ চাষীদের তারা চাষবাস করতে বাধা দিত।

ডাঃ বুকানানের মনে হয়েছিল যে অভিযোগগুলি প্রায়শই অতিরঞ্জিত হলেও ভিত্তিহীন ছিল না এবং তিনি মনে করতেন যে "নতুন লাইসেন্স একেবারে বন্ধ করে দিলে এবং যে সমস্ত ইয়োরোপীয় নিজ নিজ আচরণের জন্য কোম্পানির কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নন তাদের প্রধান নগর বা বন্দরগুলিতে আটকে রাখলে অসীম সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হবে"[১৪]। এই ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি দূর করবার জন্য কোম্পানির যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল পরবর্তী অধ্যায়ে সে কথা বলা হবে।

এই জেলার বাণিজ্যের একটা বিরাট অংশ দেশীয় বণিকদের হাত থেকে কোম্পানির বণিকদের হাতে চলে গিয়েছিল। সওদাগর বা বড় দেশীয় বণিক বলতে এই জেলায় আর কেউ ছিল না। "এই উপজীবিকায় একটি পরিবার অবশ্য প্রচুর ধনসম্পত্তি অর্জন করেছিল। বৈদ্যনাথ মণ্ডলের পিতৃপিতামহগণ নয়পুরুষ ধরে প্রচুর খ্যাতি ও যোগ্যতার সঙ্গে বিপুল ব্যবসা চালিয়ে গেছেন। পরিবারের বর্তমান কর্তা ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে প্রচুর জমি কিনেছেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষেরা যতটা সম্মানিত ছিলেন তিনি ততটাই ঘৃণিত।"[১৫]

এই জেলায় বসবাসকারী অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যবসাদারগণ—যাদের বলা হয় মহাজন—২,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত মূলধন নিয়ে চাল, চিনি, গুড়, তৈল ও তামাক চালান করেন এবং লবণ, তুলা, ধাতু ও মশলা আমদানি করেন। দোকানের মোট সংখ্যা এই জেলায় ২০০০-ও ছিল না, কিন্তু খোলা বাজারের সংখ্যা ছিল প্রচুর। ছোট ছোট ব্যবসাদারদের বলা হত পাইকার। সোনা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল, কলকাতার কুলদার রুপিই ছিল চালু মুদ্রা এবং কড়িরও ব্যাপক প্রচলন ছিল।

বর্ষাকালে নৌকা-সব গ্রামেই যেত। কিন্তু তখন চালান বলে প্রায় কিছুই ছিল না। খরার দিনে বলদের পিঠে মাল চালান যেত, মাল চালান দেবার জন্য "রাস্তা বলতে কিছু ছিল না।" ১৩ টাকা বা ২৬ শিলিং-এর বিনিময়ে ১০০ মণ মাল (৮০০০ পাউণ্ড) নৌকায় কলকাতায় নিয়ে যেত। আধা-রুপিরও কম পয়সায় গরুর গাড়ীতে বার মাইল পথ মাল নিয়ে যেত।

পূর্ণিয়া জেলা

(আয়তন ৬৩৪০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ২,৯০৪,৩৮০)

এই জেলার প্রধানতম শস্য ছিল বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শীতকালীন ধান। সেদ্ধ না করলে সত্তর সের ধানে ৪০ সের চাল হত। সেদ্ধ করে নিলে ৬৫ সের ধানে ৪০ সের চাল হত। এই কাজে স্ত্রীলোকেরা সর্বত্রই ঢেঁকি ব্যবহার করত।

দিনাজপুর অপেক্ষা এই জেলায় গমের ব্যবহার বেশী ছিল। জমিতে হালচাষ না দিয়েই নদীর তীরে যব বপন করা হত এবং দরিদ্র লোকেরা যব প্রচুর পরিমাণে খেত। মারুয়াও যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া হত। বিশেষ করে কোশী নদীর পশ্চিমদিকে। ভুট্টা, জনার এবং বিভিন্ন ধরনের জোয়ার-ভুট্টার চাষ হত।

শুঁটি-জাতীয় শস্যের মধ্যে মাস-কলাই, খেসারি, অরহড়, বুঁট, কুলটি ও মুগের বহুল ব্যবহার ছিল। তেলের জন্য সরষে, রাই, তিসি ও রেড়ি জন্মানো হত। আঠাশ হাজার একর জমিতে শাক-সবজির চাষ হত।

দড়ির জন্য পাটের চাষ হত। তুলোর চাষ খুবই সামান্য ছিল। আখের চাষ প্রধানত কান কাঙ্গি নদীর তীরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই জেলায় উৎপন্ন তামাকের অর্ধেকেরই চাষ হত জেলা-শহরের আশে পাশে। পানও একটা উল্লেখযোগ্য উৎপাদন ছিল। যদিও এর ব্যবহার দিনাজপুর থেকে অনেক কম ছিল।

জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে শ্রী এলার্টনের ব্যবস্থাপনায় সতেরোটি নীলের কারখানা ছিল। জেলার অন্যান্য অংশে এরকম আরও পঞ্চাশটি কারখানা ছিল। রেশমকীটের জন্য তুঁতের চাষ সামগ্রিক ভাবে জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশেই সীমাবদ্ধ ছিল।

জেলার চারণভূমির মধ্যে ছিল ২৩৪ বর্গমাইল উঁচু পতিত জমি, ৪৮২ মাইল অকর্ষিত জমি ও ১৮৬ মাইল পাড়ভাঙ্গা জমি ও রাস্তা। এ ছাড়াও ছিল প্রায় ৩৮৯ মাইলের মত ঝোপঝাড়ে ভরা নীচু জমি। উপরন্তু আমন ধান তোলা হয়ে গেলে, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে ধানগাছের নাড়া একটি বিরাট সংস্থান হয়ে উঠত। নেপাল সরকারের অধীনে মোরাং-এর বনাঞ্চল বাদ দিলে এই জেলার চারণভূমি গরুমোষের মোট সংখ্যার পক্ষে যথেষ্ট হত না। মোরাং-এ পাঁচশ' বা ছ'শ গরুমোষের পালের মালিককে চারণ খরচা বাবদ গোর্খা অফিসারকে একটি এঁড়ে বাছুর দিতে হত। "জেলার অঞ্চল বিশেষে জমিদারগণের মধ্যে গোচারণ বাবদ খাজনা আদায় করবার একটা মানসিকতা ছিল, যদিও ঐ জমিদারগণ অন্যদিক দিয়ে গোঁড়া হিন্দু ছিলেন।

বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী খাজনারও তারতম্য ঘটত। কিন্তু চাষের সম্ভাব্য খরচ বাবদ [উৎপাদনের] অর্ধেক এবং অবশিষ্টাংশের অর্ধেক প্রজার নীট লাভ ধরে নিয়ে জমিদার যতটা পাবেন সেই সম্ভাব্য দাবীর পরিমাণ আমরা অনুমান করতে পারি এবং তাঁরা যতটা পান দাবীর মাত্রা সম্ভবত তাকে অনেকটা ছাড়িয়ে যায়।"[১৬]

অন্যভাবে বলতে গেলে, ডাঃ বুকানানের ধারণায় উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশই

যুক্তযুক্ত খাজনা। কিন্তু যে সময় কোম্পানি সরকার মাদ্রাজের কৃষকদের কাছ থেকে ভূমি-কর বাবদ উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক আদায় করতেন পূর্ণিয়া ও বাংলার অন্যান্য জেলায় জমিদারগণ খাজনা বাবদ তার চেয়ে অনেক কম আদায় করতেন।

সুতো কাটবার জন্য কোন বর্ণের লোকেরাই অসম্মানিত হতেন না। জেলার স্ত্রীলোকদের একটা বিরাট অংশই অবসর সময় কিছু না কিছু সুতো কাটতেন। ডাঃ বুকানান তাঁদের লাভের হিসেব কষতে পারেন নি। কিন্তু তিনি অনুমান করেছিলেন যে বছরে তাঁরা যতটা তুলা ব্যবহার করতেন তার মূল্য ৩০০,০০০ টাকা এবং কাটা সুতোর মূল্য ১,৩০০,০০০ টাকা, ফলে মুনাফা থাকত ১,০০০,০০০ টাকা বা ১০০,০০০ পাউণ্ড।

২০০ তাঁতে বিশুদ্ধ রেশমের বস্ত্র তৈরী হত। ৩৪,২০০ টাকা মূল্যের কাঁচা রেশম থেকে ৪৮,৬০০ টাকা মূল্যের বস্ত্র উৎপন্ন হত, মুনাফা হত ১৪,৪০০ টাকা। এই ভাবে প্রতিটি তাঁত থেকে বাৎসরিক আয় হত ৭২ টাকা বা ১৪৪ শিলিং।

যে সব তাঁতীরা রেশম ও তুলো মিশিয়ে কাপড় বুনত তাদের অবস্থা দিনাজপুরে যারা একাজ করত তাদের মতই ছিল।

তুলাবস্ত্রের তাঁতীদের সংখ্যা অনেক ছিল। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই গ্রামাঞ্চলে ব্যবহারের জন্য মোটা কাপড় উৎপাদন করত। সরেস কাপড় তৈরীর জন্য নিযুক্ত তিন হাজার পাঁচশ'টি তাঁতে ৫০৬,০০০ টাকা মূল্যের মাল উৎপন্ন হত এবং নীট লাভ থাকত ১৪৯,০০০ টাকা, অর্থাৎ প্রতিটি তাঁত থেকে বাৎসরিক আয় হত ৮৬ শিলিং। মোটা কাপড় উৎপাদনের জন্য নিযুক্ত দশ হাজার তাঁত ১,০৮৯,৫০০ টাকা মূল্যের বস্ত্র উৎপাদন করত এবং নীট লাভ আনত ৩২৪,০০০ টাকা, অর্থাৎ প্রতিটি তাঁত থেকে বাৎসরিক আয় হত ৬৫ শিলিং।

যে সব তাঁতী সতরঞ্জি ও ফিতে তৈরী করত তারা জেলা-শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাটের তৈরী মোটা কাপড়ের বহুল প্রচলন ছিল এবং পূর্ব সীমান্তের স্ত্রীলোকদের একটা বড় অংশ আচ্ছাদনের জন্য এই কাপড় ব্যবহার করত। কম্বল ও পশমের বস্ত্রও মোটা হত, কিন্তু বর্ষা ও শীতে গরীবদের খুবই তা কাজে আসত।

পূর্ণিয়ার অন্যান্য শিল্প-শ্রেণীর মধ্যে ছিল স্বর্ণকার, ছুতোর, বিদ্রি ও অন্যান্য ধাতুর কাজ, লোহার কাজ ও রং-এর কাজ। চিনির উৎপাদন তেমন ছিল না। পাঁচশ' পরিবার লবণ উৎপাদন করত।

তুলো আসত পশ্চিম ভারত থেকে আর চিনি আমদানি হত দিনাজপুর ও

পাটনা থেকে। পূর্ণিয়ায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের সাতটি কুঠি ছিল। টাকা জমা দিলে তারা হুণ্ডি দিত এবং অন্য কুঠি হুণ্ডিতে বাট্টা করত। "যদি সোনারূপো ভাঙ্গাবার প্রয়োজন হত, তবে তা একমাত্র এই কোঠিওয়ালাদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করা যেত। জগৎ শেঠের কুঠি যে কোন সময়েই এক লক্ষ টাকার হুণ্ডি কেটে দিতে পারে। অন্য কুঠি তার অর্ধেক পরিমাণের বেশী পারে না।" টাকশালের বাইরের পুরনো রূপির প্রচলন কলকাতার কুলদার রূপির মতই ছিল। "এ রকম একটা দরিদ্র অঞ্চলে স্বর্ণমুদ্রাঙ্কণ নীচ শ্রেণীর লোকেদের কাছে অত্যন্ত হয়রানিকর এবং আমার বিনীত মতে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন এখনই বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এই অঞ্চলে একটা রূপিই একটি বিরাট অঙ্ক।······সৌভাগ্যবশতঃ সোনা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং অর্থ প্রদানের বৈধ মাধ্যম হিসেবে আর গৃহীত না হওয়ায়, হয়ত আর কোনদিনই তা ফিরে আসবে না। জেলার প্রায় সমস্ত অংশেই প্রচলিত ছিল রূপোর মুদ্রা ও কড়ি। পশ্চিমাঞ্চলের দিকে পয়সা বলে পরিচিত কিছু তাম্র মুদ্রার প্রচলন আছে। এর মূল্য রূপির $\frac{১}{৬৪}$ ভাগ। কিন্তু এই পয়সাও এই অঞ্চলের সামান্য অর্থের পক্ষে যথেষ্ট বেশী। এখানে দুটি পয়সাই একটি পুরুষ-ভৃত্যের দৈনিক সন্তোষজনক ভাতার সমান।[১৭]

নদীপথে মাল বহনের জন্য এই জেলার সঙ্গতি বেশ ভাল ছিল এবং দিনাজপুর অপেক্ষা নৌকা অনেক বেশী ছিল। এই জেলা থেকে কলকাতা পর্যন্ত ১০০ মণ (৮০০ পাউণ্ড) মাল বহনের মাশুল ছিল ১৪ টাকা বা ২৮ শিলিং। জেলা শহরের আশে পাশে কতগুলি সড়ক ও নীলের কারখানা তৈরী হয়েছিল। মাল বহনের জন্য টাট্টু ঘোড়া এবং বলদ ব্যবহৃত হত। ধনী ব্যক্তিরা পরিব্রাজকদের বাসস্থান ও আশ্রয় দিত। মুদির দোকান বা মিঠাই-এর দোকানগুলি ছিল সরাইখানা বিশেষ, যেখানে তারা আহার ও ঘর ভাড়া পেত।

সংক্ষিপ্তসার

ডাঃ বুকাননের গ্রন্থে রংপুর ও আসাম—অবশিষ্ট এই দুটি জেলার যে বিবরণ আছে তা অসম্পূর্ণ। সেই বিবরণে কৃষি, খাজনা, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত বিবরণ নেই। সুতরাং বর্তমান অধ্যায়ে ঐ জেলাগুলির উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

যে ছয়টি জেলার বিবরণ উপরে দেওয়া হল, বর্তমানে ঐ নামের জেলাগুলি বলতে যে যে অঞ্চলবিশেষ বোঝায় তার থেকে অনেক বেশী অঞ্চল এই জেলা সমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের মোট আয়তন ছিল ৩৬,০০০ বর্গমাইল এবং

লোকসংখ্যা ছিল এক কোটি চল্লিশ লক্ষ। এই বিরাট ও জনাকীর্ণ জেলাগুলির বিবরণ থেকেই বাংলা ও উত্তর ভারতে কোম্পানির সামগ্রিক সম্পত্তির সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। সাধারণ লোকেরা তখনও যৎপরোনাস্তি দরিদ্র। কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় থেকে কৃষির উন্নতি ঘটেছিল এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকেই বহু পতিত জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।

জমিদারগণ যতটা সম্ভব খাজনা আদায় করতে ইচ্ছুক হলেও, মাদ্রাজে কোম্পানির কর্মচারীরা যে পরিমাণে আদায় করেছিল, সে পরিমাণে কখনোই করেন নি এবং এই ভাবে তারা প্রজাদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে তাঁরা ফসল তোলার খরচ বাদ দিয়ে নীট উৎপাদনের অর্ধেক দাবী করতেন কিন্তু প্রতিদানে নিজেদের খরচায় সেচের কাজের ব্যয়ভার বহন করাকে তাঁরা বাধ্যতামূলক মনে করতেন। সাধারণভাবে বাংলাদেশে খাজনা হিসেবে তাঁরা মোট উৎপাদনের এক চতুর্থাংশ পেতেন। কিন্তু যেহেতু সরকারী রাজস্বের হার চিরস্থায়ীরূপে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এবং খাজনার হারও প্রথানুযায়ী বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, সেই হেতু, যতই বৎসর অতিক্রান্ত হতে লাগল ততই পতিত জমির উন্নতি ও পুনরুদ্ধার করবার একটা প্রেরণা দেখা গেল।

কিন্তু প্রজাদের আদায়ের উৎসে যে বিপদের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল তা হ'ল তাদের শিল্প ও কারবারের মন্দা অবস্থা। ডাঃ বুকানানের দেখা বহু জায়গায় এর মধ্যেই সেই বিপদ অনুভূত হয়েছিল এবং পরে তা আরও ভয়ঙ্কররূপে দেখা দেয়। আমরা এখন দেশের শিল্পগুলির বিবরণে যাচ্ছি।

১। *History of Eastern India,* by Montgomery Martin (London, 1838), Vol. i, pp, 282 and 294.

২। *Ibid.*, p. 299.

৩। *Ibid.*, pp, 303 and 305.

৪। *Ibid.*, p 350.

৫। *Ibid.*, p. 355

৬। *Ibid.*, p. 541.

৭। *Ibid.*, Vol. II, p. 220.

৮। *Ibid.*, p, 223.

৯। *Ibid.*, p, 283.

১০। *Ibid.*, p. 587.

১১। *Ibid.*, pp. 547 and 549.

১২। *Ibid*., p. 889.

১৩। *Ibid*., pp. 907 and 908.

১৪। *Ibid*., p. 996.

১৫। *Ibid*., p. 1001.

১৬। *Ibid*., Vol. III., p. 290.

১৭। *Ibid*., Vol. ii pp. 840-42.

চতুর্দশ অধ্যায়

শিল্পের অবনতি (১৭৯৩-১৮১৩)

গত দুইটি অধ্যায়ে যে তথ্যাবলী দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ভারতীয় জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশই বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত ছিল। কাপড় বোনা তখনও দেশের জাতীয় শিল্প। লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক সুতো কাটা থেকে উপার্জন করে পারিবারিক আয় পূরণ করত। রং-এর কাজ, চামড়া পাকা করবার কাজ এবং বিভিন্ন ধাতুর কাজেও লক্ষ লক্ষ লোকের উপজীবিকার সংস্থান হত।

কিন্তু ভারতীয় শিল্পসমূহের উন্নতি বিধান ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নীতি ছিল না। পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ডিরেক্টরগণ চেয়েছিলেন বঙ্গদেশে কাঁচা রেশমের উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হোক আর রেশম বস্ত্রের উৎপাদনে বাধা দেওয়া হোক। এবং তাঁরা পুনরায় এই মর্মে আদেশ জারী করেছিলেন যে রেশমের কাপড় যারা তৈরী করে তাদের দিয়ে কোম্পানির কুঠিতে কাজ করাতে হবে এবং তাদের বাইরে কাজ করা নিষিদ্ধ করতে হবে। "এ ব্যাপারে সরকারের গুরুতর শাস্তি দেবার ক্ষমতা থাকবে।"[১] এই পরোয়ানায় ঈপ্সিত ফললাভ হয়েছিল। ভারতবর্ষে রেশম ও তুলাজাত দ্রব্যের কারবারের অবনতি ঘটেছিল এবং বিগত শতাব্দীগুলিতে যে ব্যক্তিরা এই মাল ইয়োরোপ ও এশিয়ার বাজারে রপ্তানি করত তারাই এগুলি ক্রমবর্ধমান পরিমাণে আমদানি করতে আরম্ভ করে। বিশ বৎসর ধরে উত্তমাশা অন্তরীপের পূর্বদিকস্থ বন্দর-গুলিতে, প্রধানত ভারতবর্ষে, ইংল্যাণ্ড থেকে কেবলমাত্র যে তুলাজাত দ্রব্য পাঠানো হয়েছিল নিম্নলিখিত সারণীর পরিসংখ্যানে তার মূল্য ধরা পড়বে।[২]

বর্ষশেষ ৫ই জানুয়ারী					
১৭৯৪······	১৫৬	পাউণ্ড	১৭৯৯······	৭,৩১৭	পাউণ্ড
১৭৯৫······	৭১৭	”	১৮০০······	১৯,৫৭৫	”
১৭৯৬······	১১২	”	১৮০১······	২১,২০০	”
১৭৯৭······	২,৫০১	”	১৮০২······	১৬,১৯১	”
১৭৯৮······	৪,৪৩৬	”	১৮০৩······	২৭,৮৭৬	”

বর্ষশেষ ৫ই জানুয়ারী

১৮০৪……	৫,৯৩৬	পাউণ্ড	১৮০৯……	১১৮,৪০৮	পাউণ্ড
১৮০৫……	৩১,৯৪৩	”	১৮১০……	৭৪,৬৯৫	”
১৮০৬……	৪৮,৫২৫	”	১৮১১……	১১৪,৬৪৯	”
১৮০৭……	৪৬,৫৪৯	”	১৮১২……	১০৭,৩০৬	”
১৮০৮……	৬৯,৮৪১	”	১৮১৩……	১০৮,৮২৪	”

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সনদ পুনরায় নবীকরণ করা হয়। এই পুনরাবৃত্তির পূর্বে তদন্ত করা হয় ও সাক্ষীসাবুদদের সাক্ষ্য নেওয়া হয়।

ওয়ারেন হেষ্টিংস, টমাস মুনরো ও স্যর ম্যালকম-এর মতন জাঁদরেল সাক্ষীগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং ভারতীয় জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য হাউস অব কমন্স যথাসম্ভব উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কিন্তু ভারতীয় শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে তাঁরা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছিলেন কি ভাবে ইয়োরোপীয় শিল্পসামগ্রী ভারতীয় শিল্পসামগ্রীর স্থানে প্রতিস্থাপন করা যায় এবং কি ভাবেই বা ভারতীয় শিল্পের বিরুদ্ধাচরণ করে বৃটিশ শিল্পসমূহের উন্নতিবিধান করা যায়।

পূর্ববর্তী অর্ধশতাব্দীতে ভারতবর্ষ বারম্বার দুর্ভিক্ষের কবলে প্রপীড়িত হয়েছিল। যে বৎসর সাক্ষ্য নথীভুক্ত করা হয় সেই বৎসরই এক দুর্ভিক্ষে বোম্বাই জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। বাংলা ও মাদ্রাজে শিল্প ও উৎপাদনের অবনতি ঘটেছিল। তবুও একটা জাতির উন্নতিকে যা নিশ্চিত করে তোলে সেই সমৃদ্ধির উৎসগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল সে সম্পর্কে এই পুরনো দলিলে কোন প্রশ্ন খোঁজা বৃথা। পক্ষান্তরে বৃটেনের দ্রব্যসামগ্রী কি ভাবে ভারতীয় জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে অবিরত ও অন্তহীন অনুসন্ধান দেখতে পাচ্ছি।

ওয়ারেন হেষ্টিংসকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "ভারতীয় চরিত্র ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে আপনার ধারণা থেকে ভারতীয় জনসংখ্যার নিকট নিজেদের ব্যবহারের জন্য ইয়োরোপীয় পণ্যসামগ্রীর চাহিদার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আপনি কি কিছু বলতে পারেন?"

ওয়ারেন হেষ্টিংস উত্তর দিয়েছিলেন, "একটা জাতির অভাববোধ ও ভোগের জন্যই বাণিজ্যিক সরবরাহ হয়ে থাকে। ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের কোন অভাববোধ নেই বলা চলে। তাদের অভাব বাসস্থান, খাদ্য ও সামান্য পরিমাণ আচ্ছাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং এ সবই তারা যে জমির ওপর নির্ভর করে তার থেকেই পেতে পারে।"[৩]

স্যর জন ম্যালকম বেশ কিছুদিন ভারতীয়দের মধ্যে বসবাস করেছিলেন। তিনি তাদের চিনেছিলেন যেমন তারপর দু'চারজন ইংরেজ তাদের চিনেছেন। জন ম্যালকম এই জাতির বিভিন্ন গুণাবলীর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। উত্তর ভারত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে সাধারণভাবে "হিন্দু অধিবাসীরা এমন একটা জাতি যারা কয়েকটি চারিত্রিক মাধুর্যের জন্য যতটা বিশিষ্ট, আকৃতিগত উচ্চতার দিক দিয়ে ততটা বিশিষ্ট নন। তারা সাহসী, উদার ও মনুষ্যত্বের অধিকারী। তাদের সত্যবাদিতা তাদের সাহসের মতই উল্লেখযোগ্য।" বৃটিশ পণ্যসামগ্রীর গ্রাহক তারা হতে পারে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "ইয়োরোপীয় পণ্যের গ্রাহক তারা হতে পারে না কারণ, যদিও বা জীবনযাত্রা ও পোষাক পরিচ্ছদে অতি সাধারণ চালচলনের মধ্যেও তাদের ইয়োরোপীয় পণ্যের প্রয়োজন ঘটে তা ক্রয় করবার সঙ্গতি তাদের নেই।"[৪]

গ্রীম মার্কার চিকিৎসক হিসেবে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকুরী করতেন। রাজস্ব ও রাষ্ট্র বিভাগেও তিনি চাকুরী করেছেন। ভারতীয়দের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "তারা নম্রস্বভাব, সাধারণ আদাবকায়দায় মার্জিত, গার্হস্থ্য জীবনে দয়ালু ও স্নেহপরায়ণ, শাসকগোষ্ঠির প্রতি অনুগত এবং নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও সেই সম্পর্কিত আচারানুষ্ঠান পালনের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত।" ভারতে ইয়োরোপীয় পণ্যসামগ্রীর আমদানির উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে রোহিল-খণ্ডে মেলার প্রবর্তন করে, এই জেলায় বৃটিশ পশমের প্রদর্শনী করে এবং একই উদ্দেশ্যে বৃটিশ আবাসিকগণকে হরিদ্বারের বিরাট মেলায় যোগদান করবার আদেশ দিয়ে লর্ড ওয়েলেসলী ভারতে এই সব পণ্যসামগ্রীর বাজার খোলবার চেষ্টা করেছিলেন।[৫]

কিন্তু এই সব স্মরণীয় ঘটনার উপলক্ষে হাউস অব কমন্স যাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন সেই টমাস মুনরোই ছিলেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাক্ষী। তাঁর আগাগোড়া সাক্ষ্যই ভারতীয়দের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও তাদের গুণাবলীর সপ্রশংস উপলব্ধিতে উজ্জীবিত। এই সহানুভূতি ও উপলব্ধিই সেই প্রতিভাবান স্কটল্যাণ্ডবাসীর ভারতে ১৭৮০ থেকে ১৮০৭—এই সাতাশ বৎসরের কার্যাবলীকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিল।

মুনরো বলেছিলেন যে ভারতে কৃষি মজুরদের গড় মজুরী ছিল মাসে ৭ থেকে ৬ শিলিং। জীবিকা নির্বাহ করবার জন্য মাথা পিছু বাৎসরিক খরচ ১৮ থেকে ২৭ শিলিং। বৃটিশ পশম সামগ্রীর বিক্রয়ের প্রসারের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কারণ লোকেরা নিজেদের তৈরী মোটা পশমই ব্যবহার করত। তারা চমৎকার

কারিগর এবং ইংলণ্ডে তৈরী দ্রব্যসামগ্রীর তারা অনুকরণ করতে পারত। হিন্দু স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামীদের দাসী ছিল কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে মুনরো বলেছিলেন, "পরিবারে তাদের ততটাই প্রভাব আছে বলে আমার মনে হয় যতটা এই দেশের (ইংলণ্ড) স্ত্রীলোকদের আছে।" এবং খোলা বাণিজ্যের দ্বারা হিন্দু সভ্যতার উন্নতি বিধান করা যেত কিনা এই প্রশ্ন করা হলে তিনি সেই স্মরণীয় উত্তর দিয়েছিলেন যা প্রায়শই উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং পুনরুদ্ধৃত হবে: "হিন্দুদের সভ্যতা বলতে কি বোঝানো হয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। বিজ্ঞানের উচ্চতর ক্ষেত্রে, সুষ্ঠু প্রশাসনের তত্ত্ব ও প্রয়োগ জ্ঞানে, এবং যে শিক্ষা বিভেদ ও সংস্কার বিদূরিত করে সব দিক থেকে সব রকমের জ্ঞানাহরণে মনকে তৈরী করে তোলে, সেই শিক্ষায় তারা ইয়োরোপীয়দের থেকে নিকৃষ্টতর। কিন্তু কৃষির চমৎকার ব্যবস্থা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী কারিগরী দক্ষতা, স্বাচ্ছন্দ্য বা বিলাসের উপযোগী সমস্ত কিছু উৎপাদনের ক্ষমতা, পঠন-পাঠন, লিখন ও গণিত শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পরস্পরের প্রতি আতিথেয়তা ও পরহিতপরায়ণতা এবং সর্বোপরি বিশ্বাস, সম্মান ও নমনীয়তার সঙ্গে স্ত্রীলোকদের গ্রহণ করা যদি সেই সব লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হয় যা একটি সভ্যজাতিকে চিহ্নিত করে, তাহলে হিন্দুরা ইয়োরোপের জাতিসমূহ থেকে নিকৃষ্ট নয়। এবং সভ্যতা যদি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে এই দেশ (ইংলণ্ড) আমদানি জাহাজ মারফৎ লাভবানই হবে।"[৬]

তাঁর সময়ে ভারতীয় শিল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে মুনরো-র উচ্চ ধারণা ছিল। ভারতে বৃটিশ পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের প্রসারতা বন্ধ হয়ে যাবার কারণগুলির মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছিলেন "এদেশের অধিবাসীদের ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক আচার ব্যবহার এবং সর্বোপরি তাদের নিজেদের শিল্পসামগ্রীর উৎকর্ষ।" একটা ভারতীয় শাল তিনি সাত বৎসর ব্যবহার করেছিলেন এবং এই দীর্ঘকাল ব্যবহার করবার পরও তিনি ইতর বিশেষ কিছু বদল দেখতে পান নি। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডে তৈরী নকল শাল সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "যদি উপহারস্বরূপও আমাকে দেওয়া হয়, তবু ব্যবহারোপযোগী ইয়োরোপীয় শাল আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নি।"[৭]

আর একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। তিনি হলেন জন স্ট্রাসি। বিচার বিভাগ ও বেঙ্গল এস্টাব্লিশ্মেণ্টের সরকারের আণ্ডার-সেক্রেটারী হিসেবে তিনি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকুরী করেছিলেন। তিনি জবানবন্দীতে বলেছিলেন যে ভারতীয় মজুররা মাসে ৩ শিলিং ৬ পেন্স থেকে ৭ শিলিং ৬ পেন্স পর্যন্ত উপার্জন করে। এরকম একটা জাতি কিভাবে ইয়োরোপীয় পণ্য দ্রব্য

ব্যবহার করতে পারে? "হঠাৎ সস্তা দরে কেনা সামান্য পশমী কিংবা বড় বহরের কাপড় ছাড়া ইয়োরোপের কোন পণ্যদ্রব্য তারা আটপৌরে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করে বলে আমার জানা নেই।"[৮]

এই ধরনের তদন্ত হাউস্ অব্ কমন্সের উদ্দেশ্যটি মোটামুটি ব্যক্ত করে। কোন মানবগোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জন্য নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দেবে—এটা মানবচরিত্র বিরোধী। ভারতীয় শিল্পের ক্ষয়ক্ষতি করে বৃটিশ শিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য যা কিছু করা সম্ভবপর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণ সবই করেছিলেন। কোম্পানির গভর্ণর জেনারেল ও বাণিজ্যিক আবাসিকগণের প্রতিনিধিত্বের মারফৎ বৃটেনে উৎপাদিত পণ্য জোর করে ভারতে পাঠানো হত, পক্ষান্তরে নিষিদ্ধ রপ্তানির আওতায় এনে ভারতীয় শিল্পের ইংলণ্ডের বাজার বন্ধ করে দেওয়া হল। জন র‍্যাঙ্কিং নামে একজন বণিকের সাক্ষ্যে এটা পরিষ্কার হবে। কমন্স কমিটি তাঁকে জেরা করেছিলেন।

"আপনি কি বলতে পারেন ঈস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে যে সব কাপড়ের থান বিক্রয় হয় তার মূল্যানুযায়ী শুল্ক কত?"

"যাকে ক্যালিকো বলা হয় সেই কাপড়ের আমদানি শুল্ক শতকরা ৩ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৮ পেন্স। আর যদি তা স্বদেশের জন্য ব্যবহৃত হয় তবে শতকরা অতিরিক্ত ৬৮ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৮ পেন্স দিতে হয়।"

"আরও একটি কাপড় হল মসলিন। তার ওপর আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ। এবং যদি তা স্বদেশের জন্য ব্যবহৃত হয় তা হলে আমদানি শুল্ক হল শতকরা ২৭ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৮ পেন্স।

"তৃতীয়টি হল রঙিন কাপড়, এদেশে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং এর ওপর আমদানি শুল্ক হল শতকরা ৩ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৮ পেন্স। এই কাপড় কেবলমাত্র রপ্তানির জন্য।

"পার্লামেন্টের এই অধিবেশনে স্থায়ী শুল্কের ওপর অতিরিক্ত ২০ শতাংশ নতুন কর বসানো হয়েছে। এর ফলে এদেশে বিক্রয়ের জন্য ক্যালিকোর ওপর শুল্ক হবে শতকরা ৭৭ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৮ পেন্স এবং এদেশে বিক্রির জন্য মসলিনের ওপর শুল্ক হবে শতকরা ৩১ পাউণ্ড, ৬ শিলিং ৮ পেন্স।"

এই নিষেধাজ্ঞামূলক শুল্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করবার কোন অভিপ্রায় ছিল না। ঐ একই সাক্ষী জন র‍্যাঙ্কিং আরও বলেছিলেন, "এটাকে আমি সংরক্ষণমূলক শুল্ক হিসেবেই মনে করি যা আমাদের শিল্পোৎপাদনকে উৎসাহিত করবে।"[৯]

ভারতীয় শিল্প সামগ্রীর ওপর এই শুল্কের ফল কি হয়েছিল? হেনরি সেণ্ট জর্জ টুকার ভারতীয় অভিজ্ঞতায় পরিপক্ব হয়ে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়েছিলেন এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নাম উত্তর ভারতে ভূমি-বন্দোবস্ত সংক্রান্ত ব্যাপারে পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক নীতির উদ্দেশ্য ও ফলাফল গোপন করেন নি। ১৮২৩ অর্থাৎ উপরোদ্ধৃত পার্লামেণ্টের তদন্তের দশ বৎসর পরে লিখতে গিয়ে তিনি কঠোরতম ভাষায় ঐ নীতির নিন্দা করেছেন।

"ভারত সম্পর্কে এদেশে আমরা যে বাণিজ্যিক নীতি গ্রহণ করেছি তার স্বরূপ কি? রেশমজাত শিল্পসামগ্রী এবং রেশম ও তুলোর সংমিশ্রণে তৈরী কাপড়ের থান বহুদিন আমাদের বাজার থেকে উধাও; এবং ইদানীং যে তুলাবস্ত্র ভারতের প্রধানতম পণ্যসামগ্রী ছিল তা কিছুটা ৬৭ শতাংশ শুল্ক বসানোর ফলস্বরূপ এবং মুখ্যত উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কেবলমাত্র আমাদের বাজারেই স্থানচ্যুত হয় নি, উপরন্তু এশিয়ায় আমাদের অধিকারভুক্ত এলাকার মোট ব্যবহারের এক ভাগ সরবরাহের জন্য প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের তুলাজাত শিল্পসামগ্রী রপ্তানি করে থাকি। এইভাবে ভারত শিল্পোৎপাদনশীল দেশের মর্যাদা থেকে কেবলমাত্র কৃষি-উৎপাদনশীল দেশে নেমে এসেছে"[10]

আরও জোরালো হল ভারতের ইতিহাস রচয়িতা এইচ. এইচ. উইলসন-এর নিরপেক্ষ রায়।

"ভারত যে দেশের অধীন হয়ে পড়েছে সেই দেশ ভারতের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করেছে এটা তার একটা বিষাদময় উদাহরণ। [১৮১৩-তে] সাক্ষ্যে বলা হয়েছিল যে ঐ সময় পর্যন্ত ভারতের রেশম ও তুলাজাত পণ্যবস্ত্র ইংলণ্ডে তৈরী বস্ত্র অপেক্ষা ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ কম মূল্যে বৃটনের বাজারে মুনাফার জন্য বিক্রয় করা যেত। ফলস্বরূপ মূল্যের ওপর ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে বা নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞার দ্বারা ইংলণ্ডে তৈরী কাপড় সংরক্ষণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল। যদি অবস্থাটা এরকম না হ'ত, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা-মূলক শুল্ক ও সরকারী হুকুম না থাকত, তবে পেজলি ও ম্যানচেষ্টারের কাপড়ের কলগুলি প্রারম্ভেই বন্ধ হয়ে যেত। বাষ্পীয় শক্তিও সেগুলি পুনরায় চালু করতে পারত কিনা সন্দেহ। ভারতীয় শিল্পের বলীদানের ফলেই ঐ কলগুলি সৃষ্ট হয়েছিল। ভারত যদি স্বাধীন হত, তবে সেও প্রতিশোধ নিত, বৃটেনজাত দ্রব্য সামগ্রীর ওপর নিষেধাজ্ঞামূলক মাসুল আরোপ করত, এবং এইভাবে আপন উৎপাদনশীল শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করত। তাকে এই আত্মরক্ষার

অধিকার দেওয়া হয় নি। সে আগন্তুকের করুণার উপরে নির্ভরশীল ছিল। বৃটেনজাত পণ্যসামগ্রী বিনাশুল্কে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তারা কখনোই এঁটে উঠতে পারত না তাকে দাবিয়ে রাখা ও শেষপর্যন্ত কণ্ঠরোধ করে হত্যা করবার জন্য বিদেশী পণ্য উৎপাদনকারীরা রাজনৈতিক অ'বচারের হাতিয়ারকে ব্যবহার করেছিল।"[১১]

ভারতীয় শিল্পসমূহকে বাধা দেবার জন্য যখন ইংলণ্ডে এই নীতি অনুসৃত হয়েছিল তখন ভারতে অনুসৃত রীতিতেও তার উন্নতিবিধানের প্রতি কোন ঝোঁক ছিল না। দেশের রাজস্ব কোম্পানির লগ্নীখাতেই খরচ করা হত; অর্থাৎ ইয়োরোপে রপ্তানি ও বিক্রয়ের জন্য ভারতীয় মাল খরিদ করা হত এবং এর কোন ব্যবসায়িক আগম ছিল না। নিম্নলিখিত তালিকা থেকেই বোঝা যাবে দেশের রাজস্বের কতটা এই খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল।[১২]

সাল	লগ্নীর মৌলিক ব্যয় পরিমাণ, ভারত	
১৭৯৩-১৭৯৪	১,২২০,১০৬	পাউণ্ড
১৭৯৪-১৭৯৫	১,২৮৮,০৫৯	"
১৭৯৫-১৭৯৬	১,৮২১,৫১২	"
১৭৯৬-১৭৯৭	১,৭০৮,৩৭৯	"
১৭৯৭-১৭৯৮	১,০২৫,২০৪	"
১৭৯৮-১৭৯৯	২,০১৯,২৬৫	"
১৭৯৯-১৮০০	১,৬৬৫,৬৮৯	"
১৮০০-১৮০১	২,০১৩,২৭৫	"
১৮০১-১৮০২	১,৪২৫,১৬৮	"
১৮০২-১৮০৩	১,১৩৩,৫২৬	"
১৮০৩-১৮০৪	১,১৮৭,০০৭	"
১৮০৪-১৮০৫	১,০৮৮,৭০০	"
১৮০৫-১৮০৬	১,৩৩৫,৪৬০	"
১৮০৬-১৮০৭	৯৮৬,৩১০	"
১৮০৭-১৮০৮	৮৮৭,১১৯	"
১৮০৮-১৮০৯	১,০১৩,৭৪০	"
১৮০৯-১৮১০	১,২৪০,৩১৫	"

সাল	লগ্নীর মৌলিক ব্যয় পরিমাণ, ভারত
১৮১০-১৮১১	৯৬৩,৪২৯ পাউণ্ড
১৮১১-১৮১২	১,১১০ ৯০৯ „
মোট উনিশ বৎসরে	২৫,১৩৪,৬৭২ পাউণ্ড
বাৎসরিক গড়	১,৩২২,৮৭৭ „

এই লগ্নী সরবরাহের জন্য যে পন্থা অনুসৃত হত তা হল এই। ডিরেক্টরগণের কতটা পরিমাণ প্রয়োজন সে সম্পর্কে অবহিত হয়ে ভারতস্থ বোর্ড অব ট্রেড সেই আদেশের প্রতিলিপি যে সমস্ত কুঠিতে পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন হত সে রকম কয়েকটি কুঠিতে পাঠিয়ে দিতেন। কুঠির বাণিজ্যিক আবাসিকগণ আবার ঐ আদেশ অধস্তন কুঠিগুলিতে বিলি করে দিতেন। দাদন নেবার জন্য তাঁতীদের একটা নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত থাকতে বলা হত। প্রত্যেক তাঁতীকেই আগাম টাকা ঋণ হিসেবে দেওয়া হত এবং মাল সরবরাহের পর সেই ঋণ পরিশোধ হত। তাঁতীরা যদি দরে আপত্তি জানাত তবে বোর্ড অব ট্রেড আপন বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করত।[১৩]

১৮১৩-তে হাউস অব কমন্স যাদের জেরা করেছিলেন তাদের মধ্যে বহু সাক্ষীর সাক্ষ্যেই দেখা যায় কিভাবে এই প্রথার অপব্যবহার হয়েছিল। টমাস মুনরো এজাহারে বলেছিলেন যে বরামহলে কোম্পানির কর্মচারীরা মুখ্য তাঁতীদের একত্র করাতো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কেবলমাত্র কোম্পানিকে মাল সরবরাহ করবার চুক্তিতে না আসতো ততক্ষণ তাদের ওপর একজন পাহারাদার নিযুক্ত রাখত।[১৪] কোন তাঁতী একবার দাদন নিলে সে আর দেনা থেকে পরিত্রাণ পেত না। মাল সরবরাহে দেরী হলে তা ত্বরান্বিত করবার জন্য তার ওপর একজন পেয়াদা নিযুক্ত হত এবং বিচারালয়ে তার শাস্তিও হতে পারত। পেয়াদা পাঠাবার অর্থই ছিল তাঁতীর ওপর দিনপ্রতি এক আনা (প্রায় ১½ পেন্স) জরিমানা। পেয়াদার হাতে বেত থাকত এবং তা যখন তখন অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। কখনো কখনো তাঁতীদের জরিমানা করা হত এবং তা আদায় করবার জন্য তাদের পেতলের বাসনপত্র ক্রোক করা হত।[১৫] এইভাবে গ্রামের সমগ্র তাঁতী সম্প্রদায়কে কোম্পানির কুঠির মুখাপেক্ষী করে রাখা হ'ত। এবং শ্রী ককস্ তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে তিনি যে কুঠির কর্তাব্যক্তি ছিলেন সেখানে পরিবার পরিজন বাদ দিয়ে ১৫০০ তাঁতী তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল।

তন্তুবায় সম্প্রদায়কে যে শাসনে আটকে রাখা হত সেটা কেবলমাত্র একটা প্রথাই ছিল না। উপরন্তু তা প্রবিধানের দ্বারা বৈধ করা হয়েছিল। আইনে বলা হয়েছিল যে, যে-তাঁতী কোম্পানির কাছ থেকে দাদন নিয়েছে সে "কোন ক্ষেত্রেই কোম্পানির জন্য নির্ধারিত নিযুক্ত শ্রম বা উৎপাদন অন্য কোন ব্যক্তিকে দিতে পারবে না—তিনি ইয়োরোপীয়ই হউন বা ভারতীয়ই হউন; যে চুক্তি অনুযায়ী বস্ত্র সরবরাহে ব্যর্থ হলে "সরবরাহ ত্বরান্বিত করবার জন্য বাণিজ্যিক আবাসিক ইচ্ছানুযায়ী তাঁতীর উপর পেয়াদা নিযুক্ত করতে পারবেন"; অন্য ব্যক্তির নিকট বস্ত্র বিক্রয় করলে তাঁতী "দেওয়ানী আদালতে অভিযুক্ত হতে পারেন"; যে, "যে-সকল তন্তুবায়গণ একাধিক তাঁতের অধিকারী এবং এক বা ততোধিক শ্রমিকের আহার জোগান তিনি লিখিত চুক্তি অনুযায়ী মাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে প্রতিটি বস্ত্রের নির্ধারিত মূল্যের ওপর ৩৫ শতাংশ জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবেন"; যে, জমিদার ও দখলদার প্রজাদের এই মর্মে "নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে তাঁরা যেন বাণিজ্যিক আবাসিক বা তাঁদের কর্মচারিগণ ও তন্তুবায়গণের মধ্যে সংযোগ রক্ষায় বাধা না দেন"; এবং কোম্পানির "বাণিজ্যিক আবাসিকগণের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার থেকেও" তাঁদের "কঠোরভাবে প্রতিনিবৃত্ত হতে বলা হচ্ছে।"[১৬]

উৎপাদকগণ যখন কোন রকম দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন তখন উৎপাদনের উন্নতি ঘটে না। কিন্তু এই ব্যবস্থার জঘন্যতম পরিণতি হল যে কোম্পানির কর্মচারীরা ভারতীয় কারিগরদের ওপর এতটা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও, আরও বেশী ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে অধিকারী অন্যান্য ইয়োরোপীয়গণ তাদের সঙ্গে আরও অসংযত আচরণ করতেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস বলেছিলেন যে "ভারতস্থ ইংরেজদের চরিত্রই আলাদা। ইংরেজ অভিধার অর্থই হল ঐ ব্যক্তির নিরাপত্তা এবং যে অন্যায় কাজ স্বদেশে করতে সে সাহস পেত না সেই কাজের অনুমোদন।"

লর্ড টেইনমাউথ বলেছিলেন, "সম্ভবত দেশের গভীরতম প্রদেশে ইয়োরোপীয়দের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ও দেশী জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের সংমিশ্রণের ফলে একটি সামগ্রিক পরিণতি ঘটেছে। তা হল এই যে ভারতীয় চরিত্রের উন্নতি বিধান না করে বরং সাধারণভাবে ইয়োরোপীয় চরিত্র সম্পর্কে তাদের নিম্নতর মূল্যায়ন ঘটাবার দিকে একটা প্রবণতা এনে দিয়েছে।"

টমাস মুনরো বলেছিলেন, "বণিকদের মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখিনা। তারা যখন এদেশ ছেড়ে চলে যায় তখন তাদের মেজাজ শান্ত হয় কিনা জানিনা।

যাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা চলে এমন একটা অপ্রতিরোধী জাতির সংস্পর্শে যখন তারা এসে পড়ে তখন আর তারা সংযত থাকে না। কারণ ভারতে আগন্তুক এমন প্রতিটি বণিককেই সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলে ধরা হয়। আমি শুনেছি যে গত দু' তিন বছরের মধ্যে, মনে হয় বঙ্গদেশে ১৮১০-এ, বেসরকারী বণিক নীলকরগণ দেশের অধিবাসীদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখেছে, নিজেদের অনুচরদের সমবেত করে দু'দলের মধ্যে মারামারি বাধিয়েছে এবং বহুলোককে আহত করেছে।"

টমাস সিডেনহ্যাম বলেছিলেন, "আমি সব সময়েই লক্ষ্য করেছি যে অন্য যে কোন জাতি অপেক্ষা ইংরেজরা বিদেশে হিংসাত্মক কার্যে বেশী পারদর্শী এবং আমার মনে হয় ভারতে এটাই ঘটছে।"[১৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেশের অভ্যন্তরে ইয়োরোপীয় বণিক ও নীলকরদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রায়ই এতই সচরাচর ছিল যে ঐ বিষয়ে জেলাশাসকগণের কাছে ইস্তাহার জারী করতে সরকার বাধ্য হন। ১৩ই জুলাই, ১৮১০-এর ইস্তাহারে বলা হয়েছিল :

"নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি যে যে অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং যে যে অপরাধ সন্দেহাতীতরূপে ও মতামত নির্বিশেষে নীলকর ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে, সেই অপরাধসমূহ নিম্নরূপ শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

"প্রথমতঃ যে হিংসাত্মক কার্য আইনত খুনের সমপর্যায়ভুক্ত নয় তাতেও ভারতীয়দের মৃত্যু ঘটিয়েছে।

"দ্বিতীয়তঃ পাওনা বকেয়া টাকা আদায় কিংবা অন্য কোন কারণে অবরুদ্ধ করে বিশেষত পায়ে বেড়ি দিয়ে দেশী লোকদের অবৈধভাবে আটকে রাখা।

"তৃতীয়তঃ নিজ নিজ কুঠির সঙ্গে যুক্ত ও অন্য লোকদের উত্তেজিত ভাবে জড় করা এবং অন্যান্য নীলকরদের সঙ্গে হিংসাত্মক দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়া।"

ইস্তাহারে জেলাশাসকদের এই মর্মে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে তাঁরা যেন বেড়িগুলি বিনষ্ট করে ফেলেন, চাষীদের ওপর প্রহার ও দৈহিক নির্যাতনের ঘটনাবলীর বিবরণ পেশ করেন এবং যদি ইয়োরোপীয় নীলকরগণ সরকারী আদেশের মর্ম মেনে না চলেন তবে গ্রামাঞ্চলে তাঁদের বসবাস প্রতিরোধ করেন। ২০শে জুলাই, ১৮১০-এ অন্য একটি ইস্তাহারে ম্যাজিষ্ট্রেটদের নির্দেশ দেওয়া হয়, যে-সমস্ত নীলকর চাষীদের দাদন নিতে বাধ্য করে এবং বে-আইনী কায়দায় তাদের নীল চাষে বাধ্য করে থাকে, তাদের সেই সব কাজের রিপোর্ট পাঠাতে।[১৭]

বঙ্গদেশে নীলকরদের অত্যাচার অর্ধ শতাব্দী কাল ধরে চলেছিল যতদিন না বাংলার জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ১৮৫৯ এর নীল বিদ্রোহের পর বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলেই ইয়োরোপীয় নীলকরদের নীলচাষ বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলার শ্রেষ্ঠতম নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর স্মরণীয় নাটক "নীলদর্পণে" নীলকরদের অত্যাচারের কথা খুলে ধরেছেন। এই নাটকটির ইংরেজী অনুবাদের জন্য কলকাতার হাইকোর্ট রেভারেণ্ড জেমস লং-কে জরিমানা ও কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। এই অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য পরবর্তীকালে বাংলার লেফ্‌টানেণ্ট-গভর্ণর এ্যাসলি ইডেন যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সেজন্য জনসাধারণ তাঁর নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

ভারতীয়গণ যাকে "দাস আইন" (Slave Law) বলেন সেই বিশেষ আইনটি আসামে চায়ের চাষে শ্রমিক সংগ্রহ করবার জন্য এখনও বলবৎ। চুক্তিপত্রে সই করবার পর নিরীহ স্ত্রীপুরুষদের দণ্ডসাপেক্ষ আইনের আওতায় এনে চা-বাগানে বেশ কয়েক বৎসর কাজ করতে বাধ্য করা হয়। বাগানে যখন তাদের বলপূর্বক ধরে রাখা হয় সেই সময়টাতে এই দরিদ্র শ্রমিকেরা যা'তে যথাযথ বেতন পায় সে ব্যাপারে এই বৎসরে (১৯০১) আসামের চীফ কমিশনারের চূড়ান্ত প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আমাদের এবার ১৮১৩-এর বৃত্তান্তে ফিরে যেতে হবে।

১৮১৩-তে অনুষ্ঠিত পার্লামেণ্টের তদন্ত ভারতীয় কারিগরদের দুর্দশা লাঘব করতে পারেনি। নিষেধাজ্ঞামূলক শুল্কের লাঘব হয় নি। কোম্পানির লগ্নীও বন্ধ হয় নি। বিপরীতপক্ষে সমগ্র হাউসই এটা অনুমোদন করেছিলেন।

"পূর্বে উল্লেখিত আয় সংগ্রহ ও অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করবার পর উপরি বর্ণিত খাজনা, রাজস্ব ও মুনাফার যে অংশ উদ্বৃত্ত থাকবে তার পুরোটাই বা অংশবিশেষ ভারতে কোম্পানির লগ্নীতে বিনিয়োগ ; চীনে লগ্নীর জন্য অর্থপ্রেরণ বা ভারতে ঋণ পরিশোধ অথবা বোর্ড অব কমিশনার্সের অনুমোদন নিয়ে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ সময়ানুসারে যে রকম নির্দেশ দেবেন সেই উদ্দেশ্যেই তা ব্যয়িত হবে।"[১৮]

ঐতিহাসিক এইচ. এইচ. উইলসন বলেছেন যে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের বিতর্কে ভারতীয়দের স্বার্থে মুক্তকণ্ঠে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। এ কথা সত্য। কিন্তু এটা প্রমাণ করা দুরূহ হবে যে যাঁরা বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সম্রাটের ভারতীয় প্রজাবৃন্দের প্রতি স্বার্থহীন সহানুভূতির দ্বারাই শুধু

উজ্জীবিত হয়েছিলেন।...যুক্তরাজ্যের বণিক ও কারিগরগণের প্রকাশ্য লক্ষ্য ছিল নিজ নিজ মুনাফার প্রতি।"[১৯]

১৮০৩-তে পার্লামেন্টের বিতর্কের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ডের উৎপাদনকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা। ইয়োরোপের বন্দরগুলি থেকে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বৃটেনের পণ্যসামগ্রীর উৎখাত ঘটিয়েছিলেন। ইংলণ্ডের বণিক ও উৎপাদনকারীরা অসুবিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন; যদি শিল্পোৎপাদন বিক্রয় করবার কোন পথ খোলা না পাওয়া যেত তবে সে দেশ দুর্দশার সম্মুখীন হ'ত। এমতাবস্থায় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে জাতীয় দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে যখন তাদের সনদ পুনরায় নবীকরণ হয় তখন ভারতের সঙ্গে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের বিলোপ সাধিত হয়। এইভাবে এই প্রথম বৃটেনের ব্যবসায়িগণ ভারতের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে একটা খোলা পথ পেয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা যে ভারতীয় উৎপাদনকারীদের কল্যাণের জন্য খুব বেশী মাথা ঘামাবেন—এটা মানব চরিত্রবিরোধী।

১। General Letter, dated 17th March 1769.

২। Return to an Order of the House of Commons, dated 4th May 1813

৩। Minutes of Evidence, &c. in the Affairs of the East India Company (1813), p, 3 ভারতীয়দের সামগ্রিক চরিত্র সম্পর্কে লর্ডস কমিটিতে ব্যক্ত ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর মতামত এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে।

৪। ঐ, pp, 54 এবং 57,

৫। ঐ, pp, 88-89

৬। ঐ, pp, 124, 127 এবং 131,

৭। ঐ, pp, 123 এবং 172

৮। ঐ, pp 296,

৯। ঐ, pp, 463 এবং 467

১০। Memorials of the Indian Government, হেনরি সেণ্ট টুকারের রচনাবলীর নির্বাচিত সঙ্কলন থেকে গ্রথিত (London, 1853), p. 494,

১১। Mill-এর *History of British India.* Wilson's Continuation' Book I, Chapter viii, note,

১২। Minutes of Evidence, & c,, or the Affairs of the East India Company, 1813, p, 848,

১৩। ঐ, p 582

১৪। ঐ. pp, 537-89,

১৫। Regulation xxxi, of 1793

১৬। Minutes of Evidence & c, (1813), pp. 2, 10 188, 359

১৭। ঐ, p, 567

১৮। Resolutions of the Committee of the Whole House, 1813.

১৯। Mill-এর *History of British India*, Wilson's Continuation, Book I, Chapter, viii,

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিল্পের অবস্থা (১৮১৩-১৮৫৫)

পূর্বাঞ্চলীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের অবসান হয় সর্বপ্রথম এইভাবে, ১৮১৩ সালে তার সনদ পুনর্নবীকরণের সময়। ব্যক্তিগত বাণিজ্যের অধিকার একবার স্বীকার করে নেওয়ার ফলে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল, আর কোম্পানির বাণিজ্য হ্রাস পেল। এবং ১৮৩৩ সালে আরেকবার সনদ নবীকরণের সময় যখন এল, তখন প্রশ্ন উঠল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো হবে কিনা। ইংলণ্ডের জনমত ছিল এই অভিমতের পক্ষে যে ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য ভারতে ভূমির অধিকারী এক কোম্পানির অসঙ্গত প্রতিযোগিতা মুক্ত করে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের হাতেই পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া উচিত ; এবং ব্যবসায়ীদের কর্তব্য আর একটি সাম্রাজ্যের শাসকদের কর্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। লণ্ডন এবং ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্রের যে সমস্ত ব্যবসায়ী ভারতে কোম্পানির অসঙ্গত সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত ছিলেন এবং যাঁরা আশা করতেন যে কোম্পানির বাণিজ্য বন্ধ করতে পারলে নিজেদের বাণিজ্য বাড়াতে পারবেন, তাঁরা এই শেষ যুক্তিটি ক্রমেই অধিকতর জোর দিয়ে উপস্থিত করতে থাকেন।

তদনুযায়ী কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো হয় ১৮৩৩ সালে, এবং সেই সময় থেকে কোম্পানি ভারতের প্রশাসকের ভূমিকা গ্রহণ করে ভারতের রাজস্ব থেকে ডিভিডেণ্ড আহরণ করতে থাকে।

১৮৩০, ১৮৩১ ও ১৮৩২ সালে যখন এই বিতর্ক চলছিল, সেই সময়ে ভারতের বাণিজ্যে ও শিল্প সম্পর্কে এবং ভারতের প্রশাসনের সকল শাখা সম্পর্কে প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ নথীবদ্ধ করা হয়। ১৮৩০-এ লর্ডস কমিটির সামনে মূল্যবান সাক্ষ্য দেওয়া হয়। এর চেয়েও মূল্যবান ও বিশদ সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয় ১৮৩০, ১৮৩০-৩১, ও ১৮৩১-এর কমন্স রিপোর্টে, ১৮৩২ এর কমন্স কমিটির সামনে নতুন সাক্ষ্য প্রদান করা হয় এবং এগুলি প্রকাশিত হয় প্রায় ছ-হাজার ফোলিও পৃষ্ঠা-সংবলিত বিরাট বিরাট ছ খণ্ড গ্রন্থে।[১]

এই সুবিশাল সাক্ষ্যের যে-সমস্ত অংশ বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত, সেগুলি

কিছুটা একপেশে। ব্রিটিশ পুঁজিতে যেসব শিল্প চলত, কিংবা যেসব শিল্পে ব্রিটিশ পুঁজি নিযুক্ত হবার সম্ভাবনা ছিল, সেগুলির অবস্থা সম্পর্কে লর্ডস ও কমন্স কমিটি তদন্ত করেন; ভারতের জনসাধারণের শিল্প এবং ভারতের কারিগরদের মজুরী ও মুনাফা তাঁদের খুব একটা কৌতূহলী করেনি. তাঁরা অনুসন্ধান করেছেন, কোম্পানির বাণিজ্যের বিলুপ্তি ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়াবে কিনা, ইংল্যাণ্ডের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী ও প্রস্তুত-কারকদের উপকার করবে কিনা; ভারতের মানুষের চালানো ভারতের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের অবস্থা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। ভারতের জনসাধারণের নিজস্ব বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি বিধান ১৮১৩ বা ১৮৩২-এর তদন্তের লক্ষ্য ছিল না। তারপর যে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়েছে সেই সময়েও এই লক্ষ্য গুরুত্বসহকারে ও নিয়মিতভাবে অনুসৃত হয়নি।

তা সত্ত্বেও, নথীবদ্ধ সাক্ষ্য যা আছে তা থেকেই আমরা প্রচুর তথ্য পাই। এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে এই বিরাট সাক্ষ্যকে আমরা বোধগম্য রূপে সংক্ষেপে উপস্থিত করার চেষ্টা করব।

তুলা

ভারতীয় তুলা ছিল আমেরিকান তুলার চেয়ে হ্রস্বতর আঁশযুক্ত, তাতে ময়লা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী এবং তৈরীর সময় বেশী অপচয় হত: এই তুলা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হত মোটা কাপড়চোপড় তৈয়ারীর কাজে, কিংবা পশমের কাপড়ে পশমের সঙ্গে মিশ্রিত হত। সুরাটের তুলাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হত এবং বঙ্গে প্রস্তুত ঢাকাই মসলিনের সমতুল বস্ত্র ইংল্যাণ্ডে ছিল না। আইল অব ফ্রান্স থেকে আমদানি করা বীজ থেকে উচ্চ মানের তুলা সাফল্যের সঙ্গে ফলানো হয়েছিল তিন্নেভেলিতে। সমুদ্রের কাছে ছাড়া ভারতে আর কোথাও দীর্ঘ আঁশ যুক্ত তুলার চাষ হত না বললেই চলে। এবং জনসাধারণের নিজেদের সামগ্রী তৈরীর কাজেও তা ব্যবহৃত হত না। ভারতে সমস্ত সুতোই হাতে কাটা হত।[২]

ভারতীয় তুলার রপ্তানি আমেরিকান বাজারের প্রতিযোগিতার ফলে পড়ে গিয়েছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ অঞ্চলগুলির তুলা ছিল বৃটিশ বাজারে আসা তুলার মধ্যে নিকৃষ্ট। পরিষ্কার করা বোম্বাই তুলা এবং উচ্চতর অঞ্চলের মার্কিন তুলার মধ্যে মূল্যের তারতম্য ছিল ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। সুরাটের তুলা সাধারণতঃ শুধু ইংল্যাণ্ডের অপেক্ষাকৃত মোটা বস্ত্রাদি তৈরীর

কাজেই ব্যবহৃত হত, অপেক্ষাকৃত মিহি সুতা বোনার কাজেও মেশানো হত। ভারতে তুলার উন্নতিবিধানের চেষ্টা সফল হয়নি ; কতকগুলি পরীক্ষার ফলে তুলার আরো অবনতি ঘটে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বীজ থেকে ভালো গাছ হয়নি। তুলার চাষ করত ভারতের জনসাধারণ, তা নিয়ে আসা হত বোম্বাইতে এবং কিনত ইয়োরোপীয়রা। তুলা ফলানোর কোনো জমি ইয়োরোপীয়দের হাতে ছিল না, তুলার চাষের কাজে তাদের কোনো অংশও ছিল না। ভারতে তুলা পরিষ্কার করার যন্ত্রটি ছিল একটি ক্ষুদ্র হস্তচালিত 'জিন'-যন্ত্র বা কাঠের তৈরী বেলনাকৃতি যন্ত্র, আবহমান কাল ধরে তা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই যন্ত্রটির দাম ছিল ৬ পেন্স, এটি চালানো হত হাত দিয়ে, এর জন্য শক্তির দরকার হত না, এর সাহায্যে তুলা পরিষ্কার হত মোটামুটি। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তুলার 'বিনিয়োগ' সংগ্রহ করতেন তাদের কমার্শিয়াল রেসিডেন্টরা, প্রধানতঃ তিন্নেভেলিতে। ১৮২৩ সালে এই 'বিনিয়োগ' ছিল ২৫০ পাউণ্ড ওজনের ৮০০০ গাঁট, এবং তা পাঠানো হয়েছিল চীনে। ইয়োরোপীয়দের পক্ষে তুলার চাষের জন্য বঙ্গদেশ অনুপযুক্ত ছিল, কিন্তু ঢাকার কাছে লোকে এক ধরনের সূক্ষ্ম তুলা ফলাতেন। শ্রেষ্ঠ ভারতীয় তুলা হত গুজরাট ও কচ্ছতে। ভারতীয় তুলা প্রথম ইংলণ্ডে আমদানি করা হয় ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে, এবং আমেরিকার তুলা ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে। ১৮২৭-তে ভারত থেকে রপ্তানিকৃত মোট তুলার পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৬৮০ লক্ষ পাউণ্ড, তার মূল্য ছিল দশলক্ষ পাউণ্ড স্টারলিং। ইংলণ্ডে আমেরিকান তুলার মোট আমদানির পরিমাণ ছিল ২৯ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। কলিকাতায় সুতা বোনার জন্য একটি সুতিকল চালু করা হয়।[৩]

কোম্পানি প্রধানতঃ বঙ্গ ও বোম্বাই থেকে তুলা রপ্তানি করতেন এবং মাদ্রাজ থেকেও রপ্তানি করতেন ; কারখানাগুলি উঠে যাওয়া পর্যন্ত এই রপ্তানি চলেছিল। গ্রামাঞ্চল থেকে কলিকাতায় তুলা নিয়ে আসা হত নৌকায় করে, তাতে জল-হাওয়া থেকে রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকত না, নৌকায় তুলা পড়ে থাকত চার পাঁচ মাস ; তারপর সেই তুলা রাখা হত 'কটন স্ক্রু'-তে তার সঙ্গে বেশ কিছু বীজও চলে যেত এবং ইংল্যাণ্ডে প্রেরণের জন্য জাহাজে চাপানো হত ভেজা-ভেজা, ছাতা-পড়া অবস্থায়, এই রকম কাণ্ডের পর বঙ্গের তুলা যে-অবস্থায় ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছত সূক্ষ্মতম তুলাও তার চেয়ে ভালো অবস্থায় গিয়ে পৌঁছতে পারত না।[৪]

রেশম

রেশম গুটি প্রধানতঃ বঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল ; উত্তর ভারতে তা ভালো হত না এবং বোম্বাইয়ের জমি তুঁতগাছের উপযোগী নয়। ইংল্যাণ্ডের জন্য কোম্পানির 'বিনিয়োগের' ব্যবস্থা করত তাদের কমার্শিয়াল রেসিডেণ্টদের এজেন্সী—এরা আবার তা সংগ্রহ করত যারা রেশমগুটির চাষ করে তাদের কাছ থেকে ; তাদেরই দাদন দেওয়া হত। কোম্পানির প্রায় বারোটি রেসিডেন্সী ছিল আর ছিল পণ্য তৈরীর বহু কারখানা কিন্তু তাতে কাটিমে গুটিয়ে রাখার অতিরিক্ত তৈরীর কাজ করা হত না। কয়েকটি কারখানায় 'পাটনি সিল্ক' থেকে টুকরো বস্ত্রাদি তৈরী হত। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম রেশম বস্ত্র তৈরী যথেষ্ট হ্রাস পায় এবং ইংল্যাণ্ডের রেশমবস্ত্র প্রচুর পরিমাণে আমদানি করা হয়। কয়েকজন ইয়োরোপীয়ের নিজেদের কারখানা ছিল, কিন্তু কোম্পানির মতো বৃহৎ নয় এবং কোম্পানিই বাজারে প্রভুত্ব করত। ভারতীয় রেশমের ত্রুটি ছিল সুতার উৎকর্ষের অভাব ও পরিচ্ছন্নতার অভাব। শ্রেষ্ঠ ভারতীয় রেশমবস্ত্র শ্রেষ্ঠ ইতালীয় রেশমবস্ত্রের মতোই উচ্চমূল্যে বিক্রী হত, কিন্তু ভারতীয় রেশমবস্ত্রের বৃহত্তর অংশটিই ছিল নিকৃষ্ট। বাণিজ্য ছিল কোম্পানির হাতে, সূক্ষ্ম ধরনের উৎকৃষ্ট রেশম বস্ত্র তৈরীর জন্য যে কঠোর তত্ত্বাবধান দরকার কোম্পানি তা করতে পারত না। রপ্তানির জন্য খুব সামান্য পরিমাণ ভারতীয় রেশমবস্ত্রই বিক্রি হত, লোকে চীনা রেশমই বেশি পছন্দ করত।[২]

ভারতে তিন ধরনের তুঁত ফল ফলানো হত—ইয়োরোপে যার চাষ হয় সেই সাদা তুঁত ফল, চীনে যার চাষ হয় সেই গাঢ় নীল-বেগুনী তুঁতফল, এবং ভারতীয় তুঁত ফল। দু ধরনের গুটি পোকা ছিল—দেশী পোকা এবং ইতালি বা চীন থেকে আনা, সূক্ষ্মতর রেশম উৎপাদনকারী বার্ষিক পোকা। তুঁতফলের চাষ ও রেশমগুটি উৎপাদনের কাজ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল সাধারণ লোকের কাছে ; কোম্পানি তাদের অগ্রিম দিত এবং রেশম বা রেশমগুটি সরবরাহের পর দাম স্থির করত। বঙ্গদেশে কোম্পানির গুটি থেকে রেশম নিষ্কাশনের এগারো-বারোটি স্থান ছিল, তার যন্ত্রপাতি ছিল ইতালিয়ান ধরনের ও অত্যন্ত সহজ। কোম্পানির রেসিডেণ্টদের অর্থ প্রদান করা হত সরবরাহ কৃত পরিমাণের উপর ২½ শতাংশ কমিশনের সাহায্যে এবং তাঁদের নিজস্ব হিসাব-বাবদও ক্রয় করতে দেওয়া হত। তাঁরা রেশম ভালো চিনতেন না। বঙ্গের মোটা রেশমের গুণগত মানের অবনতি

ঘটেছিল, কিন্তু বাণিজ্যের সুযোগ খুলে যাওয়ার দরুন এবং শুল্ক হ্রাস পাওয়ার দরুন রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। ১৮২৩ থেকে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে মোট রেশমের চালান বেড়েছিল ৩৫$\frac{১}{২}$ শতাংশ, অথচ কোম্পানির বিনিয়োগ বেড়েছিল মাত্র ১৭$\frac{১}{২}$ শতাংশ।[৬]

রেশমগুটির খাদ্যের জন্য বঙ্গে তুঁতফল ও রেড়ির তেলের গাছ চাষ করা হল। তুঁত গাছগুলি রোপন করা হত ছয় কি আট ইঞ্চি দূরে দূরে সারিবদ্ধ ভাবে, গাছগুলি উচ্চতায় হত প্রায় তিন ফুট। জনসাধারণের লক্ষ্য ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের অতি দ্রুততা, যাতে তারা আশু ফল পেতে পারে; কিন্তু ইয়োরোপের দক্ষিণাঞ্চলে অনুসৃত পদ্ধতি যদি গ্রহণ করা হত তাহলে এই ফললাভ আরো বেশি হত। গাছ লাগাবার প্রায় চার মাস পরে প্রথমে পাতা বাছাই করা হত; তার পর প্রতি আট-দশ সপ্তাহ অন্তর একটি করে ফলন হত; প্রথম বছরে হত চারটি ফলন, দ্বিতীয় বছরে ছ'টি। ইংরেজী হিসাবে এক একরের এক-তৃতীয়াংশ জমিতে দিনে ১০০০ গুটিকে আহার্য যোগানোর মতো ফলন হত। রেশমের পার্থক্য নির্ভর করত কোন ঋতুতে সুতা কাটা হয়েছে তার উপরে: সর্বশ্রেষ্ঠ ঋতুটি ছিল নভেম্বর, তাতে গুটিপোকাগুলির সুতা কাটার কাজ শেষ হত ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে; সবচেয়ে খারাপ ছিল বর্ষাকাল। দেশি গুটিপোকা বছরে চারবার ডিম-ফোটাতো, বার্ষিক ধরনের গুটিপোকাগুলি একবার। কোম্পানির রেসিডেণ্টরা পাইকারদের মারফৎ অগ্রিম দাদন দিতেন এবং তাদের মারফৎ তাঁদের কারখানায় রেশমগুটি পেতেন, সেখানে কারখানার পক্ষ থেকে ভাড়া করা এবং মজুরী-প্রদত্ত দেশী মজুররা সেগুলিকে কাটিয়ে পাকিয়ে রাখত। বারোটি রেসিডেন্সী ছিল; বোর্ড অব ট্রেডের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষ, রেসিডেণ্টরা সরবরাহের পর মূল্য নির্ধারণ করতেন। কোনো প্রস্তুতকারক তাঁর প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানের জন্য যে রকম লোক নির্বাচন করেন, রেসিডেণ্টরা আদৌ সে ধরনের লোক ছিলেন না। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত মোটা রেশম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটেছিল এবং কোম্পানি তার পরিমাণ বাড়িয়েছিলেন। কোম্পানি ভারতেও রেশম গোটানোর ইতালিয়ান পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন; বাণিজ্য ছিল একেবারে অবাধ এবং ইংল্যাণ্ড থেকে বহু ব্যক্তি গিয়ে রেশম-নিষ্কাশনের স্থান তৈরী করেছিলেন, কিন্তু কেউই সাফল্যলাভ করেননি; কোম্পানির সঙ্গে তাঁরা প্রতিযোগিতা করতে পারেননি। ইতালিয়ান রেশম ভালো ছিল, ফরাসী সিল্ক ভালো ছিল, বঙ্গের রেশমেরও অন্য যে কোনো রেশমের মতোই চাহিদা ছিল, কিন্তু ইতালি, ফ্রান্স বা তুরস্কের রেশমের মতো অত শক্ত ছিল না। ইতালিয়ান রেশমের চেয়ে তা

অনেক মোটাও ছিল। কারণ লোকে গুণগত উৎকর্ষের চেয়ে পরিমাণের দিকেই নজর দিত বেশি এবং কাটিম পাকানোর কাজে ইতালি বা ফ্রান্সের মতো তত যত্নও নেওয়া হত না। তাই বঙ্গের রেশম ছিল অমসৃণ ও "ছিন্নসূত্র", তাতে বহু জায়গায় সুতা ছেঁড়া থাকত।[৭]

বঙ্গদেশে কোম্পানির শাসনের সত্তর বছরে তুলা ও রেশম শিল্পে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, পাঠক উপরোক্ত সাক্ষ্যের চুম্বক থেকে তা দেখতে পাবেন। স্বতন্ত্র ভারতীয় প্রস্তুতকারীদের দ্বারা উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হত না; তা বন্ধ করা হত কখনও পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞার সাহায্যে, আর পরবর্তীকালে কোম্পানির রেসিডেণ্টদের প্রভাবের দ্বারা বস্ত্রবয়ন অধিকাংশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যে সব ব্যক্তি নিজেদের পুঁজি দিয়ে কাজ করতেন, নিজেদের বাড়িতে ও গ্রামে পণ্য উৎপাদন করতেন এবং নিজেদের মুনাফা অর্জন করতেন, তাঁরা নির্ভরশীল হয়ে পড়েন কোম্পানির রেসিডেণ্টদের উপর, যারা তাঁদের কাঁচা তুলা ও রেশম নিতেন, রেসিডেণ্টদের নির্ধারিত মূল্যই তাঁরা পেতেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে তাঁরা হারিয়েছিলেন তাঁদের শিল্প-সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং তাঁদের যা উৎপন্ন করতে বলা হত তার জন্য পেতেন মজুরী ও মূল্য। বিশ্বের বাজারের জন্য আর স্বাধীন উৎপাদনকারী রূপে না-থাকায়, তাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক চাকুরির জন্য কোম্পানির কারখানার দ্বারস্থ হতেন। কারখানাগুলির চাহিদা ছিল কাঁচা সামগ্রী, ভারতের জনগণ যোগাতেন কাঁচা সামগ্রী; তাঁরা তাঁদের পুরনো প্রস্তুতকারকের দক্ষতা বিস্মৃত হয়েছিলেন; সামগ্রী-প্রস্তুতের মুনাফা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ ইয়োরোপ ও ভারতের মধ্যে এই বাণিজ্যবৃদ্ধি—কাঁচা সামগ্রীর আমদানি ও তৈরী পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি—লক্ষ্য করেন এবং ভারতে সুখসমৃদ্ধি বাড়াবার স্বপক্ষে যুক্তি তোলেন। লর্ডস ও কমন্স সভা অনুসন্ধান করেন, এই ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে থাকবে, না ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের হাতে থাকবে। কেউই একথা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন মনে করেননি—বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির অর্থ ভারতীয় শিল্পগুলির বিলুপ্তি কি না, এবং ভারতের ক্ষেত্রে শিল্প সংক্রান্ত মুনাফা-হানি কি না। জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য ভারতের বয়নশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব কি না, সে বিষয়টিও কেউ অনুসন্ধান করতে চাননি।

খাদ্যশস্য

ভারতীয় কৃষকদের অজ্ঞতা ও যত্নহীন কৃষিকর্ম সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডে চিরদিনই অনেকখানি ভ্রান্ত ধারণা আছে; কিন্তু যে সমস্ত ইংরেজ কৃষি সম্পর্কে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করার কষ্ট স্বীকার করেছেন তাঁরা এই অসঙ্গত ও অসত্য ধারণা দূর করার চেষ্টা করেছেন। কলিকাতায় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোটানিকাল গার্ডেনের একদা-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ডঃ ওয়ালিক ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট তারিখে কমন্স কমিটির সামনে এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

"বঙ্গ দেশের চাষ-আবাদকে ভারতের বাইরের ইয়োরোপীয়রা অনেকখানি ভুল বুঝেছে। বঙ্গের কৃষিকর্ম তার পদ্ধতি ও ধরনের ক্ষেত্রে বহু দিক দিয়ে অত্যন্ত সরল ও আদিম হলেও, লোকে সাধারণভাবে যতটা অনুমান করে ততটা নিচু স্তরের নয়; এবং আমি প্রায়শই দেখেছি যে এই কৃষি কর্মে অতি আকস্মিক কোনো অভিনব পন্থায় কোনো সুফল হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বঙ্গদেশের সাধারণ লাঙলের সাহায্যে অত্যন্ত ক্লান্তিকর ভাবে ও উপর-উপর জমি-চষার পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাবার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে ইয়োরোপীয় লোহার লাঙল প্রবর্তনের কথা আমি জানি। কিন্তু তার ফল কী হয়েছে? আগে আমি যেকথা উল্লেখ করার সুযোগ নিয়েছি—যে জমি অত্যন্ত অগভীর, উপর-উপর ভাবে চষা দরকার, সে জমি বিদীর্ণ করার ফলে সাধারণত একেবারে তলার জমির মিশেল পেয়েছে, যার ফলে তার যথেষ্ট অবনতি হয়েছে।"

ভারতীয় কৃষিকর্মের বিরাট কোনো উন্নতি সম্ভব কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে ডঃ ওয়ালিক বলেন: "নিশ্চয়ই; কিন্তু সাধারণভাবে যতখানি কল্পনা করা হয় ততটা নয়; ধানের চাষের কথাই ধরা যাক। আমার মনে হয়, আমরা যদি আরো হাজার বছর বাঁচি, তাহলেও কৃষিকর্মের সেই শাখায় আদৌ কোন উন্নতি দেখতে পাব বলে মনে হয় না।"[৮]

বঙ্গদেশ থেকে তুষসহ চালের রপ্তানি ১৮৩০-এর অল্পকাল আগে ১০০০ টন পর্যন্ত বেড়েছিল; প্রধানতঃ সেই চাল ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছবার পর তার তুষ ছাড়াবার যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার দরুন। এর আগে তুষ ছাড়িয়েই চালান যেত, কিন্তু তাতে প্রচুর ময়লা এবং ভাঙা দানা থাকত। এই আবিষ্কারের পর চালান যেত তুষ সহ, পরিষ্কার করা হত ইংল্যাণ্ডেই, এবং তা আমেরিকান চালের মতোই তাজা ও ঝকঝকে দেখাত। ক্যারোলিনার মতো ভারতেও যদি চাল সে-রকম

পরিষ্কার করা যেত তবে বৃহত্তর ' পরিমাণে তা রপ্তানি করা যেত ; কারণ তুষ-সহ অবস্থায় চাল দ্বিগুণ স্থান অধিকার করত বলে তার জন্য দ্বিগুণ ভাড়া লাগত।

নীল

যেমন প্রত্যাশিত, ইয়োরোপীয় নীলকরদের অধীনে চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা পরস্পর-বিরোধী সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল। রামসে দাবি করেছেন যে, যে-সমস্ত রায়ত ইয়োরোপীয় আবাদকারীদের জন্য খাটত, তাদের অবস্থা অন্য রায়তদের চেয়ে খারাপ ছিল ; উপায় থাকলে তারা তাদের যতখানি জমিতে নীল চাষ করত, তার চেয়ে বৃহত্তর অংশে নীল চাষ করতে ইয়োরোপীয় নীলকররা তাদের বাধ্য করত ; চাষীর নিজের জমি নিজের ইচ্ছামত চাষ করার অধিকারের উপর ইয়োরোপীয় নীলকররা হস্তক্ষেপ করত। অন্যান্য সাক্ষীরা তাঁর বিপরীত কথা বলেছেন ; কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশের অবস্থার কথা যাঁদের স্মরণে আছে তাঁরাই জানেন যে রামসে যে-সমস্ত মন্দ জিনিসের কথা বলেছিলেন তা দীর্ঘকাল বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল।

যে-সমস্ত চাষী নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ নীলগাছ দিতে রাজী হত ইয়োরোপীয় আবাদকারীরা তাদের অগ্রিম দিতেন। আবাদকারী যদি জবরদস্তি করত তাহলে "আদালতে আপীল করা ছাড়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে রায়তের কোনো প্রতিকার ছিল না, আদালতে তার আপীল যে শোনা হবে তার সম্ভাবনাও ছিল ক্ষীণ। অত্যাচার প্রধানতঃ চলে বঙ্গের নিম্ন অঞ্চলে, যেখানে কিছু ইয়োরোপীয় ও দো-আঁশলা বসতি করে।"

কয়েকজন ভারতীয় নীলকরের যথেষ্ট সংখ্যক কারখানা ছিল, কিন্তু তাদের নীল ইয়োরোপীয়দের তৈরী নীলের মতো তত ভালো ছিল না। ভারতীয় নীলকরদের দ্বারা নীল প্রস্তুতের কাজ বাড়ছিল। পাঁচশো থেকে এক হাজার ইয়োরোপীয় নিযুক্ত ছিলেন নীল প্রস্তুতের কাজে ; সাধারণতঃ তাঁরা ইয়োরোপ থেকে কোনো মূলধন আনতেন না ; মূলধন তাঁরা ঋণ করতেন কলিকাতায় ভারতীয়দের কাছ থেকে কিংবা কোম্পানির ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের কাছ থেকে অথবা এজেন্সী হাউসগুলির কাছ থেকে, তারপর কারখানা চালু করতেন। মূলধন-সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি নীল বাগিচা প্রতিষ্ঠার জন্য দেশ ছেড়ে ভারতে গেছেন এমন একটিও দৃষ্টান্ত জানা নেই।[৯]

ভারত থেকে নীলের আমদানি শুরু হয় আনুমানিক ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে এবং চল্লিশ বছরে তা এত বৃদ্ধিলাভ করেছিল যে অন্য সমস্ত নীলকে সরিয়ে ভারতীয় নীল

সেই স্থান দখল করেছিল। চাষের কাজ চলত ঢাকা থেকে দিল্লী অবধি এবং রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৯০ লক্ষ পাউণ্ড। ব্রিটিশ নীলকররা খাজনা ও মজুরী বাবদ প্রতি বছর যে-অর্থ প্রদান করত তার পরিমাণ হল ১,৬৮০,০০০ পাউণ্ড; কলিকাতায় পণ্য পৌছলে তার মূল্য ধরা হত ২,৫০৩,০০০ পাউণ্ড এবং ইংলণ্ডে তা দাম পেত ৩,৬০০,০০০ পাউণ্ড। বঙ্গদেশে ৩০০ কি ৪০০টি কারখানা ছিল, প্রধানতঃ যশোহর, কৃষ্ণনগর ও ত্রিহুতে। গঙ্গার জলে প্লাবিত জমিই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ জমি। মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে কিছু নীল চাষ হত। সাধারণভাবে নীলকররা কলকাতার বৃহৎ বৃহৎ সংস্থার কাছ থেকে তাঁদের মূলধন ঋণ করতেন ১০ বা ১২ শতাংশ স্থদে, নিজেদের সম্পত্তি বন্ধক রেখে। স্থদের হার চড়া ছিল, কারণ এতে যথেষ্ট ঝুঁকি ছিল! ভারতীয় নীলকররা নীল প্রস্তুতের ইয়োরোপীয় প্রক্রিয়া অনুকরণ করতে শুরু করেছিলেন। নীল প্রস্তুত ও রপ্তানি নিশ্চয়ই ইয়োরোপীয়রা আরম্ভ করেন নি, কারণ রঙ হিসাবে নীল প্রাচ্যে বহুদিন ধরেই পরিচিত ও ব্যবহৃত এবং ভারতের দেশীয় লোকেরা তা তৈরী ও রপ্তানি করত।[১০]

নীল তৈরীর পুরনো ভারতীয় পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ; ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নীল উৎপাদনের জন্য ইয়োরোপীয় নীলকরদের অর্থ অগ্রিম দিয়েছিল এবং ১৮:৯ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে নীল চালান দিতে শুরু করেছিল। বঙ্গদেশে নীল ব্যবসায়ের এই বিরাট ও আকস্মিক সমৃদ্ধির কারণ ছিল সেণ্ট ডোমিঙ্গো ধ্বংস হয়ে যাওয়া; ফরাসী বিপ্লবের আগে সেণ্ট ডোমিঙ্গোই প্রায় সমগ্র বিশ্বে নীল সরবরাহ করত কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ জনসমষ্টির বিদ্রোহের পর সেখানে এক পাউণ্ড নীলও উৎপন্ন হত না। সেই বিদ্রোহের সময় নীলের সব কারখানাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।[১১]

চিনি

চিনির চাষ করা হত দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে। এর জন্য দরকার হত সেচ। ভারতীয় প্রস্তুত প্রণালী ছিল অত্যন্ত সরল, তার যন্ত্রপাতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ; উন্নয়নের প্রচুর অবকাশ ছিল। চিনির চাষ তুলা ও নীলের মতোই একেবারে অবাধ ছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করা হয়, কিন্তু সাধারণ ভারতীয় যন্ত্রপাতির মতো তা আখ থেকে ততটা নিষ্কাশন করতে পারত না। ফলে ফাটকাবাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মালাবারে দুজন ইয়োরোপীয় এই ফাটকায় প্রবৃত্ত হন এবং উভয়েই এই উদ্যোগ পরিত্যাগ করেন। ১৭৯৬ থেকে

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গঞ্জামে চিনির চাষ প্রবর্তন করার চেষ্টা হয়, কিন্তু ফলাফল হয় অসন্তোষজনক।[১২]

ইয়োরোপীয়রা নীল তৈরীর কাজে যেভাবে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, চিনির চাষ ও তৈরীর কাজে সেভাবে প্রবৃত্ত হননি ; তাঁরা শুধু তা ক্রয় করতেন বাজার থেকে অথবা যেসব চাষীদের অগ্রিম দেওয়া হত তাদের কাছ থেকে। ভারতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের ছিল, এবং ভারতে কোনো বৃহৎ আখ-বাগিচা ছিল না। ভারতীয় চিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চিনির চেয়ে খারাপ ছিল। বঙ্গে আখ ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতোই ভালো এবং এক বিশেষ প্রক্রিয়া চালিয়ে উন্নত মানের কিছু চিনি তৈরীও করা হয়েছিল, কিন্তু তার জন্য খরচ এত বেশী পড়েছিল যে সেটা লাভজনক হয়নি। বঙ্গে উৎপন্ন চিনির উপর শুল্ক ছিল মোট মূল্যের উপর ১২০ শতাংশ হারে, অর্থাৎ মূল্য প্রাথমিক খরচার উপর ২০০ শতাংশ শুল্কের সমান।

চিনির পক্ষে উপযুক্ত জমি ভারতে প্রচুর ছিল, কিন্তু তৈরীর কাজটি ছিল কু-পরিচালিত। আরো বিবেচনা করে আখ বাছাই এবং আরও স্বল্পব্যয়ে রস নিষ্কাশন ও সেই রসকে চিনিতে পরিণত করতে পারলে চাহিদা বাড়াতে পারত। বারাণসীতে কোম্পানির একটি কারখানা ছিল। সেখানকার এজেন্টরা দেশময় ঘুরে বেড়াত এবং ক্ষুদ্র উৎপাদকদের কাছ থেকে চিনি কিনত ; কিন্তু সম্প্রতিকালে চিনির আমদানি বন্ধ করার নির্দেশ জারী করা হয়েছিল।[১৩]

তামাক

উৎপাদনকারী ও প্রস্তুতকারকদের দক্ষতার অভাবের দরুন ভারতীয় তামাকের মূল্য আমেরিকান তামাকের এক-তৃতীয়াংশও ছিল না। বীজ নির্বাচন, জমি বাছাই, আগাছা নিড়ানো, ফসল কাটা, তৈরী করা ও প্যাক করার দিকে আরো দৃষ্টি দেওয়া দরকার ছিল ; ভারত আমেরিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারত না, তবে ভারতীয় তামাকের ব্যাপক চাহিদা হতে পারত, যদি দক্ষতা ও পুঁজি তাতে লাগানো হত।[১৪]

তামাক বেচাকেনায় ইয়োরোপীয়রা প্রবৃত্ত হতেন না, এবং তাঁদের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হতে দেওয়া হত না। তামাক ব্যাপকভাবে চাষ করা হত বোম্বাইয়ের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে, সেখানে গুণগত উৎকর্ষ খুব উচ্চমানের ছিল। ইংল্যাণ্ডে আমদানি করা এক গাঁট তামাক যে কোনো আমেরিকান তামাকের চেয়ে বেশী দামে বিক্রী হত—ভারতীয় তামাক বিক্রী হত ৬ পেন্সে

আর আমেরিকান তামাক ৫ পেন্সে—কিন্তু একটি পরীক্ষামূলক রপ্তানি-চালানের গড় সংরক্ষণের সময় ক্রটিপূর্ণ দেখা গেল। বঙ্গদেশ ও বোম্বাই থেকে ইংল্যাণ্ডে আমদানি-চালানগুলি সফল হয়নি। গুজরাটের তামাক চাষের জমি ছিল সবচেয়ে পরিষ্কার এবং সবচেয়ে সুব্যবস্থাযুক্ত এবং মাদ্রাজের কোইম্বাটুরে তামাকই ছিল সবচেয়ে মূল্যবান পণ্য।[১৫]

তামাকের কোনো ভারতীয় নাম ছিল না, তা থেকে দেখা যায় যে এটি ভারতের দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য ছিল না, কিন্তু সেখানে তার চাষ হত আবহমান কাল ধরে। এটি ছিল ভারতের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কৃষিকর্মের একটি, এবং তা উৎপন্ন করা হত গার্হস্থ্য ব্যবহারের জন্য। ভারতে তা ব্যবহার করা হত ঝোলাগুড়, মশলাপাতি ও ফলের সঙ্গে মিশিয়ে। অতি উর্বর জমিতে এর ফলন ছিল একরে ১৬০ পাউণ্ড, এবং গড়পড়তা সাধারণ জমিতে ৮০ পাউণ্ডকেই মনে করা হত কাঁচা পাতায় মোটামুটি ভালো ফলন বলে। সাধারণতঃ ভারতীয় তামাক খারাপ ছিল, কিন্তু খুব সম্ভবত তা উন্নত করা যেত। উত্তরাঞ্চলের সরকারগুলির তামাককে নস্যে পরিণত করা হত মসলিপত্তমে, ইংল্যাণ্ডে তা অত্যন্ত আদৃত ছিল। খুব চমৎকার কিছু হাভানা তামাক উৎপন্ন হত বিহারের ভাগলপুরে।[১৬]

রঞ্জকদ্রব্য ও শোরা, কফি ও চা

লাক্ষা-রঞ্জক ইংল্যাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে আমদানি করা হত। লাক্ষা-যষ্ঠি ছিল আঠা, তার মধ্যে থাকত কীট বা তার ডিম, এ-থেকেই রঙ তৈরী করা হত। রঞ্জক কণাগুলি পৃথক করে রঙে পরিণত করা হত আর আঠাকে পরিণত করা হত গালায়। লাক্ষা-রঞ্জক ব্যবহার করা হত লাল কাপড় রঙ করার জন্য, কিন্তু সূক্ষ্মতম রঙের জন্য ব্যবহার হত না। লাক্ষাকে ব্যবহার করা হত বার্ণিশ হিসেবে।

লাক্ষাকীট সংগৃহীত হত মাদ্রাজের দক্ষিণাঞ্চলগুলিতে, কিন্তু মেক্সিকোর তুলনায় তা ছিল স্থূল ও নিকৃষ্ট। লাক্ষাকীটের দাম ১৮২০ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রায় এক-চতুর্থাংশ হ্রাস পেয়েছিল, সম্ভবত লাক্ষা-রঞ্জকের দরুন। বঙ্গদেশ থেকে কোনো কীট আমদানি করা হত না।[১৭]

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা ইংল্যাণ্ডে শোরা আমদানির পরিমাণ ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ছিল ১৪৬,০০০ হন্দর, কিন্তু ১৮৩২-এ ছিল মাত্র ৩৭,৩০০ হন্দর। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা শোরা আমদানি শুরু করার ফলে তার দাম এত কমে যায়

যে তখন তা কেনা হত সার হিসাবে। ১৮১৪-তে দাম ছিল হন্দর প্রতি ৮৯ শিলিং ৬ পেন্স, ১৮৩২-এ মাত্র ৩৭ শিলিং। ১৮১৪-র আগে আমদানি কোম্পানির পক্ষে লাভজনক ছিল; কিন্তু তার পর থেকে অলাভজনক হয়ে দাঁড়ায়।[১৮]

কফির চাষ ব্যাপকভাবে শুরু হয় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই। সরকার সেই সময়ে কফি বাগিচা মালিকদের কফির চাষ করার অনুমতি দেন, বহু বছর ধরে তাদের হাতে জমি রাখার অনুমতি দেন। এই সুবিধা অন্য কোনো ধরনের ইয়োরোপীয় বাগিচা-মালিকদের দেওয়া হত না। বাঙ্গালোরের কফি ছিল অত্যন্ত ভালো ধরনের, যদিও মোচা-র কফির মতো ততটা ভালো নয়, এবং তার চাষের বিস্তৃতি ঘটছিল। আরকটে কফি চাষের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, গঞ্জামে কোকো বাগিচাগুলিও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বঙ্গদেশে সূর্যালোক ছিল কফির পক্ষে অত্যন্ত বেশী কড়া। কোয়েম্বাটুরে কফির চাষ লক্ষণীয়ভাবে ভালো হয়।[১৯]

চায়ের চাষের প্রবর্তন ভারতে তখনও হয়নি, কিন্তু ডঃ ওয়ালিক, ধান চাষ সম্পর্কে যাঁর সাক্ষ্য পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তিনি হিন্দুস্থানের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে চায়ের চাষ প্রবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি মূল্যবান নিবন্ধ পেশ করেন। নিচে তা থেকে কিছু উদ্ধৃত দেওয়া হল।

"এই গাছের (চা) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাষ হয় উত্তর অক্ষাংশের ২৭ ও ৩০তম সমান্তরালের মাঝে অবস্থিত চীন সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিতে, সেখানে প্রায় সমগ্রভাবেই কালো চা উৎপন্ন হয়; কিন্তু দক্ষিণে, ক্যান্টনের সমুদ্রতীর পর্যন্ত এলাকায়ও এই চা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়···

"এই গাছ পেনাঙ দ্বীপের জলবায়ু ভালোভাবেই সহ্য করতে পারে এই সম্পর্কহীন তথ্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে স্বর্গীয় মিঃ ব্রাউন তার চাষের পরিকল্পনা করেন··· মোটের উপর গাছগুলি বেশ ভালোভাবেই বেড়ে উঠেছিল, কিন্তু যখন এ-কাজে ব্যয়িত সমস্ত শ্রম, সময় ও খরচের ফসল ঘরে তোলার সময় হল, তখন দেখা গেল উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত মান অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের···

"জাভায়, একেবারে অনুরূপ পরিস্থিতিতে অনুরূপ পরীক্ষাও সমানভাবে নিষ্ফল হয়েছে, এবং তার ফলে তা পরিত্যক্ত হয়েছে। আমাকে জানানো হয়েছে, সিংহলের দক্ষিণাঞ্চলে ওলন্দাজ সরকার বহু বছর ধরে যেসব পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, তারও তেমন সাফল্য ঘটেনি।

"প্রায় কুড়ি বছর আগে রায়ো জেনেরিয়োতে চা গাছের চাষ ব্যাপক আকারে শুরু করা হয়েছিল···গন্ধের দিক দিয়ে উৎপন্ন চা এত খারাপ হল যে সম্প্রতি এর চাষ প্রায় পরিত্যাগ করা হয়েছে।

"ব্রেজিলে উৎপন্ন চায়ের একটু নমুনা পরীক্ষা করার সুযোগ আমার হয়েছিল ··· এর স্বাদ অত্যন্ত খারাপ···

"ঈস্ট ইণ্ডিজে বৃটিশ অঞ্চলের মধ্যে এমন সমস্ত অঞ্চল আছে, সব দিক দিয়ে যা চায়ের চাষবিশিষ্ট অঞ্চলগুলির সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এবং এই অঞ্চলগুলির যে চীনে উৎপন্ন শ্রেষ্ঠ ধরনের চায়ের সমান চা উৎপন্ন করার ক্ষমতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।···

"যেখানে চা-গাছের চাষ সর্বোচ্চ মাত্রায় ও সর্বাধিক ত্রুটিহীনতা সহকারে হয় সেই চীন ও জাপান সম্পর্কে আমরা যা জানি ঠিক সেই রকমই অবস্থা আছে কুমায়ুন, গাড়োয়াল ও সিরমুর অঞ্চলে···

"ইতিমধ্যেই আমার দেখার সুযোগ হয়েছে নেপালে এক ধরনের বুনো ক্যামেলিয়া জন্মায়, এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এর এক বিবরণ প্রকাশ করার সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে কাঠমাণ্ডুতে একটি বাগানে একটি চা-গাছের ঝোপ সতেজে বেড়ে উঠেছে, তার উচ্চতা ১০ ফুট এবং বছরের শেষ চার মাসে তাতে প্রচুর ফুল ও ফল হয়। কয়েক বছর পরে সেই রাজধানীতে আমার ভ্রমণের সময় আমি সেই ঝোপটি দেখতে পাই এবং খোঁজ করে জানতে পারি, গুর্খা সরকার চীনে যে দূতস্থানের ত্রিবার্ষিক কর্মচারীদের প্রেরণ করেন তাঁদের একজন ফিরে আসার সময় পিকিং থেকে এর বীজ নিয়ে এসেছিলেন।

"এই সমস্ত সমজাতীয় পরিস্থিতি আমরা যদি যথাযথ ভাবে বিবেচনা করি তা হলে নিশ্চয়ই এই দৃঢ় আশা পোষণ করতে পারি যে সুপরিচালিত ব্যবস্থাপনার অধীনে চায়ের গাছ অনতিবিলম্বেই মহামান্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডোমিনিয়নগুলিতে ব্যাপক চাষের বিষয় হয়ে উঠবে এবং সভ্য জীবনের বৃহত্তম স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের অন্যতম এই দ্রব্যটির সরবরাহের জন্য আমাদের আর বেশী দিন এক স্বেচ্ছাচারী জাতির খেয়ালখুশীর উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে না।"[২০]

ডঃ ওয়ালিকের চিঠির তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩২ এবং ন্যায্যতই আমরা তাঁকে গণ্য করতে পারি ভারতে চা শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ বলে—অজ্ঞাত যেসব গুর্খা রাজদূতরা নেপালে এর প্রবর্তন করেছিলেন তাঁদের ঠিক পরবর্তী বলে।

স্বর্ণ, লৌহ ও তাম্র

নীলগিরিতে স্বর্ণ আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং খাঁটি সোনাই তোলা হত; উইনাদ জেলায়, ঠিক পাহাড়ের নিচেও কিছু পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া গিয়েছিল। ভারতের

অধিকাংশ স্থানেই আকরিক লৌহের প্রাচুর্য ছিল। রামনাদে তা বৃটিশ ও সুইডিশ লৌহের চেয়ে উচ্চ মূল্যে বিক্রী হত এবং তা ছিল অধিকতর নমনীয়, কিন্তু কাজের সময় প্রচুর অপচয় হত। দেশী তৈরী লৌহ ইংল্যাণ্ডের লৌহের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল, তার কারণ প্রস্তুত প্রণালীর নিকৃষ্টতা। বঙ্গদেশে বর্ধমানের কাছে কিছু ভালো আকরিক লৌহ পাওয়া যেত, কিন্তু তার চেয়ে ভালো ধরনের পাওয়া যেত মাদ্রাজ উপকূলে। একে সহজে ইস্পাতে পরিণত করা যেত না বটে, তবে একবার তৈরী হলে সেই ইস্পাত হত রীতিমত ভালো। মিঃ হীথ মাদ্রাজের কাছে একটি লৌহ ঢালাই কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানে ইয়োরোপীয় যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; তিনি সনদের মেয়াদ কালের শেষ পর্যন্ত লৌহ তৈরীর একান্ত সুযোগের অধিকারী ছিলেন। এই লৌহ অন্য যে কোনো ভারতীয় লৌহ অপেক্ষা, এমনকি সুইডিশ লৌহ অপেক্ষাও অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। আকরিক লৌহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত মালাবার সীমান্তে, এবং কোয়েম্বাটুরে তা ছিল উল্লেখযোগ্য ভাবে শস্তা। কচ্ছের লৌহ বিশেষভাবে উৎকৃষ্ট ছিল, প্রধানতঃ তা পাওয়া যেত ভূপৃষ্ঠেই এবং ঝুড়িতে সংগ্রহ করে তাকে কাঠকয়লার আগুনে পোড়ানো হত। সর্বশ্রেষ্ঠ ইস্পাত তৈরী হত কচ্ছে এবং সেই ইস্পাত দিয়ে তৈরী হত বর্ম, তরবারি প্রভৃতি। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে তামা পাওয়া গিয়েছিল।[২১]

কয়লা ও কাঠ

বঙ্গদেশের বর্ধমান জেলায় বিরাট বিরাট কয়লাখনি ছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সেখানে বছরে ১৪০০০ বা ১৫০০০ টন পর্যন্ত কয়লা তোলা হয়েছিল। খনির কাজ প্রথম আরম্ভ হয় আনুমানিক ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু ব্যাপকভাবে কাজ শুরু হয় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। কয়লার স্তর ছিল ৯ ফুট গভীর, এবং ভূত্বক থেকে প্রায় ৯০ ফুট নিচে। সেখানে কাজ করত দু-তিন হাজার লোক; তাদের মজুরী ছিল মাসে ৬ কি ৮ শিলিং। কয়লা প্রধানতঃ ব্যবহার হত স্টিম ইঞ্জিনের জন্য, ইট পোড়াবার জন্যও ব্যবহৃত হত। বুন্দেলখণ্ডেও কয়লা পাওয়া গিয়েছিল এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছিল কচ্ছে।[২২]

কচ্ছের কয়লা স্টিম ইঞ্জিনের পক্ষে তেমন ভালো ছিল না, এবং বোম্বাইতে ইংল্যাণ্ডের কয়লাই ছিল অপেক্ষাকৃত সস্তা। বর্ধমানের কয়লা ছিল ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কলকাতায় অন্য কোন কয়লা ব্যবহৃত হত না। দাম ছিল প্রতি

বুশেল ১০ আনা (১ শিলিং ৩ পেন্স)। এই কয়লা জমাট বাঁধত না, সাদা ছাই হয়ে পুড়ে যেত। লৌহ তৈরীর পক্ষে এই কয়লা ইংল্যাণ্ডের কয়লার মতো ভালো ছিল না। শক্তির দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ইংল্যাণ্ডের কয়লা আর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কয়লার অনুপাতিক হিসাব ছিল ৫ : ৩।

ভারতীয় অরণ্যে ছিল পৃথিবীর সব ধরনের কাঠ, কিংবা তার বিকল্প কাঠ। প্রধান প্রধান ধরনের কাঠ ছিল—সেগুন, শাল, শিশু তুন, জারুল ও আম। শাল-কাঠ ব্যবহার হত জাহাজ-নির্মাণ ও গৃহনির্মাণে এবং সামরিক উদ্দেশ্যে। মন্দ ও অমিতব্যয়ী ব্যবস্থাপনার দরুন শাল, শিশু ও বাঁশের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। পাইন ও ওক গাছের প্রাচুর্য ছিল। ভারতের কাঠ বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি সামগ্রী হতে পারত।[২৩]

আফিম ও লবণ

এই সামগ্রীগুলিতে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার বজায় ছিল, যে-অধিকার আজও পর্যন্ত ভারত সরকারের আছে। এই সামগ্রী ছিল রাজস্বের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কমন্স কমিটি যাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান সাক্ষী হোল্ট ম্যাকেঞ্জি বলেছিলেন, "আফিম ও লবণ তৈরীর কাজ চালানো হয় রাজস্বের উদ্দেশ্যে, বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নয়। আমার অভিমত এই যে এই সামগ্রীগুলি সম্পর্কে প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহের মধ্যে এমন একটিও নেই যার ফলে বিরাট পরিমাণে রাজস্ব হানি ঘটবে না। আমার মনে হয়না যে, জনসাধারণের মধ্যে বিক্রির দ্বারা লবণ বিভাগে যত রাজস্ব পাওয়া যায় সেই পরিমাণ রাজস্ব কোনো শুল্কের সাহায্যে আমরা সংগ্রহ করতে পারি……

"সেই উৎস (আফিম) থেকেও তারা বিরাট পরিমাণ রাজস্ব লাভ করে ; প্রথম মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্যের উদ্বৃত্ত অঙ্কটি এমন একটা ট্যাক্স হয়ে দাঁড়ায় যে আমি মনে করি অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করা অসম্ভব ; এবং ব্যবসায়গত বিবেচনায় যদিও এই ব্যবস্থা সম্পর্কে জোরালো আপত্তি আছে, তবুও তার বিরুদ্ধে আমাদের রাজস্বের প্রয়োজনীয়তার কথাটি তুলে ধরতে হবে ; এবং আমার বিশ্বাস সমপরিমাণ রাজস্ব অন্য উপায়ে পাওয়া যাবে না।"[২৪]

সংক্ষিপ্তসার

উপরের সংক্ষিপ্তসার থেকে দেখা যাবে যে লর্ডস ও কমন্স কমিটি ১৮৩০ থেকে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে সাক্ষ্য নথীবদ্ধ করেছেন, তাতে আমরা তৎকালে ভারতের শিল্প সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান বিবরণ পাই; ঠিক যেমন ডঃ ফ্রান্সিস বুকানানের নথীতে পাই ১৮০০ থেকে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে অতি মূল্যবান বিবরণ। তা সত্ত্বেও ডাঃ বুকানানের নথীর তুলনায় পার্লামেণ্টারি নথীপত্রগুলি হল অসম্পূর্ণ বিবরণ। লর্ডস ও কমন্স কমিটি তাঁদের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন সেই সমস্ত শিল্পের মধ্যেই যেখানে বৃটিশ পুঁজি প্রয়োগ করা হয়েছে অথবা লাভজনকভাবে প্রয়োগ করা যায়। যে সব অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ভারতের জনসাধারণের কর্মসংস্থান করত—যেমন ইটখোলা ও গৃহনির্মাণ, পাথর-কাটা ও ছুতোরগিরি, নৌকা-বানানো, এবং আসবাবপত্র, পিতল, লৌহ ও তামার বাসনপত্র, সোনা ও রূপার কাজ, রঞ্জন ও চামড়া পাকা করার শিল্প এবং ভারতের ক্ষীয়মান সুতা-কাটা ও তাঁত শিল্প—সেগুলি তাঁদের আগ্রহ তেমন জাগ্রত করেনি।

নথীবদ্ধ সাক্ষ্য থেকে একথা প্রকাশ পায় যে নিছক কৃষিকর্মের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা দেবার মতো তেমন কিছু ছিল না; কিন্তু খাদ্যশস্য পরিষ্কার করা ও তুষ ছাড়ানোর ব্যাপারে, সুতা কাটা ও বোনার ব্যাপারে, নীল, তামাক ও চিনি প্রস্তুত করার ব্যাপারে, কফি ও চা চাষ করার ব্যাপারে, লৌহ ঢালাইয়ের ব্যাপারে, কয়লা খনি ও স্বর্ণখনির কাজে, যন্ত্রপাতির উপরে নির্ভরশীল সমস্ত শিল্পের ব্যাপারে ইয়োরোপ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ভারত অপেক্ষা অধিকতর ত্রুটিহীন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। একথা ভাবা যেতে পারে যে, জাতীয় শিল্পগুলির উন্নয়নের দিকে নজর রেখে কাজ করে এমন এক সরকার ভারতের পরিশ্রমী ও দক্ষ জনসাধারণের মধ্যে এই সমস্ত উন্নততর পদ্ধতি প্রবর্তন করতে পারতেন, আমাদের এই পুরুষেই জাপানের জনগণের মধ্যে যেভাবে তা প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু নিজেদের মুনাফার জন্য যারা কাজ করত সেই সব বিদেশী বণিক ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রস্তুতকারকদের সামনে এই লক্ষ্য থাকবে, এমনটি হওয়া সম্ভব ছিল না বললেই চলে এবং এই প্রচেষ্টা কখনোই করা হয়নি। ভারতের তৈরী পণ্য সামগ্রীকে যতদূর সম্ভব বৃটেনে প্রস্তুত পণ্য দিয়ে স্থানচ্যুত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এর ঠিক বিপরীত নীতিই অনুসৃত হয়েছিল। ১৮৩২-এর পার্লামেণ্টারি

তদন্তের তারিখের পাঁচ-বছর পরে লিখতে গিয়ে মন্টগোমারি মার্টিন তৎকালীন বাণিজ্য নীতির বর্ণনা ও নিন্দা করেছেন কঠোরতম ভাষায়।

"সরকারের কাছে এই সরকারী বিবরণী [উত্তর ভারতে ডাঃ বুকানানের অর্থনৈতিক তদন্ত] দাখিল করার পর আমাদের লোলুপতা ও স্বার্থপরতায় ভুক্তভোগীদের কল্যাণের জন্য ইংলণ্ডে অথবা ভারতে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা কি গ্রহণ করা হয়েছে? হয়নি! বরং ইংরেজের বাণিজ্যের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার শিকার দুঃখী মানুষগুলিকে আরো দীনদরিদ্র করে তোলার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই আমরা করেছি। সামনের পৃষ্ঠাগুলিতে সমীক্ষা করা জেলাগুলিতে কত লোক তাদের প্রধান জীবিকার জন্য কাপড় বোনা প্রভৃতিতে তাদের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবাধ বাণিজ্যের অজুহাতে ইংলণ্ড হিন্দুদের বাধ্য করেছে নিছক নামমাত্র শুল্কে ল্যাঙ্কাশায়ার, ইয়র্কশায়ার, গ্লাসগো প্রভৃতি স্থানের বাষ্পচালিত তাঁতের উৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণ করতে; আর বঙ্গ ও বিহারের হস্তচালিত তাঁতের সুন্দর জমিনের টেঁকসই কাপড়ের ইংলণ্ডে আমদানির উপর গুরুভার এবং প্রায় নিবারণমূলক শুল্ক চাপানো হয়েছিল।"[২৫]

সাক্ষী হোল্ট ম্যাকেঞ্জিকে কমন্স কমিটি প্রশ্ন করেন, "ভারতের যে অংশে বৃহত্তম সংখ্যক বৃটিশ অধিবাসী দেখা যায়, সেখানে দেশীয় লোকেদের মধ্যে কি ইংরেজের রুচি, ফ্যাশন ও আচার ব্যবহারের প্রতি অনুরক্তির ক্ষেত্রে কোনরূপ বৃদ্ধি ঘটেছে?"

হোল্ট ম্যাকেঞ্জি উত্তর দেন, "কলকাতার কথা বিচার করে আমার মনে হয় দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ইংরেজী বিলাসব্যসনে লিপ্ত হওয়ার একটা লক্ষণীয় প্রবণতা দেখা গেছে; তাদের সুসজ্জিত গৃহ আছে, অনেকেই ঘড়ি পরে, তারা গাড়ি চড়তে ভালোবাসে এবং শোনা যায় মদ্যপানও করে থাকে।...[২৬]

ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রয়াসের এই তাৎপর্য পূর্ণ সাক্ষ্য লাভ করে ইংলণ্ডের গুরুগম্ভীর ও শ্রদ্ধেয় কমন্স-সদস্যদের মুখে নিশ্চয়ই ছড়িয়ে পড়েছিল সন্তোষের মৃদু হাসি।

১। ছটি খণ্ড হল: (1) Public, (2) Finance and Trade, (3) Revenue (4) Judicial, (5) Military, (6) Political.

২। Evidence before the Lord's Committee, 1830. Digest.

৩। Evidence in the Commons' Reports of 1830, 1830 31, and 1831. Digest.

৪। Evidence before the Commons' Committee, 1832. Digest.

৫। Evidence before the Lord's Committee, 1830, Digest.

৬। Evidence in the Commons' Reports of 1830, 1830-31, and 1831. Digest.

৭। Evidence before the Commons' Committee, 1832. Digest.

৮। Evidence before the Commons' Committee, 1832. vol. ii, Part 1., p. 195. বর্তমান কাল পর্যন্ত এই হল সমস্ত বিশেষজ্ঞের মত। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রয়্যাল এগ্রিকালচারাল সোসাইটির কনসালটিং কেমিস্ট ডাঃ ভোয়েলকারকে ভারতীয় কৃষি সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং তার উন্নয়নকল্পে পরামর্শ দানের জন্য ভারতে পাঠানো হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন: "একটি বিষয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না, যেমন, সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা আদিম ও পশ্চাৎপদ এবং এই অবস্থা সংশোধনের জন্য এবং সংশোধনের চেষ্টায় কিছুই করা হয়নি বলে যে ধারণাটা ইংলণ্ডে সাধারণতঃ পোষণ করা হয় এবং প্রায়শই ব্যক্তও করা হয়, সেই ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত……সবচেয়ে ভালো অবস্থায়, একজন ভারতীয় রায়ত বা চাষী একজন গড়পড়তা বৃটিশ চাষীর মতোই সমান ভালো, কোনো ক্ষেত্রে তার চাইতে ভালো; আর সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় তার সম্পর্কে একথা বলা যায়, এই অবস্থা ঘটে অনেকাংশে উন্নয়নের সুযোগসুবিধা না থাকার দরুন, সুযোগ সুবিধার এই অভাবের সমতুল সম্ভবত অন্য কোনো দেশেই নেই, এবং একজন রায়ত সমস্ত অসুবিধার সামনে যে ভাবে ধৈর্যের সঙ্গে ও অভিযোগ না করে লড়াই করে যাবে, তেমনটি আর কেউ করবে না।

"আমি যা বলছি তাতে আমাদের বৃটিশ চাষাদের অবাক হবার কিছু নেই, কারণ মনে রাখতে হবে যে ভারতের দেশীয় লোকেরা ইংলণ্ডের লোকের চেয়ে শত শত বছর আগেই গম-চাষ করত। অতএব, তাদের কাযধারা খুব একটা উন্নত করা দরকার হবে বলে মনে হয় না। অধিকতর ফসল ফলানোর কাজে যা তাদের বাধা দেয় তা হল তাদের প্রাপ্ত সীমাবদ্ধ সুযোগ-সুবিধা, যেমন জল ও সার। কিন্তু চাষবাসের সাধারণ কাজগুলি ধরলে, জমিকে আগাছা থেকে সুচারুরূপে পরিষ্কার রাখার ও জলতোলার কৌশলের ক্ষেত্রে এমন উদ্ভাবনী দক্ষতার, জমি ও তার ক্ষমতা সম্পর্কে তথা বীজ বপন ও ফসল কাটার সঠিক সময় সম্পর্কে জ্ঞানের এত ভালো দৃষ্টান্ত ভারতীয় কৃষিতে যেমন পাওয়া যাবে, তেমনটি আর কোথাও পাওয়া যাবে না—এর এটা শুধু তার শ্রেষ্ঠ স্তরেই যে দেখা যাবে তা নয়, সাধারণ স্তরেও মিলবে। ঘুরতি-ফসল, মিশ্র ফসল ও পতিত রাখার ব্যবস্থা সম্পর্কেও এরা যে কতখানি জ্ঞান রাখে তাও চমকপ্রদ। একথা সুনিশ্চিত যে আমি অন্তত আমার ভ্রমণকালে কোনো অবস্থানের স্থলেই কঠোর শ্রম, অধ্যবসায় ও সম্পদের উর্বরতা-মিশ্রিত সযত্ন কৃষিকর্মের অধিকতর ত্রুটিহীন চিত্র আর কখনও দেখিনি।"—Report on the Improvement of Indian Agriculture.

৯। Evidence before the Lords' Committee. 1830. Digest.

১০। Evidence in the Commons' Reports of 1830, 1830-31, and 1831. Digest.

১১। Evidence before the Commons' Committee, 1832. Digest.

১২। Evidence before the Lords' Committee. 1830, Digest.

১৩ । Evidence given in the Commons' Reports of 1830, 1830-31, and 1831. Digest.

১৪ । Evidence before the Commons' Committee, 1832. Digest.

১৫ । Evidence before the Lords' Committee, 1830, Digest,

১৬ । Evidence in the Commons' Reports of 1830, 1830-31 and 1831. Digest.

১৭ । ঐ ।

১৮ । Evidence before the Commons' Committee, 1832. Digest.

১৯ । Evidence before the Lords' Committee, 1830 ; in the Commons' Reports of 1830, 1830-31, and 1831 , and before the Commons' Committee 1832. Digest.

২০ । Evidence before the Commons' Committee, 1832, Part II, Appendix 21

২১ । Evidence in the Commons' Report of 1830, 1830-31, Digest.

২২ । ঐ ।

২৩ । Evidence before the Commons' Committee, 1832 Digest.

২৪ । ঐ, Part I, p, 26

২৫ । *Eastern India* by Montgomery Martin (London, 1838), *vot.* iii, Introduction.

ষোড়শ অধ্যায়

বহির্বাণিজ্য (১৮১৩-১৮৩৫)

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে একটি আইন পাশ হয়, সেই আইনে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যগত হিসাব থেকে আঞ্চলিক হিসাব পৃথক করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয় যে আঞ্চলিক রাজস্ব প্রয়োগ করতে হবে (১) সামরিক ব্যয়ে; (২) অসামরিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে; এবং (৩) ভারতীয় ঋণবাবদ সুদ পরিশোধে। আর ব্যবসা-বাণিজ্যগত মুনাফা প্রয়োগ করতে হবে (১) হুণ্ডি পরিশোধে ও অন্যান্য চলতি ঋণের পরিশোধে; (২) ডিভিডেণ্ড প্রদানে; এবং (৩) ভারতীয় ঋণ বা 'হোম বণ্ড' ঋণ হ্রাসের কাজে।[১]

১৮১৩ থেকে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ওই পনেরো বছরে ভারতের আঞ্চলিক রাজস্ব ছিল :

বঙ্গ	১৯৬,১২১,৯৮৩ পাউণ্ড
মাদ্রাজ	৮২,০৪২,৯৬৭ "
বোম্বাই	৩০,৯৮৬,৮৭০ "
অযোধ্যা ও অধীনস্থ এলাকা	১,৯৩১,৪৮০ "
মোট	৩১১,০৮৩,৩০০ "

এ থেকে আমরা গড়ে বার্ষিক আঞ্চলিক রাজস্ব দেখতে পাই দু'কোটি স্টার্লিংয়ের বেশী। এই ভারতীয় আঞ্চলিক রাজস্ব থেকে ইংলণ্ডে ব্যয়িত "হোম চার্জ"-এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল বার্ষিক গড়ে ১,৬৯৩,৪৭২ পাউণ্ড; এবং মোট আঞ্চলিক ব্যয় মোট আঞ্চলিক রাজস্বকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এবং তাতে বার্ষিক গড় ঘাটতি দেখা গেল ১,২২৭,৩৪৩ পাউণ্ড। এই পনেরো বছরে আঞ্চলিক ঋণ বেড়ে গিয়েছিল তিন কোটি থেকে চার কোটি সত্তর লক্ষ স্টার্লিংয়ে; এবং ৩৭ বছরে কোম্পানির আঞ্চলিক ঋণের ক্রমান্বিত ও নিয়ত বৃদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়েছে নিচের অঙ্কগুলিতে :[২]

এপ্রিল ১৭৯২	৯,১৪২,৭২০ পাউণ্ড
" ১৮০৯	৩০,৮১২,৪৪১ "
" ১৮১৪	৩০,৯১৯,৬২০ "
" ১৮২৯	৪৭,২৫৫,[illegible]৭৪ "

এইভাবে দেখা যাবে যে লর্ড ওয়েলেসলী ও লর্ড হেস্টিংস্-এর যুদ্ধকালীন-সদৃশ প্রশাসনের সময়ে ঋণের সঙ্গে বিরাট বিরাট অঙ্ক যোগ হয়েছিল। বিল অব এক্সচেঞ্জ ও ডিভিডেণ্ড প্রদানের পর কোম্পানির উদ্বৃত্ত বাণিজ্যিক মুনাফা প্রযোজ্য ছিল ভারতীয় ঋণ বা হোম বণ্ড ঋণ হ্রাসের ক্ষেত্রে, যেকথা আগেই বলা হয়েছে। ১৮১৪, ১৮১৭ ও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে দশ লক্ষ স্টার্লিংয়েরও অধিক এই উদ্বৃত্ত বাণিজ্যিক মুনাফা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে সাম্রাজ্যের বিস্তার ও কোম্পানির পতনের সঙ্গে সঙ্গে; এবং ১৮২৮ থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তার পরিমাণ ছিল মাত্র ৩০ ০ থেকে ৪২,০০০ পাউণ্ডের মধ্যে।

১৮২৪-এর পর কোম্পানি ভারতে পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করা বন্ধ করে দেয় এবং তাদের একমাত্র রপ্তানি ছিল সামরিক ও রাজনৈতিক সামগ্রী। ভারতে তাদের রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ করার কারণ হল প্রতিদানে ভারতে উৎপন্ন বা প্রস্তুত কোনো সামগ্রী লাভের অসুবিধা। ভারতীয় শিল্পগুলির অবনতি ঘটেছিল এবং কোম্পানি ভারত থেকে ইংলণ্ডে যে সব সামগ্রীর আমদানি চালিয়ে যাচ্ছিল তা হল কাঁচা রেশম, রেশমের কিছু থান, শোরা ও নীল। নীল কেনা হত কলকাতা থেকে, কাঁচা রেশম ও শোরা তৈরী করা হত তাদের কারখানায় এবং রেশমের টুকরো সামগ্রী নেওয়া হত প্রধান তাঁতীদের সঙ্গে চুক্তি করে। ইংলণ্ডে ভারতীয় চিনির আমদানি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভারতের সঙ্গে কোম্পানির বাণিজ্যের এই ক্রমাবনতির ফলে, তাদের বাণিজ্য ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন তাদের সনদের নবীকরণ হল, তখন চূড়ান্তভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গেল।

কোম্পানির ভারতীয় বাণিজ্যের অবনতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমে চলে যায় ব্যক্তিগত বণিকদের হাতে। এই বাণিজ্য সর্বপ্রথম ১৮১৩ খৃষ্টাব্দেই তাদের কাছে খুলে দেওয়া হয়। তার পরবর্তী ষোল বছরে কোম্পানির বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়াল গড়ে বার্ষিক ১,৮৮২,৭১৮ পাউণ্ড, আর ব্যক্তিগত বাণিজ্য গড়ে বার্ষিক ৫,৪৫১,৪৫২ পাউণ্ড। অতএব ব্যক্তিগত বাণিজ্য ছিল কোম্পানির তুলনায় তিনগুণ বেশী এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চালাবার ব্যাপারে ভারতের ভূখণ্ডের প্রভুদের চেয়ে ব্যক্তিগত বণিকরাই নিজেদের যোগ্যতর বলে প্রমাণ করলেন। ভারতীয় তৈরী পণ্যের বিলুপ্তির প্রক্রিয়াটি অবশ্য নতুন ব্যবস্থাতেও চলতে থাকল; ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা লণ্ডনে রপ্তানি করেছিল ২০ লক্ষ স্টার্লিংয়ের তুলাজাত দ্রব্য; ১৮৩০-এ কলিকাতা আমদানি করল ২০ লক্ষ স্টার্লিংয়ের ব্রিটিশ তুলাজাত সামগ্রী। ভারতে ব্রিটিশ তুলোর পাকানো সুতো প্রথম আমদানি হয় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তার

পরিমাণ ছিল ওজনে ১২১,০০০ পাউণ্ড ; ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়াল ওজনে ৪০ লক্ষ পাউণ্ডে। পশমী দ্রব্য, তামা, সীসা, লৌহ, কাচ ও মৃৎপাত্রও আমদানি হত। ব্রিটিশ তৈরী পণ্য কলকাতায় আমদানি হত সামান্য ২½ শতাংশ শুল্ক দিয়ে, আর ইংলণ্ডে ভারতীয় তৈরী পণ্যের আমদানিকে নিরুৎসাহিত করা হত তাদের মূল্যের উপরে ৪০০ শতাংশ পর্যন্ত মোটা শুল্ক চাপিয়ে।[৩]

১৮১২ থেকে ১৮৩২-এর মধ্যে ইংলণ্ডে ভারতীয় তৈরী পণ্যের আমদানির উপরে যে সব শুল্ক বাণিজ্যের বিভিন্ন সামগ্রীর উপরে বসানো হয়েছিল তা নিম্নলিখিত সারণিতে দেখানো হয়েছে :[৪]

	১৮১২	১৮২৪	১৮৩২
	মূল্যের উপরে শতাংশ	মূল্যের উপরে শতাংশ	মূল্যের উপরে শতাংশ
অলঙ্কৃত বেতের কাজ	৭১	৫০	৩০
মসলিন	২৭	৩৭½	১০
ক্যালিকো	৭১ ১/৬	৬৭½	১০
অন্যান্য তুলার তৈরী পণ্য	২৭ ১/৬	৫০	২০
ছাগলোমের শাল	৭১	৬৭½	৩০
কলাই করা বাসনপত্র	৭১	৬২½	৩০
মাদুর	৬৮ ১/৬	৫০	২০

	১৮১২	১৮২৪	১৮৩২
কাঁচা রেশম	মূল্যের উপরে ২ পা ১৩ শি ৪ পে তৎসহ ওজনে পাউণ্ড পিছু ৪ শি	ওজনে পাউণ্ড পিছু ৪ শিলিং	ওজনে পাউণ্ড পিছু ১ পেন্স
তৈরী রেশমের সামগ্রী	নিষিদ্ধ	নিষিদ্ধ	মূল্যের উপর ২০ শতাংশ
তাফতা বা অন্যান্য সাধারণ বা অলঙ্কৃত রেশম	নিষিদ্ধ	নিষিদ্ধ	মূল্যের উপর ৩০ শতাংশ
রেশম থেকে তৈরী সামগ্রী	নিষিদ্ধ	নিষিদ্ধ	মূল্যের উপরে ২০ শতাংশ
চিনি (ক্রয় মূল্য হন্দর পিছু প্রায় ১ পাউণ্ড)	প্রতি হন্দরে ১ পা ১৩ শি	প্রতি হন্দরে ৩ পা ৩ শি	প্রতি হন্দরে ১ পা ১২ শি
মদ্য (আরক)	প্রতি গ্যালনে ১ শি ৮ পে তৎসহ ১৯ শি ১$\frac{১}{২}$ পে আবগারি শুল্ক	প্রতি গ্যালনে ২ শি ১ পে তৎসহ ১৭ শি ০$\frac{৩}{৪}$ পে আবগারি শুল্ক	প্রতি গ্যালনে ১৫ শি
তুলার সুতো	প্রতি ১০০ পাউণ্ড ওজনে ১৬ শি ১১ পে	৬ শতাংশ	২০ শতাংশ

ইংলণ্ডে ভারতীয় তৈরী পণ্যের রপ্তানির উপরে এই সমস্ত অন্যায় ও বিপুল শুল্কের বিরুদ্ধে হাউস অব কমন্সের কাছে নিষ্ফলভাবে আবেদন পত্রাদি পেশ করা হয়। চিনি ও মদ্যের উপরে[৫] শুল্কের বিরুদ্ধে একটি আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন প্রায় চারশো ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় বণিক; এঁদের মধ্যে আমরা রামগোপাল ঘোয়ের নাম পাই, এটি সম্ভবত বিখ্যাত ভারতীয় প্রচারক-লেখক রামগোপাল ঘোষের নামের ছাপার ভুল। ভারতের তুলা ও রেশমের কাপড়ের উপর শুল্ক হ্রাস করার জন্য অসংখ্য শ্রদ্ধাভাজন ভারতীয়ের স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যাত হয়; এবং এরপর লণ্ডনের কয়েকজন বণিক এই সমস্ত কাপড় ইংলণ্ডে আমদানি করার উপর ২$\frac{১}{২}$ শতাংশ ছাড় দেবার জন্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে আবেদন করেন।[৬] এই আবেদন সমানভাবে নিষ্ফল হয়।

ইংলণ্ডের অন্যায় বাণিজ্যিক নীতি ভারতের তৈরী সামগ্রীকে কী পরিমাণে নিরুৎসাহিত ও বিনষ্ট করেছিল তা ত্রিশ বছরে কলকাতা বন্দর থেকে পাঠানো রপ্তানির সারণি থেকে দেখা যাবে। ২৬৬ পৃষ্ঠার অঙ্কগুলি শুধু যুক্তরাজ্যেই রপ্তানির পরিচায়ক :[৭]

এই অঙ্কগুলি থেকে দেখা যাবে যে ইয়োরোপীয় বাগিচা-মালিকদের দ্বারা নীল যেমন তৈরী বেড়েছিল এবং কাঁচা রেশমের রপ্তানি মোটামুটি বজায় ছিল, তেমনি রেশমের থান রপ্তানি নিম্নগামী হয়েছিল। তুলা রপ্তানিও নিম্নগামী ছিল কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছিল তুলার থান রপ্তানি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চার বছরে, সমস্ত নিষেধাজ্ঞা ও বিধিনিষেধমূলক শুল্ক সত্ত্বেও কলকাতা থেকে যুক্তরাজ্যে চালান গিয়েছিল ৬ থেকে ১৫ হাজার গাঁইট। ১৮১৩-তে এই অঙ্ক দ্রুত হ্রাস পায়। সেই বছর ব্যক্তিগত বণিকদের কাছে বাণিজ্যের সুযোগ খুলে দেওয়ার ফলে ১৮১৫-তে আকস্মিক ভাবে তা বৃদ্ধি পায়; কিন্তু এই বৃদ্ধি ছিল নিতান্তই সাময়িক। ১৮২০-র পর তুলার থান তৈরী ও তার রপ্তানি ক্রমাগত নিম্নগামী হয়, আর কখনো তা উর্ধ্বমুখী হয়নি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও, বিশেষত আমেরিকা, ডেনমার্ক, স্পেন, পোর্তুগাল, মরিশাস ও এশিয়ার বাজারগুলিতে ভারতীয় টুকরা সামগ্রীর রপ্তানিও অনুরূপভাবে হ্রাস পায়। আমেরিকায় রপ্তানির পরিমাণ ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১৩,৬৩৩ গাঁইট থেকে ১৮২৯-এ এসে দাঁড়ায় ২৫৮ গাঁইট; ডেনমার্ক ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নিয়েছিল ১৪৫৭ গাঁইট, ১৮২০-র পর সে ১৫০ গাঁইটের বেশী আর কখনো নেয়নি; পোর্তুগাল ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নিয়েছিল ৯৭১৪ গাঁইট, ১৮২৫-এর পর হাজার খানেক গাঁইটের

বছর	তুলা	তুলাজাত কাপড়ের থান	রেশম	রেশম-জাত থান	লাক্ষা ও লাক্ষা রঞ্জক	নীল
	(গাঁইট)	(গাঁইট)	(গাঁইট)	(গাঁইট)	(মণ)	(পেটি)
১৮০০	৫০৬	২,৬৩৬	২১৩	—	—	১২,৮১১
১৮০১	২২২	৬,৩৪১	২৩৮	—	—	৯,৯২৮
১৮০২	২,০৭২	১৪,৮১৭	৪০০	—	—	৮,৬৯৪
১৮০৩	২,৪২০	১৩,৬৪৯	১,২৩২	—	—	১২,৯৮৬
১৮০৪	৬০২	৯,৬৩১	১,৯২৬	—	—	১৮,৩৩৯
১৮০৫	২,৪৫৩	২,৩২৫	১,৩২৭	—	—	১৩,৪৮৬
১৮০৬	৭,৩১৫	৬৫১	১,৬৮৯	—	—	১৭,৫৪২
১৮০৭	৩,৭১৭	১,৬৮৬	৪৮২	—	—	১৯,৪৫২
১৮০৮	২,০১৬	২৩৭	৮১৭	—	—	১৬,৬২২
১৮০৯	৪০,৭৮১	১০৪	১,১২৪	—	—	৮,৮৫২
১৮১০	৩,৪৭৭	১,১৬৭	৯৪৯	—	—	১৩,২৬৪
১৮১১	১৬০	৯৫৫	২,৬২৩	—	—	১৪,৩৩৫
১৮১২	...	১,৪৭১	১,৮৮৯	—	—	১৩,৭০৩
১৮১৩	১১,৭০৫	৫৫৭	৬৩৮	—	—	২৩,৬৭২
১৮১৪	২১,৫৮৭	৯১৯	১,৭৮৬	—	—	১৬,৫৪৪
১৮১৫	১৭,২২৮	৩,৮৪২	২,৭৯৬	—	—	২৬,২২১
১৮১৬	৮৫,০২৪	২,৭১১	৮,৮৮৪	—	—	১৫,৭৪০
১৮১৭	৫০,১৭৬	১,৯০৪	২,২৬০	—	—	১৫,৫৮৩
১৮১৮	১২৭,১২৪	৬৬৬	২,০৬৬	—	—	১৩,০৪৭
১৮১৯	৩০,৬৮৩	৫৩৬	৬,৯৯৮	৪৬৮	—	১৬,৬৭০
১৮২০	১২,৯৩৯	৩,১৮৬	৬,৮০৫	৫২২	—	১২,৫২৬
১৮২১	৫,৪১৫	২,১৩০	৬,৯৭৭	৭০৪	—	১২,৬৩৫
১৮২২	৬,৫৪৪	১,৬৬৮	৭,৮৯৩	৯৫০	—	১৯,৭৫১
১৮২৩	১১,৭১৩	১,৩৫৪	৬,৩৫৭	৭৪২	১৪,১৯০	১৫,৮৭৮
১৮২৪	১২,৪১৫	১,৩৩৭	৭,০৬৯	১,১০৫	১৭,৬০৭	২২,৪৭২
১৮২৫	১৫,৮০০	১,৮৭৮	৮,০৬১	১,৫৫৮	১৩,৪৯১	২৬,৮৩৭
১৮২৬	১৫,১০১	১,২৫৩	৬,৮৫৬	১,২৩৩	১৩,৫৭৩	১৪,৯০৪
১৮২৭	৪,৭৩৫	৫৪১	৭,৭১৯	৯৭১	১৩ ৭৫৬	৩০,৭৬১
১৮২৮	৪,১০৫	৭৩৬	১০,৪৩১	৫৫০	৫,৩ ৯	১৯,০৪১
১৮২৯	...	৪৩৩	৭,০০০(?)	...	৮,২৫১	২৭,০০০(?)

বেশি আর কখনো নেয়নি ; এবং আরব ও পারস্য উপসাগরে রপ্তানি যেখানে ১৮১০ থেকে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৪ থেকে ৭ হাজার গাঁইটে উঠে এসেছিল, ১৮২৫-এর পর তা ২ হাজার গাঁইটের বেশী আর হয়নি।

অন্য দিকে, ভারতের পণ্য-তৈরীর শিল্প যেহেতু নষ্ট হয়ে গেল, সেই হেতু সে আমদানি করতে শুরু করল বৃটিশ ও অন্যান্য বিদেশী কাপড়ের থান। তার মূল্য সে দিত খাদ্য শস্যে। ২৬৮ এবং ২৬৯ পৃষ্ঠার অঙ্কগুলি তাৎপর্যপূর্ণ :[৮]

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কমন্স কমিটির সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্যে টমাস মুনরো ভারতের চমৎকার শালকে পাইসলের শাল স্থানচ্যুত করবে, এই চিন্তাটাই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজের গভর্ণর ছিলেন, এবং নিশ্চয়ই উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন কিভাবে ভারতে তৈরী সামগ্রীকে স্থানচ্যুত করার জন্য ইয়োরোপীয় শাল, সেই সঙ্গে মসলিন ও থান, মোটা পশমী বস্ত্র ও পশমের তৈরী পোশাকের প্রবর্তন হচ্ছিল। সমানভাবেই সহানুভূতিশীল প্রশাসক স্যার জন ম্যালকম বোম্বাইয়ের গভর্ণর ছিলেন ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এবং তিনিও ভারতীয় শিল্পগুলির বিনাশ এবং ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য লক্ষ্য করেছেন আতঙ্কের সঙ্গে।

"কোর্টের (কোর্ট অব ডিরেক্টর্স) পত্রে মন্তব্য করা হয়েছে যে বিশেষভাবে ওই বিষয়টির প্রতি এবং যেসব কাঁচামালের উপর গ্রেট ব্রিটেনের সবচেয়ে মূল্যবান তৈরী পণ্যগুলি নির্ভর করে তার একটা বড় অংশের জন্য অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীলতা থেকে গ্রেট ব্রিটেনকে মুক্ত করার উপায় হিসেবে ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রতি তাঁদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে······

"এই সঙ্গে একথা আমাকে যোগ করতেই হবে যে একমাত্র রেশমের মতো পণ্য প্রবর্তিত করেই, আমাদের তুলার সুতার উন্নয়ন ঘটিয়েই এবং আমাদের চিনি তৈরী ও তাকে পরিশোধিত করার সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার সাফল্য দ্বারাই আমরা আমাদের অনেকগুলি জেলাকে নতুন করে প্রাণ দিতে পারি এবং আমাদের অঞ্চলগত সম্পদকে রক্ষা করতে পারি······

"আমি যেসব পণ্যের কথা আগে বলেছি সেই রকম সমৃদ্ধতর পণ্য এবং দানা-শস্য ছাড়াও অন্যান্য সামগ্রীকে উৎসাহ যুগিয়ে, বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে এবং বিত্তশালী ও উদ্যোগী মানুষদের দেশের ভিতর দিকে থাকতে অথবা বসতি স্থাপনে রাজী করিয়েই আমরা গ্রামাঞ্চলে প্রাণসঞ্চার করতে পারি এবং তাকে তার রাজস্ব প্রদানে সক্ষম করে তুলতে পারি। এই অভীষ্ট অর্জনের জন্য আমাদের শাসন ও নিয়ন্ত্রণাধীন দেশীয় জনসমষ্টির মধ্যে প্রতিভা বা উৎসাহের অভাব নেই,

কলকাতার মধ্য দিয়ে বাংলায় আমদানি করা কিছু ব্রিটিশ ও বিদেশী পণ্য

বছর	মোটা পশমী বস্ত্র	তুলার সুতা, পাউণ্ডে	তুলা পাকানো, পাউণ্ডে	সুতা কাটার কলে পাকানো সুতা, পাউণ্ডে	থান মূল্য পাউণ্ড স্টার্লিংয়ে	মদ্য মূল্য পাউণ্ড স্টার্লিং
১৮১৩	৩,৩৮১	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই		৫২,২৫৩
১৮১৪	৪,৬৩৫	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই		৫৭,২০১
১৮১৫	৩,৯০৮	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই		৫৯,৪৬২
১৮১৬	৩,৭০৭	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই		৫৬,৪১১
১৮১৭	২,৩৫৫	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই		৫৩,১৫৭
১৮১৮	৫,৬৩৩	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই		৩৬,৭১২
১৮১৯	৯,২৪৪	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই		২০,৯৮৮
১৮২০	৫,৫৪৬	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই		২৬,০৪৯
১৮২১	৭,৫৯০	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই		৩০,৩৮২
১৮২২	৫,১০৮	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই		৪৬,২৩৫
১৮২৩	৭,৩৪৬	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	৬৪,৪৪৯	৩০,১২৯
১৮২৪	৫,৪০১	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	৪৩,০৩০	২২,৪৩৯
১৮২৫	১৩,৯৮১	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	১৫৮,০৭৬	১৪,২২৩
১৮২৬	৯,৬২৯	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	হিসেব দেওয়া নেই	১৭৮,৪৮১	৫৬,০৫৮
১৮২৭	৫,৪৩০	৮২,৭৩৮	৪৩২,৮৭৮	৩৩৯,২৩৪	২৯৬,১৭৭	৮০,৫৯৫
১৮২৮	৭,৬০৯	১৪৯,০৭৬	৬৪২,৩০৬	৪৬৪,৭৭৬	২৩৫,৮৩৭	৪১,১৪২
১৮২৯	১১,৮৩৮	৯৮,১৯৪	৩৯৮,৯৩০	৯১৮,৬৪৬	১৯৭,২৯০	৩১,৩১১

মাদ্রাজের মধ্য দিয়ে মাদ্রাজ প্রদেশে আমদানি করা কিছু ব্রিটিশ ও বিদেশী পণ্য

বছর	ছিট কাপড়	লংক্লথ	মসলিন	থান	সাটিন	রেশম থান	মোটা পশমী বস্ত্র	শাল	পশমী পোশাক	পশম জাত পণ্য
	পাউণ্ড স্টার্লিং	পাঃ	পাঃ	পাঃ	পাঃ	পাঃ	পাঃ	পাঃ	পাঃ	পাঃ
১৮২৪								১৮১		
১৮২৫								৯২০		
১৮২৬			৩৪২	৯০৩	৩১২		৮৩৫	১০৫৯		৬১৪
১৮২৭	৫১০	৪৭০	৯৪১	৫৩৬	৬৩৭		২১৭৬	৭৫৪	৬০১	৯১৫
১৮২৮	২১৯	৩৮০	৭৮৯	৯৫৮	৫৯৩		৯১৫	১১১৫	৪৮১	১৩১০
১৮২৯	৩৫২	৩৪৮	৫৯৮	৬৭৪	৮৫৩	৬৪৪	১৪১৭	৪০৯	৫৮১	৮৪৪
১৮৩০	৩৭২	...	২২৪	১১২১	৫৭৭	১৩৬	১১৫৮	৪৭৬	৩৬৫	৪৫৭

কিন্তু সেটা কাজে লাগানো দরকার ; এবং একাজ করার জন্য, যে-সরকার বোঝে তার কর্তৃত্বাধীন সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধির সঙ্গে তার নিজের সমৃদ্ধিকে কিভাবে মেলাতে হয়, এমন এক সরকারের সমস্ত কাজকর্ম, কর্মোৎসাহ ও বিশদীকৃত নীতি সর্বতোভাবে নিয়োজিত করা দরকার।"[৯]

এমন কি স্যর জন ম্যালকমও দেখেননি কিংবা একথা বলা আদৌ প্রয়োজন মনে করেন নি যে শাসক জাতিটির নির্ধারিত নীতি যখন "যেসব কাঁচামালের উপর গ্রেট ব্রিটেনের সবচেয়ে মূল্যবান তৈরী পণ্যগুলি নির্ভর করে তার একটা বড় অংশের জন্য অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীলতা থেকে গ্রেট ব্রিটেনকে মুক্ত করার" উদ্দেশ্যে ভারতকে নিছক একটা কাঁচামাল তৈরী করার দেশে পরিণত করা, তখন অধীনস্থ জনসমষ্টির শিল্পগত সমৃদ্ধি ছিল অসম্ভব।

ইংলণ্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও লেখকরা ভারতে অনুসৃত এই নীতির কথা কখনও বলেন নি বা লেখেন নি। রিকার্ডোর নেতৃত্বে তৎকালের বিরাট বিরাট অর্থনীতিবিদদেরও এ বিষয়ে কোনই বক্তব্য ছিল না। 'কর্ন ল্ব'-র (Corn Law) বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতারা, যাঁরা মজুরদের শস্তায় রুটি পাবার মতো ব্যবস্থার জন্য ইংলণ্ডের ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত ভাবে ও সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, তাঁরাও যে-নীতি ভারতের লক্ষ লক্ষ তাঁতী ও কারিগরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল সে সম্পর্কে কিছুই বলেন নি, কিছুই জানতেন না। সেই সময়কার সবচেয়ে উদারহৃদয়, সহানুভূতিশীল ও আলোকপ্রাপ্ত ইংরেজ—কবডেন ও ব্রাইট 'কর্ন ল্ব'-র বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সাফল্যের পথে নিয়ে যান ; এবং ১৮৪৬-এর সেই 'কর্ন ল্ব' যিনি বাতিল করেছিলেন সেই স্যর রবার্ট পীল বিশ্বাস করতেন যে তাঁর নাম ইংরেজরা স্মরণে রাখবেন, "তাঁরা তাঁদের নিঃশেষিত শক্তি নতুন করে সংগ্রহ করবেন প্রচুর এবং নিষ্কর খাদ্য তখন আরো মধুর লাগবে কারণ তাতে আর অবিচারের ভাব মেশানো নেই।" কিন্তু ভারতীয় কারিগর ও প্রস্তুতকারকদের খাদ্যে এখনও পর্যন্ত অবিচারের ভাব মেশানো এবং তাদের পুরনো ও বিধ্বস্ত শিল্পগুলিকে রক্ষা করার জন্য সযত্নে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এখনও পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্রনীতিকই গুরুত্ব সহকারে কোনো প্রয়াস করেন নি।

ইয়োরোপ মহাদেশের অর্থনীতিবিদরা পরিস্থিতি সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন এবং আরো খোলাখুলি ও অবাধে মত প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে, যখন 'কর্ন ল্ব'-র অবিচার ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের মন অধিকার করেছিল, সেই সময়ে জার্মানীতে লিখিত অর্থনীতি

বিষয়ক এক মূল্যবান গ্রন্থে একজন জার্মান অর্থনীতিবিদ ভারতে চালানো এরচেয়েও গুরুতর অবিচারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন।

"তারা যদি ভারতীয় তুলাজাত ও রেশমজাত সামগ্রী ইংলণ্ডে অবাধে আমদানি হতে দিত তাহলে ইংলণ্ডের তুলাজাত ও রেশমজাত পণ্য তৈরীর শিল্প অবশ্যই অচিরে অচল হয়ে যেত। ভারতের শুধু যে অপেক্ষাকৃত শস্তা শ্রম ও কাঁচামালের সুবিধা ছিল তাই নয়, সেই সঙ্গে তার ছিল অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও বহুশতাব্দীর কাজের অভ্যাস। অবাধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থায় এই সব সুবিধা-গুলির ফল না-ফলেই পারত না।

"কিন্তু পণ্য তৈরী শিল্পে ভারতের অধীন হবার উদ্দেশ্যে এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনে ইংলণ্ড অনিচ্ছুক ছিল। তার চেষ্টা ছিল বাণিজ্যিক আধিপত্য অর্জন করার এবং সে মনে করত যে পরস্পরের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য রক্ষাকারী দুটি দেশের মধ্যে যে শিল্প পণ্য বিক্রি করবে সেই হবে প্রধান আর যে শুধু কৃষিজাত পণ্যই বিক্রি করতে পারবে সে হবে অধীন। উত্তর আমেরিকান উপনিবেশগুলিতে ইংলণ্ড ইতিমধ্যে এই নীতি অনুযায়ীই কাজ করেছে—সেই সব উপনিবেশগুলিতে এমন কি একটি ঘোড়ার নালের পেরেকও তৈরী হতে দেয়নি, এবং তদুপরি সেখানে তৈরী কোনো ঘোড়ার নালের পেরেক ইংলণ্ডে আমদানি করা নিষিদ্ধ করেছে। তার কাছ থেকে এটা কী করে প্রত্যাশা করা যায় যে সে তার ভবিষ্যৎ বিরাটত্বের বনিয়াদ শিল্পপণ্যের নিজস্ব বাজার ছেড়ে দেবে হিন্দুদের মতো এত অসংখ্য, এত মিতব্যয়ী, পণ্য শিল্পোৎপাদনের পুরনো প্রথায় এত অভিজ্ঞ ও ত্রুটিহীন একটা জাতিকে?

"তদনুযায়ী, ইংলণ্ড তার নিজস্ব কলকারখানায় যেসব পণ্য হয় সেই সব সামগ্রী, ভারতীয় তুলাজাত ও রেশমজাত বস্ত্রের আমদানি নিষিদ্ধ করেছিল। এই নিষেধাজ্ঞা ছিল সার্বিক ও চরম। ইংলণ্ড তাদের একটা সুতো পর্যন্ত ব্যবহৃত হতে দিত না। এই সব সুন্দর, শস্তা কাপড় সে তো নিতই না বরং নিজের নিকৃষ্ট ও অপেক্ষাকৃত দুর্মূল্য মাল ব্যবহারই সে শ্রেয় মনে করত। মহাদেশের অন্যান্য জাতিকে শস্তা দামে ভারতের অপেক্ষাকৃত মিহি কাপড় সরবরাহ করতে সে কিন্তু রীতিমত ইচ্ছুক ছিল এবং সেই শস্তা দামের সুবিধা ইচ্ছুকভাবেই তাদের সে দিত; কিন্তু নিজে সে-সুবিধার কিছুই নিত না।

"ইংলণ্ডের একাজ কি মূর্খতার পরিচায়ক? অ্যাডাম স্মিথ ও জে. বি. সে-র তত্ত্ব, মূল্য সংক্রান্ত তত্ত্ব অনুযায়ী, অতি অবশ্যই। কারণ, তাঁদের মতে, ইংলণ্ডের যা দরকার সেই তার কেনা উচিত সেখান থেকেই যেখানে সে

সবচেয়ে শস্তায়, সবচেয়ে ভালো জিনিস পাবে ; যে-জিনিস সে অন্যত্র কিনতে পারত, সে জিনিস তার চেয়ে অধিক মূল্যে নিজে তৈরী করা, এবং সেই সঙ্গে সেই অল্প মূল্যের স্থবিধা মহাদেশের অন্য দেশকে বিলিয়ে দেওয়া মূর্খতারই কাজ।

"আমাদের তত্ত্ব অনুযায়ী, যাকে আমরা বলি উৎপাদনের শক্তির তত্ত্ব এবং ইংরেজ মন্ত্রিসভা যে-তত্ত্বের বনিয়াদ পরীক্ষা না-করেই তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্য আমদানি ও বস্ত্র রপ্তানির নীতি বলবৎ করার সময়ে কার্যত গ্রহণ করেছেন, সেই তত্ত্ব অনুযায়ী ঘটনাটা ঠিক বিপরীত।

"ইংলণ্ডের মন্ত্রীরা স্বল্পমূল্যের ও বিনাশশীল তৈরী পণ্য সংগ্রহ করার দিকে নজর দেননি, দিয়েছেন অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ ও স্থায়ী পণ্য প্রস্তুত ক্ষমতার দিকে।"[১০]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাবে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বৃটিশ অর্থনীতিবিদরা যখন অবাধ বাণিজ্যের নীতি প্রচার করছিলেন তখন বৃটিশ জাতি সে নীতিগুলি গ্রহণ করতে অস্বীকার করছিল—যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ভারতের পণ্যপ্রস্তুত ক্ষমতাকে চূর্ণ করে নিজেদের পণ্য ক্ষমতা গড়ে তুলেছিল। তারপর বৃটিশ জাতি পরিণত হল অবাধ ব্যবসায়ীতে এবং অন্যান্য জাতিকে আমন্ত্রণ জানাল অবাধ বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করতে। বৃটিশ উপনিবেশসমূহ সহ অন্যান্য জাতি অবস্থাটা ভালো করেই জানে এবং তারাও এখন তাদের পণ্যপ্রস্তুত ক্ষমতা গড়ে তুলছে সংরক্ষণব্যবস্থার সাহায্যে। কিন্তু ভারতে জনগণের পণ্য প্রস্তুত ক্ষমতাকে নিঃশেষে বিনষ্ট করা হয়েছিল তার শিল্পগুলির বিরুদ্ধে সংরক্ষণব্যবস্থার সাহায্যে এবং তারপর তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল অবাধ বাণিজ্য নীতি, যাতে পুনরুজ্জীবন তার আর না হতে পারে।

১। Act 53 Geo, III., 5, 155,

২। Minutes of Evidence taken before the Commons' Committee 1832. Vol ii. Report.

৩। Evidence in the Commons' Reports of 1830, 1830-31. and 1831. Digesst.

৪। Evidence taken before the Commons' Committee, 1832, vol. ii. Appendix 5

৫। ঐ, Appendix 6.

৬। ঐ, Appendix 7,

৭। ঐ, Appendix 31,

৮। ঐ, Appendix 33.

৯। Sir John Malcom's General Minutes of 30th November 1831, on his administration of Bombay Government.

১০। *The National System of Political Economy*, by Friedrich List, Translated by Samson S, Llyod, M. P. (London, 1885) p. 42,

সপ্তদশ অধ্যায়

আভ্যন্তরিক বাণিজ্য : খাল ও রেলপথ (১৮১৩-১৮৩৫)

ভারতের আভ্যন্তরিক বাণিজ্য তখনও পূর্ববর্তী শতাব্দী থেকে চাপিয়ে দেওয়া আপত্তিকর মাল-চলাচল শুল্কের ফলে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। স্মরণ করা যেতে পারে যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাদের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের উপর থেকে এই মাল-চলাচল শুল্ক রদের সাহায্যে, যে শুল্ক দেশের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, এ-দেশে প্রথম তাদের পত্তন ঘটিয়েছিল এবং একথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে কোম্পানির কর্মচারীরা যখন তাঁদের নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য এই ছাড় দাবী করেছিলেন, তখন নবাব মীর কাসিম হঠাৎ ঔদার্যভরে বঙ্গ থেকে সকল মাল-চলাচল শুল্কই তুলে দিয়েছিলেন, আর এই উদারতার মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছিল তাঁর সিংহাসন হারিয়ে। অবশেষে ১৭৬৫-তে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন বঙ্গের অবিসংবাদিত প্রভু হন, তখন তাঁদের সময় হয় মীর কাসিমের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার এবং যে সমস্ত শুল্ক ভারতের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যকে নিষ্পেষিত করছিল সেগুলি থেকে মুক্তি দেবার। কিন্তু এই শুল্ক থেকে, যত সামান্য পরিমাণেই হোক, কিছু রাজস্ব আসত। এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁদের রাজস্বের কোনো অংশ ছেড়ে দিতে গড়িমসি করছিলেন।

মাল-চলাচল শুল্ক নবাবদের অধীনে যতখানি দুঃসহ ছিল তার চেয়েও দুঃসহ হয়ে উঠল বৃটিশ শাসনে। কারণ কোম্পানির ক্ষমতা ছিল আরো সুদূরপ্রসারী, নিরঙ্কুশ ও অবিসংবাদিত এবং প্রতিটি চৌকিতে প্রতিটি স্বল্প বেতনভুক কর্মচারীর হাতে ছিল আরো নিপীড়ন চালাবার উপায়। এই অনিষ্টকর অবস্থা অব্যাহত-ভাবে বেড়ে চলে ৬০ বছর ধরে এবং তারপরে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন আঞ্চলিক সেক্রেটারী হোল্ট ম্যাকেঞ্জি কঠোরতম ভাষায় এর নিন্দা করেন।

"কতকগুলি সামগ্রীকে দশটি শুল্কগৃহের আক্রমণ কাটিয়ে আসতে হয়, প্রত্যেকটি শুল্কগৃহে আবার কতকগুলি অধীনস্থ চৌকি পেরিয়ে আসতে হয়, তারপর তারা এসে পৌঁছয় প্রেসিডেন্সীতে এবং দেশের প্রধান প্রধান পণ্যদ্রব্যের সামান্যই কিংবা কোনোটিই বারবার আটক হবার হাত এড়িয়ে যেতে পারে না।

"এমনকি যদি ধরেও নেওয়া যায় যে কোনরূপ অর্থআদায় বা বিলম্ব ঘটানো

হয় না, তাহলেও এই ব্যবস্থা দেশের বাণিজ্যিক লেনদেনকে গুরুতররূপে ব্যাহত করবে, কারণ কতকগুলি সারিসারি চৌকির দ্বারা বিভক্ত জেলাগুলির মধ্যে পণ্যের কোনো আদান-প্রদান হতে পারে না, যদি না দামের তফাৎটায় শুধু পণ্য-সামগ্রীর পরিবহনের ও অন্যান্য ব্যয়ই নয়, সরকারের বসানো ৫ বা ৭½ শতাংশ শুল্ককেও পুষিয়ে যায়। এই ভাবেই দামের স্বাভাবিক অসাম্যও বেড়ে গেছে এবং ভোগের উপরে করের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রযোজ্য প্রতিটি নীতির পরিপন্থীরূপে, বোঝাটা পড়ে সেই সব জায়গার উপরেই যেখানে ক্রেতাকে শুল্ক-নিরপেক্ষভাবে অধিকাংশ মূল্যই দিতে হয়।

"কিন্তু সরকারী দাবীর সঙ্গে যখন শুল্ক-গৃহের কর্মকর্তাদের দাবী যোগ হয়, তখন এটা নিশ্চিত বলেই মনে হয় যে ক্ষুদ্র পুঁজিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা যে বাণিজ্য চলতে পারত তার অনেকখানি একান্তভাবেই বন্ধ করতে হবে। ধনী বণিক তার উপরে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দাবী মেটাবার ক্ষমতা রাখে, কারণ বিরাট বিনিয়োগের উপরে বড় রকমের উৎকোচ খুব গুরুভার হবে না এবং তার পদমর্যাদা ও বিত্ত নিরাপদ রাখে। কিন্তু একজন ছোট ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে মাঝারি পরিমাণে ধার্য অর্থই তার উদ্যোগের সম্ভাব্য মুনাফাকে গ্রাস করে নেবে, এবং মধ্যবর্তী অবস্থা হেতু তার নিরাপত্তা যৎসামান্য কিংবা একেবারেই নেই......

"এতাবৎকাল স্বদেশে কর্তৃপক্ষের এবং ইংলণ্ডে সাধারণভাবে ব্যবসায়ী-কুলের মনোযোগ প্রধানত যুক্তরাজ্যের তৈরী পণ্যের জন্য একটা বাজার খুঁজে বার করার দিকেই চালিত হয়েছিল বলে মনে হয়। ফলত তাঁরা ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের চেয়ে আমদানির উপরেই দৃষ্টি দিয়েছেন বেশী। ১৮১০-এর নবম রেগুলেশনে নির্ধারিত শুল্ক তদনুযায়ী ইংলণ্ড থেকে প্রেরিত অনেকগুলি সামগ্রীকে বাদ দিয়েছে; আর রপ্তানি সামগ্রীর মধ্যে শুধু নীল, তুলা, পশম ও শণকে নিঃশুল্ক করা হয়েছে, এবং আমার আশঙ্কা এটা করা হয়েছে 'ভারতীয় সামগ্রীর চেয়ে বরং ইংরেজী সামগ্রীর উপরই বেশী নজর রেখে...

"যে-সমস্ত সামগ্রী দিয়ে কলকাতার বাণিজ্য চলে সে সম্পর্কে সযত্ন বিবেচনা এবং প্রত্যেকটি সামগ্রী যতখানি শুল্ক বহন করতে পারে তার হার বিবেচনা করার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে খুব বেশী পরিমাণে স্বার্থত্যাগ না করেই আমাদের অন্তর্দেশীয় কাস্টমসের অভিশাপ থেকে দেশকে অব্যাহতি দেওয়া যায়, যদি অন্তত আমাদের পশ্চিম সীমান্তে বসানো লবণকর যা—বঙ্গের একচেটিয়া ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়—বজায় থাকে।

"রপ্তানি ও আমদানি শুল্কের ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই, আভ্যন্তরিক

শুল্ক যদি উঠিয়ে দেওয়া হত, তাহলে রাজস্বের ক্ষেত্রে আশু লোকসান হত প্রায় ৩৩ লক্ষ (৩৩০,০০০ পাউণ্ড), এবং পশ্চিমের লবণের উপর কর বজায় রাখা হলেও ২২ লক্ষ টাকা (২২০,০০০ পাউণ্ড) লোকসান হত। আমার আশঙ্কা, সমুদ্রপথে আমদানি ও রপ্তানি সামগ্রীর উপর নতুন নতুন শুল্ক বসিয়ে এর সমস্তটা অবিলম্বেই স্থানান্তরিত করা যায় এবং সে হেতু প্রস্তাবিত ব্যবস্থাটি বাণিজ্যকে বিস্তৃত করার জন্য কাজ করবে বলে আশা করি, এবং যেহেতু তা আমাদের প্রাতিষ্ঠানগত ব্যয় হ্রাস করতে সাহায্য করবে, সেই জন্য লাভ-লোকসানের খতিয়ানকে নিছক লোকসান বলে গণ্য করা যায় না।"[১]

কিন্তু হোল্ট ম্যাকেঞ্জির কথায় কেউ কর্ণপাত করেননি। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের জন্য স্বেচ্ছায় ২২০,০০০ পাউণ্ড রাজস্ব বা তার কোন অংশ বিসর্জন দিতে রাজী ছিলেন না। মুখে ভারতের জনগণের বৈষয়িক সুখসমৃদ্ধির জন্য পরম উদ্বেগ প্রকাশ করলেও, সেই সুখসমৃদ্ধির জন্য তাঁরা এক শিলিংও বিসর্জন দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। অন্তর্দেশীয় শুল্ক তুলে দেওয়া যদি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর নির্ভর করত, তাহলে তাদের শাসনে সে শুল্ক কোনকালেই বাতিল হত না।

সৌভাগ্যবশতঃ তাঁদের কর্মচারীদের দ্বারাই তাঁরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কোম্পানির মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতে যান ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এবং তিনিই স্যার চার্লস ট্রেভলিয়ানকে নিযুক্ত করেন মাল-চলাচল শুল্ক সম্পর্কে তদন্ত করে এক রিপোর্ট পেশ করার জন্য। ট্রেভলিয়ানের বিখ্যাত রিপোর্ট এই প্রথার কুফলগুলিকে নির্দয়ভাবে উদ্ঘাটিত করে। এই রিপোর্টে দেখানো হয় যে বঙ্গের নবাবদের অধীনস্থ অবস্থার তুলনায় বৃটিশ শাসনে এই সব অশুভ জিনিস বেড়েছে; সারা দেশে বণিকদের বিলম্ব ও অর্থ আদায়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে; শিল্প উৎপাদন মারা পড়েছে এবং কাস্টমস অফিসারদের অর্থ-আদায়ের ফলে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পঙ্গু হয়ে গেছে। এই অফিসাররা এত কম বেতন পেতেন যে শুধু জবরদস্তি অর্থ আদায় করেই তাঁদের পক্ষে বাঁচা সম্ভব ছিল; ভ্রমণকারীদের বিব্রত করা হত এবং কাস্টমস হাউসগুলির মধ্য দিয়ে যাতায়াতকারিণী নারীদের সম্মান নিরাপদ ছিল না; এবং নিপীড়নের এই বিশাল ব্যবস্থা দেশে রক্ষা করা হত অকিঞ্চিৎকর রাজস্বের খাতিরে।[২] লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ট্রেভলিয়ানের রিপোর্ট প্রকাশ করেন এবং এইভাবে অন্তর্দেশীয় শুল্কের মৃত্যু সঙ্কেত ঘোষণা করেন।

ইংলণ্ডে লর্ড এলেনবরো এই রিপোর্ট গ্রহণ করে নিজের ওজস্বিনী ভাষায়

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চোখের সামনে এই ব্যবস্থার খারাপ দিকগুলি তুলে ধরেন।

"ইংলণ্ডের তুলাজাত তৈরী সামগ্রী যেখানে ভারতে আমদানি করা হয় ২½ শতাংশ শুল্কে, সেখানে ভারতের তুলাজাত তৈরী সামগ্রীর উপরে শুল্ক বসানো হয় কাঁচা মালের উপরে ৫ শতাংশ হারে, সুতার উপর আরো একদফা শুল্ক ৭½ শতাংশ হারে, তৈরী সামগ্রীর উপর অতিরিক্ত শুল্ক ২½ শতাংশ হারে, এবং সবশেষে আরো ২½ শতাংশ শুল্ক—যদি সাদা কাপড় হিসেবে 'রওয়ানা' (ছাড়পত্র) দেওয়ার পর সে-কাপড় রং করা হয়। এইভাবে ভারতের তুলাজাত পণ্যকে (ভারতে ব্যবহৃত) মোট ১৭½ শতাংশ শুল্ক দিতে হয়……

"কাঁচা চামড়াকে দিতে হয় ৫ শতাংশ। চামড়া তৈরী হয়ে যাবার পরে আরো ৫ শতাংশ দিতে হয়; এবং সেই চামড়া যখন জুতায় পরিণত হয় তখন আরো ৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়। দেখা যাচ্ছে, সর্বমোট শুল্ক পড়েছে ১৫ শতাংশ [ভারতে ব্যবহৃত ভারতীয় চামড়ায় তৈরী পণ্যের উপরে]…

"আমাদের নিজেদের চিনি আমরা কিভাবে ব্যবহার করছি? একটি শহরে আমদানি হবার পর এই চিনিকে দিতে হয় কাস্টমস বাবদ ৫ শতাংশ, এবং নগর-শুল্ক বাবদ ৫ শতাংশ, এবং যখন তা তৈরী হয়ে যায় তখন সেই শহর থেকেই রপ্তানির পর তাকে দিতে হয় আরো ৫ শতাংশ, মোট ১৫ শতাংশ [ভারতে ব্যবহৃত ভারতীয় চিনির উপর]।

"কম করে ২৩৫টি পৃথক ধরনের সামগ্রার উপর অন্তর্দেশীয় শুল্ক বসানো হয়েছে। এই শুল্কের আওতায় ব্যক্তিগত বা গার্হস্থ্য ব্যবহারের প্রায় সব জিনিসই পড়ে এবং এর কর্মপদ্ধতি ও তার সঙ্গে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা সবচেয়ে বিরক্তিকর ও আপত্তিকর ধরনের, বৈষয়িকভাবে তা রাজস্বেরও কোনো উপকার করে না। কাস্টম-হাউসের প্রতিটি অফিসার যদি সত্যিই অনুসন্ধানের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তবে এর ফলে প্রয়োজনীয় যে বিলম্ব ঘটবে তা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে স্তব্ধ করে দেবে। জোর করে অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্য ছাড়া এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় না।

"জাতীয় নীতিবোধের উপর এর প্রভাব জাতীয় সম্পদের উপর প্রভাবের চেয়েও অনেক গুরুতর। প্রতিটি বণিক, প্রতিটি শিল্পদ্রব্য উৎপাদনকারী ও প্রতিটি পর্যটক দেখা যাচ্ছে তার সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য কিংবা তার ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা রক্ষার জন্য, এবং প্রায়শই তার পরিবারের নারীদের মান-অপমানবোধ রক্ষার জন্য সরকারের অফিসারদের সঙ্গে বেআইনি যোগসাজসে লিপ্ত হতে বাধ্য। এ এমন এক ব্যবস্থা যা আমাদের নিজেদের জনগণেরই নৈতিক অধঃপতন ঘটায়

এবং যা এশিয়ার সমস্ত বিদেশী বণিকদেরই বিরূপতা উদ্রেক করে বলে মনে হয়...

"আমরা এখনই আমাদের নিজস্ব ক্ষমতাবলে ছ-কোটি মানুষকে আভ্যন্তরিক যোগাযোগের সামগ্রিক অধিকার দিতে পারি। যে দেশের সর্বত্র নাব্য নদীপথে চলাচল করা যায়, বৈদেশিক যুদ্ধ যেখানে পৌছয় না এবং যে দেশের মানুষের সম্পত্তি এক পক্ষপাতহীন আইনের শাসনে সুরক্ষিত, সেই উর্বর বঙ্গদেশের পরিশ্রমী অধিবাসীরা এই ভাবে, তাঁদের সরকারের আলোকপ্রাপ্ত নীতির সাহায্যে সমৃদ্ধির যে ব্যাপক উপায় লাভ করবেন তা পৃথিবীর অন্য কোনো জাতিই ভোগ করে না।"৩

কিন্তু লর্ড এলেনবরোও এ সব কথা বলেছিলেন বধিরদের কাছে—কেউ তাতে কর্ণপাত করেনি। কোর্ট অব ডিরেক্টর্স উত্তর দিলেন যে "এই কর বসানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিকর ফলগুলি সম্পর্কে বৃটেনের কর্তৃপক্ষ যে মত পোষণ করেন সে সম্পর্কে, এবং যখনই তা তুলে দেওয়া নিরাপদ বলে বিবেচিত হবে তখনই সেই কর তুলে দেবার জন্য তাঁদের ইচ্ছা সম্পর্কে ভারত সরকার ভালো-ভাবেই অবগত আছেন। কোর্ট মনে করেন এরকম একটি বিষয় সম্পর্কে স্থানীয় সরকারের উপর অবশ্যপালনীয় চরম নির্দেশ দিয়ে এর চেয়ে বেশ দূর যাওয়া অসময়োচিত ও অবিচক্ষণতার কাজ হবে।"৪ ভাষান্তরে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের এবং সংস্কারকর্মে হাত দিতে তাঁদের অনিচ্ছাকে স্থানীয় সরকারের প্রভাবশালী চেহারার আড়ালে গোপন করবার রীতিটিই অনুসরণ করে গেলেন, যা, দুর্ভাগ্যবশত নতুন কিছু নয়।

কিন্তু নিয়তির পরিহাসে সেই আবরণ একবার অন্তত তাঁদের আড়াল করতে ব্যর্থ হয়। ট্রেভেলিয়ানের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ায় ভারতের জনমতে আলোড়ন জাগে এবং আপার প্রভিন্স-এ মিঃ রস তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে ভারতীয় কাস্টম-হাউসগুলি তুলে দেবার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। এবং লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল এই পথে আরো অগ্রসর হন ১ মার্চ ১৮৩৬ তারিখে বঙ্গের সমস্ত কাস্টমস হাউস তুলে দিয়ে এবং ১ মে ১৮৩৬ তারিখে নগর শুল্ক তুলে দিয়ে। এই সমস্ত ব্যবস্থা অনুমোদনে বাধ্য হলেও কোর্ট অব ডিরেক্টর্স কিন্তু গভর্ণর জেনারেলের কাছে এই মর্মে তাঁদের দুঃখ প্রকাশ করেন "যে রাজস্বের ক্ষতিপূরণে জন্য প্রাপ্য কোনো পরিকল্পনা তৈরী করতে সক্ষম না হয়েই আপনি অতিরিক্ত ত্বরায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।"৫

আমরা এখন এসে পৌছেছি সেই সময়ে যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া বৃটিশ

সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। কিন্তু প্রসঙ্গটির অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে আরো কয়েক বছরের অন্তর্দেশীয় শুল্কের বিবরণ দেওয়া দরকার। লর্ড অকল্যাণ্ড ভারতে এসে পৌছেছিলেন ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে। মহারাণীর অধীনে তিনিই ছিলেন প্রথম গভর্ণর-জেনারেল। দুঃখের কথা নতুন শাসনের একেবারে গোড়াতেই ভারতীয় প্রশাসন এক বিস্ময়কর নিবুদ্ধিতার কাজ করে, এবং তার পরিণতিতে ঘটে গুরুতর এক বিপর্যয়। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক প্রবর্তিত শান্তি, ব্যয়-সঙ্কোচ ও সংস্কারের নীতিকে উপেক্ষা করে লর্ড অকল্যাণ্ড নিজেকে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম আফগান যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেন। এক মিত্রভাবাপন্ন ও সমরকুশলী জাতিকে শত্রুতে পরিণত করে, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের সর্বনাশা পশ্চাদপসরণের মধ্যে, ৪০০০ ফৌজ ও ১২০০০ অনুগামীর প্রাণনাশের মধ্যে এবং বাইরে এক যুদ্ধে ভারতীয় রাজস্ব বিসর্জনের মধ্যে এইযুদ্ধের অবসান হয়।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে অন্তর্দেশীয়শুল্ক তুলে দেবার জন্য যিনি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর চাপ দিয়েছিলেন, সেই লর্ড এলেনবরো গভর্ণর-জেনারেল হিসেবে ভারতে যান ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুতে, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জালুন অঞ্চলে এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ৬নং অ্যাক্ট অনুযায়ী মাদ্রাজ প্রদেশে তিনি অন্তর্দেশীয় শুল্ক তুলে দেন।

নয় বছর পরে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ যখন পুনরায় নবীকরণের জন্য উপস্থিত করা হয়, তখন লর্ড এলেনবরো ছিলেন লর্ডস সভার সিলেক্ট কমিটির অন্যতম সদস্য এবং স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ান ছিলেন অন্যতম সাক্ষী। অন্তর্দেশীয় শুল্ক বিলোপের কথা উল্লেখ করে লর্ড এলেনবরো প্রশ্ন করেন :

"এবিষয়ে তদন্ত করার জন্য লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক আপনাকে পাঠানোর দরুনই কি এটা হয় নি, যার পরে আপনার রিপোর্ট বেরোয় এবং এইসব শুল্ক বিলুপ্ত করে সরকারের আইন হয়?"

স্যার চার্লস উত্তর দেন: "আমার রিপোর্ট যদি অপ্রকাশিত থাকত এবং নিছক সাধারণ সরকারী আলোচনার মধ্য দিয়েই যেত তাহলে মাল-চলাচল শুল্ক ও নগর শুল্কের বিলোপের আগে বছরের পর বছর কেটে যেত। কিন্তু তার পরিবর্তে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়, এবং প্রত্যেকে তখনই অনুভব করেন যে এই ব্যবস্থাটি অচল।"৬

আধুনিক পাঠকদের অবগতির জন্য বলা দরকার যে এই অধ্যায়ে আমরা যে-সময়ের কথা বলছি তখনও পর্যন্ত ভারতের একই ধরনের কোনো মুদ্রাব্যবস্থা ছিল না। কলিকাতার রৌপ্য মুদ্রা ছিল সিক্কারুপি, যার মূল্য ছিল মাদ্রাজের টাকার চেয়ে ৬⅔ শতাংশ বেশী। সোনার মোহর ছিল ১৬ টাকা মূল্যের বৈধ

মুদ্রা, কিন্তু সোনার মূল্যবৃদ্ধির ফলে তা বিক্রী হত ১৮ টাকায়, এবং তা আর চালু মুদ্রা ছিল না। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের গভর্ণর হর্সলে পামার ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন: "ভারতে রৌপ্য যেখানে প্রকৃত মুদ্রা ও আইনত গ্রাহ্য অর্থ, সেখানে স্বর্ণ চালু মুদ্রা হিসেবে কোনো মতেই চলে না, চলবেও না···ভারতে সেখানকার চালু মুদ্রা হিসেবে স্বর্ণকে প্রবর্তিত করার যৌক্তিকতার অভিমতের আমি একেবারে বিরোধী।"[৭]

লোহিত সমুদ্রের মধ্য দিয়ে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে স্টিমারযোগে যোগাযোগ শুরু হয়েছিল, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তা ছিল প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ। 'দি হাগ্ লিণ্ডসে' নামক স্টিমারটি বোম্বাই থেকে সুয়েজে পৌঁছেছিল তেত্রিশ দিনে; এই দূরত্ব এখন অতিক্রম করা যায় এর এক-চতুর্থাংশ সময়ে।

বঙ্গের নদীগুলিতে স্টিমার চলাচল প্রবর্তন করা এবং কলকাতা ও এলাহাবাদের মধ্যে পরীক্ষামূলক এক ভ্রমণ প্রবর্তন করার কথাও আলোচিত হয়। সেই ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন সেক্রেটারি এইচ. টি. প্রিন্সেপ এই বিষয়ে এক চমৎকার মন্তব্যলিপি পেশ করেন। তিনি বলেন, গঙ্গার উপর যত বিরাট পরিমাণ নৌচলাচল হয় এমন নদী চীন ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও নেই! সেই ১৭৮০ খৃষ্টাব্দেই ত্রিশ হাজার মাঝি ঐ নদীটির উপরেই জীবিকা উপার্জন করত, তারপর এই সংখ্যা আরো বেড়েছে। প্রত্যেকেই "উজানে ও ভাটিতে যাতায়াতকারী নৌকার নিরবচ্ছিন্ন সারি দেখে অভিভূত হয়েছেন, নদী কখনোই এক মুহূর্তের জন্যও একেবারে নৌকামুক্ত বলে মনে হয় না; এবং যেহেতু সকল ঋতুতে এবং সমস্ত স্থানে এই ব্যাপারটা প্রায় একই রকম, সেইজন্য এই চমৎকার স্রোতধারা বাণিজ্য ও ভ্রমণকারীর চাহিদা কী অপরিমেয় পরিমাণে মেটায় তার একটা ধারণা রেখে যায়।"[৮] ভারতের বর্তমান রেলপথের ব্যবস্থা বাণিজ্যের চাহিদাকে আরো অনেক কার্যকরভাবে পূরণ করে বটে, কিন্তু তা নির্মিত হয়েছে বিদেশী পুঁজি দিয়ে এবং তা সুদ দেয় বিদেশী শেয়ার হোল্ডারদেরই; ফলে লক্ষ লক্ষ মাঝি ও নৌকা নির্মাতা, গাড়োয়ান ও বলদের মালিক তাঁদের জীবিকা হারিয়েছেন।

পশুতে-টানা যানবাহনের জন্য খালপথ ও রেলপথের উপযুক্ততার প্রশ্নটিও আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়। হিসেব করে দেখা যায় যে একটি খাল এবং একটি রেলপথ নির্মাণের ব্যয় পড়বে একই—প্রতি মাইলে প্রায় ৯০০ পাউণ্ড; প্রথমোক্তটি থেকে পাওয়া যাবে প্রতি মাইলে ১৯০ পাউণ্ড, এবং দ্বিতীয়টি থেকে ১৭৫ পাউণ্ড।

"একটা খালের জন্য দরকার হয় এমন কাজ যা সেচের খালের জন্য প্রয়োজন হয় না, অথচ যা খুব একটা আলাদা ধরনেরও নয়। কিন্তু পশুতে টানা যানবাহনের জন্য একটা রেলপথ হল সম্পাদনযোগ্য সহজতম কাজের অন্যতম এবং এখন সেচকর্মে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাজের চেয়ে এতে অনেক কম প্রতিবন্ধকতা দেখা দেবে। রেলপথগুলি খালের চেয়েও বেশী শ্রেয় হবে, কারণ তাতে জল লাগবে না—যে জল কর্নাটকে এত মূল্যবান···কিন্তু প্রধান প্রশ্নটি মনে হয় এই যে, বর্তমানে ব্যবহৃত অথবা নতুন সেচকর্মের জন্য ব্যয়িত সমপরিমাণ অর্থ ও দক্ষতা সামগ্রিকভাবে আভ্যন্তরিক যোগাযোগের উপায়গুলির উন্নয়নের পেছনে ব্যয়িত হবার তুলনায় দেশের বেশী উন্নতি ঘটাবে কি না। এখানে উল্লেখ করা সমীচীন হতে পারে যে রেলপথ সংক্রান্ত উপরোক্ত সমস্ত হিসেব নিকেশ ও মন্তব্য শুধু পশু শক্তির জন্য পরিকল্পিত রেলপথ সংক্রান্তই, কারণ রেল ইঞ্জিনের ব্যবহার বৈষয়িকভাবে কাজের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায় এবং প্রচণ্ডভাবে ব্যয় বাড়ায়, কারণ শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রথমটির মতো এত বিরাট মোড় বা এত তীব্র বাঁক নিতে দেওয়া যায় না। এই ভাবে মাঞ্চেস্টার ও লিভারপুলের রেলপথের জন্য খরচ পড়েছিল প্রতি মাইল ২৫০০০ পাউণ্ড করে, আর সারা ইংলণ্ডের ডবল রেলপথের [পশু শক্তির জন্য] পড় ছিল প্রতি মাইলে ৫০০০ পাউণ্ড···ট্যাঙ্ক ডিপার্টমেণ্টে ক্রমাগত যেসব কাজ করা হচ্ছে তার যেকোনো একটিকে প্রয়োগ করার জন্য অল্প পরিমাণ রেল এবং ওয়াগনের চাকা পাঠানো খুবই যুক্তিযুক্ত হবে মনে হয়। প্রায় এক হাজার গজ ডবল রেল—যেমনটি ইংলণ্ডে সাময়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়—এবং চল্লিশটি রেলওয়ে ওয়াগনের জন্য চাকা পাঠানো যেতে পারে প্রায় ২৫০ পাউণ্ডের বিনিময়ে।"[৯]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি আমরা দিলাম এই কারণে যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যে বিতর্কটি বিরাট আকার ধারণ করেছে তার সূচনার সন্ধান করাটা সর্বদাই কৌতূহলোদ্দীপক। খাল ও রেলপথের তুলনামূলক গুণাগুণ সংক্রান্ত আলোচনা চালানো হয়েছিল পরবর্তী অনেকগুলি দশক ধরে এবং, যা প্রত্যাশিত ছিল, অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল সেই রেলপথকেই যা ভারতের সঙ্গে বৃটিশ বাণিজ্যের সুবিধা বাড়িয়েছিল। যে খালপথ ভারতীয় কৃষির উপকার করতে পারত তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। ভারতীয় প্রশাসনের উপরে বৃটিশ বণিকদের প্রভাব এত বিরাট ছিল যে ভারত সরকার ভারতে রেলপথ নির্মাণকারী কোম্পানিগুলিকে ভারতীয় রাজস্ব থেকে সুদের একটা নির্দিষ্ট হারের নিশ্চিতি প্রদান করেছিলেন; এবং রেলপথের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল ২২৫,০০০,০০০ পাউণ্ড, তার ফলে ১৯০০

খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় করদাতাদের লোকসান হয়েছে ৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড, মুনাফা হয়নি। এবং ভারতীয় কৃষির স্বার্থকে এত কম উপলব্ধি করা হয়েছিল যে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেচকর্মের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল মাত্র ২৫,০০০,০০০ পাউণ্ড।

১। Holt Mackenzie's Memorandum, Bengal Salt and Opium Consultations, 23rd June 1825.

২। ট্রেভলিয়ানের রিপোর্ট প্রসঙ্গে মেকলে লিখেছিলেন, "সরকারী ব্যাপার সম্পর্কে অভ্যস্ত হলেও, এর চেয়ে যোগ্য কোনো রাষ্ট্রীয় দলিল আমি কখনও পড়িনি, এবং আমি মনে করি না ভারতে কেন ইংলণ্ডেও সাতাশ বছর বয়স্ক আর একজনও আছেন যিনি এ রিপোর্ট লিখতে পারতেন। G. O Trevelyan-এর *Life and Letters of Lord Macaulay.*

৩। Lord Ellenborough to Chairman and Deputy Chairman of the East India Company, dated 18th March 1835.

৪। Letter of the Court of Directors, dated 2nd April 1835.

৫। Letter to the Governor-General in Council, dated 7th June 1837.

৬। Second Report from the Lord's Committee, 1853 p. 161.

৭। Evidence before the Common's Committee, 1832. vol. ii, p. 109.

৮। H. T. Princep's Notes, dated 31st July 1828.

৯। Evidence before the Commons' Committee, 1832, vol. ii, Part ii, Appendix xxiv.

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রশাসনিক ব্যর্থতা (১৭৯৩-১৮১৫)

ভারতে কোম্পানির অধিকৃত অঞ্চলে বেসামরিক ও বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের জন্য প্রথমে ওয়ারেন হেস্টিংস ও পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস যে সব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে তা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। ঐ সকল পন্থায় কল্যাণকর ও সুবিধাদায়ক অনেক কিছুর সঙ্গে কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটী ছিল। কালের অগ্রগতির সঙ্গে এই ত্রুটীগুলি ক্রমশ প্রকট হয়ে পড়ে। প্রথমত, কর্ণওয়ালিসের মৃত্যুর সময় যেখানে কোম্পানির অধিকৃত অঞ্চলেই লোকসংখ্যা দশ কোটির মতন ছিল সেই বিরাট দেশের প্রয়োজন অনুসারে বিচার বিভাগের কাঠামোই একান্ত অপর্যাপ্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ না করেই ন্যায়বিচার কার্যকর করার পরিকল্পনা এবং এই মহান ও সুসভ্য জনসংখ্যার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করবার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

এই দেশের ভাষা সম্পর্কে ইয়োরোপীয় বিচারপতিগণের পরিচিতি সামান্যই ছিল এবং আচার-ব্যবহার সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ছিল ততোধিক অপরিণত। এই বিচারপতিগণের যে সব ভারতীয় পরামর্শদাতা ছিলেন তাঁরা অত্যল্প বেতন পেতেন। ফলে তাঁরা দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন। যারা উচ্চতম মূল্যে নীলাম ডাকতেন বিচার তাদের কাছেই বিক্রীত হত। এর চেয়েও খারাপ হল, মামলার সংখ্যা এতই জমে গিয়েছিল এবং তাদের নিষ্পত্তি হতে এতই বিলম্ব হচ্ছিল যে জনসাধারণ প্রকৃতপক্ষে বিচারে বঞ্চিত হচ্ছিল। বাড়ী ও কর্মস্থল থেকে সাক্ষীসাবুদদের জোর করে দূরদূরান্তের বিচারালয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। সাক্ষী হিসেবে সমন পাওয়াটাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত লোক একটা গুরুতর শাস্তি-স্বরূপ মনে করতেন। বিচারকে ব্যয়সাপেক্ষ করা ও আদালতের আশ্রয় গ্রহণে নিরুৎসাহিত করবার জন্য ব্যয় ও ফী-এর বোঝা চাপানো হল। বিচারপতিদের অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হল, আর কাজের ভার কমাবার উদ্দেশ্যে আপীলের সুবিধাদি হ্রাস করা হল। কিন্তু যে অনাচারের একটি মাত্রই প্রতিবিধান ছিল—জনগণের সহযোগিতা গ্রহণ করা, এবং বিচারবিভাগীয় প্রশাসনের ভার জনগণের উপরে অর্পণ করা, সেই অনাচারের প্রতিবিধানের জন্য সমস্ত প্রকার অসার্থক দমনমূলক ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়েছিল।

"এ কথা হয়ত এখন বিস্মৃত যে ইয়োরোপীয় কর্ণধারদের আগমনের পূর্বে শত শত বৎসর ধরে আইন ও বিচারের প্রশাসন প্রধানত এদেশের লোকেরাই করেছেন। তবুও সমাজের বন্ধন ছিল অটুট। এবং পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিকদের বিবৃতি অনুসারে জানা যায় এমন একদিন ছিল যখন, ভারত ছিল জনাকীর্ণ ও উন্নতিশীল, অধিবাসীরা ছিল সমৃদ্ধ ও সুখী।"[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এটাই যদি দেওয়ানী বিচারের প্রশাসনে গলদ হয়ে থাকে, বলতে হবে ফৌজদারী বিচারের প্রশাসনে গলদ ছিল আরও মারাত্মক। বাংলাদেশে দস্যুদলের প্রাদুর্ভাব ছিল। এদের বলা হত ডাকাত। জেলাশাসকগণ স্বল্প বেতনভুক্ ও দুর্নীতিপরায়ণ আরক্ষা বাহিনীর সাহায্যে তাদের দমন করতে সমর্থ ছিলেন না। বড় বড় শহরে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে দুঃসাহসিক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হত। গ্রামগুলিতে নিয়তই একটা ভীতি বিরাজ করত এবং কুখ্যাত ডাকাত সর্দারদের শান্ত রাখবার জন্য তারা প্রায়শই টাকা দিত। ১৮০০ হ'তে ১৮১০ পর্যন্ত সমগ্র দেশ সর্বদাই একটা আশঙ্কার মধ্যে থাকত। বাজারে, গঞ্জে বাংলার বীর ডাকাতদের কীর্তিকাহিনী বিবৃত হত। জেলাশাসক ও আরক্ষাবাহিনীর কোন ক্ষমতাই ছিল না। প্রজারা নিজ নিজ ভাগ্যকেই স্বীকার করে নিত।

"বৃটেনের সর্বোচ্চ সরকারী কর্তাদের চোখের সামনেই একটা অস্বাভাবিক ও বিশৃঙ্খল সামাজিক অবস্থা বিরাজ করছিল। একেবারে সরকারের পীঠস্থানেই এই ছিল অবস্থা। সঙ্গত ভাবেই সমগ্র দেশ সরকারের কাছ থেকে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার প্রত্যাশা করতে পারত। মন্থর প্রতিবিধানের অপেক্ষায় এই অন্যায়কে ফেলে রাখা যায় না। আমাদের চোখের সামনেই লোকেরা প্রাণ হারিয়েছে। প্রতি সপ্তাহের বিলম্বের অর্থই ছিল জনাকীর্ণ অঞ্চলের প্রতিরোধহীন অধিবাসীদের বিরুদ্ধে হত্যা ও নিপীড়নের দণ্ডদান।"[২]

এই উৎপাতের প্রতিবিধানের জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল তা ঐ উৎপাতের চেয়ে আরও জঘন্য ছিল। অপরাধ নিবারণের উদ্দেশ্যে জেলাশাসকদের নির্দেশ অনুযায়ী চলবার জন্য দু'জন ইয়োরোপীয় পুলিশ সুপার-ইনটেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা হল। বিশেষ জেলাশাসকদের নিযুক্ত করা হল এবং ডাকাতি বন্ধ করবার জন্য তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হল। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্যাদি জানাবার জন্য তাঁরা গোয়েন্দা বা গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন এবং এইভাবে অপরাধ-জনিত অনাচারের সঙ্গে যুক্ত হল গোয়েন্দাগিরির ব্যাপক ব্যবস্থার উৎপাত। মিথ্যা সংবাদের ভিত্তিতে গ্রামের বাসিন্দাদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হত। বিচারে পাঠাবার আগে তাদের মাসের পর মাস, কখনও বা বছরের পর বছর

জেলে আটকে রাখা হত। কখনও বা তারা কারাগারে মারা যেত—এ ঘটনা প্রায়শই ঘটত। বাংলার প্রতিটি বড় জেল শত শত, হাজার হাজার নিরীহ মানুষে ভরে গিয়েছিল। গ্রামবাসীরা জেলাশাসকের রোষ অপেক্ষা গোয়েন্দার বিদ্বেষকেই বেশী ভয় করত।

১৮১৩-তে কোর্ট অব ডিরেক্‌টর্‌স্‌ ভারতে বিচার ব্যবস্থার কাজ কি রকম চলছিল সে সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি প্রশ্নতালিকা কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মচারীদের মধ্যে বিলি করেন। ঐ কর্মচারিগণ সে সময়ে ইংলণ্ডেই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই তখনও সেই পুরনো বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে ছিলেন যে ভারতীয়রা দায়িত্বশীল কাজের অনুপযুক্ত ও অযোগ্য। সেই পুরনো বিশ্বাসের একটাই গুণ ছিল যে নিজেদের পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, আত্মীয়স্বজনদের জন্য ভারতের সমস্ত উচ্চপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারিগণের মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞতম ও চিন্তাশীল ছিলেন তাঁরা এই মতবাদের শূন্যগর্ভতার কথা বুঝেছিলেন এবং তখন পর্যন্ত যেটা বিরুদ্ধ মতবাদ ছিল তাঁরা সেটাই বলিষ্ঠ ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত ভারত শাসন করা যাবে না। প্রথম যাঁদের এই সত্য বুঝবার মতো বিজ্ঞতা ও ঘোষণা করবার মতো বলিষ্ঠতা ছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাংলার স্যর হেনরি স্ট্র্যাচি, মাদ্রাজের টমাস মুনরো ও বোম্বাই-এর কর্নেল ওয়াকার। কোর্ট অব ডিরেকটার্সকে তাঁরা যে উত্তর দিয়েছিলেন তার অংশবিশেষ পাঠকের কাছে মেলে ধরা প্রয়োজন।

স্যার হেনরি স্ট্র্যাচি লিখেছিলেন; "আমি যে গলদগুলির উল্লেখ করেছি আমার প্রস্তাবে তার প্রতিবিধান হল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে স্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত বিচারালয় আরও অধিক সংখ্যায় স্থাপন করা। তাঁরা পরিপূর্ণভাবে আমাদের প্রবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবেন। স্থানীয় বিচারপতিগণকে যথাযথ বেতন দেওয়া হোক। তা হলেই তাঁরা ঠিকমত কাজ করবেন। এ সম্পর্কে আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে। এর জন্য ব্যয় কিছুই হবে না, হলে সামান্যই হবে। কারণ ফী-এর মারফত সমগ্র খরচ উঠে আসবে, যদিও স্থানীয় বিচারপতিদের মুক্তহস্তে বেতন দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে। অন্যায় খাজনা আদায়ের সমস্ত ক্ষেত্রেই দলিলের জন্য কোন ফী বা স্ট্যাম্প বাবদ কোনো খরচ নেওয়া হবে না এবং অভিযোগ দায়েরের জন্য ব্যতীত অন্য কোন অর্থগ্রহণ চলবে না।"

"যদি মুন্সেফ্‌গণের (স্থানীয় দেওয়ানী জজ) ক্ষমতা ২০০ টাকা (২০ পাউণ্ড) পরিমাণের মকদ্দমার নিষ্পত্তি পর্যন্তও বাড়িয়ে দেওয়া হত,—যা বর্তমানে রেজিস্ট্রারের এক্তিয়ারভুক্ত ক্ষমতার শেষ সীমা,—তা হলে মনে হয়, কেবলমাত্র

দায়েরের খরচেই এমন একটা তহবিল গঠিত হত যার থেকে স্থানীয় জজ ও তাঁদের আমলাদের (করণিক) বেতন দেওয়া যেতে পারত। আমি যখন স্থানীয় জজদের মুক্তহস্তে বেতন প্রদানের কথা বলছি তখন বুঝতে হবে ইয়োরোপীয় জজদের বেতনের এক-দশমাংশেরও কিছু কম বেতনের কথাই বলছি।"

"আমার মতে কোম্পানির যদি সদিচ্ছা থাকে তবে বঙ্গদেশে সমস্ত বিচারকার্যই ধীরে ধীরে ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে এবং আমাদের প্রবিধান অনুসরণ করে ভারতীয়গণ ইয়োরোপীয়গণের মতই সুষ্ঠুভাবে কার্য নির্বাহ করতে পারেন, হয়ত ক্ষেত্রবিশেষ তা অধিকতর সুষ্ঠুভাবে নির্বাহিত হতে পারে। উপরন্তু, এ-জন্য ব্যয় হবে বর্তমান ব্যয়ের এক-দশমাংশ।"

ভারতে ইয়োরোপীয় বণিকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্যর হেনরি লিখেছিলেন, "গত অর্ধশতাব্দী বা ততোধিক কাল ধরে বঙ্গদেশের বাণিজ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইয়োরোপীয়দের হাতে রয়েছে।

"দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসমূহ বর্তমান আকারে এবং পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ইয়োরোপীয় সওদাগরদের অত্যাচার বন্ধ হয় নি। কোম্পানি বা বেসরকারী ইয়োরোপীয় সওদাগরদের অধীনে কর্মরত শ্রমিক ও কারিগরদের বন্দী করে রাখা হত এবং পেয়াদাদের দিয়ে মারধোর ও নিগৃহীত করা হত।

"আমার মনে হয় এটা এ দেশেরই প্রাচীন ব্যবস্থা। ইয়োরোপীয়গণ এটা আবিষ্কার করেন নি। কিন্তু কোম্পানির এজেন্টদের হাতেই সর্বাধিক ক্ষমতা থাকত এবং তারাই ছিলেন জঘন্যতম অত্যাচারী।

"লবণ শিল্পে জুয়াচুরি ও নিপীড়নের একটা নির্লজ্জ প্রথা সর্বত্রই চালু ছিল। হাজার হাজার লোককে কাজ করতে বাধ্য করান হত, আর তাদের সামান্যমাত্র বেতন দেওয়া হত। শত শত লোককে প্রতিবছর এই কাজে ঢোকান হত। কোম্পানির মুনাফার জন্য লবণ তৈরীর কাজে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের হাত পা বেঁধে সুন্দরবনের অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হত।

"১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে আদালত প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এ সব ব্যবস্থা চালু ছিল; এবং তারপর অবিলম্বেই আবিষ্কৃত হল এ-সবই ছিল অন্যায় ব্যবস্থা। ঐ সময় পর্যন্ত এ সবের অস্তিত্ব ছিল। কারণ এই নয় যে ঐ অন্যায়গুলি সরকারীভাবে কার্যকরী করার জন্য আমরা আইন তৈরী করেছি বরং সাধারণ লোকেরাই ও-সবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনত না তাই। যদি তারা অভিযোগ করত তা হলে জেলা-শাসক

(Collector) অভিযোগকারীর এমন এক-শতাংশ বক্তব্যও শোনার অবস্থায় থাকতেন না। কেননা তাদের অভিযোগ করার রীতিও দেশের রীতিনীতির অনুসারী ছিল।

"সাধারণভাবে কোম্পানি ও ইয়োরোপীয়গণ যে বাণিজ্যিক লেনদেন করতেন তাতে ভারতীয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হত, যদিও চরম নিষ্ঠুরতার জন্য জেলা শাসক (Collector) সময় বিশেষে শাস্তি দিতেন।

"দেওয়ানী আদালতের রায় এবং ছোট ছোট ফৌজদারী মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দণ্ডদান ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের পর থেকে জনকল্যাণের একটা বিরাট পরিবর্তন এনেছে। শেষোক্ত মামলার নিষ্পত্তি দ্রুত ও জরুরী হয়েছে।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস বিচার ও প্রশাসন বিভাগ পৃথক করে দিয়েছিলেন। প্রশাসন ও বিচার বিভাগীয় কর্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে স্যর হেনরি স্ট্র্যাচির মন্তব্য বর্তমান ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কালেকটর, বিচারপতি (Judge) ও ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার পৃথকীকরণ হয় এবং বাংলায় বিভিন্ন ব্যক্তি সে সব পদে আসীন ছিলেন। আমার মনে হয় এই পরিকল্পনা কয়েক বৎসর পূর্বে আংশিকভাবে কার্যকর করবার চেষ্টা হয়েছিল যদিও তা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু এই সময় পর্যন্ত বিচার প্রশাসন,—কালেকটরের নিকট তা প্রেরিত হোক বা না হোক,—একটা গৌণ ব্যাপার বলে মনে হত। কালেকটরের অন্যান্য কার্যে যতটা সময় ব্যয়িত হত এ ব্যাপারে তার চেয়ে অনেক কম সময় অতিবাহিত হত। দেশের প্রাচীন ও বিশিষ্ট প্রথা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় তখনও আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য এবং প্রধানতম কার্য বলে বিবেচিত হত।

"মাত্র এই সময়ের (১৭৯৩) পরেই বাংলা সরকার বিচারবিভাগীয় কর্মচারীদের মারফত রাষ্ট্রের অধীনস্থ বিরাট জনসংখ্যার কল্যাণ ও নিরাপত্তার প্রতি আন্তরিক মনোযোগে নিবিষ্ট হন।"[৩]

জমিদারী ব্যবস্থায় বাংলার কৃষকদের ওপর অত্যাচার সম্পর্কে স্যার হেনরি স্ট্রাচি বহু কথা বলেছেন। ১৮৫৯, ১৮৬৮ ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের রেণ্ট এ্যাক্ট-এর পর সেই অত্যাচার বন্ধ হয়েছে। রায়তোয়ারী বন্দোবস্তে মাদ্রাজের চাষীদের ওপর অত্যাচারের কথাও তিনি তেমনই জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

"রায়তোয়ারী কালেকটরগণ নিশ্চয়ই বাংলার বিচার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্যের কথা আলোচনা করতে পারেন। মাদ্রাজ সরকার বেঙ্গল রেগুলেশন-এর প্রবর্তন বছরের পর বছর বিলম্বিত করতে পারেন,

পাছে কালেকটরগণের ক্ষমতা খর্ব হয় ও রাজস্ব আদায় বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।...

"যদি বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠার পর রায়তোয়ারী বন্দোবস্ত সাফল্যজনকভাবে কার্যকরী করা যায়, যদি এমন আইন রচিত হয় যার বলে রায়তোয়ার কালেকটর কেবলমাত্র একটি এস্‌টেটের ম্যানেজার থাকবেন, এবং সমস্ত অভিযোগের নিষ্পত্তির অধিকার বিচারপতির থাকবে, তা হলে এই পরিকল্পনার নিন্দা আমি করব না। কিন্তু আমার অভিযোগ রায়তোয়ারী কালেকটরের বিরুদ্ধে, যার বিচার সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা নেই। একটা এস্‌টেট-এর ম্যানেজার হিসেবেই তাঁকে দেখা উচিত। স্বভাবতই তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের ঈর্ষা হবে, কারণ এই ক্ষমতাকে সে অত্যাচারের উদ্দেশ্যে বিকৃত করে তুলতে পারে। ভারতবর্ষে এস্‌টেট-এর প্রত্যেক ম্যানেজারেরই অত্যাচারের দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক বা প্রবণতা আছে। রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে বোঝান যে এ কাজে নিযুক্ত ব'লে তিনি এবং তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা যে অত্যাচার করে থাকেন তার হাত থেকে রায়তদের রক্ষা করবার জন্য জগতে তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি এবং তাঁর বৃত্তি সমস্ত শাসন-নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে, তা হলে সে ব্যক্তি আমার মতে মারাত্মক ভুল করবেন।"[৪]

স্যার হেনরির মূল্যবান পত্র থেকে আরও একটি অংশবিশেষের উদ্ধৃতি প্রয়োজন। ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের তদারকি ব্যতীতই উচ্চ ও দায়িত্বশীল বিচার সংক্রান্ত কার্যে ভারতীয়দের যোগ্যতার কথা তিনি এই পত্রে জোর দিয়ে প্রতিপাদন করেছেন।

"আমার মনে হয় ইয়োরোপীয়দের কোন তদারকির প্রয়োজন নেই। চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে এর পূর্বেই এ বিষয়ে আমার মতামত জানিয়েছি। যদি এ কার্যে বা অন্য কোন পদের জন্য ভারতীয়গণ যোগ্য না হন তবে সে দোষ আমাদের, তাদের নয়। যদি আমরা তাদের উৎসাহ দিই, উচ্চপদের অভিলাষী হতে অনুমতি দিই, ঠিক মতন বেতন দিই, যদি তাঁদের আপন মানে তুলে ধরি, তা হলে অবিলম্বেই দেখা যাবে ভারতে তাঁরা যে কোন পদের যোগ্য।

"এ বিষয়ে বহুদিন পূর্বে যা বলেছিলাম সংক্ষেপে তারই পুনরাবৃত্তি করছি। ভারতীয়গণ অত্যাচারিত ও নিপীড়িত। আমরা তাদের নিম্নতর ও দাসত্বসুলভ পদে আটকে রেখেছি। যদিও তাদের শিক্ষা অত্যন্ত ত্রুটীপূর্ণ এবং সমস্ত শ্রেণী, বিশেষত হিন্দুদের মধ্যে, অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাস সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, তবুও আমরা যে কাজের ভার তাদের ওপর ন্যস্ত করতে চাই দেখা গেছে সেই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা তারা সহজেই আয়ত্ত করতে পারে।

"কিন্তু আমরা একজন ইয়োরোপীয়কে প্রলোভনের ঊর্ধ্বে বসিয়ে রাখি। আর যে ভারতীয়ের পূর্বপুরুষগণ হয়ত উচ্চ ক্ষমতায় আসীন ছিলেন, তাকে মাসে নগণ্য বিশ বা ত্রিশ টাকার (২ বা ৩ পাউণ্ড) ভাতার বিনিময়ে কোন সরকারী কাজ দিয়ে থাকি। তারপরই আমরা ঘোষণা করি ভারতীয়গণ দুর্নীতিপরায়ণ, কোম্পানির ইয়োরোপীয় কর্মচারী ব্যতীত আর কোন মানবগোষ্ঠীই তাদের শাসন করবার পক্ষে যোগ্য নন।"

স্যার হেনরি স্ট্র্যাচির কাছ থেকে এখানেই আমাদের বিদায় নিতে হবে, যদিও তাঁর পত্রের পরবর্তী অংশের অনেকটাই মূল্যবান। বঙ্গদেশে ডাকাতি দমন করবার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তার কঠোরতা প্রমাণ করবার জন্য তিনি পরিসংখ্যানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সন্দেহবশে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার ছাড়াই দু'শ নয় জন বন্দীকে ২৪ পরগণার কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন পাঁচ মাস ধরে আটক আছে। আরওয়াল-এ ডাকাতির পর বাষট্টি জন ব্যক্তি সন্দেহবশে গ্রেপ্তার হয়। তাঁদের মধ্যে নয় জন কারাগারেই মারা যায়। বিচারে কারোরই শাস্তি হয় নি। দুঙ্গাই-এ ডাকাতির পর চুরাশী জন ব্যক্তিকে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারপতি তাঁদের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ করেন। মদনপুরে এক ডাকাতির পর এক শ' বিরানব্বুই জনকে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় বা তার মিথ্যা বয়ান তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। তাদের মধ্যে ছেচল্লিশ জন এক বৎসরের অধিককাল লোহার বেড়ীতে আটক থাকে। তিন ব্যক্তি মারা যায়। অবশিষ্টগণ বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হন এবং ছাড়া পান। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৮০৯-এর মে মাস-এর মধ্যে নদীয়া জেলায় ২০৭১ জন সন্দেহবশে গ্রেপ্তার হয়। ছয় মাসে আটচল্লিশ জন কারাগারে মারা যায়, ২৭৮ জনের বিরুদ্ধে তখনও তদন্ত করা হচ্ছে আর ১৪৭৭ জনের তখনও বিচার হয়নি। স্যার হেনরি বলছেন, "এ ধরনের জঘন্য নিষ্ঠুরতা, খোলা চোখে বিচারের এই ইচ্ছাকৃত পাশবিক বিকৃতি, লক্ষ লক্ষ লোককে কারাগারে নিক্ষেপ করা, নিপীড়ন, নানাভাবে মিথ্যা হলফ ও সাক্ষ্য দেওয়ান, লুঠ, কারাগারে নিরীহ ব্যক্তির মৃত্যু—আমার ধারণা এ সব দৃশ্যই যাঁরা ঘটতে দিয়েছেন তাঁদের পক্ষে ঘটনাগুলি কলঙ্কজনক। কোন অবস্থাতেই এগুলি চলতে দেওয়া যেতে পারে না। ডাকাতি ভীতিজনক ঠিকই, কিন্তু এই ভয়াবহ ব্যবস্থায় যে ক্ষতি হচ্ছে ক্ষতির পরিমাণের দিক থেকে ডাকাতিকেও তার সঙ্গে তুলনা করা চলে না।"[৮]

এবার টমাস মুনরো-র মতামতসমূহ দেখা যাক। তাঁর মতামতও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

"ভারতবর্ষের মতো একটা সভ্য ও জনাকীর্ণ দেশে ভারতীয়দের মারফত-ই বিচারের সুষ্ঠু বণ্টন হতে পারে।……সম্মান ও বেতনের বিনিময়ে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের ন্যায়পরায়ণতা লাভ করবার কথা প্রায় সমস্ত ইয়োরোপীয় সরকারই ভেবেছেন। যদি আমরা ভারতবর্ষেও এটা চাই, তবে অনুরূপ পন্থাগুলিই অবলম্বন করতে হবে। **যদি আমরা ঐ মূল্যই দিই তবে এই ন্যায়-পরায়ণতা আমরা ভারতবাসীদের মধ্যে ইয়োরোপীয়দের মতোই সঙ্গে সঙ্গে পাব—এতে বিস্মিত হব না।** মুসলমান বিজেতাগণের অধীনে ভারতবাসীগণ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ লাভ করতেন। কেবলমাত্র বৃটিশ প্রশাসনেই তাঁরা এই সুযোগে বঞ্চিত। যখন তাঁদের সরকারী বিভাগে নিয়োগ করা হয়ে থাকে, তখনও তাদের পদমর্যাদা চাপরাসীদের থেকে বেশী উঁচু হয় না।"[৯]

অপর একটি স্মারকলিপিতে টমাস মুনরো গ্রাম পঞ্চায়েতের মারফত বিচার বণ্টনের প্রাচীন হিন্দু প্রথা এবং এর সমস্ত গুণাগুণের কথা লিখেছেন।

"পঞ্চায়েৎ মাধ্যমে বিচারের প্রতি ভারতীয়দের তীব্র আসক্তি নিঃসন্দেহে কিছুটা শাসকবর্গের ন্যায়-অন্যায় বিচার-হীনতাজাত ভয় থেকে উৎপন্ন। কিন্তু কোন বিচারক, তিনি যতই সৎ বা কর্মশীল হোন না কেন, ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিশুদ্ধরূপে ও দ্রুত বিচারের ফয়সালায় ঐ রকম একটি পর্ষৎ-এর মতন উপযুক্ত নন—এই অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিশ্বাসই পঞ্চায়েতের প্রতি তাদের আসক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে এবং দৃঢ়মূল করে তুলেছে।"

এই প্রাচীন ব্যবস্থার সঙ্গে বৃটিশগণের প্রবর্তিত ব্যবস্থার বৈপরীত্য দেখাতে যেয়ে তিনি কতকগুলি চিন্তাশীল মন্তব্য করেছেন।

"স্পষ্টতই আমাদের বর্তমান ব্যবস্থা কেবলমাত্র ব্যয়বহুল ও হয়রানিকরই নয়, সব দিক থেকেই অনুপযুক্তও বটে। বাংলা দেশের সরকারের অধীনে এখনও এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মামলা বকেয়া পড়ে আছে। মাঝামাঝি হিসেবেও এই মামলাগুলির জন্য দশ লক্ষ সাক্ষীর প্রয়োজন হবে। আর ব্যয়, দূরত্ব এবং যে সময়টা তাঁরা বাড়ীতে থাকবেন না সেটাও ভেবে দেখলে এতে দেশ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার পরিমাণ নির্ণয় করাটা খুব সহজ হবে না। কিন্তু সপ্রমাণ করা হয়েছে যে এই ক্ষতি অপরিহার্য এবং এর উৎপত্তির জন্য ভারতীয়দের মামলাবাজী চরিত্রই দায়ী। এটাই যদি ভারতীয়দের প্রকৃত চরিত্র হত, তা হলে মামলার নিষ্পত্তির জন্য যখন তাদের কোন খরচ ছিল না তখনও তা প্রতীয়মান হতে পারত। বিভিন্ন অবস্থায় তাদের পর্যবেক্ষণ করবার পর্যাপ্ত সুযোগ আমি পেয়েছি এবং হলফ করে বলতে পারি তারা মামলাবাজ নয়। যে সাবলীলতার

সঙ্গে তাদের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি হয় এবং যে সততার সঙ্গে বিজিত পক্ষ তার বিরুদ্ধের দাবীগুলি মেনে নেয় তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু ব্যয় ও বিলম্বের দরুন উত্তেজনায় ক্লান্তিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে মামলা এগুবার সঙ্গে মামলাবাজী চরিত্রের বিকাশ হতে পারে—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।··· আমাদের ব্যবস্থাই মামলা-মকদ্দমার সৃষ্টি করে। আর যুক্তিহীনভাবে আমরা সেটা জাতির চরিত্রের ওপর আরোপ করি।"[১০]

পরিশেষে আমরা বোম্বাই-এর কর্ণেল ওয়াকারের মন্তব্যর প্রতি দৃকপাত করছি। বৃটিশ শাসনে ভারতে প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থার উৎকর্ষ ও ত্রুটী নিয়ে তিনি সপ্রশংস সংযম ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে লিখেছিলেন।

"বৃটিশ বিচার ব্যবস্থার উৎকর্ষের কথা অনেক সময়েই জাতীয় শ্লাঘার উত্তাপের সঙ্গে স্বীকার করা হয় এবং লেখা হয়। নির্ভেজাল জনকল্যাণের ভিত্তিতেই এই ব্যবস্থা নির্দেশিত হয়েছে এবং সর্বাধিক সম্মান ও যথাযথ সংহতির সঙ্গেই এই প্রশাসন চলছে। সমস্ত শ্রেণীর প্রজাদের প্রতিই নিখুঁতভাবে বিচার-প্রশাসন পরিব্যাপ্ত। এবং মানব চরিত্রের দুর্বলতার কথা ধরে নিয়েও বলা যায় এই প্রশাসন কঠোর ও অবিচল নিরপেক্ষতার সঙ্গে চলছে। এই অবস্থার অসুবিধাগুলি প্রধানত আচার ব্যবহারের বিরাট পার্থক্য এবং বিদেশী প্রজাদের প্রতি বিচার-প্রশাসনে আগন্তুকদের প্রতিকূল অবস্থার ওপরেই আরোপ করা যেতে পারে। এটা একটা বিরাট অসুবিধার দিক এবং কার্যকরভাবে কখনোই এটা দূর করা যাবে না, তবে প্রশাসনে ভারতীয়দের অংশীদার করে নিয়ে এই অসুবিধা কিছুটা লাঘব করা যায়।···বর্তমান ব্যবস্থার বৃহত্তম ত্রুটী হল দেশের জনসাধারণকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে সর্বক্ষেত্রে বিদেশীদের নিয়োগ।"[১১]

ভারতীয়দের আত্মসংযম ও অধ্যবসায় সংক্রান্ত ডিরেক্টরগণের নবম প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কর্ণেল ওয়াকার বারংবার এই বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

"কোম্পানির বেসরকারী প্রশাসনের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রায় সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব বর্জন। নিম্নতম পদগুলিতেই ভারতীয়গণ বহাল আছেন। কোন ইয়োরোপীয়ের নিকটই তা অভিলষিত উদ্দেশ্য হতে পারে না। এবং এই পদগুলির জন্য যে বেতন দেওয়া হয় তাতে তাদের ও পরিবারগুলির জীবিকার সংস্থান হতে পারে না। মর্যাদাসম্পন্ন ও শিক্ষিত ভারতীয়গণের নিকট লোভনীয় এমন কিছুই নেই যা তাঁকে কোম্পানির চাকুরী গ্রহণে প্ররোচিত করতে পারে। যে বেতন দেওয়া হয় সেটাই কেবল স্বল্প নয়, তাদের ওপর যে অবিশ্বাস

স্থাপন করা হয়, যে চোখে তাদের গ্রহণ করা হয়, তা তাদের মধ্যে অনতিক্রম্য বিরক্তির সঞ্চার না করে পারে না··· ।

"সম্মান ও লাভজনক পদে ভারতীয়দের গ্রহণ করাই হল একমাত্র পন্থা যার দ্বারা সার্থকভাবে তাদের বশীভূত করা যেতে পারে। এই আশা বৃথা যে মানুষেরা কেবলমাত্র তাদের সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্যই চিরদিন সন্তুষ্ট থাকবে আর অন্যদিকে সম্মানজনক উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমস্ত পথই তাদের সম্মুখে বন্ধ থাকবে। এই উৎপীড়নমূলক ভাবে বাদ দেওয়ার ফলে প্রতিভার শ্বাসরোধ হয়, পারিবারিক গৌরব দমিত করে এবং দুর্বল ও অযোগ্য ব্যতীত সকলকেই নিষ্পেষিত করে। সমাজের উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণ এটাকে একটা নিদারুণ অবিচার বলে মনে করেন। কিন্তু এঁরাই হলেন দেশের প্রভাবশালী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি। এঁরাই জনমত গঠন করেন। যতদিন পর্যন্ত এই বিরোধের কারণগুলি বর্তমান থাকবে, ততদিন বৃটিশ শাসন সর্বদাই একটা জোয়াল চাপিয়ে দিচ্ছে বলে মনে হবে।···

"যে রোমানদের কাজই ছিল রাজ্যবিজয় এবং যারা সভ্যজগতের বৃহত্তম অংশে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল, একাধিক জাতিকে অধীনস্থ করে রাখবার শিল্পকলায় সেই রোমানদের নিঃসন্দেহে পথপ্রদর্শক হিসেবে ধরা যেতে পারে। ঐ বিচক্ষণ জাতি বিজিত দেশের প্রশাসনের একটা বিরাট অংশই দেশী ব্যক্তিদের হাতে ছেড়ে দিত।"[১২]

উল্লেখযোগ্য যে পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাপক সমীক্ষা কর্ণেল মুনরো ও কর্ণেল ওয়াকারকে একই সিদ্ধান্ত বাতলে দিয়েছে। কর্ণেল মুনরো মুসলমান বিজেতাগণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, যাঁরা "রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদে" ভারতীয় হিন্দুদের গ্রহণ করে উত্তর ভারতে পাঁচশত বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। আর কর্ণেল ওয়াকার রোমান বিজেতাগণের নজির দেখিয়েছেন, যাঁরা একই কাল ব্যাপে "বিজিত দেশের অধিবাসীদের হাতে প্রশাসনের একটা বিরাট অংশ" ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমী জগৎকে নিজেদের পদানত করে রেখেছিলেন। ভারতে ইংলণ্ডের শাসনের আশীর্বাদ সম্পর্কে যাঁরা অতিমাত্রায় সচেতন—ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই তাঁদের পুরোধা—তাঁরাও কিন্তু বেদনার সঙ্গেই অবগত আছেন কিভাবে উচ্চপদ থেকে ভারতীয়গণের কার্যত বহিষ্কার এবং শাসন নিয়ন্ত্রণ বৃটিশ প্রশাসনকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জনসাধারণের অপ্রিয় করে তুলছে এবং সাম্রাজ্যকে দুর্বলতর করছে।

এবং এই বহিষ্কারকে অনেক সময়েই ভারতীয় চরিত্রের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সমর্থন করা হয়। পত্রের শেষদিকে কর্ণেল ওয়াকার সতর্ক হয়ে এর উল্লেখ করেছেন।

"ভারতীয় প্রজাদের যোগ্যতা সম্পর্কে যে সব রিপোর্ট তাঁরা পেয়ে থাকেন, তা বাদ দিয়ে এমন কোন প্রতারণার কারণ নেই যার বিরুদ্ধে সতর্ক হওয়া কোম্পানির পক্ষে শোভা পায়। এই রিপোর্টগুলি অবশ্য সেই দেশে চাকুরীরত ইয়োরোপীয়গণের মারফত পাঠানো হয়ে থাকে। কিন্তু বর্ণ-বিদ্বেষ বা স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে তাঁরা অনেক সময়ই ভারতীয়দের যোগ্যতার অবমূল্যায়ন করেন। একথা ঠিক যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা এ ধরনের মানসিকতার উর্ধ্বে এবং হয়ত এমন লোক সামান্যই আছেন যাঁরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে তদনুযায়ী কাজ করবেন। কিন্তু তবুও এই নীতিটি গুপ্তভাবে ক্রিয়াশীল এবং সাধারণ মানুষের ধারণা ও মতামতের ওপর সর্বদাই তা একটা শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করবে যদিও সে প্রভাব হয়ত অনুভূত হবে না।"[১৩]

১। Mill's *History of British India*, Wilson's Constitution, Book I, Chapter vii.

২। Lord Minto's Minute, dated 24th November 1810.

৩। *East India Papers* (London, 1820) vol. ii, p. 56.

৪। ঐ, vol. ii, p. 58.

৫। ঐ, p. 58। দুর্ভাগ্যক্রমে তখন থেকে বিচার ও শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলীকে পুনরায় একীকরণ করা হয়েছে।

৬। ঐ, pp. 64, 65। মাদ্রাজের রায়তোয়ারী কালেকটর এখনও (১৯০১) তার জেলার ম্যাজিস্ট্রেট।

৭। ঐ, p 67.। বড় হরফ আমার।

৮। ঐ, p. 70.।

৯। ঐ, pp. 105, 110। বড় হরফ আমার।

১০। ঐ, pp. 116, 118।

১১। ঐ, pp. 183, 184।

১২। ঐ, pp. 185, 186।

১৩। ঐ, p. 188। বড় হরফ আমার।

উনবিংশ অধ্যায়

প্রশাসনিক সংস্কার ও লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক

(১৮১৫-১৮৩৫)

স্যার হেনরি স্ট্র্যাচি, কর্নেল মুনরো ও কর্নেল ওয়াকারের মতো ব্যক্তিদের নথীবদ্ধ মতামত, ১৮১২-র হাউস অব কমন্স-এর সিলেক্ট কমিটি উপস্থাপিত বিখ্যাত পঞ্চম রিপোর্ট, এবং সব শেষে, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে হাউস অব কমন্সের সামনে মুনরো ও ম্যালকম প্রদত্ত সাক্ষ্য ইংলণ্ডের জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ভারতের বিচারবিভাগীয় প্রশাসনের সংস্কার করার জন্য কোর্ট অব ডিরেক্টর্সকে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত ও তার সংস্কারের জন্য তাঁরা এক বিশেষ কমিশন নিযুক্ত করেন।

মুনরো জুন ১৮১৪-তে ইংলণ্ড ত্যাগ করেন এবং আঠারো সপ্তাহের পর মাদ্রাজ এসে পৌছন সেপ্টেম্বর মাসে। সময় নষ্ট না করে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ নিয়ে কাজে মনোনিবেশ করেন এবং সেই বছরেই বড়দিনের প্রাক্কালে মাদ্রাজ সরকারের কাছে তাঁর ছ-দফা পরামর্শ ও প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে (১) কলেকটরের হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া দরকার এবং গ্রামের পুলিসি ব্যবস্থাপনার ভার গ্রাম প্রধানদের হাতেই ফিরিয়ে দেওয়া দরকার; (২) গ্রাম পঞ্চায়েৎ নতুন করে গঠন করা উচিত; (৩) দেশীয় জেলা জজ বা কমিশনার নিযুক্ত করা দরকার; (৪) কলেকটরদের 'পাট্টা রেগুলেশন' বলবৎ করার ক্ষমতা দেওয়া দরকার; (৫) জমিদারদের ক্রোক করার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করা দরকার; এবং (৬) বিতর্কিত জমির সীমা সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি করবেন কলেকটররা।[১]

যে-দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা টমাস মুনরোকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই প্রথম প্রস্তাব-গুলিতে তা লক্ষ্য না করে পারা যায় না। প্রথমত তিনি জোর দিয়েছিলেন গ্রাম প্রধান, জেলা জজ ও কমিশনার রূপে নির্বাচিত ভারতের মানুষের হাতেই যথাসম্ভব সমস্ত বিচার সংক্রান্ত কাজ ন্যস্ত করার উপরে। দ্বিতীয়ত সমস্ত কার্যনির্বাহী ক্ষমতাকে—রাজস্ব, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস—তিনি একজন মাত্র কর্তা—জেলা কলেকটরের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম চিন্তাটি আংশিক-ভাবে মাত্র কার্যকর করা হয়েছে, এবং জেলা জজের পদটি, বর্তমান কাল পর্যন্ত

কার্যত ইয়োরোপীয়দের জন্যই সংরক্ষিত। তাঁর দ্বিতীয় চিন্তাটি সম্ভবত বিশৃঙ্খলা ও কুশাসনের সময়ে যথাযথ হতে পারত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একেবারে বর্তমান সময় পর্যন্ত তদনুযায়ীই কাজ হয়েছে।

এই স্বল্প পরিসরে পরবর্তী দুবছরে কমিশনের কাজ, এবং তার ফলে যে বিরাট পরিমাণ চিঠিপত্রাদি লেখা হয় (এবং যা 'ঈস্ট ইণ্ডিয়া পেপার্স'-এর[২] প্রায় ৫০০ ফোলিও পৃষ্ঠা জুড়ে আছে) তা বর্ণনা করা অসম্ভব। একথা বলাই যথেষ্ট যে কমিশন প্রথমে সাতটি রেগুলেশনের খসড়া করেন এবং সংশোধন-পরিমার্জনের জন্য মাদ্রাজের প্রধান দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কাছে পেশ করেন। এর পর কোর্ট অব ডিরেক্টর্সদের কাছ থেকে ২০ ডিসেম্বর, ১৮১৫ তারিখের একটি চিঠি আসে এবং সেটিকে কমিশনের বরাবরে পাঠানো হয়। মাদ্রাজ সরকার ও প্রধান আদালতগুলির পরামর্শ ও প্রস্তাব অনুযায়ী মূল খসড়ায় অনেকগুলি পরিবর্তন ও সংযোজন করা হয়। শেষে, ১৮১৬ সালে বিভিন্ন তারিখে পনেরোটি রেগুলেশন পাশ হয়।

এই রেগুলেশনগুলির আশু ফল হল দায়িত্বশীল পদে মাদ্রাজের লোকদের নিযুক্তি বৃদ্ধি এবং বিচারবিভাগীয় কাজের অনেকখানিই তাদের হাতে হস্তান্তরিত করা। গত বহু বছর ধরেই কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে সবচেয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই সংস্কারের কথা বলে আসছিলেন, সুশাসনের জন্য এই সংস্কার প্রয়োজন ছিল। টমাস মুনরোই সর্বপ্রথম এই প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যকর করার ভার পেলেন।

মাদ্রাজ সরকারের কাছে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স লিখেছিলেন, "সেই কর্তব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও পরিশ্রম সাপেক্ষ অংশটি পড়েছিল প্রথম কমিশনার কর্নেল মুনরোর উপরে, যাঁর সম্পর্কে প্রশংসাসূচক কিছু বলা আমাদের পক্ষে বাহুল্য হত, তবুও নিতান্তই আপনাদের আশ্বস্ত করার জন্য এবং আপনাদের ও সাধারণভাবে সিভিল সার্ভিসের অবগতির জন্য জানাই যে কমিশনের প্রধানরূপে তিনি কোম্পানি ও দেশীয় মানুষদের যে সেবা করেছেন তা তাঁর দীর্ঘ সম্মানজনক কর্মজীবনের যে কোন কাজের মতোই আমাদের আন্তরিক স্বীকৃতি লাভের যোগ্য।"[৩]

এই উচ্চ প্রশংসা তাঁর সত্যই প্রাপ্য এবং ভারতের জনমতও তা সমর্থন করেছে। তা সত্ত্বেও বলা দরকার যে মুনরো তাঁর রেগুলেশনে যে সমস্ত লক্ষ্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন তার কতকগুলি পূর্ণ হয়নি। গ্রামের পুলিসকে গ্রাম প্রধানদের অধীনে রাখার প্রয়াস পরিত্যক্ত হয়, এখন সারা ভারতে পুলিস একটি পৃথক শক্তি। আর, গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করার প্রয়াসও ব্যর্থ

হয়েছে, যার কারণ অন্যত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রাম ইউনিয়নগুলিকে বিজ্ঞতর নিয়ম অনুযায়ী গঠন করার সময় এখন এসেছে, এবং যতদিন তা না করা হচ্ছে ততদিন ভারতের সরকার কখনই জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন না।

অন্যদিকে, একই ব্যক্তির হাতে কলেকটর, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিসের কর্তব্যভার একসঙ্গে দিয়ে টমাস মুনরো যে-ভুল করেছিলেন সেটাই চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমন কি ১৮১৫ ও ১৮১৬ সালে মাদ্রাজ সরকারের জোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও এ-ভুল করা হয়েছিল। মাদ্রাজ সরকারের সদস্য মিঃ ফুলারটন সেই কর্তব্যভার একত্রে মেলানোর ব্যাপারে প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে ও সুস্পষ্টভাবে পেশ করেছিলেন।

"আমি অবশ্যই মনে করি, কলেকটরদের হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্যও হস্তান্তর করা এমন একটা বিচ্যুতি হবে যা কার্যনির্বাহী কর্তৃত্বকে অতিরিক্ত ক্ষমতায় বলীয়ান করে এবং বিচার বিভাগের রক্ষণ ক্ষমতা সম্পর্কে জনসাধারণ যে বিশ্বাস ও আস্থা পোষণ করতে শুরু করেছেন তাকে হ্রাস করিয়ে বিচারব্যবস্থার উপকারিতা বহুল পরিমাণ ব্যাহত করতে পারে।"[৪]

মাদ্রাজ সরকারেরও একই মত ছিল, এবং তাঁরা মনে করতেন যে কলেকটরকে পুলিসের তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে বটে, তবে তাঁর হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া উচিত নয়। প্রশ্নটি কোর্ট অব ডিরেক্টর্স পর্যন্ত গিয়েছিল, এবং ডিরেক্টররা মাদ্রাজ সরকারের বক্তব্য বাতিল করে দেন ও একই অফিসারদের হাতে রাজস্ব ও ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্যভার মিলিতভাবে রাখার নির্দেশ দেন।

"আপনাদের ও কর্নেল মুনরোর মধ্যে যে-বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে সেটি আমাদের পত্রের সেই অংশ সম্পর্কে যেখানে আমরা কলেকটরের হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা হস্তান্তরিতে করার কথা বলেছিলাম : কর্নেল মুনরো মনে করছেন যে এই হস্তান্তরের মধ্যে শুধু পুলিসের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণই নয় বরং ম্যাজিস্ট্রেটের সম্পূর্ণ কর্তব্যকর্মও আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছি, অন্যদিকে আমাদের কাউন্সিলের গভর্নর মনে করছেন যে এই হস্তান্তরকে আমরা শুধু পুলিস বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছি।

"নির্দ্বিধায় আমরা ঘোষণা করছি যে আমাদের উদ্দেশ্য হল কর্নেল মুনরো যে-অর্থে এবং যতদূর পরিমাণে এই হস্তান্তর হবে বলে মনে করছেন, সেই ভাবেই এই হস্তান্তর ঘটবে।"[৬]

মাদ্রাজ সরকারকে এই সিদ্ধান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিতে হয়। রবার্ট ফুলারটন আবার লেখেন: "ইতিপূর্বে আমি যে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলাম, উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তারপরে পাওয়া নির্দেশ ও অভিমতের সঙ্গে তার অমিল হয়েছে বলে আমি যত দুঃখই প্রকাশ করি না কেন, সে বক্তব্য আমি বিবেকের দোহাই দিয়ে ফিরিয়ে নিতে পারি না। পরবর্তী চিন্তা এবং তারপরে প্রাপ্ত বহুবিধ সরকারী দলিলপত্র এই বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করেছে যে কলেকটরের হাতে ন্যস্ত জেলার সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা—যার অনেকখানিই দিতে হবে দেশীয় রাজস্ব অফিসারদের হাতে, এবং মাঝে মাঝে সার্কিট জজের সফর ছাড়া যে ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিত থাকবে—রাজস্ব বিভাগের যে-পরিমাণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবে, তার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো আপীল কার্যকরভাবে করা যাবে না।"৬

এবারে বোম্বাইয়ের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বোম্বাইয়ের কোনো উল্লেখ করা হয়নি, কারণ এই প্রদেশের বৃহত্তর অংশটি বৃটিশ শাসনের অধীনে আসে বঙ্গ ও মাদ্রাজের অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল পরে। বঙ্গে বৃটিশ প্রভাব দৃঢ়ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর এবং মাদ্রাজে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে বন্দিবাস-এর যুদ্ধের পর, কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড ওয়েলেসলীর যুদ্ধগুলি সত্ত্বেও ভারতের পশ্চিমভাগে মারাঠারা অপরাহত ছিল। শেষ পেশোয়াকে পুণার গদীতে বসানো হয় ১৮০২ সালে বৃটিশের অস্ত্রবলের সাহায্যে এবং বৃটিশের সঙ্গে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিনি তাঁর রাজ্যের মধ্যে বৃটিশ ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী রাখেন। এটাই ছিল শেষের শুরু। অচিরেই তিনি তাঁর নতুন মিত্রদের প্রচণ্ড ক্ষমতা আবিষ্কার করেন এবং নিজেকে সংযত রাখার আড়ালে মনে মনে ক্রোধে-ক্ষোভে জ্বলতে থাকেন। অবশেষে তিনি তাঁর মুখোশ খুলে ফেলেন; একটি যুদ্ধ করে তিনি পরাস্ত হন এবং ১৮১৭ সালে তাঁর রাজ্য বৃটিশ এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

টমাস মুনরোর নাম যেমন মাদ্রাজের সঙ্গে যুক্ত, তেমনি বোম্বাইতে বৃটিশ প্রশাসন গড়ে তোলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত মাউণ্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের নাম। সতেরো বছরের তরুণ এলফিনস্টোন ভারতে আসেন ১৭৯৬ সালে। সাত বছর পরে আর্থার ওয়েলেসলীর (পরবর্তীকালে বিখ্যাত ডিউক অব ওয়েলিংটন) অধীনে ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে তাঁর কাজ করবার সৌভাগ্য হয়। ১৮০৩ সালে আসায়ের বিরাট যুদ্ধে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে ডিউকের পাশে পাশে ছিলেন এবং মারাঠাদের ব্যাপার ও প্রশাসন সম্পর্কে প্রথম পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান অর্জন করেন

১৮০৪ থেকে ১৮০৮ পর্যন্ত নাগপুরের রেসিডেণ্ট রূপে অবস্থান কালে। কাবুলে একটি মিশনে যাবার ফলে সেই অজ্ঞাত দেশের জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তিনি একটি সুখপাঠ গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হন এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, ১৮১১ সালে পুনায় রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন ; কয়েক বছরের মধ্যেই সেখানে যে রাষ্ট্রবিপ্লব হয় তাতে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন, এ যেন ছিল নিয়তির বিধান। আগেই বলা হয়েছে, এই বিপ্লব এসেছিল ১৮১৭-তে ; শেষ পেশোয়া বাজীরাওয়ের শাসনের উচ্ছেদ ঘটল ; এবং দাক্ষিণাত্য হল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

মারাঠাদের বিষয়ে এলফিনস্টোনের অতুলনীয় অভিজ্ঞতা তাঁকেই চিহ্নিত করেছিল বিজিত অঞ্চলের বন্দোবস্ত করার যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবে। জানুয়ারী ১৮১৮ থেকে তিনি দাক্ষিণাত্যের কমিশনার নিযুক্ত হন এবং এই পদে থাকাকালীন তিনি যে যে কাজ করেছিলেন পরবর্তী অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হবে। ১৮১৯ সালে তিনি বোম্বাইয়ের গভর্ণর নিযুক্ত হন, এবং এই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকার আট বছরে তিনি পশ্চিমভারতে বৃটিশ প্রশাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন।

উদার শাসক রূপে তাঁর সুখ্যাতির কারণ প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে তাঁর কাজের জন্য। তাঁর প্রথম উদ্যোগ ছিল আইনকে বিধিবদ্ধ করা। তাঁর দ্বিতীয় মহৎ লক্ষ্য ছিল প্রশাসনের কাজে ভারতের মানুষকে তখন যতখানি সম্ভব ছিল ততখানি অংশ দেওয়া। তাঁর তৃতীয় ও শেষ উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মধ্যে সুশিক্ষার বিস্তার, যাতে ভবিষ্যতে তারা তাদের নিজস্ব ব্যাপারের ব্যবস্থাপনায় উচ্চতর ও অধিকতর দায়িত্বশীল অংশগ্রহণে সক্ষম হয়।

প্রথম কাজটি ভালোভাবে ও সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। "সমগ্র বোম্বাই রেগুলেশনগুলিকে বিধিবদ্ধ করা হয়, বিষয়বস্তু অনুযায়ী যথাযথভাবে বিন্যস্ত করা হয়। এই বিধিগ্রন্থে আছে সাতাশটি রেগুলেশন, এগুলি আবার অধ্যায় ও অংশে বিভক্ত। এতে বেঙ্গল রেগুলেশনের মতো একই বিষয়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু পার্থক্য এই ক্ষেত্রে যে তাতে বেশ কিছু ফৌজদারী আইন আছে।"[৭] এছাড়াও এলফিনস্টোন জনসাধারণের নিজস্ব আইন, প্রথা ও আচারের একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরীর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "আমরা যাকে হিন্দু আইন বলি তা শুধু ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ; প্রতিটি বর্ণের আলাদা আলাদা আইন ও প্রথা আছে ;" এবং এলফিনস্টোনের চিন্তাটা ছিল সমস্ত বর্ণ ও উপজাতির এই সমস্ত নানান ধরনের প্রথার একটা সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্তসার সংকলন

করা। এই চিন্তা তাঁরই যোগ্য ছিল বটে, কিন্তু একাজ সম্পন্ন করা ছিল অসম্ভব, এবং কাজটি অসমাপ্তই থেকে যায়।

ভারতস্থিত শ্রেষ্ঠ শাসকগণ ইংলণ্ডের উচ্চতম চিন্তা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সর্বদাই কত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তা বোঝা যাবে এই ঘটনা থেকে যে এলফিনস্টোন যখন হিন্দু রীতিনীতি ও আইনের এক সংক্ষিপ্তসার সংকলন করতে চাইছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জেরেমি বেন্থামের রচনাবলীও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করছিলেন। তিনি স্ট্র্যাচিকে লিখেছিলেন :

"আপনার জেরেমি বেন্থাম সংক্রান্ত বিবরণী পড়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। তাঁর সম্পর্কে আমার প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল, তা সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়েছে। তিনি নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর খামখেয়ালীপনা বিশিষ্টও বটে, যেটা তাঁর মতবাদের ও ব্যক্তিগত আচার-আচরণের উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষিত হয় সম্ভবত পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর সামান্য পরিচয়েরই দরুন। তাঁর উপহার দেওয়া বইগুলি পেয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত বোধ করেছি, আমি আর কোনো লেখকের কথা জানি না যার কাছ থেকে এমন উপহারকে আমি এত উচ্চ সম্মান দিতাম। আমি যখন এর আগে শেষবার আপনাকে দীর্ঘ পত্রটি দিয়েছি, সেই সময়ে আমি বঙ্গবিষয়ক উপদেষ্টাদের নিযুক্ত করার কথা ভাবছিলাম। আশা করেছিলাম পুণায় তাঁদের পাবো এবং ব্রাহ্মণদের অধীনে যেভাবে আইন প্রয়োগ করা হয় সেই হিন্দু আইন ও মারাঠা দেশের প্রথা তাঁদের দিয়ে বিধিবদ্ধ করাতে পারবো, অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে-সব আইন ও প্রথা আমাদের নিজেদের আইন দ্বারা সংশোধিত করে নেওয়া হবে ; কিন্তু কোনো উপদেষ্টা আমি পাইনি এবং এই কাজটা সম্পর্কে আমি যত চিন্তা করেছি কাজটা ততই বিরাট মনে হয়েছে।"[৮]

ভারতের ঐতিহাসিকেরা একথাটা সবসময়ে যথেষ্ট পরিষ্কার করে বলেননি যে গত ১৫০ বছরে ভারতে বৃটিশ শাসন সর্বদাই ইয়োরোপীয় প্রভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফ্রেডারিক দি গ্রেট যে-সমস্ত যুদ্ধ করেছিলেন, সেগুলিই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধকে তীব্র করেছে এবং তার পরিণতি ঘটেছে ভারতে ফরাসীদের প্রভাবলুপ্তির মধ্যে ; আর নেপোলিয়নের যুদ্ধগুলি লর্ড ওয়েলেসলী ও লর্ড হেস্টিংসের উচ্চাভিলাষমূলক দেশজয়কে অনুপ্রাণিত করেছে। এর পরে বিচার সংক্রান্ত, নাগরিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কারকর্মের যে প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং ইংলণ্ডে ১৮৩২ সালের 'রিফর্ম অ্যাক্টে' যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে, তা ভারতেও অনুরূপ সংস্কারের জন্ম দেয় এবং মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বঙ্গদেশে

প্রশাসনিক কাজে জনসাধারণের বৃহত্তর অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এবং তার পরে অতিবাহিত সত্তর বছরে, ইংলণ্ডে শান্তি ও সংস্কারের প্রতিটি কালপর্বই চিহ্নিত হয়েছে ভারতে কোনো না কোনো প্রত্যক্ষ সংস্কারকর্ম দিয়ে; এবং ইংলণ্ডে যুদ্ধের মনোভাবের প্রতিটি ঢেউই উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার জন্ম দিয়েছে এবং প্রায়শই ভারতে অর্থহীন যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে। ভারতে কোনরূপ জন-প্রতিনিধিত্বের অভাব সে দেশকে একাধিক দিক দিয়ে ইংলণ্ডের উপর নির্ভরশীল করে রাখে; এবং এজন্য ভারতের জনসাধারণকে প্রায়শই অবিজ্ঞজনোচিত ও পশ্চাৎগতিশীল প্রশাসন সহ্য করতে হয়েছে, ইংলণ্ডের সাময়িক উন্মত্ততার সময়ে অবিজ্ঞজনোচিত ও নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত যুদ্ধের জন্য মূল্য দিতে হয়েছে!

এই অধ্যায়ে আমরা যে সময়টির কথা বলছি, সে সময়ে ইংরেজদের প্রভাব ছিল সবচেয়ে সুস্থ ধরনের, এবং মুনরো, এলফিনস্টোন ও বেন্টিঙ্ককে তা শুধু ভারতের আইন সংস্কারেই উদ্বুদ্ধ করেনি, প্রশাসনে জনসাধারণের আইনসঙ্গত অংশলাভের দাবীকেও অনুকূলভাবে বিবেচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে অভিমতের ব্যাপারে এলফিনস্টোন ছিলেন মুনরোর মতোই স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল এবং তাঁর যত চিঠিপত্র ও বিবরণীতে প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উঠেছে, সর্বত্রই তিনি তা ব্যক্ত করেছেন। ১৮২২ সালে স্যর টমাস মুনরোকে লেখা একটি চিঠির নিম্নোদ্ধৃত অংশটি উদাহরণ স্বরূপ পরিগণিত হতে পারে:

"শুনতে পেলাম মাদ্রাজে আপনি নেটিভ বোর্ডের মতো একটা কিছু সংগঠিত করেছেন, পরিকল্পনার ধরনটি সম্পর্কে আমাকে যদি অবহিত করান তাহলে বাধিত হব। মনে হয় এই ব্যবস্থার একটা বড় সুবিধা এই যে উচ্চ ও দক্ষতাপূর্ণ পদে তা দেশীয় ব্যক্তিদের চাকরীর দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। এই পরিকল্পনা বিচারবিভাগীয় অথবা অন্য কোনো ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা যায় বলে আপনি মনে করেন কিনা, সেটা জানতে পারলে আনন্দিত হব। দেশীয় লোকদের শাসন করার কাজে ভালো দেশীয় উপদেষ্টা পাবার প্রয়োজনীয়তা ছাড়া, তাদের নিজেদের দেশের শাসনকার্যে দেশীয় লোকেদের কিছুটা অংশ দেবার পথও আমাদের প্রশস্ত করা দরকার। আমরা যখন তা করতে বাধ্য হব তার হয়তো এখনও অর্ধশতাব্দী বাকি; কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই সরকার ও শিক্ষার যে-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছি তা কোনও না কোনও সময়ে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটাবে যে তখন তাদের অধীনস্থ চাকরীতে সীমাবদ্ধ রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে; এবং আমরা যদি তাদের উচ্চাশা ও যোগ্যতার পথ আগেই খুলে না দিই তাহলে আমরা একটা বিস্ফোরণ আশঙ্কা করতে পারি, যে-বিস্ফোরণ আমাদের সরকারকে উল্টে দেবে।"[৯]

চার বছর পরে, হেনরি এলিসের কাছে লিখিত এক পত্রে এলফিনস্টোন এবিষয়ে তাঁর সুপরিণত অভিমত আরো জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেন।

"এটা সব সময়েই আমার একটা প্রিয় ধারণা যে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশীয়দের সঙ্গে আমাদের সেইরকম সম্পর্ক রাখা যে সম্পর্কে রয়েছে চীনাদের সঙ্গে তাতারদের: সরকারী ও সামরিক ক্ষমতা হাতে রাখা, কিন্তু অসামরিক প্রশাসনে সকল অংশ ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করা, শুধু সেইটুকু নিয়ন্ত্রণ ছাড়া, যেটুকু সমগ্র ব্যাপারটাকে একটা গতি ও গতিমুখ দেবার জন্য প্রয়োজন। এই কাজটা হবে এত ক্রমান্বিত ভাবে যে আপনি যেরকম মনে করছেন, ডিরেক্টরদের পর্যন্ত তা শঙ্কিত করবে না…; কিন্তু এটা আমাদের মনে রাখা দরকার এবং আমাদের সমস্ত ব্যবস্থাই সেই লক্ষ্য অনুসারে হওয়া উচিত।"[১০]

এলফিনস্টোন তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ধারণায় অটল থেকেছেন এবং তা প্রচার করেছেন! ভারত থেকে তাঁর অবসর গ্রহণের কুড়ি বছরেরও পরে, যখন তিনি সারে-তে তাঁর শান্ত গ্রাম্যভবনে তাঁর পুস্তকসম্ভারের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত জীবন যাপন করছিলেন—সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত ভারত বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বলে, এবং তাঁকে একাধিকবার চাপ দেওয়া হয়েছিল গভর্ণর জেনারেল রূপে ভারতে যাবার জন্য—তখনও তিনি একই অভিমত পোষণ করতেন এবং তাঁর চিঠিপত্রে একই অভিমত ব্যক্ত করতেন।

"আমাদের…… দেশীয় ব্যক্তিদের এমন অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য উদ্যোগী হতে হবে যা তাদের নিজেদের শাসন করতে সক্ষম করে তুলবে এবং সেই শাসন হবে এমনভাবে যা আমাদের স্বার্থ তথা তাদের নিজেদের ও বাকি পৃথিবীর স্বার্থের পক্ষে হিতকারী হবে; এবং আমাদের উদ্যোগী হতে হবে এই কৃতিত্বের গৌরব এবং আমাদের প্রয়াসের প্রধান পুরস্কারের জন্য আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি এই চরিতার্থতাবোধ লাভের জন্য।"[১১]

এখানে একথাও যোগ করা দরকার যে এলফিনস্টোন তাঁর শাসনকালে এই নীতিকে কার্যকর করার জন্য তাঁর যথাসাধ্য করেছেন; এবং স্যার টমাস মুনরো মাদ্রাজে যে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তা বোম্বাইয়ের বিচারবিভাগীয় কাজকর্মের একটা বড় অংশকে বিভিন্ন স্তরের ভারতীয় সিভিল জজদের হাতে তুলে দিতে তাঁকে সক্ষম করেছে।

এলফিনস্টোনের শাসনের তৃতীয় ও সর্বশেষ মহৎ লক্ষ্যটি ছিল জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। শিক্ষার দিক দিয়ে বোম্বাই তখন সমস্ত প্রেসিডেন্সীগুলির মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে পিছিয়ে ছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যাজকরা সামান্য

কয়েকটি দাতব্য বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করতেন এবং মিশনারী প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল ১৮১৪-তে বোম্বাইয়ে আগত ক্ষুদ্র একদল মার্কিন মিশনারীর মধ্যে।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে এলফিনস্টোন এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন এবং দরিদ্রদের শিক্ষাদানের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। ছাপার কাজ ও পুরস্কার ক্রয়ের উদ্দেশ্যে এই সমিতির জন্য তিনি ৫০০০ পাউণ্ডের অনুদান যোগাড় করেন এবং পরবর্তী ১৬ বছর দেশীয় ভাষায় সমস্ত শিক্ষাদানই চালানো হয় এই সমিতির মাধ্যমে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিশদ অনুসন্ধান চালানো হয় এবং ১৮৩২-এ প্রকাশিত এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফলাফলে প্রকাশ পায় যে প্রায় ৫০ লক্ষ জনসংখ্যাবিশিষ্ট বোম্বাই প্রদেশে মোট ১৭০৫টি স্কুল এবং সেই সব স্কুলে আছেন ৩৫,১৪৩ জন শিক্ষক।[১২]

উচ্চ শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টায় এলফিনস্টোনকে তাঁর নিজের কাউন্সিলের কাছ থেকে এবং কোর্ট অব ডিরেক্টর্স-এর কাছ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এলফিনস্টোনের ইচ্ছা ছিল তরুণ সিভিলিয়ানদের জন্য বোম্বাইতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করবেন, সেখানে দেশীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ থাকবে; প্রকল্পটির শেষ অংশের বিরোধিতা করেন তাঁর কাউন্সিল; এবং সমস্ত প্রকল্পটিই ডিরেক্টরদের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হয়।

সাধারণ শিক্ষার প্রসারের জন্য এলফিনস্টোন এই ব্যবস্থাগুলি প্রস্তাব করেছিলেন—(১) দেশীয় বিদ্যালয়গুলির উন্নতি ও সংখ্যাবৃদ্ধি; (২) তাদের স্কুলপাঠ্য বই সরবরাহ করা; (৩) নিম্ন শ্রেণীর লোকদের শিক্ষালাভে উৎসাহ দান; (৪) ইয়োরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য নতুন নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা; (৫) দেশীয় ভাষাগুলিতে নৈতিক ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বই রচনা; (৬) ইংরেজী শিক্ষার জন্য নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা, (৭) জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান। ডিরেক্টরদের রাজী করাবার জন্য এলফিনস্টোন দেখান যে এই বিদ্যালয়গুলি বাবদ কোম্পানির ব্যয় হবে সামান্যই এবং সে ব্যয়ভার প্রধানত গ্রামগুলি বহন করবে। তা সত্ত্বেও, তাঁর ভারত ত্যাগের আগে তাঁর এই পরিকল্পনা কোনো অনুমোদন লাভ করেনি। প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয়টি বোম্বাইতে খোলা হয় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এলফিনস্টোনের ভারত ত্যাগের পরের বছরে; সেই বছরেই পুণার সংস্কৃত কলেজে একটি ইংরেজী বিভাগ খোলা হয়; এবং বোম্বাইয়ের বিখ্যাত এলফিনস্টোন ইনস্টিট্যুশন ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত খোলা হয়নি।

ভারতে এলফিনস্টোনের শিক্ষামূলক কাজের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা তাঁর ১৮২৪-এর বিবরণী থেকে দু-একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি।

"আমাদের ভারতীয় সরকারের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে যে প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির আমরা ক্ষতিসাধন করেছি এবং আমরা সমস্ত উৎস বন্ধ করে দিয়েছি, এই সমস্ত উৎসভাণ্ডার থেকে দেশ বঞ্চিত, এবং আমরা নিজেরা উপযোগিতার কিংবা চমৎকারিত্বের একটিও কাজ করিনি। আরও ন্যায্যভাবে এ অভিযোগও করা যায় যে দেশীয় প্রতিভার উৎসগুলিকে আমরা শুষ্ক করে দিয়েছি, এবং আমাদের বিজয়ের চরিত্র থেকে, জ্ঞানের প্রসারের দিকে সমস্ত রকম উৎসাহ যে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে তাই নয়, জাতির প্রকৃত জ্ঞানও সম্ভবত নষ্ট হতে চলেছে এবং আগেকার মতো প্রতিভা সৃষ্টিও বিস্মৃতির ঘটনা হতে চলেছে। এই অভিযোগ দূর করার জন্য অবশ্যই কিছু করা উচিত।"[১৩]

আবার সেই বছরেই তিনি লিখেছিলেন :

সরকারী চাকরীর জন্য দেশীয় লোকদের উপযুক্ত গুণসম্পন্ন করার ব্যাপারে যদি যত্ন নেওয়া হত, এবং তারপরে তাদের কর্মে নিযুক্তির প্রতি যদি নজর দেওয়া হত, তা হলে ছবিটা শীঘ্রই বিপরীত হত। অনতিকালের মধ্যেই আমরা দেখতে পেতাম ইয়োরোপীয় সহকারীরা এখন যেমন করছেন, দেশীয় ব্যক্তিরাও ঠিক সেই রকমই একটি জেলার একটি অংশ তত্ত্বাবধানের কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। আরো অগ্রসর স্তরে, তাঁরা কখনও রেজিস্ট্রার ও সাব-কলেকটর কিংবা কলেকটর ও জজ পর্যন্ত হতে পারতেন ; এবং এমন একটা সময়ের কথা অনুমান করাও কল্পনাবিলাস নয় যখন তাঁরা তাতারদের সঙ্গে চীনাদের যে-সম্পর্ক আছে ইংরেজদের সঙ্গেও প্রায় সেইরকম সম্পর্ক বজায় রাখছেন—ইয়োরোপীয়দের হাতে রয়েছে সরকারী ও সামরিক ক্ষমতা আর দেশীয়রা নিযুক্ত আছেন অনেকগুলি অসামরিক পদে এবং সেনাবাহিনীর অধস্তন বহু পদে।"[১৪]

সেকালের দুই শ্রেষ্ঠ প্রশাসক একই বছরে ভারত থেকে প্রস্থান করেন। স্যর টমাস মুনরোর জীবনাবসান ঘটে জুলাই ১৮২৭-এ এবং মাউণ্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন ভারত পরিত্যাগ করেন তার চার মাস পরে। সেই বছরই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং মুনরো ও এলফিনস্টোন সুচারুভাবে যে কাজ শুরু করেছিলেন তা সম্পূর্ণ করার ভার পড়ে তাঁরই উপর।

নেপোলিয়নের যুদ্ধগুলির পর ইয়োরোপে যে সুস্থ জনমত গড়ে উঠেছিল তার বলিষ্ঠ প্রভাব নিয়ে আর কোনো প্রশাসক ভারতে আসেন নি। বেণ্টিঙ্ক ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মাদ্রাজের গভর্ণর ছিলেন, বিদ্রোহ শুরু হবার পরে সে পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং তারপর তিনি ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে

জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি সিসিলি ও ইটালীতে ছিলেন, ইটালীর মুক্তির জন্য ডিউক অব অরলিন্সের (পরবর্তীকালে লুই ফিলিপ্পি, ফ্রান্সের রাজা) সঙ্গে পরিকল্পনা করেছেন; এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে জেনোয়া অধিকারের পর জেনোয়াবাসীদের পুরনো সংবিধান তাঁদের জন্য পুনরায় বলবৎ করেন এবং ইটালীয়দের উদ্দেশে সংগ্রাম করার ও মুক্ত জাতি হবার আহ্বান জানান। বিজয়ী মিত্রপক্ষ অবশ্য পুরনো ব্যবস্থাই বজায় রাখতে চেয়েছিলেন এবং ভিয়েনার কংগ্রেস ইটালিকে অষ্ট্রিয়ার ঘৃণিত শাসনের অধীনে যেতে বাধ্য করেছিল। এর তেরো বছর পরে, ফ্রান্স যখন ১৮৩০-এর বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে, ইংলণ্ডে যখন রিফর্ম অ্যাক্টের জন্য আন্দোলন চলছিল, তখন লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ভারতে এসে পৌছলেন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যে সমস্ত প্রশাসনিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কার কার্যকর করেন সেগুলি ছিল মুনরো ও এলফিনস্টোনের প্রদর্শিত ধারা অনুযায়ীই। বিচার বিভাগীয় কাজের একটা বড় অংশ দেওয়া হল উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ভারতীয় কর্মকর্তাদের এবং সদর-আমীন নামে ভারতীয় বিচারপতিদের একটা উচ্চতর বর্গ সৃষ্টি করা হল। তাঁদের হাতে কিছু কিছু কার্যনির্বাহী ও রাজস্বসংক্রান্ত কাজের দায়িত্বও দেওয়া হল এবং তাঁদের জন্য ডেপুটি-কলেকটর নামে একটি উচ্চতর বর্গও সৃষ্টি করা হল। সত্তর বছরেরও অধিক কাল ধরে ভারতের শিক্ষিত মানুষ কঠিনতম ও দায়িত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজে তাঁদের যোগ্যতা, সততা ও দক্ষতা প্রমাণ করেছেন।

উত্তর ভারতে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের যে জমি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত অনুযায়ী রাষ্ট্র ভূমি-কর বাবদ তিন চতুর্থাংশেরও বেশী অংশকে ভূমি-কর হিসেবে দাবী করত, সেটা চরম নিপীড়নমূলক হয়ে উঠেছিল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করে রাষ্ট্রের দাবীকে খাজনার দুই-তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ এবং আর. এম. বার্ড কর্তৃক প্রযুক্ত এক নতুন বন্দোবস্ত জনসাধারণের যথেষ্ট কষ্ট লাঘব করে, এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে জমি থেকে রাজস্ব বৃদ্ধি করে। আমরা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে এই নতুন বন্দোবস্ত সম্পর্কে আলোচনা করব।

শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর, রাজা রামমোহন রায় হিন্দু বিধবাদের তাদের মৃত স্বামীদের চিতায় দাহ হবার নিষ্ঠুর প্রথা উচ্ছেদ করার কাজে গভর্ণর জেনারেলকে সমর্থন দান করেন। এই প্রথা সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত ছিল। আর স্লীম্যানের নাম বিশিষ্ট হয়ে আছে ঠগী নামে পরিচিত

দুর্বৃত্তদের অথবা পথিমধ্যে যারা মানুষকে হত্যা করত সেই দুর্বৃত্তদের দমন করার কাজের সঙ্গে। এই দুর্বৃত্তরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উপদ্রব করত।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সনদ পুনর্ণবীকরণ হয় এবং কোম্পানির বাণিজ্য লোপ করা হয়। এর পর থেকে তাঁরা থাকেন ভারতের প্রশাসক রূপে, বণিক রূপে নয়; এবং লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের মধ্যে তাঁরা পান ভালো প্রশাসনের কাজে একজন উপযুক্ত সাহায্যকারীকে। গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের একজন আইন-বিষয়ক সদস্যের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং স্বনামধন্য মেকলে ভারতে যান প্রথম আইন-বিষয়ক সদস্যরূপে।

এর পূর্বে আর কোনো গভর্ণর জেনারেলরই এত উৎসাহী সহকর্মী ছিল না। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যে আভ্যন্তরিক শুল্ক এতদিন ভারতে বাণিজ্যকে ব্যাহত করছিল তার অবলুপ্তি ঘটাবার কাজে ট্রেভেলিয়ান প্রথম চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। মেকলে সাহায্য করেছিলেন সমস্ত আইন বিষয়ক কাজকর্মে এবং সেই বিখ্যাত ভারতীয় দণ্ড বিধির (পেনাল কোর্ড) প্রথম খসড়া তৈরী করেছিলেন, যে দণ্ডবিধি এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অপরাধ সংক্রান্ত আইন। আর লর্ড উইলিয়মের অবসর গ্রহণের পর মেটকাফ তাঁর নীতিকে অনুসরণ করে চলেছিলেন এবং তাঁর স্বল্পকালের প্রশাসনে ভারতে সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন।

সত্যকার সংস্কারকর্মের ফলে সর্বদাই কিছু কাট-ছাঁট হয়; ভারতের বাজেটের চিরকালের ঘাটতিকে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক পরিণত করেছিলেন উদ্বৃত্তকে। ১৮১৪ থেকে ১৮২৮ এই পনেরো বছরে মোট ঘাটতি ছিল প্রায় দুই কোটি স্টার্লিং, আর এই কালপর্বের শেষ ছ-বছরে ঘাটতির পরিমাণ ছিল বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ স্টার্লিং। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রশাসন একে পরিবর্তিত করে ২০ লক্ষ স্টার্লিংয়ের উদ্বৃত্তে রূপান্তরিত করেছিল।

ভারতীয় প্রশাসনে সত্যকার কোনো সংস্কারকই নিন্দা ও সমালোচনা থেকে রেহাই পাননি। ভারতীয় কর্মকর্তাদের সিভিল ক্ষমতার বিস্তৃতিতে ভারতের ইয়োরোপীয়রা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। যে অ্যাক্ট বা আইন অনুযায়ী কলিকাতাস্থিত সর্বোচ্চ আদালতের সামনে তাঁদের দেওয়ানী আপীল আনার বিশেষ সুবিধা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল তার নাম দেওয়া হয় 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' বা কালাকানুন, এবং এজন্য মেকলে ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের উদ্দেশে অজস্র গালিগালাজ বর্ষিত হয়।[১৫] এই জাতিগত কুসংস্কারে ঐতিহাসিক থর্নটন নিজেও বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন এবং বেণ্টিঙ্ক সম্পর্কে লিখেছিলেন যে তিনি "ওলন্দাজের

সতর্কতার সঙ্গে ইটালীয়র বিশ্বাসঘাতকতাকে যোগ করেছিলেন।" যে-সমস্ত ব্রিটিশ প্রশাসক প্রতিনিধিত্বহীন জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করার জন্য পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের ভাগ্যে এরকম প্রায়শই ঘটেছে। এর সাম্প্রতিকতর দৃষ্টান্ত হলেন ক্যানিং ও রিপন।

ইংরেজী শিক্ষার অগ্রগতি বোম্বাইয়ের তুলনায় কলিকাতায় বেশী ঘটেছিল। ডেভিড হেয়ার নামে কলকাতার জনৈক ঘড়ি-নির্মাতা একটি ইংরেজী স্কুল আরম্ভ করেন এবং বঙ্গদেশে তাঁর নাম আজও পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষার জনকরূপে স্মরিত হয়। পরবর্তীকালে, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস অব হেস্টিংস কলিকাতার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। অচিরেই প্রশ্ন ওঠে ভারতে শিক্ষা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হবে, না সংস্কৃত ও আরবী ও ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলির মাধ্যমে। প্রাচ্যবিষয়ক পণ্ডিতরা, যাঁরা প্রাচ্যের চিরায়ত গ্রন্থগুলির মধ্যে যা কিছু মহৎ ও উচ্চ তার প্রতি অকুণ্ঠ প্রশংসার মনোভাব পোষণ করতেন, তাঁরা বলেন যে জনসাধারণকে শিক্ষাদান করা উচিত তাঁদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমেই। কিন্তু মেকলে ও ট্রেভেলিয়ানের মতো অপেক্ষাকৃত বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা মনে করেছিলেন যে একটি আধুনিক ভাষার মাধ্যম ছাড়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় না। মেকলের অসাধারণ 'মিনিট'ই কার্যত এই বিতর্কের মীমাংসা করেছিল। এই 'মিনিট' এখন এক ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে তাঁর বোধ যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা সঠিক ছিল—অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষা দেওয়া যায় একমাত্র একটি আধুনিক ভাষার মাধ্যমেই।

"মনে করুন, যে মিশর একদা ইয়োরোপের জাতিগুলির চেয়ে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিল অথচ এখন তাদের চেয়ে অনেক নিচে নেমে গেছে, সেই মিশরের পাশাকে যদি মিশরের সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত ও উন্নত করার উদ্দেশ্যে এবং মিশরের শিক্ষিত দেশীয় অধিবাসীদের উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হত, তাহলে কেউ কি এমন কথা অনুমান করবেন যে তিনি চাইতেন তাঁর রাজত্বের যুব সমাজ বছরের পর বছর চিত্রলিপি অধ্যয়নের পেছনে ব্যয় করুক, ওসিরিসের উপকথার আড়ালে যে সব তত্ত্ব আছে তার সন্ধানে সময় ব্যয় করুক এবং কোন্ কোন্ লোকাচার দিয়ে বিড়াল ও পেঁয়াজকে প্রাচীনকালে পূজা করা হত যতদূর সম্ভব সঠিকভাবে তা স্থির করার জন্য বছরের বছর পর কাটাক? তিনি তাঁর তরুণ প্রজাদের স্তম্ভগুলির লেখমালার পাঠোদ্ধার করার কাজে লাগবার পরিবর্তে যদি তাদের নির্দেশ দিতেন ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় শিক্ষালাভ করতে

এবং এই ভাষাগুলি যে সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে প্রবেশের প্রধান চাবিকাঠি সেই বিজ্ঞানগুলিতে শিক্ষিত হতে, তাহলে কি তাঁকে অসংলগ্নতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায়?...

"আমাদের শিক্ষিত করতে হবে এমন এক জনসাধারণকে যাদের বর্তমানে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যাবে না। তাদের কিছু বিদেশী ভাষা আমাদের শেখাতেই হবে। আমাদের নিজেদের ভাষার দাবীগুলি নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। এমন কি পশ্চিমের ভাষাগুলির মধ্যেও তা বিশিষ্ট।... এটাই সব নয়। ভারতে, ইংরেজী হল শাসক শ্রেণীর ভাষা। সরকারের পদগুলিতে উচ্চ শ্রেণীর দেশীয় ব্যক্তিরা এই ভাষাতেই কথা বলেন। প্রাচ্যের সমগ্র সমুদ্রাঞ্চল জুড়ে এটাই ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। এ ভাষা হল উদীয়মান দুটি বিরাট ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা, একটি উদিত হচ্ছে আফ্রিকার দক্ষিণে, অপরটি অস্ট্রেলেশিয়ায়, এ দুটি জাতি গোষ্ঠী প্রতিদিনই আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং আমাদের ভারত সাম্রাজ্যের সঙ্গে আরো বেশী ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হচ্ছে। আমরা আমাদের সাহিত্যের মূল্যের দিকেই দৃষ্টিপাত করি অথবা এদেশের বিশেষ পরিস্থিতির দিকেই তাকাই, একথা মনে করার সবচেয়ে জোরালো যুক্তি আমরা খুঁজে পাবো যে সমস্ত বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরেজী ভাষাই হবে আমাদের দেশীয় প্রজাদের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী।"[১৬]

মেকলের 'মিনিটে'র অপ্রতিরোধ্য যুক্তি ও তুলনাহীন শক্তিতে প্রাচ্যপন্থীরা পর্যুদস্ত হন। স্থির হয় যে ভারতের জনসাধারণকে শিক্ষাদান করা হবে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। উনিশ বছর পরে, এই সিদ্ধান্তের অনুপূরকরূপে আসে বিখ্যাত ১৮৫৪-র 'এডুকেশন ডেসপ্যাচ'। তাতে এই ব্যবস্থা রাখা হয় যে ভারতীয় বিদ্যালয়গুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে ভারতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমে এবং তা পৌঁছে দেবে ইংরেজীতে উচ্চতর শিক্ষার স্তরে। আজ পর্যন্ত এই হল ভারতের শিক্ষা নীতি।

২০ মার্চ, ১৮৩৫ তারিখে, সাত বছর ব্যাপী উদার ও সার্থক শাসনকার্যের পর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভারত ত্যাগ করেন। কলিকাতায় বেন্টিঙ্কের প্রতিমূর্তির পাদদেশে উৎকীর্ণ মেকলের বর্ণাঢ্য ভাষায় বলা যায়, তিনি "কখনই একথা বিস্মৃত হননি যে শাসনকার্যের চরম উদ্দেশ্য হল শাসিতের সুখ।"

ভারত থেকে অবসর গ্রহণের পর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে 'লিবারেলদের' হয়ে গ্লাসকো শহর থেকে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন; কিন্তু তাঁর সময়ের বেশ বড় অংশ তিনি কাটিয়েছিলেন ফ্রান্সে, তাঁর বন্ধু লুই ফিলিপ্পি

ছিলেন সেখানকার রাজা। জুন ১৮৩৯-এ বেন্টিঙ্ক প্যারিসে পরলোকগমন করেন। ভারতে স্থবিধাভোগী শ্রেণীগুলির ব্যক্তিরা যে নিন্দা ও সমালোচনায় তাঁকে বিদ্ধ করেছিলেন, তারও অবসান ঘটল; এবং তাঁর মৃত্যুর চার বছর পরে, ভারতে তাঁর সতীর্থ স্যর চার্লস ট্রেভেলিয়ান লর্ডস কমিটির সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্যে বেন্টিঙ্কের শাসন সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা ভারতের জনগণের সর্বজনীন সম্মতি লাভ করেছে।

"লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সম্বন্ধে আমাকে অবশ্যই এই কথা বলতে হবে যে—ভারতে আমাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার গৌরব অন্যদের প্রাপ্য হলেও, ভারতে আমাদের রাজত্বকে তার যথাযথ বনিয়াদের উপর স্থাপন করার জন্য বিরাট প্রশংসা লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের প্রাপ্য; তিনি তা স্থাপন করেছিলেন এই মহৎ নীতির স্বীকৃতিতে যে ভারতকে শাসন করতে হবে ভারতীয়দের উপকারের জন্য এবং তা থেকে আমরা যে সব স্থবিধা পাই সেগুলি হবে শুধুই নৈমিত্তিক এবং সেই কাজ করার স্থত্রে প্রাপ্ত।"[১]

এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে মুনরো, এলফিনস্টোন ও বেন্টিঙ্ক ট্রেভেলিয়ান, মেটকাফ ও মেকলের মতো ব্যক্তিরা তাঁদের ভারত শাসনের কাজে এই উচ্চ আদর্শকে সামনে রেখেছিলেন; এবং এক জাতির পক্ষে অপর জাতির স্বার্থে কাজ করা যদি সম্ভব হত, তা হলে আজ ভারত শাসিত হত "ভারতীয়দের কল্যাণার্থে"। কিন্তু এক জাতির জন্য আরেক জাতির কাজ করা মানব চরিত্রে নেই; এবং একথা উপেক্ষা করা অসম্ভব যে বাণিজ্যিক, শিল্প-সংক্রান্ত, অর্থ নৈতিক ও আর্থিক সমস্ত ভারতীয় স্বার্থ ই এখনও পর্যন্ত ইংলণ্ডের স্বার্থসাপেক্ষ। মানবজাতি এখনও পর্যন্ত একটা পদানত জাতিকে সেই জাতির কল্যাণের জন্য শাসন করার কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেনি, শুধু তাদের নিজেদের ব্যাপারসংক্রান্ত প্রশাসনে তাদের কিছুটা অধিকার দেওয়া ছাড়া, কিছুটা পরিমাণে প্রতিনিধিত্ব ও স্বায়ত্তশাসনের স্থযোগ দেওয়া ছাড়া। এবং যতদিন পর্যন্ত এই নীতি ভারতে গৃহীত না হয়, ততদিন পর্যন্ত "ভারত শাসিত হবে ভারতীয়দের কল্যাণের জন্য"—এই কথাগুলি হয়ে থাকবে শূন্যগর্ভ গালভরা কথামাত্র, কিংবা হয়তো নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ।

১। Colonel Munro to the Madras Government, letter dated 24th December 1814, para 6.

২। Vol. ii. (1820), pp. 291-769.

৩। Judicial Letter to Madras. dated 12th May 1819.

৪। Minute, dated 1st January 1816.

৫। Judicial Letter from the Court of Directors to the Government of Madras, dated 20th December 1815, paras. 12 and 13.

৬। Minute of 13th September 1816. রবার্ট ফুলার্টন সম্ভবত সচেতন ছিলেন যে বোর্ড ও ডিরেক্টর্দের মুখ্য সংশ্রব ছিল রাজস্ব বিষয়ে এবং তাদের নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব বিভাগের হাতে যতদূর সম্ভব ক্ষমতা প্রদান করা।

৭। Sir James Stephen. Proceedings of the National Association for the Promotion of Social Science for 1872-78.

৮। *Life of the Hon. Mountstuart Elphinstone,* by Sir J. E. Colebrook (1884), vol. ii, p 115. ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮২০ তারিখের চিঠি।

৯। ঐ, পৃ ১৪২। ২৭শে অক্টোবর ১৮২২ তারিখের চিঠি।

১০। ঐ, পৃ ১৪৬। ৩০শে অক্টোবর ১৮২৩ তারিখের চিঠি। ডিরেকটরগণ এবং তাঁদের সিভিল পৃষ্ঠপোষকতা আর নেই, কিন্তু ইংরেজ ছেলেদের জন্য ভারতে জীবিকা দেখে দেবার ইচ্ছা এখনও উচ্চতর পদগুলিকে প্রকৃতপক্ষে দেশের ছেলেদের কাছে অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

১১। Cameron's Address to Parliament on the Duties of Great Britain to India (1853), Quoted in J. S. Cotton's *Mountstuart Elephinstone and the Making of South-Western India* (1896), p 190.

১২। J. S. Cotton's *Mountstuart Elephinstone and the Making of South-Western India,* 1896, p. 193.

১৩। Forrest's *Selection from the Minutes and other Official Writtings of the Hon. Mountstuart Elphinstone* (1884), p. 108.

১৪। পূর্বোল্লেখিত J. S. Cotton-এর গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১৫। মেকলে এই ইয়োরোপীয়দের আন্দোলনকে এই ভাষায় উল্লেখ করেছেন: এই জনমতের অর্থ হলো এমন পাঁচশত মানুষের মত যাদের, যে পাঁচকোটি মানুষের মধ্যে তাদের বাস, তাদের আগ্রহ, অনুভূতি বা রুচির সঙ্গে কোন মিল নেই। 'স্বাধীনতার প্রীতি' বলতে বোঝায় এই পাঁচশত জনের পাঁচকোটি মানুষের ওপর তাদের যথেচ্ছাচার-প্রতিবন্ধকতাকারী সকল ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদের বাসনা।"—Trevelyan রচিত *Life and Letters of Lord Macaulay.*

১৬। Macaulay's Minute, dated 2nd February 1835.

১৭। Trevelyan's Evidence. Second Report from the Select Committee of the House of Lords 1853. p. 159.

বিংশ অধ্যায়

বোম্বাইতে এলফিনস্টোন (১৮১৭-১৮২৭)

সর্বশেষ মারাঠা পেশোয়া বাজী রাওয়ের রাজত্ব ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ আধিপত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং পরের বছর দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর তাঁকে বন্দী করা হয়। তিনি পেনশন নিয়ে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর বিস্তৃত রাজত্বই বর্তমান বোম্বাই প্রদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বন্দোবস্তের দায়িত্ব পড়েছিল কোম্পানির যোগ্যতম ও শ্রেষ্ঠ কর্মচারীদের একজনের উপরে। একাদশতম লর্ড এলফিনস্টোনের পুত্র মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন ভারতে এসেছিলেন ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে, একথা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই বলা হয়েছে। নানান ধরনের অভিজ্ঞতার পর, ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তাঁকে পুণায় কার্যভার দেওয়া হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বাজী রাওয়ের কাছ থেকে লব্ধ অঞ্চলের কমিশনার নিযুক্ত হন।

এর চেয়ে ভালো নির্বাচন আর কিছু হতে পারত না। টমাস মুনরো থেকে প্রায় ২০ বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ এলফিনস্টোনের ছিল রাজস্বসংক্রান্ত কাজের সমান ক্ষমতা, জনসাধারণের প্রতি সমান দরদ, সমান সাহিত্যরুচি, ভারত সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি বাড়াবার জন্য সমান উদার ও রাষ্ট্রনীতিবিদসুলভ বাসনা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে বেশ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ প্রশাসকের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁরা যেমন তাঁদের সংগঠনী ক্ষমতা ও কাজের ক্ষমতার জন্য, তেমনই জনসাধারণের প্রতি দরদের জন্য বিশিষ্ট। কিন্তু একথা স্বীকার করলে সম্ভবত এই সময়ে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্যান্য গুণী কর্মচারীদের প্রতি অবিচার করা হবে না যে মাদ্রাজের মুনরো এবং বোম্বাইয়ের এলফিনস্টোন বাকি সকলের চেয়ে অনেকখানি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। সমস্ত চিন্তাশীল পর্যবেক্ষকের মনে বাধ্য হয়েই এই বিষণ্ণ চিন্তার উদয় হয় যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই শ্রেণীর সহানুভূতিশীল প্রশাসক অপেক্ষাকৃত দুর্লভ হয়ে গিয়েছেন; এবং জনসাধারণের অগ্রগতি ও স্বায়ত্তশাসন লাভে সহায়তা করার পরিবর্তে তাদের রাজনৈতিক অগ্রগতিকে দমন করার বাসনাই প্রায়শ পরবর্তীকালের প্রশাসনকে প্রভাবিত করেছে।

অক্টোবর ১৮১৯-এ গভর্ণর জেনারেলের কাছে পেশ করা এলফিনস্টোনের

"পেশোয়ার কাছ থেকে অধিকৃত অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে প্রতিবেদন"-টি দেশের এবং সেখানকার বন্দোবস্তের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলীর এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণ। এই প্রতিবেদনটি আয়তনে বিরাট—"ঈস্ট ইণ্ডিয়া পেপার্স"-এর চতুর্থ খণ্ডের প্রায় সত্তরটি ফোলিও পৃষ্ঠায় তা বিধৃত এবং এখানে আমরা শুধু তার কয়েকটি সংক্ষেপিত উদ্ধৃতি দেবো।

গ্রাম-সমাজসমূহ

"যে দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা দাক্ষিণাত্যের দেশীয় সরকারকে বিচার করি, সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি হল গ্রামে অথবা উপনগরীতে বিভাজন। এই গ্রাম সমাজগুলির মধ্যে সংক্ষিপ্তাকারে একটি রাষ্ট্রের সমস্ত উপাদানই আছে এবং যদি অন্য সমস্ত সরকারী শাসন প্রত্যাহার করেও নেওয়া হয়, তা হলে তারা নিজেদের সদস্যদের রক্ষা করার মতো প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। সম্ভবত অত্যন্ত ভালো ধরনের সরকারের সঙ্গে সেগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তা সত্ত্বেও সেগুলি যে কোনো নিকৃষ্ট সরকারের ত্রুটিগুলির ক্ষেত্রে চমৎকার প্রতিকার বিশেষ। তারা এ ধরনের সরকারের অবহেলা ও দুর্বলতার কুফলগুলি রোধ করে। এমনকি সেই সরকারের অত্যাচার ও লোলুপতার বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করে।

"প্রতি গ্রামের সংলগ্ন একখণ্ড জমি আছে, যা অধিবাসীদের ব্যবস্থাপনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। সীমানাগুলি সযত্নে চিহ্নিত এবং সুরক্ষিত। এগুলি অনেকগুলি ক্ষেতে বিভক্ত, সেগুলির সীমানাও যথাযথরূপে জ্ঞাত; প্রতিটি ক্ষেতের একটি করে নাম আছে এবং তা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত রাখা হয়, এমনকি যখন চাষবাসের কাজ বহুদিন ধরে পরিত্যক্তও থাকে তখনও। গ্রামবাসীরা প্রায় সকলেই ঐ জমির চাষী। এই সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয় সামান্য কিছু ব্যবসায়ী ও কারিগর—চাষীদের চাহিদা অনুযায়ী মাল সরবরাহ করার জন্য যাদের দরকার হয়। প্রতিটি গ্রামের প্রধান হলেন পাতিল, তাঁর অধীনে থাকে চৌগুল্লা নামে একজন সহকারী, আর কুলকার্নি নামে একজন কেরানী। এ ছাড়া আছেন বারোজন গ্রাম্য পদস্থ কর্মচারী, তাঁরা 'বারা বলোতি' নামে খ্যাত। এঁরা হলেন জ্যোতিষী, পুরোহিত, সূত্রধর, ক্ষৌরকার, প্রভৃতি; কিন্তু সরকারী প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকে একমাত্র সোনার বা পোদ্দার, যিনি রূপার কাজ করেন ও অর্থ পরীক্ষা করেন, এবং মহার, যিনি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছাড়াও গ্রামের অপরাধ ইত্যাদির দিকে নজর রাখেন। যেমন যেমন তাঁদের মূল পরিবার ভাগ হয়ে গেছে, তেমনি এইসব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা সংখ্যায় সাধারণত এক বা একাধিক হন।

ম্‌হাররা সংখ্যায় চার-পাঁচ জনের কম বড় একটা হয় না এবং যেখানে এইসব জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশী সেখানে এছাড়াও প্রায়শই থাকে কয়েকজন ভীল বা রামোশিস। তারাও নিযুক্ত হয় চৌকিদার হিসেবে কিন্তু তারা ম্‌হারের অন্যান্য কাজের একটিও করে না।

"পাতিলরা হলেন গ্রামগুলিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা, এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী। তাঁরা স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন সরকারের (প্রধানত মোঘলদের) এক বিশেষ অনুমতিবলে, সেই অনুমতি অনুযায়ী তাঁরা জমি ও বেতন লাভের অধিকারী এবং তাঁদের অনেকগুলি ছোটখাটো সুযোগ সুবিধা ও সম্মান আছে যে সম্পর্কে তাঁরা তাঁদের জমির মতোই যত্নশীল। তাঁদের পদ ও বেতন পুরুষানুক্রমিক এবং সরকারের সম্মতিক্রমে বিক্রয়যোগ্য কিন্তু চরম প্রয়োজনের ঘটনা ছাড়া তা খুব কমই বিক্রয় করা হয়, যদিও কখন কখনও পুরনো পদাধিকারীর শ্রেষ্ঠত্ব সযত্নে সংরক্ষিত করে একজন অংশীদার নেওয়া হয়। পাতিল হলেন তাঁর গ্রামের পুলিশের ও বিচারকর্মের প্রধান, কিন্তু এখানে তাঁকে শুধু রাজস্ব বিষয়ক একজন অফিসার বলে উল্লেখ করলেই চলে। সেই পদে তিনি ছোট আকারে সেই কাজটিই করেন, যে কাজটি বড় আকারে করেন একজন মামলাতদার বা কলেকটর; যে সমস্ত চাষীর নিজেদের ভূসম্পত্তি নেই তাদের জন্য তিনি জমি বরাদ্দ করেন এবং প্রত্যেককে কত খাজনা দিতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেন; রায়তদের কাছ থেকে তিনি সরকারের পক্ষ থেকে রাজস্ব আদায় করেন; এ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা তাদের সঙ্গে করেন এবং গ্রামের চাষের কাজ ও সমৃদ্ধি বাড়াতে উদ্যোগী হন। মূলত সরকারের এজেণ্ট হলেও এখন তিনি সমানভাবেই রায়তদেরও প্রতিনিধিরূপে গণ্য হন এবং জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে, কিংবা অন্তত তাদের দোষত্রুটি অভাব অভিযোগ গোচরীভূত করার কাজে যতখানি উপযোগী, সরকারের নির্দেশ কার্যকর করায়ও তার চেয়ে কম উপযোগী তিনি নন।

মিরাসদার বা কৃষক মালিক

"রায়তদের একটা বড় অংশ তাঁদের জমির মালিক, অবশ্য সরকারকে ভূমিকর প্রদান সাপেক্ষ, তাদের সম্পত্তি পুরুষানুক্রমিক ও বিক্রয়যোগ্য এবং তাঁরা যতদিন তাঁদের দেয় কর দেন ততদিন তাঁরা কখনই দখলচ্যুত হন না, এবং হলেও সরকারের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করে জমি পুনরুদ্ধার করার অধিকার তাঁদের দীর্ঘকাল (অন্তত ত্রিশ বছর) থাকে। তাঁদের ভূমিকর স্থায়ী ভাবে নির্দিষ্ট; কিন্তু

প্রাক্তন মারাঠা সরকার সেই করের উপর অন্যান্য বোঝা চাপিয়েছিলেন, যার ফলে সুবিধাটা ছিল নামেমাত্র; কিন্তু তবুও তা তাঁদের ভূসম্পত্তির মূল্য আদৌ নষ্ট করতে পারেনি, ফলে সরকার তাদের জমির প্রতি আসক্তির সুযোগ নিয়ে কোনো 'উপ্‌রি'-র চেয়েও অনেক বেশী অর্থ প্রদানে তাঁদের বাধ্য করলেও, এবং সাধারণক্ষেত্রে সমস্ত মিরাসদারই তাঁদের প্রত্যেকের কর প্রদানের অপারগতা পুষিয়ে দিতে বাধ্য হলেও, তাঁদের জমিগুলি বিক্রয়যোগ্য ছিল, এবং তা বিক্রয়যোগ্য ছিল সাধারণত দশ বছরের মেয়াদের ক্রয়ের শর্তে…

"সমস্ত মারাঠা দেশ জুড়ে এমন একটা অভিমত প্রচলিত আছে যে পুরনো হিন্দু সরকারের অধীনে সমস্ত জমির মালিক ছিলেন মিরাসিরা এবং মালিকেরা মুসলমানদের অত্যাচারে দরিদ্র হয়ে পড়ায় উপরি-ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই অভিমতের সমর্থনে এই ঘটনা দেখা যায় যে উপ্‌রিরা এখন যেসব জমি চাষ করে, গ্রামের নথীপত্রে তার বৃহত্তর অংশই নথীবদ্ধ হয়ে আছে অনুপস্থিত মালিকের জমি হিসেবে; উপদ্বীপের অন্যান্য অঞ্চলে পরিলক্ষিত অবস্থার সঙ্গে এবং মনু-কথিত লঘু ভূমিকরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এমন অনুমান জোরের সঙ্গেই করা যায় যে হিন্দুদের অধীনে রাজস্ব ব্যবস্থা (যদি তাদের সব জায়গায় একই ধরনের সমান কোনো ব্যবস্থা থেকে থাকে) প্রতিষ্ঠিত ছিল জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার উপরে।"

ব্রিটিশ শাসনে পরিবর্তনসমূহ

"এদেশ দখলের পর থেকে গৃহীত রাজস্ব ব্যবস্থার রূপরেখা কলেকটরদের কাছে নির্দেশ-সংবলিত আমার ১০ জুলাই তারিখের পত্রে এবং মামলাতদারদের জন্য নির্দেশ-সংবলিত আমার ১৪ই জুলাই তারিখের পত্রে বর্ণিত হয়েছে। প্রধান নীতিগুলি হল খামারের বিলোপ, কিন্তু অন্যথায় দেশীয় ব্যবস্থা বজায় রাখা; প্রকৃত চাষ অনুযায়ী রাজস্ব ধার্য করা, কর-নির্ধারণ লঘু করা, নতুন কোনো কর না-বসানো এবং স্পষ্টতই অন্যায় না হলে কোনো কর তুলে না দেওয়া; এবং সর্বোপরি নতুন কিছু উদ্ভাবন না করা। বহু নতুন উদ্ভাবনই অবশ্য ছিল বিদেশী শাসকদের এবং বিদেশী শাসননীতি প্রবর্তনের ফল; কিন্তু রাজস্ব বিভাগে সেগুলির অধিকাংশই সুফলপ্রদ হয়েছে। এই দেশ অতীতে বহু মামলাতদারের অধীনে থেকেছে, তাদের এলাকা ও ক্ষমতার পরিধি ছিল অসীম। এদেশকে রাখা হয়েছে পাঁচজন প্রধান অফিসারের অধীনে (তার মধ্যে আমি সাতারাকে অন্তর্ভুক্ত করছি), তাদের ভার ও দায়িত্ব ছিল অনেক বেশী। প্রধান কর্তৃপক্ষ ইদানীং

থাকতেন জেলায় এবং তাঁর সমস্ত সময় তিনি তাঁর কাজেই ব্যয় করতেন এবং অধীনস্থ সকলেই তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বাধ্য ছিলেন। মারাঠাদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রাজস্ব-বিভাগকে এক একটি দৃঢ় সংবদ্ধ জেলায় গঠিত করা হয়েছিল, প্রত্যেকটি জেলা থেকে আসত বছরে ৫০ টাকা থেকে ৭০,০০০ টাকা এবং প্রতিটি জেলাকে রাখা হয়েছিল একজন মামলাতদারের অধীনে।"

বিদেশী সরকারের কুফল

"যে সব দোষত্রুটি থেকে এতাবৎ এদেশ মুক্ত ছিল তার অনেকগুলিই এখন এক বিদেশী সরকারের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে প্রবর্তিত হয়েছে; কিন্তু খুব সম্ভব এর অধিকাংশকেই উপযুক্ত সতর্কতা নিয়ে এড়ানো যায়। নতুন ব্যবস্থায় উচ্চশ্রেণীর অনেককেই অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হতে হবে এবং যাঁরা আদালতে বা সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন তাদের অনেককেই একেবারে রুজিরোজগার হারাতে হবে। বাজী রাওয়ের শাসনের প্রারম্ভে এই দু-ধরনের দুর্ভাগ্যই কিছুটা পরিমাণে দেখা দিয়েছিল; কিন্তু সরকারের কাঠামোটি সামগ্রিক ছিল বলে এই সব আংশিক ক্ষতির কুফল অতিক্রম করা গিয়েছিল। আমরা সমান ভাবে সরকারের কাঠামো বজায় রাখতে পারব কি না, সে প্রশ্ন এখনও পরীক্ষা করে দেখা বাকি। গ্রামগুলির ক্ষেত্রে যতদূর প্রযোজ্য, বর্তমান পুলিশ ব্যবস্থা সহজেই বজায় রাখা যায়; কিন্তু গ্রামের সমস্ত সংগঠন বজায় রাখা এবং সমস্তটাকে একজন মামলাতদারের অধীনে রাখাটা যথেষ্ট হবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। গ্রামে পাতিলের সম্মান ও প্রভাব অবশ্যই রাখতে হবে গ্রাম-সংক্রান্ত কাজে খরচ এবং তার গ্রামে ছোটখাট বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনার কাজে তাকে কিছুটা ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে। এধরনের বিষয়ে সমস্ত অভিযোগ শোনা ইয়োরোপীয় অফিসারদের পক্ষে সম্ভব এমন কামনা না করে আমি মনে করি, তাঁদের যে সে সম্পর্কে তদন্ত করার সময় নেই সেটা সৌভাগ্যের বিষয়, এবং আমি মনে করি মামলাতদারদেরও একাজটা পাতিলদের উপরেই ছেড়ে দেওয়া উচিত; এবং এইভাবে এমন একটা শক্তি সংরক্ষিত রাখা দরকার যার উপর, সরকারের সকল শাখাতেই, আমাদের অনেকখানি নির্ভর করতে হবে। পাতিলদের সোৎসাহ সহযোগিতা রাজস্বের কলেকটরের পক্ষে ও দেওয়ানী বিচারের পক্ষে যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি অত্যাবশ্যক পুলিশের পক্ষে; এবং তাই সর্বতোভাবে একে সুনিশ্চিত করা উচিত। তাদের থেকে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাছে তাদের আচরণের ত্রুটি সংশোধনের জন্য অতিরিক্ত ঘনঘন এনে তাদের কর্তব্যকে বিরক্তিকর করে তোলা

এবং তাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা কোনমতেই উচিত নয়। অত্যাচারের জন্য তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগে আমি অবশ্যই কর্ণপাত করব, কিন্তু খুঁটিনাটির দিকে নজর দেয়নি বলে তাদের আমি বিব্রত করতে চাইনা; এবং আমি তাদের নিজস্ব ধরনে ছোট খাটো অভাব-অভিযোগের মীমাংসা করার স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষে—অবশ্য কোনো পক্ষই যাতে গুরুতর শাস্তি না ভোগ করে সেই শর্তে।"

"বই দুষ্প্রাপ্য এবং সাধারণ বইগুলো সম্ভবত সুনির্বাচিতও নয়, কিন্তু হিন্দু ভাষাগুলিতে প্রচুর কাহিনী ও উপকথা আছে যেগুলি সাধারণ ভাবে পঠিত হওয়া উচিত এবং তা সুস্থ নীতিবোধ প্রচার করবে। ধর্মপুস্তকও রাখতে হবে যার প্রবণতা হবে আরো প্রত্যক্ষ ভাবে সেই দিকেই। এরকম বহু বই যদি ছাপা হয় এবং সস্তায় অথবা দান হিসাবে বিতরণ করা হয়, তা হলে তার ফল হবে নিঃসন্দেহে বিরাট ও কল্যাণকর। অবশ্য অপরিহার্য ভাবেই সেই বইগুলিকে হতে হবে খাঁটি হিন্দু। প্রশ্ন বা আপত্তি তোলা যায় এমন নৈতিকতার সমস্ত শিক্ষাই আমরা নিঃশব্দে বাদ দিতে পারি, কিন্তু সামান্যতম পরিমাণে ধর্মীয় মত-বিরোধ ঢুকে পড়লে উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হবে।

"হিন্দুদের সংস্কারসাধনের জন্য তাদের ধর্মীয় সংস্কারগুলিকে আমাদের সাহায্যে লাগানো এবং ধর্মের বন্ধন দিয়ে, যে-ধর্মের বন্ধন আইনের বন্ধনের চেয়ে শক্তিশালী তাই দিয়ে তাদের দোষগুলি নিয়ন্ত্রণ করাই শ্রেয়। তাদের বর্তমান ধর্মীয় শিক্ষা-গুলিকে রক্ষা ও বিশুদ্ধ করে সেই সঙ্গে আমাদের সাহায্যে তাদের বোধশক্তি আরো উন্নত করে আমরা তাদের নিয়ে আসব ত্রুটিহীনতার সেই মানের কাছাকাছি, যেখানে গিয়ে পৌঁছনো সকলেরই কাঙ্ক্ষিত; আর তাদের ধর্মবিশ্বাসের উপর কোনো আঘাত, যদি তা সফল হয়, তত্ত্বে তা মেনে নিলেও, কার্যক্ষেত্রে দেখা যাবে ধর্মের প্রতি তাদের ভক্তিকে নড়িয়ে দিয়েছে এবং একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদও যে প্রয়োজনীয় সংযম মানুষের হৃদয়াবেগের উপর চাপিয়ে দেয় তা থেকেও তাদের সরিয়ে নিয়েছে!"

গ্রাম পঞ্চায়েৎ

"এই সমস্ত ত্রুটি নিয়েও মারাঠা দেশ সমৃদ্ধ হয়েছিল এবং মনে হয় আমাদের অপেক্ষাকৃত ত্রুটিহীন সরকারের অধীনে যে দোষগুলি রয়ে গেছে তা থেকে সেখানকার মানুষ মুক্ত ছিল। তাই এই ব্যবস্থায় এমন কিছু সুবিধা নিশ্চয়ই ছিল

যা তার সুস্পষ্ট ত্রুটিগুলির ভারসাম্য রক্ষা করত, এবং আমার মনে হয় তার অধিকাংশই উদ্ভূত হয়েছিল একটি ঘটনা থেকে ; তা এই যে সরকার জনসাধারণের জন্য ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করতে চাইলেও সে বিচারের ব্যবস্থা যাতে তারা নিজেরাই করে নিতে পারে তাদের হাতে সেই উপায়গুলি ছেড়ে দিয়েছিল। এর সুবিধা বিশেষভাবে অনুভূত হত নিম্নবর্গের লোকেদের মধ্যে, যারা তাদের শাসকদের আওতা থেকে সবচেয়ে বেশী দূরে, সকল সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত হবার সম্ভাবনাই যাদের বেশী। পঞ্চায়েতের সাহায্যে তারা নিজেদের মধ্যে একটা সহনীয় ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিল ; এটা ঘটনা যে উক্ত ব্যবস্থাটি সম্পর্কে উপরোক্ত অধিকাংশ আপত্তিই তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়···

"সুতরাং আমি প্রস্তাব করি যে দেশীয় ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত বজায় রাখতে হবে, তার দোষত্রুটি দূর করার জন্য এবং তার প্রাণশক্তি আবার ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোনো সামগ্রিক পরিবর্তনের চেয়ে দেশীয় লোকেদের কাছে এরূপ এক কর্মপন্থাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় হবে, আর তা যদি পুরোপুরি ব্যর্থই হয় তাহলে তখন আদালত ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে সেটা খুব বিলম্বের ব্যাপার হবে না······

"আমাদের প্রধান হাতিয়ার অবশ্যই থাকবে পঞ্চায়েৎ, এবং সেটা এখনও আমাদের পক্ষের সমস্ত নতুন ধরন থেকে, হস্তক্ষেপ থেকে এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবে।"[১]

পূর্ববর্তী উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাবে যে এলফিনস্টোনের মহৎ উদ্দেশ্য ছিল মারাঠাদের পুরনো আচরণবিধিগুলির মধ্যে যা ভাল তাকে সংরক্ষণ করা। এলফিনস্টোনের উত্তরাধিকারীরা যদি নতুন নতুন উদ্ভাবন প্রবর্তনে তাঁর মতো সতর্ক হতেন তবে দেশের পক্ষে ভালো হত। কিন্তু পরবর্তী শাসককুলের শাসনে গ্রাম-সম্প্রদায়গুলি অন্তর্হিত হয়েছে, এবং নির্দিষ্ট হারের করে কৃষক মালিকদের নিজেদের জমি দখলে রাখার অধিকার ক্রমবর্ধমান রাজস্বের দাবীর তলায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

এলফিনস্টোনের বিরাট যোগ্যতাই তাঁকে সরকারের উপযুক্ততম প্রধানরূপে চিহ্নিত করেছিল এবং টমাস মুনরো মাদ্রাজের গভর্ণর নিযুক্ত হবার এক বছর আগে, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এলফিনস্টোন বোম্বাইয়ের গভর্ণর নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনের আট বছরে বোম্বাইতে উপযুক্ত জমির বন্দোবস্ত করার জন্য তাঁর প্রয়াস এখন সংক্ষেপে বর্ণনা করা দরকার।

ব্রোচ

১৮২১ খৃষ্টাব্দে ব্রোচে ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত বন্দোবস্ত সম্পর্কে গভর্ণর একটি মিনিট নথীবদ্ধ করেন এবং ব্রিটিশ শাসনে ভূমিকরের যে বৃদ্ধি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল তিনি তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেননি।

"কর নির্ধারণ করা হয় পুরোপুরি গ্রাম ধরে, ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে কোনো খোঁজ খবর না করেই। উত্তরাধিকার সূত্রে নিযুক্ত রাজস্ব অফিসারদের একজনকে পাঠানো হয় প্রতি মরশুমের ফসল পর্যবেক্ষণ করতে। প্রত্যেক রায়ত কতটা জমি চাষ করেছে এবং কী কী ধরনের ফসল ফলিয়েছে তিনি তার একটা বিবরণ দেন। এগুলি যোগ করলে গ্রামে প্রত্যেক ধরনের শস্যের পুরো পরিমাণ পাওয়া যায়।··· সাধারণ নীতি হল, ফসল বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যায় তার অর্ধেক নিয়ে বাকিটা রায়তের হাতে ছেড়ে দেওয়া···

"কর-নির্ধারণ লঘু বা গুরুভার তা অনুমান করা সবসময়েই দুষ্কর। এখানে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তদনুযায়ী তা একেবারেই অবাস্তব। এ বছরে সাড়ে চার লাখ (৪৫,০০০) পাউণ্ড বৃদ্ধি ঘটেছে ; এ পরিস্থিতিটা আমি আনন্দের সঙ্গে মেনে নিতে পারছি না।"

আহমেদাবাদ

একই তারিখে এলফিনস্টোন আহমেদাবাদ ও কৈরায় ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পর্কে আরেকটি 'মিনিট' নথীবদ্ধ করেন, এবং তাঁর মন্তব্যগুলিতে সেই একই সাবধানতা ও ইতস্তত করার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

"আহমেদাবাদ জিলায়, যেসব গ্রাম সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ প্রদানে সম্মত ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা, তার ফলস্বরূপ রাজস্বের সমস্ত উৎস সন্ধান এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইজারাদারের প্রস্তাবক্রমে পঞ্চায়েত-কর্তৃক 'বিগোতি' বাড়িয়ে দেওয়া—এ সবেরই রাজস্বকে সর্বোচ্চ চূড়ায় নিয়ে যাবার প্রবণতা রয়েছে।"[২]

সুরাট

মে ১৮২১-এ এলফিনস্টোন সুরাট সম্পর্কে একটি 'মিনিট' নথীবদ্ধ করেন, তাতে তিনি পুনরায় জমির কর নির্ধারণ গুরুভার হওয়ার নিন্দা করেন।

"এই কলেকটর-এলাকায় জনসাধারণের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমাকে যদি সিদ্ধান্ত নিতে হত, তবে আমি বলতাম জনগণ অত্যন্ত দীনহীন, এবং জেলার কিছু

কিছু অংশ অত্যন্ত উৎপাদনশীল হলেও, আমি মনে করি অন্যান্য অঞ্চলে চাষের কাজ অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ।…এই দুরবস্থার জন্য বর্তমান ব্যবস্থাকে কোনমতেই দায়ী করা যায় না। বরং আমার বিশ্বাস এখন যেসব ব্যবস্থা চলছে, আমাদের পূর্ব-সূরীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ব্যবস্থা থেকে তা আমাদের ভারমুক্ত করতে অনেকখানি সাহায্য করবে। বড বাধা হবে কর-নির্ধারণের প্রচণ্ড গুরুভার এবং সম্ভবত তার অসমতা।"[৩]

কোঙ্কন

উত্তর কোঙ্কনের অবস্থা অমীমাংসিত ছিল। কলেকটর সুপারিশ করেছিলেন যে "সরকারের দাবী মোট উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশে নির্দিষ্ট করা হোক, এবং নিকৃষ্ট ধরনের জমিতে তা নির্দিষ্ট করা হোক কম আনুপাতিক হারে, এই জমি ভাগ করা উচিত তিন কিংবা বড়জোর চার শ্রেণীর জমিতে, ফসলে বা অন্যভাবে যেন কোন খাজনা না দেওয়া হয়, এই ব্যবস্থাটি সরকারের পক্ষে ব্যয়সাপেক্ষ এবং খারাপ দেশীয় অফিসারদের তা ফাটকাবাজীর সুযোগ করে দেয়; করপ্রদানের পরিবর্তিত নিয়ম টাকায় কর প্রদান ছ-বছরের জন্য নির্দিষ্ট করা হোক; নির্ধারণের হার চিরকালের জন্য স্থির না করে বারো বছরের জন্য বন্দোবস্ত করা হোক।"[৪]

এই বছরেই দক্ষিণ কোঙ্কন সম্পর্কে পৃথক একটি পত্র নথীবদ্ধ করা হয়। এই পত্র 'খোটে' সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে চাষীদের অধিকার সম্পর্কে আমাদের কিছু তথ্য পরিবেশন করে।

"গ্রামগুলিকে হয় কুলারগি, না হয় খোটেগি নামে অভিহিত করা হয়। প্রথমোক্ত গ্রামগুলিতে প্রতিটি চাষীর সরকারী নথীপত্র অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট খাজনা নির্ধারিত হয়, এই খাজনার অতিরিক্ত তার কাছ থেকে আর কিছু যথা-যথভাবে আদায় করা যায় না, আর খোটেগি গ্রামগুলিতে খোট বা গ্রাম প্রধান যদিও এক বিশেষ শ্রেণীর রায়তদের উপর একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক ধার্য করতে পারে, তবুও অন্যদের সঙ্গে, যারা হয় নতুন জমি দখল করে আছে, না হয় খোটের নিজের জমি খাজনা দিয়ে নিয়েছে তাদের সঙ্গে খোট তার নিজের ইচ্ছামতো রফা করতে পারে। এ জেলায় যে দু-ধরনের প্রজাবিলিপ্রথা প্রচলিত আছে এ থেকেই স্বভাবত তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রথা দুটি হল: প্রথমটি ধারেকরী, দ্বিতীয়টি আরধেলি।

"এর প্রথমটি দাক্ষিণাত্যের মিরাসী প্রথার সঙ্গে অনেকখানি মিলে যায়, কোনো দেশের প্রথা অনুযায়ী যতক্ষণ সে তার প্রদেয় খাজনা দেয় ততক্ষণ তাকে

উচ্ছেদ করা যায় না, এবং প্রকৃতপক্ষে বিক্রী করতে না পারলেও সে তার সম্পত্তি প্রশ্নাতীতভাবে বন্ধক রাখতে পারে, যদিও সাধারণভাবে সকলেই মনে করে যে সে তা বিক্রীও করতে পারে।…

"আরধেলি রায়ত হল অন্য অঞ্চলের জায়গার উপরির সমপর্যায়ের। সে খোটের কিংবা অন্য ভূম্যধিকারীর প্রজা। সে যে জমি দখল করে আছে তা সে বিক্রীও করতে পারে না, বন্ধকও রাখতে পারে না, কারণ অধিকার অনুযায়ী সে জমি অন্যের, সে শুধু তাতে আছে অপরের সম্মতিতে। মালিক যদি জমি নিজের হাতে নিতে ইচ্ছা করে অথবা যদি অন্য কাউকে দিতে চায় তবে সে উচ্ছেদ হতে পারে, যদিও রায়ত যদি নিয়মিত ভাবে তার কর্তব্য ও দায় পূরণ করে চলে তা হলে এই শেষোক্ত কাজটিকে কঠিন কাজ বলে গণ্য করা হবে। এই সব দায়-দায়িত্ব অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বার্ষিক এবং তাই এটা খুবই স্পষ্ট যে, জমি যতক্ষণ পর্যন্ত একেবারে চাষের ক্ষেত্রে অলাভজনক হয়ে না যাবে ততক্ষণ জমির মালিক তার দাবী বাড়িয়ে বাড়িয়ে সহজেই উচ্ছেদ করতে পারে। আরধেলি রায়ত ধানের জমি চাষ করতে পারে। সাধারণত সে তার জমিদারকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক দেয় …

"উপরোক্ত বর্ণনা থেকে মহামান্য কোর্ট দেখতে পাবেন যে খোটেদের সঙ্গে বঙ্গদেশের অপেক্ষাকৃত ছোট ধরনের জমিদারদের খুব সাদৃশ্য আছে।[৫]

দাক্ষিণাত্য

পশ্চিম উপকূলে, ব্রোচ থেকে কোঙ্কন পর্যন্ত পরীক্ষামূলক বন্দোবস্তের রিপোর্টের কথা আমরা এতক্ষণ উল্লেখ করলাম। এখন আবার আমরা দাক্ষিণাত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করছি। এলফিনস্টোনের পর দাক্ষিণাত্যের কমিশনার হন মিঃ চ্যাপলিন এবং তাঁর নভেম্বর ১৮২১ ও আগস্ট ১৮২২-এর প্রাঞ্জল রিপোর্টগুলি এবং তৎসলগ্ন দলিলপত্র ঈস্ট ইণ্ডিয়া পেপার্স-এর পাঁচশো ফোলিও পৃষ্ঠারও বেশী স্থান জুড়ে আছে।

পুণা, আহমদনগর, খান্দেশ, ধারওয়ার, সাতারা ও দক্ষিণাঞ্চলের জায়গীরগুলি সমেত নতুন-অধিকৃত এলাকার জনসংখ্যা আনুমানিক হিসাবে ধরা হয় প্রায় ৪০ লক্ষ। প্রথম দিকের জমির বন্দোবস্তের সময় চেষ্টা করা হয়েছিল, মাদ্রাজে স্যর টমাস মুনরো যা প্রবর্তন করেছিলেন সেই রায়তোয়ারি ব্যবস্থাকে মাদ্রাজের বোর্ড অব রেভিনু্য যা জোরালো ভাবে সুপারিশ করেছিলেন, সেই গ্রাম ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে। যে-বন্দোবস্ত হয় তাকে বলা হলো রায়তোয়ারি এবং

সারগতভাবে ছিলও তাই; কিন্তু বণ্টন অনেকখানি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল গ্রাম্য কর্মকর্তাদের হাতে। মারাঠা শাসনে, তাদের খ্যাতনামা মন্ত্রী নানা ফড়নবিশের সময়ে যে-ব্যবস্থা অনুসরণ করা হত তার সঙ্গে নতুন ব্যবস্থার কোনো সারগত পার্থক্য প্রথমে ছিল না; তফাৎ ছিল শুধু এই যে রাজস্ব বাড়ানো বা কমানোর ব্যাপারে মামলাদার বা জেলা অফিসারদের ক্ষমতা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। রায়তদের কর কোম্পানির কর্মচারীরা নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন তাদের চাষ এবং আগে তারা যা পেত তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং রাষ্ট্রের দাবী আদায়টা ছিল আগেকার চেয়ে অনেক বেশী কঠোর। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নতুন অধিকৃত এলাকার রাজস্ব ছিল ৮০০,০০০ পাউণ্ড; ১৮১৮-তে তা বাড়িয়ে করা হয়েছিল ১,১৫০,০০০ পাউণ্ড; এবং আরো কয়েক বছরে—১,৫০০,০০০ পাউণ্ড। গ্রামের কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা আরো কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল; কোম্পানির কর্মচারীরা চাইতেন প্রতিটি চাষীর ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শে আসতে, এবং গ্রাম-সমাজ বোম্বাইতে কয়েকবছরের মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেল, যেমন হয়েছিল মাদ্রাজে।

খান্দেশ

খান্দেশ জেলা ছিল ক্যাপ্টেন ব্রিগসের শাসনাধীনে। পরবর্তীকালে তিনি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন ভারতের ভূমিকর সংক্রান্ত তাঁর মহৎ রচনা ও ফেরিশ্‌তার ভারতের ইতিহাস অনুবাদের দ্বারা। এলফিনস্টোন ও ম্যালকম, গ্র্যাণ্ট ডাফ, টড ও হোরেস হেম্যান উইলসনের সঙ্গে তাঁর স্থানও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইঙ্গ-ভারতীয় লেখক ও ঐতিহাসিকদের একেবারে সামনের সারিতে। খান্দেশে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন "সেচের জন্য খালে-খালে জল বইয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বেশ ভালোভাবে তৈরী শতাধিক বাঁধের ধ্বংসাবশেষ; এর অধিকাংশই নির্মিত হয়েছিল প্রচুর অর্থব্যয়ে", এগুলি থেকে "প্রথম দিকের মুসলমান রাজাদের উদার ও আলোকপ্রাপ্ত কর্মনীতির" সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর সময়ে খান্দেশ ছিল প্রায় জনহীন ও দারিদ্র্যগ্রস্ত। ঘনঘন যুদ্ধবিগ্রহ, ভীলদের হানা, বাঘের প্রচণ্ড উপদ্রব—তিন মাসে বাঘ ৫০০ জন মানুষ ও ২০,০০০ গবাদি পশুর প্রাণনাশ করেছিল—এই জেলার দুঃখদুর্দশাকে আরো বাড়িয়েছিল। আর ক্যাপ্টেন ব্রিগসকে ভোগ করতে হয়েছিল "সম্পদের সমস্ত প্রামাণ্য নথীপত্রের অভাবে সহনীয় ও উঁচু কর-ধার্যের মধ্যে সীমারেখা টানার অসুবিধা।"

পুণা

পুণা জেলা ছিল ক্যাপ্টেন রবার্টসনের শাসনাধীনে। কমিশনারদের তাঁর প্রতি প্রশ্নের যেসব উত্তর তিনি দিয়েছিলেন তা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও চাষীদের অবস্থার উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করে। দাক্ষিণাত্যে মিরাসী প্রজা ছিল কার্যত কৃষক-মালিক, সরকারকে ভূমিকর প্রদান সাপেক্ষে। ক্যাপ্টেন রবার্টসন লিখেছিলেন: "উদ্ধৃতিতে বর্ণিত ভোগদখলের শর্তের দিক দিয়ে সে কোনমতেই ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে অবিসংবাদিত 'ফ্রি হোল্ড এস্টেটের' মালিকের চেয়ে ছোট নয়। দাক্ষিণাত্যের জমির বর্তমান অধিকারীদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ হয়তো তাঁদের দেশে মুসলমান বিজয়ের আগে থেকেই জমির মালিক ছিলেন, তাঁদের অধিকৃত জমির উৎপন্ন ফসলের এক ষষ্ঠাংশের সমান এক নির্দিষ্ট খাজনা (reddendum) দেবার শর্তে।" "আমাকে যদি দাক্ষিণাত্যের থালকারীর [মিরাসী প্রজা] প্রদত্ত খাজনা সম্পর্কে কোনো পার্থক্য নির্ণয় করতে হত, তাহলে আমি তাকে খাজনা না বলে বলতাম কর।"[৬] যে সমস্ত আধুনিক প্রশাসক দক্ষিণ ভারতে জমির উপর চাষীদের অধিকার এবং উত্তর ভারতে জমির উপর জমিদারদের অধিকারকে ব্রিটিশ আইনের সৃষ্টি বলে থাকেন তাঁরা প্রথম দিককার ব্রিটিশ প্রশাসকদের বিশাল বিশাল প্রতিবেদন থেকে দেখতে পাবেন যে জমির উপর উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য ব্যক্তিগত মালিকানা বর্তমান রাজস্ব বন্দোবস্তের তুলনায় ব্রিটিশ বিজয়ের আগে অনেক শক্তিশালী ছিল। জমির মালিক ছিল জাতি, রাষ্ট্র নয়, এবং মিরাসদারদের কাছ থেকে একটা কর—নির্দিষ্ট কর—ছাড়া রাষ্ট্র আর কিছু পাবার অধিকারী ছিল না।

চাষী পরিবারগুলির গ্রামগুলির উপর সাধারণ মালিকানা সম্পর্কে ক্যাপ্টেন রবার্টসনের মন্তব্যও সমান শিক্ষাপ্রদ।

"থালকারী (মিরাসী প্রজা) ও তাদের জমির মালিকানা সম্পর্কে প্রতিটি মূল কাগজপত্র, তাদের সম্পর্কে ও জমির প্রাচীন বণ্টনব্যবস্থা সংক্রান্ত যত হিসাব আমি জেলাগুলি থেকে পেয়েছি তার প্রতিটিই কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ না রেখেই প্রমাণ করে যে আগেকার দিনে প্রতিটি গ্রামের সমগ্র কর্ষণযোগ্য জমি কতকগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত।…তাদের বংশধরদের যৌথভাবে অভিহিত করা হয় জাঠা বলে; তারাই সমগ্র মূল ভূসম্পত্তির অধিকারী বলে ধরে নেওয়া হয়; সমগ্র জমির সরকার ও অন্যদের যা প্রাপ্য তা প্রদানের জন্য তারা সমবেতভাবে দায়ী।·· সরকার অথবা অন্যান্য জাঠা মনে হয় একটি জাঠাকে বেছে নিয়েছে, তার ঊর্ধ্বতন শাখার প্রতিনিধিত্বের

মারফৎ, অন্য সমস্ত জাঠার কাছ থেকে সরকারকে দেয় প্রভৃতি সংগ্রহ করার কর্তব্য পালনের জন্য এবং তাদের সকলের উপর সরকারের দাবীর ব্যাপারে দায়ী থাকার জন্য ; এইভাবে কতকগুলি দায়দায়িত্ব পালন এবং কতকগুলি সুযোগসুবিধা ভোগের জন্য একটি নেতৃত্বের অধীনে এক সম্মিলিত সংস্থাকে যৌথভাবে আনা হয়েছে। এইভাবে নির্বাচিত জাঠার সদস্যরা সম্মানজনক পাতিল উপাধি লাভ করেন, সম্ভবত সবসময়েই তাদের সেই নাম অথবা অন্য কোনো সম্মানজনক নাম ছিল···এবং তার ঊর্ধ্বতন শাখার যে ব্যক্তি তার প্রধানরূপে প্রকৃতই অধিষ্ঠিত, তাঁকে বলা হয় মুকদ্দম।···জনসম্প্রদায়ের ইচ্ছা তথা সরকারের নিয়োগ অনুসারে তিনিই ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, এখনও তাই আছেন ; ইংল্যাণ্ডে যাকে বলা যেতে পারে কর্পোরেশনের 'বাই-ল', তিনি সেগুলিকে বলবৎ করেন ; কর্পোরেশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য ও তার প্রধানরূপে নিজের মর্যাদা বজায় রাখার জন্য আগে তিনি চাঁদা করে অর্থ তুলতেন ; সমিতির উপকারের জন্য তিনি উন্নয়ন কর্মের পরামর্শ দিতেন এবং জনসাধারণের শান্তি রক্ষায় তাঁকে সাহায্য করার জন্য সদস্যদের একত্রিত করতেন ; যারা বিচারক বা সালিশ হিসেবে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে চলতে চাইত তাদের তিনি পিতৃসদৃশ ব্যক্তিরূপে দেওয়ানী বিচারের ব্যবস্থা করতেন এবং এখনও করেন ; অথবা তিনি স্বয়ং কিংবা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি তাদের বিবাদের ব্যাপারে যাদের সালিশ হিসেবে মনোনীত করতেন, তাঁদের বিচার কর্মে তিনি পৌরোহিত্য করেন।"[৭]

ক্যাপ্টেন রবার্টসন মিরাসী ভোগদখলের শর্তের উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য চরিত্র বহু দলিলপত্রের সাহায্যে প্রমাণ করে বলেছেন যে "মিরাসী ভোগ দখলের শর্ত এই কলেক্টর এলাকায় সব গ্রামেই ছিল বলা যায়। এখন যেখানে এর অস্তিত্ব নেই এমন গ্রামের সংখ্যা খুব বেশী নয়।"[৮] একথা লেখা হয়েছিল ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এবং এ থেকে মারাঠা শাসনাধীনে বোম্বাইয়ের চাষীদের অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারণা পাই।

আহমদনগর

ক্যাপ্টেন পটিংগার শাসনকার্য চালাতেন আহমদনগর জেলায়। তিনি জানান যে "যে সব রায়ত মিরাসদার, তারা তাদের জমি ইচ্ছামতো বিক্রী করতে অথবা বন্ধক রাখতে পারে।" "ভারতের এই অংশে (আমি মনে করি অন্য সমস্ত অংশের সঙ্গে একত্রেই) মিরাসী ভোগদখলের শর্ত রয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকে ; এবং আমি যখন এর প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি তখন আমাকে বলা হয়েছে যে

আমি বরং জমিটা কবে তৈরী হয়েছে সেটা জানতে চাইলেই ভালো করতাম। আমি দেখতে পাচ্ছি, মিঃ এলিস মিরাসী সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রশ্নের জবাবে এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন : 'ঘটনা এই যে এ জিনিসটা (মিরাসী) ভারতে তখন থেকেই ছিল যখন দেশের পুরাকালের আইন-প্রণেতারা আইন রচনা করেছিলেন এবং আমার বিনীত বিচারে তার অধিকার খুবই সুনির্ধারিত।"[৯]

ধারওয়ার

ধারওয়ার জেলা ছিল মিঃ সেণ্ট জন থ্যাকারের শাসনাধীনে। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ রাজস্ব অফিসার, চাষীদের সঙ্গে যথেষ্ট মেলামেশা করেছিলেন এবং তাঁর কাছে প্রেরিত প্রশ্নগুলির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "কৃষির উন্নতিকল্পে রাজস্ব অফিসারদের ব্যক্তিগত প্রয়াস সম্পর্কে বলা যায়, আমি দেখেছি রায়তদের উৎসাহ দেবার চাইতে চোখ রাঙানোর দিকেই তাঁদের ঝোঁক বেশী ; এবং তাঁদের লক্ষ্য হল দেশের সম্পদ বাড়িয়ে তোলার চেয়ে বরং কাগজপত্রে চাষের বৃদ্ধি দেখিয়ে তাঁদের কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করা।...রায়ত চাষ করে তার নিজের লাভের জন্য, আর যখন তা যথোপযুক্ত হয় তখন তাকে খোঁচা দিয়ে কাজে প্রবৃত্ত করানোর দরকার হয় না।"[১০]

দাক্ষিণাত্য

এই সমস্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য জেলার প্রতিবেদন সমেত কমিশনার চ্যাপলিন দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্পর্কে নিজের বিশদ প্রতিবেদনটি দাখিল করেন। তিনি মালিক অম্বরের বন্দোবস্তের কথা উল্লেখ করেন ; উত্তর ভারতে টোডরমলের বন্দোবস্ত যেমন বিখ্যাত ছিল, দাক্ষিণাত্যে সেই রকম বিখ্যাত ছিল মালিক অম্বরের বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্ত ছিল প্রতিটি গ্রামের জন্য এক নির্দিষ্ট আর্থিক দাবী ধরনের এবং তার নীতি প্রাচীন মিরাসী স্বত্বকে অনেকখানি উৎসাহিত করেছিল, যার দ্বারা দেশের চাষযোগ্য জমি "ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকাংশ মূল গুণগুলি অর্জন করেছিল।"

নব প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ শাসনে জমির কর নির্ধারণ প্রসঙ্গে চ্যাপলিন এই অনুমান করেন যে মাঝারি সঙ্গতিসম্পন্ন একজন কৃষকের হাতে আছে দশ একর শুষ্ক জমি এবং সম্ভবত এক-তৃতীয়াংশ একর বাগানী জমি, আর দুটি লাঙল ও চারটি বলদ

এবং তার আয় বছরে ১২ পাউণ্ড। তার ব্যয় হিসাব করা হয়েছে এইভাবে:[১১]

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
ভূমিকর	৪	৪	০
বলদের আনুপাতিক বার্ষিক দাম (একজোড়া বলদ আট বছরের জন্য কর্মক্ষম ধরে নিয়ে)	১	৫	০
লাঙল ও মাঝে মাঝে মজুর ভাড়া বাবদ ব্যয়	০	১৬	০
শুষ্ক জমি ও বাগানের জন্য বীজ	০	১৯	০
অফিসারদের ফীস ও গ্রামের পাওনা পরিশোধ	০	১২	০
আহারের জন্য দানাশস্য			
চাষীর ও তার পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্য	২	৪	০
চাষী ও তার পরিবারের কাপড়চোপড়	১	১০	০
অন্যান্য বিবিধ প্রয়োজনীয় খরচ	০	১২	০
	১২	২	০

এ থেকে দেখা যাবে যে আনুমানিক ১২ পাউণ্ড আয় থেকে রাষ্ট্রের চাহিদা ৪ পাউণ্ড ৪ শিলিং ছিল মোট উৎপন্ন ফসলের ৪৫ অথবা ৫০ শতাংশের চেয়েও কম, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে কৃষকদের কাছ থেকে সরকার মূলত এটাই দাবী করেছিলেন। কিন্তু ১২ পাউণ্ডের উপরে এই ৪ পাউণ্ড ৪ শিলিং করের ফলেও কৃষকের কোনো সঞ্চয় বা সম্পদ থাকত না। একথা রীতিমত পরিষ্কার যে রায়তোয়ারি প্রথা কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে প্রিয় হয়েছিল এই কারণেই, অর্থাৎ মুনাফার একটা অংশ মাঝখান থেকে নেবার মতো কোনো মধ্যবর্তী জমিদার বা গ্রাম সম্প্রদায় ছিল না। ক্রীতদাসের মালিকের যেমন ক্রীতদাসদের উপর প্রচণ্ড প্রতাপ থাকে, চাষীদের উপর কোম্পানির কব্জাও ছিল তেমন প্রচণ্ড, এবং তাদের বাঁচার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই কোম্পানি নিয়ে নিতে পারত। একজন ডিরেক্টর বলেছিলেন, "আমি মনে করি একথা গোপন কিংবা অস্বীকার করা যায় না যে এই [রায়তোয়ারি] প্রথার উদ্দেশ্য হল খাজনা হিসেবে জমি থেকে যতটা আদায় হতে পারে ততখানিই সরকারকে আদায় করে দেওয়া।"[১২]

মিরাসী স্বত্ব সম্পর্কে চ্যাপলিন লিখেছিলেন যে "গঙ্গোত্রীকে খান্দেশ থেকে যে পর্বতমালা বিভক্ত করেছে, কৃষ্ণা থেকে সেই পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত অধিকৃত ভূখণ্ডের সর্বত্রই তা সাধারণ ভাবে প্রচলিত ছিল।" এবং "জমি দখলের

পুরুষানুক্রমিক অধিকার রায়ত একবার অর্জন করলেই, সেও তার উত্তরাধিকারীরা ঐ জমি বিক্রয়, দান ও বন্ধকের অধিকারী হয়। দাক্ষিণাত্যের প্রথা অনুযায়ী এজন্য তাকে আগে থেকে সরকারের অনুমতি নিতে হয় না।" তিনি আরো লিখেছিলেন যে একজন মিরাসদারের "সমস্ত গ্রামীণ পরিষদে রীতিমত কর্তৃত্ব আছে, গ্রামের সাধারণ মাঠে গোচারণ ভূমি পাবার অধিকার আছে, তিনি বাড়ি তৈরী করতে পারেন অথবা বিক্রী করতে পারেন।" এবং পুণায় উপরি বা স্বেচ্ছাদান প্রজার তুলনায় মিরাসদারদের আনুপাতিক হার "প্রায় একে তিন হতে পারে।" উত্তরে, গোদাবরী ছাড়িয়ে "মিরাস অধিকারের প্রচলন কম এবং মিরাসী ও উপরি ভোগদখলের শর্তের মধ্যেকার পার্থক্য আরো অস্পষ্ট ও আবছা হয়ে দাঁড়ায়।" দক্ষিণ মারাঠা দেশে "মিরাসের কোনো অস্তিত্বই অবশ্য নেই", কিন্তু "চিরস্থায়ী দখলী স্বত্ব অবশ্য স্বীকৃত হয়।" "সাতারায় মিরাসের বিশেষ সুযোগসুবিধা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অংশেরই মতো।"[১৩]

চ্যাপলিন লিখেছিলেন "[পুণার] কলেক্টর উপযুক্তভাবেই মিরাসদারদের অধিকার বজায় রাখার পক্ষপাতী, এই নীতি তিনি বিভিন্ন জায়গায় কষ্ট স্বীকার করে সুপারিশ করেন; কিন্তু আমি মনে করি, কেউই যেহেতু তাদের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করার কথা কখনো চিন্তা করেনি, সেই হেতু এই প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা অনাবশ্যক।"[১৪] মিঃ চ্যাপলিন আগে থেকে এটা অনুমান করতে পারেননি যে পরবর্তী কালের বৃটিশ প্রশাসন দাক্ষিণাত্যের চাষীদের মিরাসী অধিকার কার্যত হরণ করে নেবেন।

চ্যাপলিনের দীর্ঘ রিপোর্টটি শেষ হয়েছে ভারতের জনগণের সঙ্গে নাগরিক মেলামেশার রীতিনীতিগুলি পালন করার জন্য ইংরেজ কর্মকর্তাদের প্রতি এক আবেদন দিয়ে।

"একথা মনে রাখা উচিত, সরকারের পরিবর্তন যেহেতু অবশ্যম্ভাবীরূপেই তাদের এত সঙ্গতি-সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত করেছে, সেই জন্যই নাগরিক মেলামেশার যে সব রীতিনীতি এখনও আমাদের হাতে রয়েছে সেগুলিকে তাঁদের কাছে নিয়ে যাওয়া আরো বেশী করে আমাদের দায়িত্ব হয়ে উঠেছে; এবং যদিও আমাদের চেয়ে তাঁদের অনেক নিচু বলে গণ্য করার ঝোঁক আমাদের থাকতে পারে, তবুও মনে রাখা উচিত যে তাঁরা তাঁদের নৃপতির দেশীয় অধীনে সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এখন আমরা তাঁর স্থান অধিকার করেছি বলে আমাদের ক্ষমতায় যতখানি সম্ভব আমাদের উচিত তাঁদের সেই সম্মান বজায় রাখা।

"প্রথম ভারতে এসে এবং সরকারী পদে প্রথম নিযুক্ত হয়েই যুবকরা এই মাত্র যে মতামত আমি প্রকাশ করলাম তার একেবারে বিপরীত মত পোষণ করার এবং একেবারে বিপরীত ধারণা অনুযায়ী কাজ করার প্রবণতা এত দেখান যে আমি দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত সহকারীদের এই নীতিগুলি শিক্ষা দেওয়া উপযুক্ত বলে মনে করি; এবং তাঁদের পথনির্দেশের জন্য এই বিষয়ে স্যর জন ম্যালকমের বিজ্ঞজনোচিত উপদেশগুলি সম্প্রতি আমি প্রচার করেছি। আমি মনে করি, ইংল্যাণ্ড থেকে সদ্য-আগত প্রত্যেকের জন্য এই ধরনের একটি আচরণবিধি যদি অনেকটা বিধিগ্রন্থ হিসেবে দেওয়া যায় তবে এর সুফল হবে। তার আদর্শবাণী হতে পারে শেকসপীয়রের ভাষায়:

'O but man, proud man,
Drest in a little brief authority,
Most ignorant of what he's most assured,
His glassy essence
Plays such fantastic tricks before high Heaven
As make the angels weep'."[১৫]

সংলগ্ন বহু দলিল পত্র সমেত এই মূল্যবান ও বিশদ রিপোর্ট পেয়ে বোম্বাইয়ের গভর্ণর মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন সমগ্র অধিকৃত অঞ্চলের ক্রমান্বিত জরীপ ও মূল্যাবধারণের নির্দেশ দেন। তিনি প্রত্যেক গ্রামে পাতিলের ক্ষমতা বজায় রাখার উপরেও জোর দেন; সুপারিশ করেন যে ধার্য কর যেন লঘু ও সমানভাবে বণ্টন করা হয়; এবং প্রচলিত সর্বপ্রকার ভোগদখলের শর্ত অনুযায়ী চাষীদের অধিকার রক্ষা করার গুরুত্ব সম্পর্কে কমিশনারকে অবহিত করান। কোর্ট অব ডিরেক্টর্সও সাধারণ জরীপের প্রস্তাবে সন্তোষ প্রকাশ করেন।[১৬]

দাক্ষিণাত্যের কমিশনার সেপ্টেম্বর ১৮২৪-এ এক প্রস্ত জরীপ সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং ফেব্রুয়ারী ১৮১৫-তে এক প্রস্ত সংশোধিত নিয়মাবলী দাখিল করেন। স্যর টমাস মুনরো মাদ্রাজে ভূমিকর কমিয়ে করেছিলেন জমির উৎপন্ন ফসলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং চ্যাপলিন সংশোধিত জরীপ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সঙ্গে প্রচার করা তাঁর বিজ্ঞপ্তির ৭ম অনুচ্ছেদে দাক্ষিণাত্যের জন্যও একই মান গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রের এই নিষ্করুণ দাবীই দক্ষিণ ভারতে কৃষির সমৃদ্ধি বিনাশের কারণ হয়েছে। মাদ্রাজে এই নিয়ম এখনও বজায় আছে সরকারের দাবির সর্বোচ্চ পরিমাণ হিসেবে; বোম্বাইতে, উৎপন্ন ফসলের কোনো সুনির্দিষ্ট ভাগ নির্ধারণ করার সকল প্রচেষ্টা পরিত্যাগ তো করা হয়েছেই, প্রকৃত ভূমিকর

যা ধার্য ও আদায় করা হয় তা প্রায়ই ক্ষেতের ফসলের এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি যায় অথবা তাকে অতিক্রম করে যায়। রায়তোয়ারি প্রথার সম্প্রসারণের কারণ সম্পর্কে হেনরি সেণ্ট জন টাকারের উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যের যাথার্থ্য এই ভাবে ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয়।

সাধারণ জরীপের প্রস্তাব তখনও পর্যন্ত অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল। মাউণ্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন চেষ্টা করেছিলেন দাক্ষিণাত্যে গ্রামীণ ব্যবস্থার উপর হাত না-দিতে। আগেই বলা হয়েছে তাঁর চিন্তাটা ছিল রায়তোয়ারি প্রথার নীতিগুলিকে গ্রামীণ প্রথার নীতির সঙ্গে মেলানো। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, রাষ্ট্রকে প্রত্যেক চাষী কত দেবে, জরীপের পর তা স্থির করে দেওয়া এবং তারপরে প্রত্যেক গ্রাম থেকে সেখানকার পাতিলের মারফৎ তা আদায় করা। "জরীপ প্রত্যেক রায়তের অধিকার ও প্রদেয় খাজনা স্থির করে দেবে, তার পরে কয়েক বছরের জন্য পাতিলের কাছে গ্রাম ইজারা দেওয়া যেতে পারে।"[১৭]

এখানে স্বীকার করা দরকার এই প্রস্তাবের প্রাথমিক একটা দুর্বলতা ছিল। প্রস্তাবিত জরীপের দ্বারা গ্রামের পাতিল ও গ্রাম-পরিষদকে যদি গ্রামবাসী চাষীদের মধ্যে তাদের যৌথ গ্রামীণ ধার্যকর বণ্টনের সমস্ত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে পাতিল ও তার পরিষদকে টিকিয়ে রেখেই বা কী লাভ? যৌথ রাষ্ট্রীয় দাবী পুষিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে গ্রামের রায়তদের উপর কর-ধার্যের যে কাজ তারা গত কয়েক শতাব্দী ধরে করে এসেছে, সেই কাজের ক্ষমতাই যদি তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে শুধু রাজস্বের ইজারাদার হিসেবে তাদের রাখারই বা প্রয়োজন কি?

প্রশ্নটি নিয়ে মাদ্রাজে প্রাথমিক নীতির ভিত্তিতে তুমুল তর্কবিতর্ক হয়। মাদ্রাজের বোর্ড অব রেভিন্যু ছিলেন পুরোপুরি "যৌথকরণপন্থী", তাঁরা গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং তাদের কর্তৃত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন। টমাস মুনরো ছিলেন পুরোপুরি "ব্যক্তিপন্থী", তিনি জোর দিয়েছিলেন রাষ্ট্র এবং আলাদা আলাদা প্রতিটি চাষীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের উপর, ভূমিকরের ব্যাপারে সেখানে গ্রামীণ কর্তৃপক্ষের কোনো হস্তক্ষেপ চলবে না। টমাস মুনরোই শেষ পর্যন্ত জয়ী হন এবং মাদ্রাজের গ্রাম-সম্প্রদায়গুলি তৎক্ষণাৎ তাদের প্রাণশক্তি হারায়, তাদের উপর অন্যান্য ক্ষমতা ন্যস্ত করে তাদের বজায় রাখার জন্য মুনরোর নিজের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও।

এই সমস্ত পরীক্ষা ও তার ফলাফলের নিজস্ব কিছু শিক্ষা ছিল। ভারতে গ্রাম-সমাজগুলিকে রাখা যেতে পারত একমাত্র গ্রাম পরিষদ ও পঞ্চায়েতের হাতে

আভ্যন্তরিক কর-নির্ধারণের কাজটি ছেড়ে দিয়ে, যেমনটি বহু শতাব্দী ধরে ছিল। জমির ফসলের পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত কর-নির্ধারণের বিরুদ্ধে কয়েকটি নিয়ম তৈরী করা যেতে পারত এবং এই সমস্ত নিয়ম সাপেক্ষে গ্রাম প্রধানদের পৃথক কর নির্ধারণ ও আদায়ের কাজ এবং রাষ্ট্রকে তাদের যৌথ কর প্রদানের কাজ চালিয়ে যাবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারত। এরূপ একটি ব্যবস্থার সুস্পষ্ট সুবিধা হত এই যে ভারতের একটি প্রাচীন প্রথা অব্যাহতভাবে বজায় থাকত এবং ভারতের প্রতিটি গ্রামে সংগঠিত একটা জনপ্রিয় সংস্থা থাকত। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা ছিল কোম্পানির নিয়মের মূলনীতিরই বিরোধী। কোম্পানির কর্মনীতি ছিল জমির প্রতিটি করদাতার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বন্দোবস্ত করা এবং যে যতখানি দিতে পারে ততটা কর ধার্য ও আদায় করা। স্বয়ং এলফিনস্টোনও এই মূলনীতির দ্বারা এতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি এক জরীপ অনুমোদন করেছিলেন যে জরীপে প্রতিটি চাষীর দায়দায়িত্বও নির্দিষ্ট করে দেবে। এবং এর পরেও যখন তিনি প্রধানের মাধ্যমে গ্রামগুলির সঙ্গে যৌথভাবে বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিলেন, তখন স্বভাবতই তাঁর পরিকল্পনার খোলাখুলি সমালোচনা হয়েছিল এই বলে যে, গ্রামপ্রধানের চাকরিই চলে গেছে!

এলফিনস্টোন ভারত ত্যাগ করেন ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে, এবং সেই বছরেই কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এলফিনস্টোনের পরিকল্পনার দুর্বল স্থানটি দেখতে পেয়ে তার সুযোগ গ্রহণ করেন।

"জরীপ যদি প্রতিটি রায়তের অধিকার ও প্রদেয় কর সত্যই স্থির করে এবং রায়তের অধিকার কোনরূপ ক্ষুণ্ণ হবার দরুন রায়ত যদি আশু প্রতিকার লাভ করতে পারে, তবে এই পত্রের পূর্ববর্তী এক অনুচ্ছেদে যেভাবে বলা হয়েছে সেই ভাবেই পাতিলকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। স্বর্গত পেশোয়ার শাসনকালে রাজস্বের ইজারা প্রথার দরুন কুফলগুলি সম্পর্কে আপনার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাতে ব্যক্তি-বিশেষের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবার ব্যাপারে আপনার অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত ছিল; তাদের পূর্বেকার অভ্যাস ও আচরণ ওই ক্ষমতার অপব্যবহারে তাদের প্রবৃত্ত করবেই। আবার জোর করে আদায়ের বিরুদ্ধে গ্রামীণ ঠিকাদার কর্তৃক সরকারকে প্রদেয় সহনীয় করনির্ধারণ যে নিরাপত্তা দেবে তার উপরও আমরা কোনো আস্থা রাখতে পারছি না।[১৮]

গ্রাম ব্যবস্থার অবসানের এটাই ছিল সূচনা।

১। Report on the Territories Conquered from the Peshwa, dated 25th October 1819.

২। Minute. dated 15th August 1821.

৩। Minute, dated 6th May 1821.

৪। Revenue Letter from Bombay to the Court of Directors, dated 19th April 1822.

৫। Revenue Letter from Bengal to the Court of Directors, dated 23rd February 1822.

৬। Paragraphs 19, 20 and 22 of Robertson's Report, dated 10th October 1821.

৭। Paragraphs 26, 27 and 32 of Robertson's Report.

৮। Robertson's Report, para, 182.

৯। Pottinger's Report, dated 31st July 1822, Answer to Query 37.

১০। Mr. Thackeray's Report, para. 51,

১১। Mr. Chaplin's Report, dated 20th August 1822, para. 105. মূল রিপোর্টে সংখ্যাগুলির মোট সংখ্যায় ভুল ছিল। চ্যাপলিনও মনে করেন যে এক জন চাষীর দুগ্ধজাত জিনিস থেকে বছরে ১৪ শিলিং আয় হয়।

১২। Henry St, John Tucker : *Memorials of Indian Government* (London, 1853), p. 113.

১৩। Mr. Chaplin's Report, paragraphs, 107, 114, 125, 131, 133, 135, 136.

১৪। ঐ, para. 143

১৫। ঐ, paragraphs 392, 393.

১৬। Revenue Letter from Bombay to the Directors, dated 5th November 1823, and Revenue Letter from the Directors to Bombay, dated 4th May 1825.

১৭। Revenue Letter from Bombay to the Court of Directors. dated 5th November 1823, para, 452.

১৮। Revenue Letter from the Court of Directors to Bombay, dated 23rd May 1827, para. 87.

একবিংশ অধ্যায়

উইনগেট ও বোম্বাইয়ে রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত (১৮২৭-১৮৩৫)

আমরা আমাদের বিবরণী মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের ভারত ত্যাগের বছর পর্যন্ত এনেছি। সে সময়ে শুধু জনসাধারণই নয়, কোম্পানির কর্মচারীবৃন্দ ও রাজস্ব অধিকর্তাদের কাছেও ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের জমির কর নির্ধারণ অত্যধিক বলে মনে হয়েছিল। আমরা দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখেছি মাদ্রাজে রাজস্ব অফিসাররা ডঃ ফ্রান্সিস বুকানানকে বলেছিলেন যে, গুরুভার ভূমিকর কৃষিকে ও জনসাধারণের সমৃদ্ধিকে ব্যাহত করেছে এবং স্যর টমাস মুনরো করের হার ক্রমে ক্রমে মোট উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক থেকে হ্রাস করে এক-তৃতীয়াংশ করেছিলেন, যদিও শেষোক্তটিও ছিল মাত্রাতিরিক্ত করভার। উত্তর ভারতে, লোকের পক্ষে যাতে সম্পদ সঞ্চয় করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে স্যর এডওয়ার্ড কোলব্রুক ও তাঁর পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল বৃটিশ সরকারের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্য এবং চিরস্থায়ীভাবে ভূমি-করের বন্দোবস্ত করার জন্য বৃথাই কোর্ট অব ডিরেক্টর্সকে অনুনয় করেছিলেন। আর বোম্বাইতে এলফিনস্টোন অনেকগুলি জেলায় রাজস্বের দ্রুত বৃদ্ধি উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন, এবং চ্যাপলিনের এই রাজস্ব মোট উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশে বেঁধে দেবার সিদ্ধান্ত সামান্যই ভারলাঘব করতে পেরেছিল। ভূমি-কর যেখানে চিরস্থায়ীরূপে নির্ধারিত হয়েছে সেই সব জায়গা ছাড়া সারা ভারত জুড়ে জনসাধারণ দেশের নতুন শাসকদের নির্ধারিত করের চাপে আর্তনাদ করছিলেন। ডিরেক্টররা আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করতেন না এবং কোম্পানির যে সমস্ত কর্মচারী জনসাধারণের প্রতি এই অবিচার অনুভব করতেন, তাঁরাও তাঁদের অভিমত প্রকাশ করতেন চাপা স্বরে এবং তাদের কোনরূপ ভার লাঘবে ছিলেন অক্ষম।

সেই সময়ে ভারতে বিশিষ্টতম ইংরেজদের একজন ছিলেন বিশপ হেবার। ১৮২৪, ১৮২৫ ও ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সারাভারত ভ্রমণ করেন এবং এই বিস্তীর্ণ সফরকালে, যে সমস্ত প্রদেশের মধ্য দিয়ে তিনি ভ্রমণ করেছেন সেই সব বিভিন্ন প্রদেশে জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে সযত্নে অনুসন্ধান করেন। তাঁর উপর যা সবচেয়ে দুঃখজনক রেখাপাত করেছিল তা হল জনসাধারণের দারিদ্র্য এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক তাদের রাজত্বের চাপানো গুরুভার ভূমিকর।

প্রকাশের দিকে নজর রেখে তিনি যে 'জার্নাল' লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাতে একথা তিনি সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেননি বটে, তবে তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে তিনি মন খুলে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। কর্ণাটক থেকে মার্চ ১৮২৬ তারিখে মাননীয় চার্লস উইলিয়ামস উইনের কাছে লেখা তাঁর চিঠিটি এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হবে।

"আমার মনে হয়, দেশীয় বা ইয়োরোপীয় কোনো কৃষিজীবীরই করের বর্তমান হারে শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে না। জমির মোট উৎপন্ন ফসলের অর্ধেককেই সরকার দাবী করেন, এবং যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেই সেখানেই এটা হল প্রায় গড় হার, —ভারতীয়দের স্বাভাবিক মিতব্যয়ী অভ্যাস এবং তারা যে অ-কৃত্রিম ও শস্তা উপায়ে জমি চাষ করে তাতেও এটা দুঃখজনক ভাবেই এত বেশী যে বর্তমানের জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা হাতে থাকে না। অধিকন্তু এটা হল যে-কোনো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক কার্যকর প্রতিবন্ধক ; এমন কি অনুকূল বছরগুলিতেও তা জনসাধারণকে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে রাখে ; এবং সামান্যতম মাত্রাতেও যদি ফসল তেমন ভালো না হয়, তা হলে সরকারের পক্ষ থেকে রেহাই ও বণ্টন বাবদ বিরাট ব্যয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাতে অবশ্য স্ত্রী-পুরুষ-শিশুর পশুর মতো দলে দলে পথে মরে থাকায় এবং পথে পথে মৃতদেহ ছড়িয়ে থাকায় কোনো বাধা হয় না। বঙ্গে জমির উর্বরতা প্রচুর তো বটেই, তা ছাড়াও সেখানে চিরস্থায়ী কর-নির্ধারণ আছে। দুর্ভিক্ষ সেখানে অজ্ঞাত। অপর দিকে হিন্দুস্থানে [উত্তর ভারত], আমি রাজকর্মচারীদের মধ্যে একটা সাধারণ মনোভাব দেখতে পেয়েছি, এবং কোনো কোনো অবস্থায় আমাকেও তাঁদের সঙ্গে একমত হতে হয়েছে যে কোম্পানির প্রদেশগুলিতে কৃষকদের অবস্থা মোটের উপর দেশীয় নৃপতিদের প্রজাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত খারাপ, তাদের দারিদ্র্য আরও বেশী এবং তারা আরো বেশী হতোদ্যম ; এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে এই মাদ্রাজে, যেখানে জমি তেমন ভালো নয় সেখানে পার্থক্য নাকি আরো প্রকট। আসল ঘটনা হল, আমরা যে খাজনা দাবী করি কোনো দেশীয় নৃপতিই তা করেন না, এবং আমাদের ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ নিয়মানুগতা ইত্যাদি সকল কথা মেনে নিয়েও বলা যায়, এমন লোকের দেখা আমি খুব কমই পেয়েছি যিনি গোপন আলাপে এই বিশ্বাস ব্যক্ত করবেন না যে লোকের উপর মাত্রাতিরিক্ত করের বোঝা চাপানো হয়েছে এবং দেশ ক্রমে ক্রমে দরিদ্র হয়ে যাবার অবস্থায় রয়েছে। কলেক্টররা এই কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করতে চান না। বস্তুতপক্ষে, মাঝে মাঝে কোনো সুযোগ্য কলেক্টর জনসাধারণের কাছে করের হার কমিয়ে নিজের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়

দিয়ে রাষ্ট্রের কাছে তা বাড়াতে সক্ষম হন। কিন্তু সাধারণভাবে তাঁরা সমস্ত বিষণ্ন চিত্র এড়িয়ে যান, পাছে তা তাঁদের অযোগ্যতার পরিচায়ক হয় এবং মাদ্রাজ বা কলিকাতা স্থিত সেক্রেটারীদের কাছ থেকে তার জন্য ভর্ৎসনা ও সমালোচনা শুনতে হয়। আবার বিলাতের ডিরেক্টররা যে-ব্যগ্রতা নিয়ে আরো অর্থের চাপ দেন, এই সেক্রেটারীরা সেই ব্যগ্রতা নিয়েই অর্থ চান।

"আমি এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত যে কৃষকদের কাছ থেকে কম অর্থ আদায় করা দরকার এবং যা আদায় করা হয় তার আরো বেশী পরিমাণ দেশের মধ্যে ব্যয় করা দরকার, ইয়োরোপে ভারতীয় শিল্পের জন্য কিছুটা দ্বার খোলা দরকার এবং দেশীয় লোকেদের তাদের নিজজাতির শাসনের ক্ষেত্রে কিছু বেশী অংশ দেওয়া দরকার, সাম্রাজ্যকে যেমন সুখী তেমনই স্থায়ী করা দরকার।"[১]

উপরোক্ত বিবরণ থেকে দেখা যাবে যে, জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানো হয়েছে একথা জানতেন না এমন কর্মকর্তা ভারতে খুব কম থাকলেও, তাঁরা সে কথা প্রকাশ্যে বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন। অবশ্য দপ্তরের পক্ষে গৌরবের বিষয়, ইংলণ্ডে যখন এই বিষয় সম্পর্কে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে তখন তাঁদের কেউ কেউ অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এঁদের একজন হলেন রবার্ট রিচার্ডস; হাউস অব কমন্সের কমিটির কাছে প্রদত্ত তাঁর কয়েকটি উত্তর উদ্ধৃতিযোগ্য।

"ভারতের মতো যেখানে রাজস্ব আদায় করা হয় এই নীতি অনুযায়ী যে, সরকার জমির মোট উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পাবার অধিকারী, এবং যেখানে এই রাজস্ব আদায়ের কাজে এত বিরাট সংখ্যক অফিসার নিযুক্ত থাকে যে তাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব, সেখানে কোনো জাতির পক্ষেই এমন ভাবে বেঁচে থাকা বা সমৃদ্ধিশালী হওয়া নৈতিক ভাবে অসম্ভব ব্যাপার, যাতে কিনা তাদের সঙ্গে অতি ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিক যোগাযোগের অবকাশ থাকে।......

"এ কাজ (অর্থাৎ, বিদেশে রপ্তানির জন্য পণ্যাদি তৈরী) করা যেতে পারে সেই সব জায়গায় যেখানে জমির উপর অতিরিক্ত কর নেই। বঙ্গদেশেও তা হতে পারে, সেখানে বহু বছর যাবৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ করা হয়েছে এবং সেখানে তার গোড়ার দিককার সর্বনাশা চাপ এখন আর ততটা গুরুতরভাবে অনুভূত হয় না; কিন্তু এটা অসম্ভব হবে সেই সব জায়গায় যেখানে, ধরা যাক, রায়তোয়ারি কর চাপানো আছে, কিংবা যেসব জায়গায় মোট উৎপন্ন ফসলের ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হয়।......

"আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন ঘটনার কথা জানি যেখানে কোনো কোনো

জমির উপর নির্ধারিত রাজস্ব প্রকৃতপক্ষে মোট উৎপাদনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভারতে আমি অন্য এমন জায়গার কথাও জানি যেখানে রাজস্ব ধার্য করা হয়েছে বিশেষভাবে ধানী জমি, ফলবাগিচা, গোলমরিচ, আঙ্গুর ও অন্যান্য দ্রব্য থেকে লভ্য হিসাবে এবং তার প্রত্যেক অংশ সুনির্দিষ্টভাবে বিবৃত আছে ; কিন্তু কর নির্ধারিত আলোচ্য স্থানগুলিকে মেলাতে গিয়ে দেখা গেছে যে সেই সব জায়গায় মানুষের স্মরণকালের মধ্যে জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই ছিল না !"[২]

ভারতে জমির কর নির্ধারণের কাজে নিযুক্ত অফিসারদের সামূহিক মনোভাব শেষ পর্যন্ত অভিব্যক্তি লাভ করেছিল এক বিরাট ও স্মরণীয় কাজের মধ্যে। প্রাচীন ও আধুনিক কালের আইন ও প্রথা সম্পর্কে বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের পর ভারতে ভূমিকরের প্রকৃত চরিত্র সর্বপ্রথম প্রতিপাদন করার কৃতিত্ব লেফটেন্যান্ট-কর্নেল ব্রিগসের প্রাপ্য। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এতকাল ভারতকে গণ্য করে এসেছেন তাদের জমিদারী বলে, এবং প্রাচীন অধিকার ও প্রথাগুলিকে উপেক্ষা করে সেখান থেকে যত বেশী সম্ভব রাজস্ব আদায় করে নিতে চেয়েছেন। জন ব্রিগস এ সবের বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে তাঁর বিরাট ও যুগান্তকারী রচনায়[৩] তিনি স্বকালের ও পরবর্তী সর্বকালের ইংরেজদের কাছে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে ভারতে জমি কখনই রাষ্ট্রের সম্পত্তি ছিল না ; অন্য সমস্ত সভ্য জাতির মতো ভারতেও জমি ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্র অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো এই ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরেও কর বসানোর অধিকারী মাত্র ছিল।

প্রায় পাঁচ শো পৃষ্ঠার এই বিরাট গ্রন্থের বিশ্লেষণ আমাদের এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে করা সম্ভব নয় ; কিন্তু কয়েকটি সিদ্ধান্ত পাঠকদের কাছে উপস্থিত করা দরকার—এই সিদ্ধান্তগুলির মূল্য সত্তর বছর আগে যেমন ছিল বর্তমান কালেও (১৯০১) তেমনই আছে। জন ব্রিগস দেখিয়েছিলেন যে প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে—গ্রীক, রোমান, পারসিক ও চৈনিকদের মধ্যে—রাষ্ট্রের অধিকার বলতে ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ কর বসাবার অধিকার। প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে রাজা বা রাষ্ট্রের ছিল জমির পার্থক্য ও সে-জমি চাষ করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম অনুযায়ী ফসলের এক-অষ্টমাংশ, এক ষষ্ঠাংশ কিংবা এক-দ্বাদশাংশ আদায় করার অধিকার।[৪] পরবর্তী বিভিন্ন কালের কার্যধারা সম্পর্কে বিশদ অনুসন্ধানের পর, ব্রিগস দেখিয়েছেন যে—

"জমির দখলকারীই সে জমির একমাত্র মালিক ; রাষ্ট্রের ব্যয় বহনের জন্য দেয় পরিমাণ তার উপর যা দাবী করা হত সেটা ছিল এক ধরনের আয়কর,

অর্থাৎ তার জমির ফসলের একটা সীমিত অংশ; এবং এই অংশ নির্দিষ্ট থাকত শান্তির সময়ে কিন্তু যুদ্ধের সময়ে তা বাড়াবার শর্ত ছিল; এবং সকল পরিস্থিতিতে জমির মালিকের তাতে কিছুটা উদ্বৃত্ত মুনাফা থাকত, যে মুনাফা ছিল খাজনার সমান। অধিকন্তু, আশা করি একথা আমি প্রমাণ করতে পেরেছি যে রাজা কখনও জমির মালিক বলে দাবী করতেন না, দাবী করতেন ভূমিকরের অধিকারী বলে।"[৫]

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক এই অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি উপেক্ষা এবং চাষীদের জন্য কোনো মতে বেঁচে থাকার মতো সামান্য কিছু ছেড়ে দিয়ে জমি থেকে সমগ্র মুনাফা ঝেঁটিয়ে নেবার চেষ্টাকে জন ব্রিগস মনে করেছেন ব্রিটিশ ভারতের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ বলে।

"গত তিন শতাব্দীর মধ্যে যে সব ইয়োরোপীয় পর্যটক প্রাচ্যদেশ ভ্রমণ করেছেন তাঁরা সকলেই মুঘল সম্রাটদের অধীনে দেশের সমৃদ্ধ অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন; এবং ভারতের সম্পদ, জনসংখ্যা ও জাতীয় সমৃদ্ধি দেখে তাঁরা বিস্ময়াভি-ভূত হয়েছেন, ইয়োরোপে তাঁরা যা দেখেছেন ভারতের সম্পদ ও সমৃদ্ধি তাকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের সরকারের অধীনে জনগণ ও দেশের অবস্থা যে এমন একটা দৃশ্য তুলে ধরে না তা আমরাই প্রতিদিন বলে থাকি এবং তাই আমরা অনুমান করে নিতে পারি কথাটা সত্যি।...

"আমি যদি প্রমাণ করতে পেরে থাকি যে আমাদের পূর্বসূরীদের আচরণ ও কর্ম থেকে আমরা বিচ্যুত হয়েছি, তাদের নিয়মিত সরকারগুলির মধ্যে নিকৃষ্টতম সরকারের অধীনে পর্যন্ত যা ছিল, কঠোরতার দিক দিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী কঠোর এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছি, তা হলে বস্তুতই সংস্কারের কথা বলার, অন্তত অনুসন্ধানের আশা করার কিছুটা কারণ আছে।...

"আমি বিবেক সম্পন্নভাবে বিশ্বাস করি যে আইনের দ্বারা চালিত বলে দাবী করে এমন কোনো সরকারের অধীনেই—সে সরকার হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক—আমাদের প্রশাসনের মতো জনসাধারণের সমৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকারক তেমন কোনো ব্যবস্থাই ছিল না...

"আমরা যদিও সর্বত্র স্বীকার করেছি যে করের প্রচণ্ড চাপই তাদের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ক্ষতস্থান, তবুও কোনো ক্ষেত্রেই সে চাপ আমরা লাঘব করিনি। তা না করে আমরা প্রয়োগ করেছি কর নির্ধারণের এক ভ্রান্ত মাপকাঠি—উৎপন্ন ফসলের পরিবর্তে অর্থ; আমরা অন্যান্য শ্রেণীর উপর মামুলী ছোটখাটো কর তুলে দেবার ভান করেছি, কিন্তু সেই অঙ্কটা চাপিয়েছি জমির মালিকের উপর; এবং প্রতিটি

ব্যক্তির সম্পদ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে, নিজেদের প্রতি ন্যায়বিচারের অজুহাতে বহু ক্ষেত্রেই আমরা গুরুভার কর (যে করের বোঝা থেকে তারা আমাদের কাছে কিছু অব্যাহতি চেয়েছিল) প্রদানের যে-উপায়গুলি চাষীদের ছিল তা থেকে তাদের বঞ্চিত করেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের রাজস্ব বাড়িয়েছি এবং জনসাধারণকে নামিয়ে এনেছি নিছক মজুরের অবস্থায়। এই হল আমাদের শাসনের ঘোষিত বাণী, জমির সমগ্র উদ্বৃত্ত মুনাফা নিয়ে নেবার সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী ফল।...

"সরকারই একমাত্র ভূস্বামী এই কথা ধরে নিয়ে সে [বর্তমান সরকার] জমিকে সমস্ত রাজস্বের সবচেয়ে লাভজনক উৎস বলে মনে করে; চাষীর উপর তত্ত্বাবধানের কাজ চালাবার জন্য সে অজস্র সরকারী চাকুরেকে নিযুক্ত করে এবং সমস্ত মুনাফা নিয়ে নেবার কথা বলে। ভারতে এখন যে রকম ভূমিকর বিদ্যমান রয়েছে, যাতে জমিদারের খাজনার পুরোটা নিয়ে নেবার কথা বলা হয়, এরকম ভূমিকরের কথা ইয়োরোপে ও এশিয়ায় কোনো সরকারের আমলেই কখনো শোনা যায়নি।"[৬]

এরকম মহান ও চিন্তাপূর্ণ রচনা পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশেই বিপ্লব সৃষ্টি করত। ভারতে তা বোম্বাইয়ের রাজস্ব-কর্তাদের কর্মপদ্ধতিতে সামান্যতম পরিবর্তনও ঘটাতে পারেনি। এলফিনস্টোনের সুপারিশ মতো 'সার্ভে সেটেলমেণ্টের' কাজ ইতিমধ্যেই বোম্বাই সিভিল সার্ভিসের প্রিঙ্গলের উদ্যোগে শুরু হয়ে গেছে ১৮২৪-২৮ খৃষ্টাব্দে; আর সে বন্দোবস্তের কাজ চালানো হয়েছিল জমির উৎপন্ন ফসলের অসত্য ও অতিরঞ্জিত হিসাবের ভিত্তিতে এবং তাই তার ফল হয়েছিল মারাত্মক।

"তার (প্রিঙ্গলের) নির্ধারণকর্মের ভিত্তি ছিল ক্ষেতগুলির পরিমাপ ও বিভিন্ন জমির ফসলের হিসাব তথা চাষের ব্যয়; যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তা হল সরকারের দাবী নীট উৎপন্ন সামগ্রীর ৫৫ শতাংশে বেঁধে দেওয়া...পরিমাপ গ্রহণের প্রাথমিক কাজ ছিল একেবারেই ত্রুটিপূর্ণ এবং কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ও যা অত্যন্ত বিশদ ভাবে তৈরী করা হয়েছিল সেই উৎপন্ন পণ্যের হিসাব ছিল এত ভুল যে তাকে নিরর্থকের চাইতেও খারাপ বলা যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে সেটেলমেণ্ট চালু করা হয়ে গেছে এবং যে দোষগুলি দূর করার জন্য তা করা হয়েছিল, সেই দোষগুলি এর ফলে আরো গুরুতর হয়ে উঠল। একেবারে গোড়া থেকেই দেখা গেল যে পুরো রাজস্বের কাছাকাছি পৌঁছবার মতো কিছু সংগ্রহ করাও অসম্ভব। কতকগুলি জেলায় অর্ধেকও আদায় করা গেল না।

অবস্থা দ্রুত আরও খারাপ হতে লাগল। প্রতি বছরেই রাজস্বের পুঞ্জীভূত বকেয়ার পরিমাণ বাড়তে লাগল এবং তার সঙ্গে দেখা দিতে লাগল কর মকুব বা সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা···দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের কাছ থেকে যথাসম্ভব আদায় করার জন্য বৈধ-অবৈধ সব প্রচেষ্টাই চালানো হল; তাদের কাছে যা দাবী করা হয়েছিল তা তারা না দিলে কিংবা দিতে না পারলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের উপর বর্ণনাতীত নিষ্ঠুর ও জঘন্য অত্যাচার চালানো হল। অনেকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে প্রতিবেশী দেশীয় রাজ্যগুলিতে পালিয়ে গেল। বিপুল পরিমাণ জমি পড়ে রইল অনাবাদী হয়ে এবং কতকগুলি জেলার চাষযোগ্য জমির এক-তৃতীয়াংশের বেশী দখলে রইল না।"[৭]

এই ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। বোম্বাই সিভিল সার্ভিসের গোল্ডস্মিড এবং লেফটেন্যাণ্ট উইনগেট (পরবর্তীকালে স্যর জর্জ উইনগেট) ১৮৩৫ সালে নতুন করে জরীপের কাজ আরম্ভ করেন।

"জমির উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ আবিষ্কারের চেষ্টা করে এবং তার একটা অংশকে সরকারের দাবীর জন্য নির্ধারিত করে দিয়ে করনির্ধারণের একটা তত্ত্বগত আদর্শে উপনীত হবার সকল প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে সার্ভে অফিসাররা প্রতিটি ক্ষেতের গড় চরিত্র ও মাটির গভীরতা নির্ধারণ করার এবং তাকে তদনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করার সহজ কার্যকর পন্থাটি গ্রহণ করেন; এই উদ্দেশ্যে মূল্য-নির্ধারণের নটির বেশী স্তরবিভাগ প্রয়োগ করা হয়নি। করের হার স্থির করার ব্যাপারে তাঁরা চালিত হয়েছেন একেবারে বাস্তব বিবেচনাবোধ দিয়ে; তা হল: জমির ক্ষমতা এবং জেলার সাধারণ অবস্থা।"[৮]

পরবর্তী এই ব্যবস্থার সরকারী অনুমোদন সত্ত্বেও পাঠক লক্ষ্য করবেন যে নতুন পদ্ধতিটি নীতিগতভাবে ভুল ছিল। ক্ষেতের গড় ফসলের ভিত্তিতে কর-নির্ধারণের নীতিই ছিল প্রাচীন ও সঠিক নীতি; যদিও প্রিঙ্গল তা ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেন নি বলে ব্যর্থ হয়েছিলেন। "জমির গড় চরিত্র ও গভীরতা নির্ধারণ করে" কর স্থির করার নতুন পদ্ধতি আপাতদৃষ্টে অবাস্তব ছিল; যদিও উইনগেট তাতে সফল হয়েছিলেন কারণ তিনি সেটাকে কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পরিমিতিবোধ ও উদারতা দিয়ে। জমির ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা তার ফলনের হিসাব করার নিরাপদ ভিত্তি নয়; এবং এই অ-নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপরে করা পরবর্তী-কালের বন্দোবস্তগুলিতে ভূমি-রাজস্বের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে জেলায় দারিদ্র্য ও ব্যাপক দুর্দশা দেখা দিয়েছিল।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ সার্ভের মধ্য দিয়ে বোম্বাইয়ের বর্তমান ভূমি-রাজস্ব

ব্যবস্থার সূচনা ; এবং উক্ত প্রদেশে প্রথম 'রেগুলার সেটেলমেণ্টের' কাজ শুরু হয় পরবর্তী বছর, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণের প্রাক্কালে। এই সেটেল-মেণ্ট কিছুটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা দরকার, কারণ বর্তমান কাল পর্যন্ত বোম্বাইতে কার্যত এই ব্যবস্থাই অনুসরণ করা হয়।

সেটেলমেণ্টের কাজ বহু বছর ধরে চলেছিল এবং ক্রমে ক্রমে তা সমগ্র প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। অভিজ্ঞতা যত বাড়তে লাগল, ততই এই চিন্তা এল যে ভবিষ্যৎ পথ-প্রদর্শনের জন্য তার ফলগুলিকে সংগ্রহ করে নিয়ম প্রণয়ন করা দরকার। 'জয়েণ্ট রিপোর্ট' নামে যা পরিচিত সেই রিপোর্টের দ্বারাই ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে একাজটি করা হয়। এই 'জয়েণ্ট রিপোর্টে' স্বাক্ষর করেছিলেন এইচ. ই. গোল্ডস্মিড, ক্যাপ্টেন উইনগেট ও ক্যাপ্টেন ডেভিডসন।[৯]

"জয়েণ্ট রিপোর্টে' বর্ণিত সেটেলমেণ্টের নীতিগুলি ছিল—প্রথমত, এই যে তা পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি ক্ষেতের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যৌথভাবে জোত বা গ্রামের মূল্যায়নের ভিত্তিতে নয় ; দ্বিতীয়ত ; আগে যে স্বল্পমেয়াদী ইজারা ছিল তার পরিবর্তে ত্রিশ বছরের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ইজারা তাতে মঞ্জুর করা হয়েছিল ; এবং তৃতীয়ত, এতে ফলনের হিসাবের ভিত্তি পরিত্যাগ করে তার জায়গায় জমির আনুমানিক মূল্যকে মূল্যায়নের ভিত্তি করা হয়েছিল। 'জয়েণ্ট রিপোর্ট' থেকে কয়েকটিমাত্র উদ্ধৃতি দিলেই তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

"চাষী যতক্ষণ তার উপর ধার্য কর দিয়ে যাবে ততক্ষণ ক্ষেতে চাষীর দখলী স্বত্ব অটুট থাকে, যদিও প্রত্যেক জমির জন্য তার দায়দায়িত্ব বছরে বছরে নতুন করে স্থির করা হয় ; এবং তার সমস্ত জোতের পরিবর্তে প্রতিটি জমির উপরে কর ধার্য করার ফলে, অবস্থাগতিকে যখন বাঞ্ছনীয় মনে হয় তখনই সে যে কোনো জমির স্বত্ব ত্যাগ করতে পারে, অথবা অনধিকৃত অন্য জমি নিতে পারে, যাতে তার যতদূর সঙ্গতি ততদূর পর্যন্ত দায়দায়িত্ব তার পক্ষে মেটানো সম্ভব হয়। আমাদের জরিপের দ্বারা প্রবর্তিত ত্রিশ বছরের মেয়াদের জন্য নির্ধারিত জমির কর এই ভাবে চাষীকে ত্রিশ বছরের লীজের সমস্ত সুবিধাগুলি এনে দেয় এবং যে-একবছর পর্যন্ত তার দায়িত্বের মেয়াদ বাড়ানো হয় তার জন্য নির্ধারিত কর দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো শর্তই তাকে ভারাক্রান্ত করে না।"

"অভিজ্ঞতায় যাকে বাস্তব কাজের পক্ষে যথেষ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খ শ্রেণীবিভাগ বলে দেখা গেছে, সব ধরনের জমিকেই সেই নয়টি শ্রেণীর একটি হিসেবে ধরে নেবার অভ্যাস আমরা বজায় রেখেছি। একটি বিশেষ ধরনের জমিকে কোন শ্রেণীতে ধরা হবে তা স্থির করার জন্য শ্রেণী-বিভাগকারীর বিচারবুদ্ধির উপর পুরোপুরি

নির্ভর না করে কোন্ জমি কোন্ শ্রেণীতে পড়তে পারে তা স্থির করার উদ্দেশ্যে আমরা কতকগুলি নিয়ম তৈরী করেছি। এদেশে, কিংবা আমাদের কাজকর্ম এখনও পর্যন্ত যে সব স্থান অবধি প্রসারিত হয়েছে অন্তত তার সকল অংশই, জমির উর্বরতা তার আর্দ্রতা গ্রহণ ও রক্ষণক্ষমতার উপরেই প্রধানত নির্ভরশীল বলে এবং এই গুণটি প্রধানত গভীরতার দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যটিকেই আমরা আমাদের আনুমানিক হিসাব তৈরীর সময়ে প্রধান নিয়ামক প্রভাব বলে ধরে নিয়েছি।"

"সমান গভীরতাবিশিষ্ট সকল জমিরই যদি একরকম উর্বরতা থাকত, তা হলে শুধু গভীরতাই তার শ্রেণী-নির্ধারণের পক্ষে যথেষ্ট হত, কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়··· মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তাদের (বিভিন্ন মাত্রার উর্বরতা যুক্ত জমির) তিনটি বর্গে ফেলাই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি, এই তিনটি বর্গকে আবার গভীরতা অনুযায়ী আমাদের মাপকাঠির ন-টি শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করা হয়; নিম্নলিখিত সারণি থেকে তা সহজেই বোঝা যাবে :

শ্রেণী	শ্রেণীর আপেক্ষিক মূল্য, আনায় অথবা এক টাকার ১/১৬ তে	প্রথম বর্গের জমি: সমান মিহি বুনোটের, ঘন কৃষ্ণ বর্ণ থেকে গাঢ় বাদামি	দ্বিতীয় বর্গের জমি: সমান অথচ পূর্বোক্ত জমির চেয়ে মোটা বুনোটের এবং রঙের দিক দিয়েও হাল্কা সাধারণ লাল	তৃতীয় বর্গের জমি: মোটা পাথুরে ও ঝুরঝুরে ধরনের, রঙ হাল্কা বাদামি থেকে ধূসর
	হাতের	মাপে গভীরতা ১	হাত ১ ১/২ ফুট	
১	১৬	১ ৩/৪		···
২	১৪	১ ১/২	১ ৩/৪	···
৩	১২	১ ১/৪	১ ১/২	···
৪	১০	১	১ ১/৪	···
৫	৮	৩/৪	১	···
৬	৬	১/২	৩/৪	১
৭	৪ ১/২	১/৪	১/২	৩/৪
৮	৩	···	১/৪	১
৯	২	···	···	১/৪

"এই সারণির প্রথম কলামে আছে আমাদের মাপকাঠির নয়টি শ্রেণী; দ্বিতীয়

কলামে, সেগুলির আপেক্ষিক মূল্য, সর্বোচ্চ মূল্যকে ১৬ আনা বা এক টাকা হিসাবে ধরে, মূল্য নির্ধারণের এই ধরনটি দেশীয় ব্যক্তিদের কাছে সবচেয়ে পরিচিত।"

"সব ধরনের জমি থেকে এতাবৎ প্রাপ্ত রাজস্বের প্রতিটি খাতের উৎস ও পরিমাণ প্রদর্শন করে বিশদ পরিসংখ্যানযুক্ত বিবরণী দিতে হবে।"

"জেলার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে স্থানীয় অনুসন্ধানের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে এই ভাবে সংগৃহীত ও প্রদর্শিত তথ্য তার অতীত অবস্থাকে যে সব কারণ প্রভাবিত করেছিল তার সন্ধান পেতে আমাদের সাধারণভাবে সক্ষম করে তুলবে; এবং এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান ও তৎসহ জেলার ক্ষমতার সঙ্গে আশপাশের অন্যান্য জেলার ক্ষমতার তুলনার ফলে কত কর বসানো হবে সে সম্পর্কে সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে।"

"কিন্তু একটি বিশেষ জেলায় কত ধার্য করা হবে সেই বিশেষ অঙ্কের বিকল্প হিসাবে এও একই ব্যাপার দাঁড়ায়; এবং তার সীমার অন্তর্ভুক্ত জমি ও চাষের বিভিন্ন ধরনের উপর কী হারে কর বসানো হবে তা স্থির করার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হয় এবং তাতে আলোচ্য অঙ্ক উৎপাদন করা যায়। আর সেটা করার জন্য দরকার হয় কেবল বিভিন্ন ধরনের চাষের জন্য সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করা, যখন অবশ্য আমাদের শ্রেণীবিভাজন মাপকাঠির আপেক্ষিক মূল্য থেকে সমস্ত নিচু হার সঙ্গে সঙ্গে বাদ দেবার মতো হবে।"[১০]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে আমরা বিখ্যাত জয়েণ্ট রিপোর্টের সার কথা পাই, বোম্বাইয়ের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার বনিয়াদটা পাই। এই ব্যবস্থায় জমিতে চাষীর হস্তান্তরযোগ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য অধিকারকে স্বীকার করা হয়, কিন্তু মারাঠা শাসনের অধীনে মিরাসী চাষী যে নির্দিষ্ট ভূমি-করের অধিকার পেতেন সেই সমধিক প্রাচীন অধিকারকে শেষ পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়। জেলার রাজস্বের দাবীকে জেলার অন্তর্ভুক্ত লক্ষ লক্ষ ক্ষেতের মধ্যে বণ্টন করে দেবার জন্য বিশদ ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু সেই দাবীর কোনো সীমা তাতে নির্দিষ্ট করা হয়নি। কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ক্ষেতের ফসলের সমতাপূর্ণ ভিত্তির জায়গায় এক অবাস্তব ভূতাত্ত্বিকভিত্তি এই ব্যবস্থায় আনা হয়। এবং ক্ষেতের আপেক্ষিক মূল্য স্থির করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি ক্ষেতের জমির গভীরতা ও প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য মাসিক দশ থেকে বারো শিলিং বেতনে ঝাঁকে ঝাঁকে শ্রেণী নির্ধারণকারী কর্মচারীদের ছেড়ে দেওয়া হয়। জেলার মোট দাবীকে বিভিন্ন ক্ষেতের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে,

উপরোক্ত প্রণালীতে নির্ধারিত তাদের আপেক্ষিক মূল্য অনুযায়ী, কিন্তু জেলার দাবীটাই ঠিক করা হয়ে অস্পষ্টভাবে "জেলার অতীত ইতিহাস থেকে" এবং জনসাধারণের অতীতের অবস্থা থেকে। এই ভাবে, প্রদেশে ত্রিশ বছরের বৃটিশ শাসনের পর জনসাধারণ যে একটি বিষয়ে কিছুটা আশ্বাস পাবার জন্য সরকারের কাছে প্রত্যাশী ছিল, সে বিষয়ে তারা কোনো সাহায্যই পায়নি, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা তাঁদের নিজেদের দাবীর কোনো সীমা নির্ধারণ করতে রাজী হননি; জনসাধারণের অবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেক দফা বন্দোবস্তের সময়ে সে চাহিদা স্থির করা, অদল-বদল করা, বা বাড়ানোর ক্ষমতা তাঁরা হাতে রেখেছিলেন। যে-ব্যবস্থা রাজস্ব কর্মীদের হাতে প্রত্যেক দফা বন্দোবস্তের সময়ে রাজস্বের দাবী বাড়াবার নিরঙ্কুশ ও অবাধ ক্ষমতা দিয়েছিল, একটা কৃষিপ্রধান জাতিকে চিরকালের জন্য দরিদ্র ও সহায়সম্পদহীন করে রাখার পক্ষে তার চেয়ে ভালো ব্যবস্থা মানুষের বুদ্ধিতে তৈরী করা আর সম্ভব ছিল না। ভূমিকর ঠিক করার ব্যাপারে চাষীর কোনো বক্তব্য বলার অধিকার ছিল না; কর নির্ধারণের ব্যাপারে তার সঙ্গে আলোচনা করা হত না; দাবী স্থির হয়ে যাবার পর তাকে তা মেটাতে বলা হত অথবা পূর্বপুরুষের জমি ছেড়ে অনাহারে থাকতে বলা হত।

নতুন ব্যবস্থার কুফলগুলিকে আমরা যে অতিরঞ্জিত করছি না তা বন্দোবস্তের কাজে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সাক্ষ্য থেকেই দেখা যাবে। কোম্পানির সনদ পুনর্নবীকরণের আগে কোম্পানির ভারতীয় প্রশাসনের সকল শাখা সম্পর্কে পার্লামেণ্টারী তদন্ত হয়। হাউস অব লর্ডস ও কমন্সের সিলেক্ট কমিটি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সনদ নথীবদ্ধ করেন এবং তাঁদের রিপোর্ট রচনা করেন। ১৮৫৩-তে তাঁরা আরো সাক্ষ্য নথীবদ্ধ করেন এবং লর্ডস দাখিল করেন তিনটি রিপোর্ট, কমন্স ছয়টি। এই বিশাল সাক্ষ্য থেকে আমরা গোল্ডফিঞ্চ নামে এক তরুণ অফিসারের সাক্ষ্য বেছে নেব। ইনি নিজে বোম্বাইতে বন্দোবস্তের কাজ করেছেন এবং তা বর্ণনা করেছেন ২০ জুন ১৮৫৩ তারিখে।

"৬৭১৪। জরিপ শেষ হবার পর, কোনো এক ব্যক্তির দখলে যখন আপনি পাঁচ বিঘা [প্রায় দু একর] জমির একটা মাঠ, ধরুন ১১ নং, ক্ষেত দেখলেন, সেখানে কলেকটর কি তার উপর ইচ্ছা মতো রাজস্ব ধার্য করেছিলেন, না কি সেখানকার বসবাসকারী বা মালিককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি ঐ পরিমাণ কর দিতে ইচ্ছুক কি না?

"কর ধার্য করেছিলেন সুপারিন্টেনডেন্ট অব সারভে, চাষীর সঙ্গে কোনো কথাবার্তা না বলে; এবং যখন সেইসব নতুন কর প্রবর্তন করা হল তখন প্রতিটি

ক্ষেতের মালিককে কালেকটরের কাছে ডেকে এনে ভবিষ্যতে তার জমির উপর কী হারে কর ধার্য করা হবে তা জানিয়ে দেওয়া হল ; এবং সেই শর্তে জমি রাখতে চাইলে সে রেখেছে, না চাইলে ছেড়ে দিয়েছে।"

"৬৭২০। ধার্য কর কি সেই জেলার সমস্ত গ্রামের নীট উৎপন্ন ফসলের সঙ্গে সমান ভাবে আনুপাতিক, না তা ওঠা-নামা করে ?

"আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না ; জমির নীট উৎপন্ন ফসলের সঙ্গে ধার্য করের আনুপাতিক হারটা কী, তার শুধু একটা আন্দাজ আমি দিতে পারি।"

"৬৭২২। একজন অফিসার কি গোটা জেলার জরিপের কাজ তত্ত্বাবধান করছেন ?

"হাঁ।"

"৬৭২৩। তাহলে, সমগ্র প্রেসিডেন্সী জুড়ে কর নির্ধারণের নীতি একই রকম ?

"নিশ্চয়ই।"

"৬৭২৪। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব সার্ভে কোন বিভাগের লোক ?

"তিনি ইনজিনিয়ার—ক্যাপ্টেন উইনগেট।"[১১]

গোল্ডফিঞ্চের কাছে মনে হয়েছিল যে "চাষীর সঙ্গে কোন কথাবার্তা না বলে" ভূমিকর নির্দিষ্ট করা এবং তার পর তাকে এই ধার্য কর মেনে নিতে অথবা জমি ছেড়ে দিতে বলাটা ন্যায্য ও সুবিচারপূর্ণ পদ্ধতি। তাঁর মনে হয়নি যে জমির মালিক ছিলেন চাষী, এবং সে জমি তাঁর পূর্বপুরুষরা ভোগ করে আসছেন একটা নির্দিষ্ট ভূমিকরে ; এবং জমি হাতছাড়া করার বিকল্পটির অর্থ হল তাঁর পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। এই বন্দোবস্তের ফলাফলের এক সম্পূর্ণতর বিবরণ "ভিক্টোরীয় যুগে ভারত" নামক আরেকটি রচনায় দেওয়া হবে।

ক্যাপ্টেন উইনগেট সম্পর্কে একথা বলা সমুচিত হবে যে এই খারাপ ব্যবস্থা নিয়ে তিনি কাজ করেছিলেন সহানুভূতি ও উদারতা সহকারে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্পর্কেও সুবিচার করে একথা বলা যায় যে তাঁরা এ ব্যবস্থার অবিচার দেখতে পেয়েছেন এবং মূল্যায়নের কিছুটা সাধারণ সীমা-নির্ধারণের প্রচেষ্টা করেছেন। সনদ পুনর্নবীকরণের তিন বছর পরে তাঁরা ১৭ ডিসেম্বর ১৮৫৬ তারিখের বিখ্যাত 'ডেসপ্যাচ'টি নথীবদ্ধ করেন। তাতে তাঁরা বলেন যে "সরকারের অধিকার খাজনা নয়, খাজনা বলতে চাষের খরচ মেটাবার পর সমস্ত উদ্বৃত্ত ফসল ও কৃষি সামগ্রীর মুনাফা বোঝায়, সরকারের অধিকার শুধু ভূমি-রাজস্বতে।" ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিলুপ্তির পর ভারতের তৎকালীন

সেক্রেটারী অব স্টেট স্যর চার্লস উড (পরবর্তীকালে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স) তাঁর সমধিক বিখ্যাত ১৮৬৪-র 'ডেসপ্যাচে' একথা লিপিবদ্ধ করেন যে তিনি ভূমিকর হিসেবে শুধু একটি ভাগ, খাজনার অর্ধাংশ মাত্র নিতে চান।

কিন্তু, বোম্বাইয়ের ব্যবস্থা অনুযায়ী জমির উৎপন্ন ফসল ও তার অর্থনৈতিক খাজনা কখনই স্থির করা হয়নি এবং প্রতি জেলায় ভূমিকর স্থির হয়েছে জনসাধারণ অতীতে কত দিত ও ভবিষ্যতে কত দিতে পারবে সে সম্পর্কে পরীক্ষা করে; তাই উপরের সদিচ্ছাগুলিকে আর কাজে পরিণত করা যায় নি। যে ব্যবস্থায় চাষীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা হয়নি এবং চাষীরা কোনো ভূমি-আদালতে যেখানে আপীল করতে পারত না, সেখানে রাজস্বের দাবী প্রত্যেক দফা বন্দোবস্তের সময়ে বাড়ানো হত এবং কৃষকসাধারণ সম্পদহীন ও দরিদ্র অবস্থাতেই থাকতেন।

লর্ড ক্যানিং ১৮৫৮ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত ভারতের বড়লাট ছিলেন, তিনি বোম্বাইয়ের তথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ভূমি-রাজস্ব চিরস্থায়ী রূপে বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব করেন; কিন্তু ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনস্থিত ইণ্ডিয়া অফিস কর্তৃক সে প্রস্তাব প্রত্যাখাত হয়। ১৮৮০ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত ভারতের বড়লাট মার্কুইস অব রিপন প্রস্তাব করেন যে ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধি মূল্য বৃদ্ধির যুক্তিসঙ্গত কারণ পর্যন্ত সীমিত করা হোক; কিন্তু ১৮৮৫-তে ইণ্ডিয়া অফিস সেই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে।

ভূমিকরের সুবিচারপূর্ণ ও বোধগম্য সীমা সম্পর্কে মাঝে মাঝে যে সব প্রস্তাব করা হয়েছে তা এই ভাবেই উপেক্ষিত অথবা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে; এবং বর্তমান ব্যবস্থাটি বোম্বাইয়ের চাষীদের চিরকাল সম্পদহীন করে রাখার জন্য মানুষের বুদ্ধিজাত যে কোনো ব্যবস্থার মতোই সুপরিকল্পিত। তাই চাষী ক্রমেই আরো বেশী করে মহাজনের দাসত্বে আবদ্ধ হয়েছে; এবং বোম্বাইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ হয়েছে ভারতের পক্ষে এতাবৎকালের সবচেয়ে ভয়াবহ ও ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে।

১। Bishop Herber's *Memoirs and Correspondence* by his Widow, London, 1830, vol. ii, p. 413. বড় হরফ আমাদের। বিশপ হারবারের উল্লিখিত সময়ের পর বোম্বাই ও মাদ্রাজে ভূমিকর কিছুটা হ্রাস করা হয়। কিন্তু এখনও তা মাত্রাতিরিক্ত এবং যা আরও খারাপ, অনিশ্চিত। এখনও তা "এমন কি অনুকূল বছরগুলিতেও জনসাধারণকে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে রাখে", "কৃষকদের কাছ থেকে আরো কম অর্থ আদায় করা এবং যা আদায় করা হয় তা আরো বেশী পরিমাণ দেশের মধ্যে ব্যয় করা"—ভারতে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে এই প্রতিকারই পঁচাত্তর বছর আগেকার তুলনায় আজ আরো বেশী দরকার।

২। Answers to Queries, 2825,2828, and 2829.

৩। *The Present Land-Tax in India*, by John Briggs, London, 1830.

৪। Manu's *Institutes* থেকে উদ্ধৃত। উপোরোক্ত গ্রন্থের p. 31 দ্রষ্টব্য।

৫। ঐ, p. 108.

৬। *The Present Land-Tax in India.* by John Briggs, pp, 893. 410, 414, 416.

৭। Bombay Administration Report of 1872-73, p. 41.

৮। ঐ. p, 42.

৯। Joint Report. dated 2nd August 1847,

১০। ঐ, paras, 9, 41,•75, 76 and 77.

১১। Fourth Report from the Commons Select Committee, 1853 p. 141.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বার্ড ও উত্তর ভারতে নতুন বন্দোবস্ত (১৮২২-১৮৩৫)

এই গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে বর্ণিত, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ উত্তর ভারতের বন্দোবস্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। স্বত্বের নথীপত্র তৈরী করার জন্য আবশ্যকীয় অনুসন্ধান কর্ম বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। ক্ষেতের ফসল সংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত বিরক্তিকর ও অর্থহীন হয়ে উঠল। সরকারের দাবী—খাজনার ৮০ শতাংশের বেশী—অত্যন্ত কঠোর ও অবাস্তব ছিল। এই ব্যবস্থা তার নিজের কঠোরতার জন্যই ভেঙে পড়ল। প্রয়োজন হল সংস্কারের, এবং দৃশ্যপটে আত্মপ্রকাশ করলেন সত্যকার এক সংস্কারক।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক গভর্ণর-জেনারেল হয়ে ভারতে এসেছিলেন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে, জনসাধারণের এর চেয়ে খাঁটি বন্ধু ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর কখনও পাঠান নি। তিনি তাঁর উত্তর ভারত সফর এবং সেখানে তিনি যা দেখেছেন, কোর্ট অব ডিরেক্টর্স-এর কাছে লেখা এক পত্রে তা বর্ণনা করেন।

"২। মাননীয় কোর্ট ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে অবহিত আছেন যে আমার পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলি সফর অনেকখানিই ১৮২২ এর ৮নং রেগুলেশনের শর্তাদি অনুযায়ী বন্দোবস্তের কাজে কী অগ্রগতি ঘটছে তা ব্যক্তিগত ভাবে দেখে নিজেকে সন্তুষ্ট করার আগ্রহ প্রণোদিত, অগ্রগতিকে আরো ত্বরান্বিত করা সম্ভব কি না কিংবা দেশের সমৃদ্ধি বাড়াবার জন্য মাননীয় কোর্ট যে সব লক্ষ্যে উপনীত হবার কথা ভেবেছেন সেই লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে সমানভাবে উপযোগী অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে বিবেচনা করার আগ্রহ-প্রণোদিত।"

"৪। যেসব অফিসারদের সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছি, তাদের মধ্যে উৎসাহের কোনো অভাব, বুদ্ধির কোনো অভাব আমি দেখতে পাইনি ; কিন্তু তা সত্ত্বেও মাননীয় কোর্টকে এবিষয়ে আশ্বস্ত করা আমার কর্তব্য যে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে যাই দেখানো হোক না কেন, এই সব প্রদেশের বন্দোবস্তের ব্যাপারে কাজ হয়েছে সামান্যই কিংবা একেবারেই হয়নি।"

"৮। মাননীয় কোর্টের গত ৯ ফেব্রুয়ারী তারিখের লিপির ৫৮তম অনুচ্ছেদের মন্তব্যগুলি আমি অকৃত্রিম পরিতোষ সহকারে দেখেছি, তাতে দীর্ঘ মেয়াদী লীজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনাদের বোধের পরিচয় পাওয়া যায়

এবং কোন প্রক্রিয়ায় বন্দোবস্তের কাজ ত্বরান্বিত করা যায় ও অধীনস্থ প্রজাস্বত্বকে রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে আপনাদের অভিমত বিশদভাবে জানা যায়; এ বিষয়ে আপনাদের অভিমত আমার নিজের অভিমতের অত্যন্ত কাছাকাছি।"[১]

সেই বছরেই বোর্ড অব রেভিন্যুর কাছে লিখিত এক পত্রে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮২২ খৃষ্টাব্দের পরিকল্পনার ব্যর্থতার প্রধান প্রধান কারণগুলির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন। খাজনার ৮০ শতাংশের বেশী—সরকারের এই মাত্রাতিরিক্ত দাবীর তিনি নিন্দা করেন এবং এই প্রস্তাব করার সাহস দেখান যে এই দাবী হ্রাস করা উচিত।

তিনি লিখেছিলেন, রেগুলেশনে বলা হয়েছে "যেখানে বৃদ্ধির দাবী করা হবে, সেখানে মূল্যায়ন এমন ভাবে করতে হবে যাতে জমিদারদের ও অন্যান্যদের হাতে যথাক্রমে তাদের দ্বারা ও তাদের মারফৎ প্রদেয় জমার (সরকারের দাবী) উপর নীট ২০ শতাংশ লাভ থাকে, আর মহামান্য লর্ড মনে করেন, যাঁদের মতামত শ্রদ্ধা দাবী করে সেই রাজস্ব অফিসারদের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে জমিদারদের অনুকূলে ভাতা কোনক্রমেই সরকারী জমার ৩০ কি ৩৫ শতাংশের কম হওয়া উচিত নয়; এবং আর যাই হোক, একে কি মূলধন বলে গণ্য করা যায় না, যার দ্বারা উন্নতিসাধন করা যেতে পারে?"

"এতে অবশ্য আদায়ের খরচপত্র বাদ দেওয়া হয়েছে, এবং এ হিসাব করা হয়েছে নীট খাজনার উপরে। জমিদার ও অন্যান্য মালিকের অনুকূলে প্রত্যেক খাতে মোট খাজনা থেকে বাদ দেওয়া হবে সেটাই, মহামান্য লর্ডশিপ যেটা নির্ধারিত করতে ইচ্ছুক হবেন; এবং উপযুক্ত হার যাই হোক, মহামান্য লর্ডশিপ-এর ইচ্ছা অনুসারে এই কথা আপনার বিবেচনার জন্য আমি প্রস্তাব করছি—জমিদারদের অনকূলে মোট খাজনা থেকে যে ভাতা বাদ দেওয়া হবে তার সমগ্রটাই একত্র করা সম্ভব হবে কি না এবং তা এমন ভাবে নির্দিষ্ট করা যায় কিনা যাতে এতকাল যেটা প্রচলিত প্রথা ছিল বলে মনে হয় সেই অফিসারবিশেষের ব্যক্তিগত বিবেচনা অনুযায়ী স্থির হওয়ার পরিবর্তে তা সমানভাবে ও সর্বজনীন ভাবে কার্যকর হয়।[২]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাবে যে সেই ১৮৩১ খৃষ্টাব্দেই লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক পরবর্তী কালের নতুন বন্দোবস্তের গুরুত্বপূর্ণ মূল নীতিগুলি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, অর্থাৎ **দীর্ঘমেয়াদী লীজ**, জমিদার ও প্রজাদের যা উন্নতির প্রণোদনা যোগাবে, এবং **সহনীয় সরকারী দাবী**, যার ফলে তাদের হাতে জমি থেকে প্রাপ্ত লাভের কিছুটা অংশ থাকবে।

আরেকটি বিষয়ও গভর্ণর-জেনারেলের মনোযোগ লাভ করেছিল। সেটি হল উত্তর ভারতের গ্রাম সম্প্রদায়গুলির সংরক্ষণ। গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের তৎকালীন সদস্য ও পরবর্তীকালে ভারতের কার্যকরী গভর্ণর-জেনারেল স্যর চার্লস মেটকাফ তাঁর বহুল-উদ্ধৃত বিখ্যাত 'মিনিটে' একথা জোরালো ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

"গ্রাম সমাজগুলি হল ছোট ছোট প্রজাতন্ত্রবিশেষ, তারা যা যা চায় তার সবকিছুই তাদের নিজেদের মধ্যেই আছে, এবং কোনরূপ বৈদেশিক সম্পর্ক থেকে তারা প্রায় স্বাধীন। যেখানে আর কিছুই স্থায়ী হয় না সেখানে তারা কিন্তু থেকেই যায়। একের পর এক রাজ বংশের পতন ঘটে; একের পর এক রাষ্ট্রবিপ্লব হয়; হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরেজ পালা করে প্রভু হয়: কিন্তু গ্রাম সম্প্রদায়গুলি একই রকম থাকে। গোলযোগের সময়ে তারা সশস্ত্র হয় এবং রক্ষাব্যূহ তৈরী করে; গ্রামের ভিতর দিয়ে বৈরী সেনাবাহিনী চলে যায়; গ্রাম সম্প্রদায় নিজেদের ঘরের দেয়ালের মধ্যে তাদের গবাদি পশুকে জড়ো করে রাখে, শত্রুকে চলে যেতে দেয় অপ্ররোচিত ভাবে। লুণ্ঠন ও ধ্বংস যদি তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং বলপ্রয়োগ যদি অপ্রতিরোধ্য হয়, তবে তারা দূরের বন্ধুভাবাপন্ন গ্রামগুলিতে পালিয়ে যায়, কিন্তু ঝড় যখন চলে যায় তখন তারা আবার ফিরে এসে যে-যার কাজ শুরু করে। কোনো অঞ্চল যদি বছরের পর বছর ধরে ক্রমাগত এমন লুণ্ঠন আর হত্যার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে যাতে সে সব গ্রামে আর বসবাস করা যায় না, তা হলেও ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা গ্রামবাসীরা শান্তিপূর্ণ দখলের ক্ষমতা ফিরে পেলেই আবার প্রত্যাবর্তন করে। এক পুরুষ শেষ হয়ে যেতে পারে, পরবর্তী পুরুষ কিন্তু ফিরে আসবে। ছেলেরা তাদের পিতাদের স্থান গ্রহণ করবে; গ্রাম জনশূন্য করার সময় যাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের বংশধররাই আবার এসে দখল করবে গ্রামের সেই একই জায়গা, তাদের ঘরবাড়ির জন্য সেই একই অবস্থান, সেই একই জমি; আর তুচ্ছ কোনো কারণে তারা বিতাড়িত হবে না, কারণ গোলযোগ ও আলোড়নের সময়ে তারা সাধারণত ঘাঁটি আগলে থাকবে এবং লুঠতরাজ ও অত্যাচার সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করার মতো যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করবে।

"গ্রাম সমাজ-গুলি প্রত্যেকটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক পৃথক রাষ্ট্র। আমার মনে হয় তাদের সম্মিলনই ভারতের জনগণ যত রাষ্ট্রবিপ্লব ও পরিবর্তনের দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন সে সবের মধ্যে তাঁদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে অন্য যে কোনো বিষয়ের চেয়ে বেশী সাহায্য করেছে এবং তাঁদের সুখের পক্ষে, তাঁদের বহুল পরিমাণে মুক্তি ও

স্বাধীনতা ভোগের পক্ষে তা বিশেষ সহায়ক হয়েছে। তাই আমার ইচ্ছা, গ্রাম সম্প্রদায়গুলিকে যেন কখনোই আঘাত দেওয়া না হয় এবং সেগুলিকে ভেঙে ফেলতে পারে এমন প্রবণতাবিশিষ্ট সব কিছুকেই আমি ভয় করি। রায়তোয়ারি বন্দোবস্তে যেটা করা হয়, গ্রাম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, প্রধান ব্যক্তি বা মোড়লের মাধ্যমে গ্রাম সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজস্বের বন্দোবস্তের পরিবর্তে এক একজন চাষীর সঙ্গে বন্দোবস্তের ফলে আমার ভয় হয়, এরকম একটা প্রবণতা থাকতে পারে। এই কারণে, এবং একমাত্র এই কারণেই, রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে সাধারণভাবে প্রবর্তিত হোক, এ আমি চাই না।"[৩]

স্যর চার্লস মেটকাফ সঠিক ভাবেই মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে গ্রাম-সমাজগুলির বিলুপ্তির কারণস্বরূপ রায়তোয়ারি বন্দোবস্তের কথা উল্লেখ করেছেন। এক একজন পৃথক পৃথক চাষীর সঙ্গে যখন বন্দোবস্ত করা হয় তখন গ্রাম-সমাজগুলির অস্তিত্বের কারণই লুপ্ত হয়ে যায়। গ্রাম-সমাজগুলিকে তাদের প্রধান কাজ থেকে বঞ্চিত করে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মুনরো ও এলফিনস্টোনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। উত্তর-ভারতেও গ্রাম-সমাজগুলি গত সত্তর বছরে অদৃশ্য হয়েছে অনুরূপ কারণেই। বৃটিশ সরকার পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা অনুযায়ী ভূমিকরের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন বিশেষ কিছু লোকের উপরে—জমিদার বা গ্রামপ্রধানের উপরে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দায়িত্বশীল রাজস্ব প্রদায়ক ও জমির মালিক না হয়েছে; ফলে গ্রাম-সমাজগুলি ক্ষয় পেল। এবং পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানগুলির ভাবধারায় নিজস্ব অফিসারদের হাতে সমস্ত বিচারবিভাগীয় ও কার্যনির্বাহী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেও সরকার সম্প্রদায়গুলির প্রাচীন ক্ষমতা কেড়ে নিলেন অথবা দুর্বল করলেন, তার ফলে গ্রাম সমাজগুলি শেষ পর্যন্ত ছিন্নমূল গাছের মতো ভেঙে পড়ল। স্বায়ত্তশাসনের এই প্রাচীন ধরনটিকে বাঁচিয়ে রাখার অকৃত্রিম বাসনা সত্ত্বেও—এই ইচ্ছা মুনরো, এলফিনস্টোন ও মেটকাফ ঐকান্তিকভাবে ও সোচ্চারভাবে পোষণ করেছিলেন এবং ব্যক্ত করেছিলেন—তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যসিদ্ধিতে ব্যর্থ হন, কারণ এই ছোট ছোট প্রজাতন্ত্রগুলির কাছ থেকে তাঁরা স্ব-শাসনের ক্ষমতাগুলি কেড়ে নিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন তাঁদের নিজেদের দেওয়ানী আদালত ও কার্যনির্বাহী অফিসারদের হাতে, কারণ জনসাধারণের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি তাঁরা প্রকৃত আস্থা স্থাপন করেননি। ভারতে বৃটিশ শাসনের অন্যতম দুঃখজনক ফল হল গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের সেই ব্যবস্থাটির বিলুপ্তি, যা পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে প্রাচীন কালে বিকাশ লাভ করেছিল এবং সবচেয়ে দীর্ঘকাল রক্ষিত হয়েছিল।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ইতিমধ্যে তাঁর কাউন্সিলরদের সঙ্গে, তাঁর বোর্ড অব রেভিন্যু ও কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন; ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে তিনি অফিসারদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন, তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন তিনি নিজে। তার ফলে ১৮৩৩-এর ৯ নং রেগুলেশন পাস হয়; এই রেগুলেশনই উত্তর ভারতে জমির বন্দোবস্তের প্রকৃত ভিত্তি। এই রেগুলেশন অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় অধিকাংশ মামলাই সেটেলমেণ্ট অফিসারদের আদালত থেকে স্থানান্তরিত করা হয়, উৎপন্ন ফসল ও খাজনার হিসাব সরল করা হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জমির জন্য গড় খাজনার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ক্ষেতের মানচিত্র ও ক্ষেতের রেজিস্টারের সার্বিক ব্যবহার এই সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট করা হয়। সরকারের দাবী মোট খাজনার দুই-তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনা হয়; এবং বন্দোবস্ত করা হয় ত্রিশ বছরের জন্য। এই বন্দোবস্তের কাজ সম্পূর্ণ করতে লেগেছিল ষোল বছর—১৮৩৩ থেকে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে।

এই বিশাল কাজের পরিচালনাভার পড়েছিল যোগ্য ব্যক্তির উপরেই। সেই ব্যক্তি হলেন রবার্ট মের্টিন্স্ বার্ড, উত্তর ভারতে জমির বন্দোবস্তের জনক। মূলত তিনি ছিলেন বিচার বিভাগীয় অফিসার এবং বিচার বিভাগীয় কর্তব্য সম্পাদন কালে তিনি যে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন সেটাই তাঁকে এক বিরাট রাজস্ব প্রশাসক রূপে উন্নততর গুণান্বিত করে তুলেছিল।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি লিখেছিলেন, "যে সব ব্যবস্থা এখন কার্যকর করা হয়েছে তার বৃহত্তর অংশটি বহু বছর আগেই যখন একটা বিচারবিভাগীয় পদে ছিলাম, এবং রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তখনই খাঁটি বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা হিসেবে আমি পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে রেখেছিলাম···

"সাধারণ উপযোগী কোনো পরিকল্পনাকে বাস্তব কাজে রূপায়িত করার কোনো সরকারী সুবিধা একজন বিচার বিভাগীয় অফিসারের নেই। তাই গোরখপুর বিভাগের বন্দোবস্তের কাজ চালাবার জন্য রাজস্ব কমিশনার রূপে নিযুক্ত হবার প্রস্তাবটি আমি সাগ্রহে গ্রহণ করেছি তা আমার উদ্দেশ্য রূপায়ণের আশু উপায় সৃষ্টি করেছে এবং প্রকৃত পরীক্ষার দ্বারা আমার মতামতের যাথার্থ ও সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখার সুযোগ দিয়েছে···

"এবিষয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ আমি দেখিনি যে জমির উপর একটা ন্যায়সঙ্গত ও সহনীয় রাজস্ব নির্ধারণ, যাকে ব্যক্তিগত অধিকার এবং গ্রাম সম্প্রদায়-গুলির চাষের সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত করা যেত যার ফলে আবার এমন নথী তৈরী

করা যেত, এমন নীতি স্থির করা যেত এবং এমন নিরাময়মূলক প্রক্রিয়া চালু করা যেত যা কিনা ভূসম্পত্তি ও কৃষির শ্রীবৃদ্ধিকে কুরে কুরে খাওয়া দুষ্ট ক্ষতের মতো দোষগুলিকে সংশোধন করত।

"এই সমস্ত নীতি অনুযায়ী আমি গোরখপুরে কাজ শুরু করি। পরলোকগত লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তার পরের বছর সেই জেলায় এসে আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত হন এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পত্রে ক্রমাগত যোগাযোগ রক্ষা করি; তার ফলে ১৮৩২ সালে তিনি আমাকে সেই পদগ্রহণে আহ্বান জানান, যে পদে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বন্দোবস্তের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রধানত আমার উপরেই বর্তেছিল···

"মোটের উপর আমি মনে করি একথা বিবেচনা করার কারণ আছে যে জমির উপর একটা সহনীয়, ন্যায্য ও সমতাপূর্ণ দাবী, যা কিনা সম্পত্তির সঞ্চয়ের উপর ও কৃষির সমৃদ্ধির উপর হাত না দিয়েই আদায় করা যায় এবং করা উচিত, সেই রকম দাবীই সাধারণভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[৪]

উত্তর ভারতের বিভিন্ন বিভাগে ও জেলায় বন্দোবস্তের ইতিহাস পর্যালোচনা করার প্রয়োজন এই গ্রন্থে নেই; কিন্তু বোর্ডের রিপোর্টের সঙ্গে সংযোজিত এক বিবরণ থেকে গৃহীত নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান থেকে কর-নির্ধারণের ফলাফল বোঝা যাবে [৩৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য—সম্পাদক]।[৫]

ভারত ছেড়ে যাবার দিন পর্যন্ত এই ছিল রবার্ট বার্ডের কাজের সাধারণ ফলাফল। দশ বছর পরে, হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষী হিসেবে যখন তাঁকে জেরা করা হয় তখন তিনি পরিষ্কার এবং প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন, ভারতে তিনি কী পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

"প্রথমেই আমি সমস্ত জমি জরিপ করার কাজ শুরু করি···তার পরের কাজটি ছিল প্রত্যেকটি ক্ষেত সমেত একটা মানচিত্র তৈরী করা, ঠিক ইংল্যাণ্ডের 'টাইদ [গীর্জায় ব্যয় নির্বাহের জন্য ফসল-চাঁদা ও নবজাত পশুর এক দশমাংশ পরিমাণ দেয় বা সরকারের আদায়িকৃত বাধ্যতামূলক ফসলাদির এক-দশমাংশ ফিউডাল রাজস্ব—সম্পাদক] কমিউটেশন ম্যাপের' মতো···এর পরের কাজ ছিল একজন শিক্ষিত অফিসারকে দিয়ে পেশাদারী ভাবে সীমানা জরিপ করানো, যা থেকে কর্ষিত ও অকর্ষিত জমি দেখা যায় এবং নিয়মিত জরিপের ফলে জ্ঞাত গ্রামের প্রকৃত চেহারাটা দেখা যায়।···তারপরে আমরা এই জমির উপর সরকারের ভূমিকর নির্ধারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে শুরু করি এবং তারপরে, প্রতি গ্রাম থেকে আমাদের যতটা দরকার হবে সেই পরিমাণ নির্দিষ্ট করি···জনসাধারণ তখন

বিভাগ ও জেলার নাম	মোট আয়তন একরে	কর্ষিত এলাকা একরে	চাষের জমির একর পিছু সরকারী রাজস্বের হার		
দিল্লী বিভাগ —			টাকা	আনা	পাই
জেলা হরিয়ানা	১,৬৫৭,৯৭৫	৬৯৬.১৪৭	০	২৪	৪
„ দিল্লী	৩৬৪ ৫৩৪	১৭৪,৬০৫	২	১	৩
„ রোটক	৮৪৪.৬৬৬	৪৭৪,৪৬৫	১	৫	২
„ গুরগাঁও	১৬০,৪৩৭	৬৪৭,৩৫৩	১	৯	০
মীরাট বিভাগ—					
জেলা সাহারানপুর	১,০১৮,৭০৫	৬০৬,৮৪৭	১	১০	৬
„ মুজফ্ফরনগর	৬৯১,৭০৬	৩৯২,৩৭৭	১	১১	২
„ মীরাট	১,৭৭৬,৪৩০	১,০৩৪,০১৬	২	১	৯
„ বুলন্দশহর	১,০২৫,০৯৬	৫৯২.৬৩০	১	৯	৮
„ আলিগড়	১,১১৯,২৩৮	৯০০,৫৬২	১	৪	০
রোহিলখণ্ড বিভাগ—					
জেলা বিজনৌর	১,০২৭,৫৩৩	৪৫৯,৪০৯	২	২	১০
„ মোরাদাবাদ	বলা নেই	বলা নেই	বলা	নেই	
„ বুদাউন	১,৪৫০,৪:৮	৭৫২,১০৩	১	৭	৬
„ পিলিবিট	বলা নেই	বলা নেই	২	০	১
„ বেরিলী	১,১১৬,১৭৪	৬৩৯,৫৭৯	১	১৫	৭
„ শাহজহানপুর	১,৩০৯,২১১	৬৫১,৫৪৯	১	৯	০
আগ্রা বিভাগ—					
জেলা মথুরা	বলা নেই	বলা নেই	বলা	নেই	
„ আগ্রা	৯৩৫,৮১৫	৬৪৬,৮১৮	২	২	৫
„ ফরাক্কাবাদ	১,২৪৭,২৮৮	৬১৪,২৫৩	২	৬	০
„ মৈনপুরী	১,২৮০,৯২৭	৬১৩,৪২২	২	৪	০
„ এটাওয়া	১,০৭১,৭৫৬	৪৭৭,৯০১	২	১১	১০
এলাহাবাদ বিভাগ—					
জেলা কানপুর	১,৪৯৭,৭৯৫	৭৮২,২৭৬	২	১	৩
„ ফতেপুর	৯৯০,৫৮৪	৫০৬,৯০৫	২	১২	৯
„ এলাহাবাদ	১, ৭৯০,২৪৪	৯৯৭,৫০৮	২	২	৬
বেনারস বিভাগ—					
জেলা গোরখপুর	৪,১১৫,২১৪	১,৯২৭,২৩৪	১	১	৩
„ আজিমগড়	১,৬৫২,২৯৩	৭৭৩,৬১৬	১	১৫	৪

এগিয়ে এসে কলেকটরের সঙ্গে দেখা করেন। ভারতে আমাদের কাজকর্ম চালানোর সাধারণ রীতি অনুযায়ী তাঁরা সাধারণত মিলিত হতেন কোনো গাছের তলায় অথবা খোলা মাঠে…বহু ক্ষেত্রেই আপত্তি তোলা হয়েছে; তাঁরা বলেছেন, 'এটা অত্যন্ত চড়া; আমার গ্রাম এত দেবে না; আমাদের গ্রাম গরীব।' তাঁদের তখন বলা হয়েছে যে সমস্ত এলাকা থেকে আমরা সেই পরিমাণ রাজস্ব চাই এবং তাই সেই গ্রাম সম্পর্কে যদি কোনো আপত্তি থাকে তাহলে তাঁদেরই দেখিয়ে দিতে হবে কে বেশী দিতে পারে; এতে তাঁরা নিজেদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতেন…গোটা এলাকার উপর নির্ধারিত করের হার কঠোরভাবে মেনে চলা হত না; আমাদের উদ্দেশ্যও তা ছিল না; কারণ থাকলে আমরা তা কমাতে প্রস্তুত ছিলাম; কিন্তু প্রথমেই থোক টাকায় দাবী করার উদ্দেশ্য ছিল, নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের অবহিত হতে বাধ্য করা এবং তাঁদের পক্ষে সন্তোষজনক এমন একটা বোঝাপড়ায় আসা।"

রবার্ট বার্ড স্বয়ং যা বর্ণনা করেছেন, সেই পদ্ধতিটি কোনমতেই ত্রুটিহীন ছিল না; কিন্তু বোম্বাইয়ের তুলনায় তা অনেক ভালো ছিল; গোল্ডফিঞ্চের মতে, বোম্বাইতে প্রত্যেক চাষীকে বলা হত সরকার-নির্দিষ্ট রাজস্বে যার যার ক্ষেত ব্যবহার করতে, তা না পারলে জমি ছেড়ে দিতে।

জমির ফসলের উপর তিনি যে সরকারী রাজস্ব নির্ধারণ করতেন তার অনুপাত কী ছিল—এই প্রশ্নের উত্তরে রবার্ট বার্ড বলেন: "মোটামুটি আমার ধারণা এই যে সেটা ফসলের এক-দশমাংশের বেশী ছিল না।" তিনি আরো বলেন যে "মাদ্রাজে ও অন্যান্য জায়গায় অধুনা কুখ্যাত যে ভুল ব্যাপারটা হয়েছে তা এই যে **গোড়াতেই খাজনা নির্ধারিত করা হয়েছে অত্যন্ত বেশী এবং তা জনসাধারণকে দীনদরিদ্র করেছে।**"[৬]

রবার্ট বার্ডের বন্দোবস্তের সম্পূর্ণতর বিবরণ 'ভারত ও ভিক্টোরীয় যুগ' নামক আরেকটি গ্রন্থে দেওয়া হবে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা শুধু উত্তর ভারতের ভূমি-রাজস্বের ইতিহাস সম্পূর্ণ করার জন্য আর কয়েকটি কথা যোগ করব।

রবার্ট মের্টিন্‌স্ বার্ড যখন ভারত ত্যাগ করেন তখন তাঁর আরব্ধ ও প্রায়-সমাপ্ত কাজ চলে যায় একজন উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে। জেমস টমাসন ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৩ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির ছোটলাট ছিলেন, এবং তাঁর চেয়ে দয়ালু ও উদারহৃদয় ইংরেজ আর কখনো ভারতে আসেননি। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে রচিত তাঁর "সেটেলমেণ্ট অফিসারদের প্রতি নির্দেশাবলী" ভারতে সংকলিত সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ জমির বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আচরণবিধি। এইগুলি এবং

তার সঙ্গে "কলেকটরদের জন্য নির্দেশাবলী" পাঁচ বছর পরে একসঙ্গে প্রকাশ করা হয় "রাজস্ব অফিসারদের জন্য নির্দেশাবলী" নাম দিয়ে, এবং বহু বছর ধরে এটাই ছিল সরকারী কাজকর্মের প্রামাণ্য আকর-গ্রন্থ। এই নির্দেশাবলীর ভূমিকায় উত্তর ভারতের ভূমি ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নীতিগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

"**প্রথমত,** দেশের বসতিসম্পন্ন সমস্ত অংশটাকেই নির্দিষ্ট সীমানাসহ খণ্ডে খণ্ডে মহাল বা এস্টেট নামে ভাগ করা হয়; প্রতিটি মহালের উপর কুড়ি বা ত্রিশ বছরে মেয়াদের জন্য একটা অর্থ ধার্য করা হয়, সেটা হিসেব করা হয় এমনভাবে যাতে জমির নীট উৎপন্ন ফসলের উপরেও নায্য একটা উদ্বৃত্ত মুনাফা থাকে; এবং সেই অর্থ যাতে যথাসময়ে প্রদান করা হয় সেই জন্য জমি চিরকালের মতো সরকারের কাছে বন্ধক রাখা হয়।

"**দ্বিতীয়ত,** কে বা কারা এই উদ্বৃত্ত মুনাফা লাভের অধিকারী তা স্থির করা হয়। এইভাবে নির্ধারিত অধিকারকে পুরুষানুক্রমে লভ্য ও হস্তান্তর-যোগ্য বলে ঘোষণা করা হয় এবং যারা তা লাভের অধিকারী তাদের গণ্য করা হয় জমির মালিক বলে, মহালের উপর সরকারের নির্ধারিত অর্থের বার্ষিক পরিশোধ তাদের কাছ থেকে বুঝে নেওয়া হয়।

"**তৃতীয়ত,** একটি মহালের সমস্ত মালিকই পৃথক পৃথক ভাবে অথবা একত্রে মহালের উপর সরকার-নির্ধারিত অর্থ প্রদানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও সম্পত্তির দিক দিয়ে দায়ী।"[৭]

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক উত্তর ভারতে যে বিরাট কর্মের সূত্রপাত করেছিলেন তা শেষ করার জন্য টমাসন দশ বছর পরিশ্রম করেন। এবং বেন্টিঙ্ক যেমন মেটকাফ, ট্রেভেলিয়ান ও মেকলের মতো যোগ্য ও বিশিষ্ট সহকর্মী পেয়েছিলেন, তেমনি টমাসনও তাঁর অধীনে যে একদল প্রশাসককে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরাও কোন অংশে কম বিশিষ্ট ছিলেন না। এঁরা হলেন জন লরেন্স, রবার্ট মণ্টগোমারি ও উইলিয়াম মুইর। যে আকাঙ্ক্ষা লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে উজ্জীবিত করেছিল, জনগণের স্বার্থে কাজ করার সেই বাস্তব আকাঙ্ক্ষায় তাঁরাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; দুর্ভাগ্যবশত শতাব্দীর শেষ কয়েক দশকে এই আকাঙ্ক্ষা অনেক কম গোচরীভূত হয়। টমাসনের দশ বছরের ভালো কাজ ইংল্যাণ্ডে স্বীকৃতি লাভ করে; এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ তারিখে মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছায় এক নির্দেশনামা স্বাক্ষরিত হয়, তাতে উত্তর ভারতের এই বিজ্ঞ ও সুযোগ্য প্রশাসককে নিযুক্ত করা হয় এক উচ্চতর পদে – মাদ্রাজের গভর্ণর পদে। কিন্তু এই পুরস্কার এসেছিল অত্যন্ত দেরিতে: সেই দিনই, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩

তারিখেই, জেমস টমাসন মৃত্যুমুখে পতিত হন সেই দেশেই, যে দেশে তিনি জনগণের সেবায় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটি ব্যয় করেছিলেন।

দু-বছর পরে, বেন্টিঙ্কের সরকারী দাবী হ্রাস করার বিজ্ঞজনোচিত নীতির যাথার্থ্য আশাতীত ভাবে প্রমাণিত হল। সেই দাবীকে তিনি হ্রাস করে খাজনার দুই-তৃতীয়াংশ করেছিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল এটাও অত্যন্ত কঠোর ও অকার্যকর। লর্ড ডালহৌসীর শাসনাধীনে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত সাহারানপুর নিয়মাবলীর দ্বারা স্থির হয় যে সরকারী দাবী খাজনার অর্ধেকে সীমাবদ্ধ থাকবে।

"একটি মহালের স্থাবর সম্পত্তি কতটা তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্থির করা দুষ্কর, কিন্তু গড় নীট স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে নিশ্চিততর খবরাখবর আগেকার তুলনায় এখন অনেক বেশী জানা যেতে পারে। এর ফলে কর-নির্ধারণ মাত্রাতিরিক্ত হতে পারে, কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই বললেই চলে যে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে মালিকরা বা সম্প্রদায়গুলি যা সাধারণত দিতে পারে সেই প্রকৃত গড়-সম্পত্তি থেকে দুই-তৃতীয়াংশ বা ৬৬ শতাংশ অনুপাতের দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী। এই কারণেই সরকার 'সেটেলমেন্ট অফিসারদের প্রতি নির্দেশাবলী'র ৫২তম অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়মগুলি ততদূর পর্যন্ত সংশোধন করবেন বলে স্থির করেছেন যাতে রাষ্ট্রের দাবী গড় নীট স্থাবর সম্পত্তির ৫০ শতাংশে সীমাবদ্ধ করা যায়। তার দ্বারা একথা বোঝানো হচ্ছে না যে প্রতিটি মহালের জমা (সরকারী রাজস্ব) নির্ধারিত হবে নীট গড় স্থাবর সম্পত্তির অর্ধেকে, বরং অন্যান্য তথ্য সহ এই সব সম্পত্তির কথা বিবেচনা করে কলেকটরকে একথা মনে রাখতে হবে যে নির্ধারিত নীট সম্পত্তির প্রায় অর্ধেক, আগেকার মতে দুই-তৃতীয়াংশ নয়, হবে সরকারী দাবী। উদ্ধৃত দলিলের ৪৭ থেকে ৫১ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত হুঁসিয়ারী কলেকটরদের মেনে চলতে হবে, বন্দোবস্তের অধীন ভূসম্পত্তিগুলির গড় নীট স্থাবর সম্পত্তি ঠিক করার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং প্রায়শই নিষ্ফল প্রয়াসে কালক্ষয় করা চলবে না।"[৮]

এই ভাবে অর্ধ শতাব্দীব্যাপী ক্রমাগত ভুলভ্রান্তির পর সরকার শেষ পর্যন্ত তার দাবী খাজনার অর্ধেকে সীমাবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সারা ভারতে, যেখানে রাজস্ব চিরস্থায়ীরূপে নির্দিষ্ট হয়নি, সেখানে এখন এটাই স্বীকৃত নীতি। মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে স্যর চার্লস উডের ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের লিপি অনুযায়ী ভূমিকর নির্দিষ্ট হয় খাজনার অর্ধেকে; উত্তর ভারতে ১৮৫৫-এর সাহারানপুর নিয়মাবলী অনুযায়ী তা নির্দিষ্ট হয়েছে খাজনার অর্ধেক। এই নীতি কঠোর ভাবে ও সততার সঙ্গে পালন করলে ভারতে সুশাসনের পক্ষে তা স্পষ্টতই লাভজনক হত।

কিন্তু যে প্রশাসন ব্যবস্থায় রাজস্ব কলেকটররা ইচ্ছামতো রাজস্ব নীতি প্রয়োগ করেন এবং জনসাধারণের যেখানে কোনো বক্তব্য বলার অধিকার নেই, সেই প্রশাসন ব্যবস্থার অনিবার্য ফলই হল এই যে সবচেয়ে পরিষ্কার এবং ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই এমন নিয়মকেও টেনে কঠিন করা হয়, ভুল ব্যাখ্যা করা হয় এবং ফাঁকি দেওয়া হয়। মাদ্রাজে ও বোম্বাইতে কিভাবে তা করা হয়েছে সেকথা অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে। উত্তরভারতে তা কিভাবে করা হয়েছিল, সেকথা স্মরণ করা বেদনাদায়ক। সারা ভারতে ভূমি-রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং যে-সুপারিশ করেছিলেন, এবং যাকে সমর্থন করেছিলেন লর্ড লরেন্স, স্যর চার্লস উড ও স্যর স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট, তা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বাতিল করা হয়। এমন কি যে সাহারাণপুর নিয়মাবলী তখনও পর্যন্ত রাজস্ব সংগ্রাহকদের উপর বাধ্যতামূলক ছিল, তাও কার্যত ফাঁকি দেওয়া হত। সাহারাণপুর নিয়মাবলীর বক্তব্যগুলিতে ভুল বোঝার কিছু নেই। উপরে উদ্ধৃত নিয়মে সরকারী দাবীকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে "গড় নীট স্থাবর সম্পত্তির", "প্রকৃত গড় স্থাবর সম্পত্তির" অর্ধেকে। কিন্তু পরবর্তী কালের বন্দোবস্তে সরকার এর ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে এর অর্থ হল মহালগুলির "সম্ভাব্য ও প্রদানক্ষম" খাজনার অর্ধেক। একটি মহালের বার্ষিক আদায়ীকৃত খাজনা ১২০০ পাউণ্ড হলে, সরকারের দাবী ছিল রাজস্ব হিসেবে ৬৫০ পাউণ্ড, কিংবা হয়তো ৭০০ পাউণ্ড, যুক্তিটা ছিল এই যে খাজনা এরপর ১৩০০ অথবা ১৪০০ পাউণ্ডে উঠতে পারে। শুধু তাই নয়; কাগজে-কলমে ভূমিকর খাজনার অর্ধেক হলেও, শিক্ষা, ডাকঘর প্রভৃতির জন্য অনেকগুলি নতুন কর প্রবর্তন করা হয়েছে এবং তা খাজনার উপর ধার্য করা হয়েছে, যার ফলে জমির ফসলের উপরে সরকারের ভাগের সঙ্গে আরো কিছুটা যোগ হয়েছে। এটা কি দুই অর্থেই—তাদের কানে প্রতিশ্রুতিকর কথা শুনিয়ে তাদের আশার ক্ষেত্রে সে প্রতিশ্রুতি ভেঙে—ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে নেহাৎ বাকচাতুরি নয়?

১। Letter from The Governor-General to the Court of Directors, dated 15th September 1831.

২। Letter to the Board of Revenue, dated 7th April 1831, paragraphs 106 and 107.

৩। Sir Charles T. Metcalfe's Minute, dated 7th November 1830.

৪। T. M. Bird's Report on The Settlement of the North-Western Provinces, dated 21st January, 1842.

৫। এই বিবৃতিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা জমিগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। হরিয়ানা জেলা সম্পর্কিত হিসাবে একটি ভুল সংশোধিত করে দেওয়া হয়েছে। একর ও পাইয়ের ভগ্নাংশ বাদ দেওয়া হয়েছে।

৬। Fourth Report from the Select Committee. 1885 বড় হরফ আমাদের। ফসলের এক-দশমাংশ মনুর প্রাচীন হিন্দু আইন ও হেদায়ার প্রাচীন মুসলমান আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এবং যেখানে বন্দোবস্ত চিরস্থায়ীভাবে হয়নি সেখানে সরকারী রাজস্বের সর্বোচ্চ সীমা এটাই হওয়া উচিত। মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে সরকারী রাজস্ব এখনও অত্যন্ত বেশী ও জনসাধারণকে তা দরিদ্র করে। ১৮৮০-এর দুর্ভিক্ষ কমিশনের কাছে প্রদত্ত বোর্ড ও রেভিন্যুর বিবৃতি (পরিশিষ্ট ৩, পৃ ৩৯৪) অনুযায়ী মাদ্রাজে মোট ফসলের উপরে রাজস্বের শতকরা হার ১২ থেকে ৩১-এর মধ্যে এবং ১৯০১-এর দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বোম্বাইয়ের কিছু কিছু অংশে শতকরা হার ২০।

৭। Selection of Papers relating to Revenue Survey and Assessment in the North-Western Provinces, 1858, pp. 4. 5.

৮। Rule XXXVI, of the Saharanpur Rules of 1855. পাঠকের স্মৃতির পক্ষে এই কথা প্রণিধান করা সহায়ক হবে যে উত্তর ভারতে বড় বড় ভূমি সংস্কারের কাজ হয়েছে প্রতি এগারো বছর অন্তর একবার, এটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। প্রথম বড় ভূমি সংক্রান্ত আইনটি হল ১৮২২-এর ৭নং রেগুলেশান। ১৮২২-এর ৯নং রেগুলেশনে সরকারের দাবী কমিয়ে খাজনার দুই-তৃতীয়াংশ করা হয় এবং সেই সময়েই আর. এম. বার্ডের নতুন বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। ১৮৪৪-এ টমাসনের 'সেটেলমেন্ট অফিসারদের প্রতি নির্দেশাবলী' বলবৎ করা হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে 'সাহারাণপুর নিয়মাবলী' পাস হয়, তাতে সরকারের দাবী কমিয়ে করা হয় খাজনার অর্ধেক।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

অর্থ ও আর্থিক নিকাশ

১৮৩৩-এ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ বিশ বৎসরের জন্য ১৮৩৪-এর এপ্রিল থেকে পুনরায় নতুন করে বলবৎ হয়। এই এ্যাক্টের ফলে যে আর্থিক বন্দোবস্ত-গুলি চালু হয়েছিল এই অধ্যায়ে আমরা সেগুলির প্রতি মনোনিবেশ করব।

সনদে এ কথা ছিল যে এই সময় থেকে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি "সমস্ত সওদাগরী ব্যবসা বন্ধ করে দেবে এবং তার থেকে বিরত থাকবে।" এটাই বিধিবদ্ধ হয়েছিল যে কোম্পানির সমস্ত অঞ্চলগত ঋণ ও অন্যান্য ঋণ ভারতবর্ষের "উক্ত অঞ্চলসমূহের রাজস্বের ওপর ধার্য এবং রাজস্বের ওপরেই প্রদেয় হবে।" ঘোষণা করা হয়েছিল যে ভারতবর্ষের রাজস্ব থেকে কোম্পানিকে "মূলধনী তহবিলের ওপর বৎসরে ১০ পাউণ্ড ১০ শিলিং হারে বাৎসরিক লভ্যাংশ" দেওয়া হবে। আরও বলা হয়েছিল যে "মোট মূলধনের প্রতি ১০০ পাউণ্ডের জন্য কোম্পানিকে ২০০ স্টার্লিং পাউণ্ড প্রদান করা হলে ১৮৭৪-এর পর কোম্পানির লভ্যাংশের দায়মুক্ত হবার অধিকার পার্লামেন্টের থাকবে।" পরিশেষে, এ কথা বিধিবদ্ধ হয়েছিল যে যদি ১৮৫৪-এর পর কোম্পানির অস্তিত্ব না থাকে বা পার্লামেণ্ট কর্তৃক ভারতবর্ষের মালিকানা ও শাসনকার্য থেকে বিচ্যুত হয়, তবে এক বৎসরের মধ্যে উক্ত লভ্যাংশ দাবী করবার অধিকার তাদের থাকবে এবং "এই দাবী জানাবার তিন বৎসরের মধ্যে পূর্বোক্ত হার অনুসারে উক্ত লভ্যাংশ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হবে।"

এই বন্দোবস্তগুলির ওপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ভূমি দখলের জন্য বৃটিশ জাতি নিজেদের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে তারা যে সাম্রাজ্য অর্জন করেছে, যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়েছে এবং প্রশাসন পরিচালনা করেছে ভারতীয় জনগণেরই অর্থে। বৃটিশ জাতি, একটা পয়সাও ছোঁয়ায় নি। যে সওদাগরী কোম্পানি এই সাম্রাজ্য আয়ত্ত করেছিল তারাও তাদের লভ্যাংশ আদায় করেছে এবং দুই যুগ ধরে এই সাম্রাজ্যের রাজস্ব থেকে মুনাফা অর্জন করেছে। ১৮৩৪-এ যখন তারা আর সওদাগর রইল না, তখন ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হল যে ভারতীয় জনসাধারণের ওপর আরোপিত কর থেকে কোম্পানির শেয়ারের লভ্যাংশের অর্থ দেওয়া চলতে থাকবে। এবং শেষ পর্যন্ত যখন ১৮৫৮-তে কোম্পানির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হল তখন তাদের শেয়ারের অর্থ ঋণের

মারফৎ পরিশোধ করা হল, আর এই ঋণটাকে ভারতীয় ঋণ হিসেবে দেখানো হল। এইভাবে সাম্রাজ্য কোম্পানির থেকে রাজমুকুটের অধীনে হস্তান্তরিত হল। কিন্তু ভারতীয়গণই ক্রয় মূল্যটি প্রদান করলেন। আর, এইভাবেই এখন পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জনসাধারণই ঋণের সুদ হিসেবে একটা বিলুপ্ত কোম্পানির শেয়ারের লভ্যাংশের টাকা মিটিয়ে যাচ্ছেন।

১৭৯২ থেকে মহারাণীর সিংহাসন লাভ পর্যন্ত বৎসর অনুযায়ী ভারতীয় রাজস্ব ও কোম্পানির খরচের একটা হিসেব পাঠকের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন।[১] [পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলির তালিকা দ্রষ্টব্য—সম্পাদক]

যদি অর্ধ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাস খুঁজতে চাই, তবে এই নীরস পরিসংখ্যানের বিস্তৃত তালিকার অর্থ ও গুরুত্ব প্রমাণিত হবে। বৃটিশ সরকারের নীতির প্রতিটি পরিবর্তন, যুদ্ধ বা শান্তি ও ব্যয়সঙ্কোচ নীতির প্রতিটি পদক্ষেপ ভারতের অর্থনীতির ওপর ছাপ ফেলেছে। কর্ণওয়ালিস ও বার্লোর সময় থেকে বেন্টিঙ্ক ও মেট্‌কাফের আমল পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে প্রশাসনিক সংস্কার কার্যকরী করা হয়েছে উপরোক্ত সংখ্যাগুলি তার নীরব সাক্ষী।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষ থেকে চলে যাবার পূর্বে অর্থকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে গিয়েছিলেন যাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ সত্তর লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং ১৫ লক্ষ পাউণ্ড উদ্বৃত্ত দেখানো যেতে পারে। এর বার বৎসরের মধ্যেই মারকুইস অব ওয়েলেসলীর অস্থির ও রণলিপ্সু নীতি ব্যয়ের পরিমাণকে এককোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ডে টেনে তুলেছিল, যার ফলে ঘাটতি দাঁড়িয়েছিল বিশ লক্ষ পাউণ্ড। এতেই কোর্ট অব ডিরেক্টার্স অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। যতদিন পর্যন্ত উদ্বৃত্ত সুনিশ্চিত ছিল ততোদিন পর্যন্ত একটি সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের এই সম্মানীয় পরিচালকগণ ভারতবর্ষে শান্তি বা যুদ্ধ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। অধিকৃত অঞ্চল থেকে আর্থিক আগমের পরিমাণই ছিল তাঁদের কাছে প্রশাসনিক গুণাগুণ বিচারের প্রধানতম মানদণ্ড। উদ্বৃত্ত যখন ঘাটতিতে পরিণত হল তখন সেটা আর তাঁরা ক্ষমা করতে পারলেন না। ওয়েলেসলীর যুদ্ধবিগ্রহকে তাঁরা আর অনুমোদন করলেন না, কারণ যুদ্ধবিগ্রহ ব্যয়বহুল ছিল। অমর্যাদার সঙ্গে তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে সেই মহান্ প্রোকন্সালকে ফিরিয়ে আনলেন।

১৭৯৫ থেকে ১৮১০ পর্যন্ত পনেরো বৎসর বঙ্গদেশ সবসময়েই উদ্বৃত্ত দেখিয়েছে, মাদ্রাজ ও বোম্বাই ঘাটতি দেখিয়েছে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমি থেকে একটা স্থির ও নির্দিষ্ট আয় জুগিয়ে বঙ্গদেশ বৃটিশ

	ভূমি-রাজস্ব	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়
১৭৯২-৯৩	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
বাংলা ...	৩,০৯১,৬১৬	৫,৫১২,৭৬১	৩,৮৭৩,৮৫৯
মাদ্রাজ ...	৭৪২,৭৬০	২,৪৭৬,৩১২	২,২২২,৮৭৮
বোম্বাই ...	৭৯,০২৫	২৩৬,৫৫৫	৮৪৪,০৯৬
মোট ...	৩,৯১৩,৪০১	৮,২২৫,৬২৮	৬,৯৪০,৮৩৩
১৭৯৩-৯৪			
বাংলা ...	৩,১৭৭,০২৮	৫,৮৭১,৯৪৫	৩,৭১৪,১৬০
মাদ্রাজ ...	৭৮৯,০৫০	২,১১০,০৮৯	১,৯৭২,২২৪
বোম্বাই ...	৮২,০৫০	২৯৪,৭৩৬	৯০৬,৭৪৫
মোট ...	৪,০৪৮,১২৮	৮,২৭৬,৭৭০	৬,৫৯৩,১২৯
১৭৯৪-৯৫			
বাংলা ...	৩,২৩৫,২৫৯	৫,৯৩৭,৯৩১	৩,৮৬৩,৫৬৬
মাদ্রাজ ...	৮৯১,৬৪০	১,৭৭৫,৭৮২	১,৮৮০,৩৩২
বোম্বাই ...	৭০,২৩৮	৩১২,৪৮০	৮২৩,৯১০
মোট ...	৪ ১৯৭,১৩৭	৮,০২৬,১৯৩	৬,৫৬৭,৮০৮
১৭৯৫-৯৬			
বাংলা ...	৩,১৩০,৬৯৭	৫,৬৯৪, ৯৪	৩,৯৮৬,৭৪৪
মাদ্রাজ ...	৯২৯,২০০	১,৮৯৪,৩০৪	২,১১৯,১৯৬
বোম্বাই ...	৬৪,০৮৫	২৭৭,৫৯৬	৭৮৩,০৫৭
মোট ...	৪,১২৩,৯৮২	৭,৮৬৬,০৯৪	৬,৮৮৮,৯৯৭
১৭৯৬-৯৭			
বাংলা ...	৩,১১৮,৫৫৬	৫,৭০৩,৯০৬	৪,১২৬,৬৪৪
মাদ্রাজ ...	৯০০,৫৩৪	১,৯৯৬,৩২৮	২,৪৪৯,০০০
বোম্বাই ...	৩৯,৭২৪	৩১৫,৯৩৭	৯৩২,৩৯৪
মোট ...	৪,০৫৮,৮১৪	৮,০১৬,১৭১	৭,৫০৮,০৩৮

	ভূমি-রাজস্ব	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়
১৭৯৭-৯৮	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
বাংলা ...	৩,০৯৭,৪৪৩	৫,৭৮২,৭৪১	৪,৩৫১,৯২৬
মাদ্রাজ ...	৭৩২,৯৮৩	১,৯৩৮,৯৫০	২,৬৬৫,২৩২
বোম্বাই ...	৩৮,৮৭২	৩৩৮,১৮৯	৯৯৮,১৬৯
মোট ...	৩,৮৬৯,২৯৮	৮,০৫৯,৮৮০	৮,০১৫,৩২৭
১৭৯৮-৯৯			
বাংলা ...	৩,০৭২,৭৪৩	৬,১৫৩,৬১৫	৪,১৪৬,৯৫৬
মাদ্রাজ ...	৮৫৬,৬৬৬	২,১২৩,৮৩১	৩,৪৪২,০৯৪
বোম্বাই ...	৩৭,০০৭	৩৭৪,৫৮৭	১,২৮০,৩১৫
মোট ...	৩,৯৬৬,৪১৬	৮,৬৫২,০৩৩	৯,১৩৯,৩৬৩
১৭৯৯-১৮০০			
বাংলা ...	৩,২১৩,২৩০	৬,৪৯৮,৪৭৩	৫,০৫৮,৬৬১
মাদ্রাজ ...	৮৮৩,৫৩৯	২,৮২২,৫৩৬	৩,৩১৯,৫৪৭
বোম্বাই ...	৩১,৩৬৪	৪১৫,৬৬৩	১,৫৭৭,১৮২
মোট ...	৪,১২৮,১৩৩	৯,৭৩৬,৬৭২	৯,৯৫৫,৩৯০
১৮০০-১			
বাংলা ...	৩,২১৮,৭৬৬	৬,৬৫৮,৩৩৪	৫,৪২০,৯৬৬
মাদ্রাজ ...	৯৫৭,৭৯৯	৩,৫৪০,২৬৮	৪,৬১৪,৩৮৭
বোম্বাই ...	৪৫,১৩০	২৮৬,৪৫৭	১,৪৩২,৮৩২
মোট ...	৪,২২১,৬৯৫	১০,৪৫৮,০৫৯	১১,৪৬৮,১৮৫
১৮০১-২			
বাংলা ...	৩,২৯৬,৩০৩	৭,১২৭,৯৮৮	৫,৬৪৭,৪১৫
মাদ্রাজ ...	১,০৯৫,৯৭২	৪,৭২৯,৬০৯	৫,৩৪৭,৮০৫
বোম্বাই ...	৫৪,৫৭১	৩০৫,৯৯২	১,৪১৪,৮২৫
মোট ...	৪,৪৪৬,৮৪৬	১২,১৬৩,৫৮৯	১২,৪১০,০৪৫

		ভূমি-রাজস্ব	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়
১৮০২-৩		পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
বাংলা	...	৩,২৯৫,৭৬১	৮,৩৮০,০৮৭	৫,৭৯৮,৮৫৮
মাদ্রাজ	...	৯৩৩,১০৮	৪,৭২৪,৯০৪	৫,১১৭,৭৬৯
বোম্বাই	...	৬৮,০১৫	৩৫৭,৫৪৬	১,৪১০,২৫৩
মোট	...	৪,২৯৬,৮৮৪	১৩,৪৬৪,৫৩৭	১২,৩২৬,৮৮০
১৮০৩-৪				
বাংলা	...	৩,২৫২,৬২১	৮,০৬০,৯৯৩	৬ ১৯৩,৬৩৮
মাদ্রাজ	...	৯২১,৬৪৬	৪,৬৫১,৭৪৪	৬,৩০৬,২৮৪
বোম্বাই	...	৩০৫,৮৬১	৫৫৮,৬৪৮	১,৮৯৫,৪৮৩
মোট	...	৪,৪৮০,১২৮	১৩,২৭১,৩৮৫	১৪,৩৯৫,৪০৫
১৮০৪-৫				
বাংলা	...	৩,২২৫,৪৩৬	৯,৩৩৬,৭০৭	৭,৪৬৪,২৯১
মাদ্রাজ	...	৯৯৩,৮৪৯	৪,৮৯৭,১৪০	৬,৩১২,৬১৩
বোম্বাই	...	৩৮৪,৭৪০	৭১৫,৫৪৮	২,৩৩৮,২৭৯
মোট	...	৪,৬০৪,০২৫	১৪,৯৪৯,৩৯৫	১৬,১১৫,১৮৩
১৮০৫-৬				
বাংলা	...	৩,৩১১,৬৭৩	৯,৫১২,৪৩০	৮,৯৩১,৯৫৮
মাদ্রাজ	...	১,০৯৭,৪১৬	৫,০১৪,৪৯৩	৫,৭২৮,১৬৪
বোম্বাই	...	৪৭১,৩৪৪	৮৪৬,৪৮৬	২,৭৬১,২৯৬
মোট	...	৪ ৮৮০,৪৩৩	১৫,৪০৩,৪০৯	১৭,৪২১,৪১৮
১৮০৬-৭				
বাংলা	...	৩,২৯৬,৬৮৪	৯,১৬০,১৪৯	৯,২৯১,৮২৬
মাদ্রাজ	...	৯৬৩,৪৪০	৪,৬০২,৭২১	৫,০৪২,৮২৯
বোম্বাই	...	৩৮৮,৫৩৬	৭৭২,৮৬৯	২,৪৭৪,২০৯
মোট	...	৪,৬৪৮,৬৬০	১৪,৫৩৫,৭৩৯	১৭,৫০৮,৮৬৪

	ভূমি-রাজস্ব	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়
১৮০৭-৮	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
বাংলা ...	৩,৭২৯,০৯৮	৯,৯৭১,৬৯৫	৭,৭৬০,৯২০
মাদ্রাজ ...	১,০৩৯,৬৭১	৪,৯২৭,৫১৯	৫,৭১৭,২২৮
বোম্বাই ...	৪১৭,১৮৬	৭৭০,৬৯১	২,৩৭২,১৪২
মোট ...	৫,১৮৫,৯৫৫	১৫,৬৬৯,৯০৫	১৫,৮৫০,২৯০
১৮০৮-৯			
বাংলা ...	৩,৮৫১,১২৮	৯,৮১৬,৪৫৮	৭,৮৯৮.৯২৪
মাদ্রাজ ...	১,০৫৭,৬২৮	৪,৯৬৮,৩২১	৫,৪৩১,১৫১
বোম্বাই ...	৪২৭,০৩৩	৭৪০,২৭৬	২,০৬২,৮১৪
মোট ...	৫,৩৩৫,৭৮৯	১৫,৫২৫,০৫৫	১৫,৩৯২,৮৮৯
১৮০৯-১০			
বাংলা ..	৩,৭০৬,২০০	৯,৫৯০,৮৮০	৭.৮১৫,৬৭৫
মাদ্রাজ ...	১,১৮৪,২৫৩	৫,৩৭৩,১৯১	৫,৬৩৭,৩৬৫
বোম্বাই ...	৩৯৬,৪৮২	৬৯১,৯১৪	২,০৮১,৬৭১
মোট ...	৫,২৮৬,৯৩৫	১৫,৬৫৫,৯৮৫	১৫.৫৩৪,৭১১
১৮১০-১১			
বাংলা ...	৩,২৯৫,৩৮২	১০,৬৮২,২৪৯	৭,২৪১,৮৩৯
মাদ্রাজ ...	১,০৭১,৬৬৬	৫,২৩৮,৫৭৬	৫.১১০,৯৭৭
বোম্বাই ...	৪৩৭,১০৮	৭৫৮,৩৭২	১,৫৫৭,১৬৫
মোট ...	৪,৮০৪,১৫৬	১৬,৬৭৯,১৯৭	১৩,৯০৯,৯৮১
১৮১১-১২			
বাংলা ...	৩,২৯৬,৯০৫	১০,৭০৬,১৭২	৭,০৫৮,৮৭১
মাদ্রাজ ...	১,০৪৮,৮৪৪	৫,১৫৬,৭১৭	৪,৬১৯,৬১০
বোম্বাই ...	৪৩৩,৭৮৫	৭৪২-৭২৬	১,৫৪২,৪৮৫
মোট ...	৪,৭৭৯,৫৩৭	১৬,৬০৫,৬১৫	১৩,২২০,৯৬৬

	ভূমি-রাজস্ব	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়
	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
১৮১২-১৩			
বাংলা ...	৩,৩১০,৮৭৪	১০,৩৯০,২৫৭	৭,২২২,৯৩৬
মাদ্রাজ ...	১,১৫৯,৭৭৮	৫,২৫৮,২৪৪	৪,৭৯৯,৬৩০
বোম্বাই ...	৪২০,৩২৩	৬৮৭,৭৮৯	১,৪৯৩,২৬২
মোট ...	৪,৮৯০,৯৭৫	১৬,৩৩৬,২৯০	১৩,৫১৫,৮২৮
১৮১৩-১৪			
বাংলা ...	৩,৩১০,৬১৭	১১,১৭০,৪৭১	৭,১৩৫,১৭২
মাদ্রাজ ...	৮৯২,৭৯৩	৫,২৯৭,০৮৮	৪,৮৯৩,২২৪
বোম্বাই ...	৪০০,৮০২	৭৫৯,১৫২	১,৫৮৯,৩২৯
মোট ...	৪,৬০৪,২১২	১৭,২২৮,৭১১	১৩,৬১৭,৭২৫
১৮১৪-১৫			
বাংলা ...	৭,৩৭০,৭৪১	১১,১৫৫,৯১২	৯,১৪৫,৫৬০
মাদ্রাজ ...	৩,৮৮৯,৫৫৫	৫,৩২২,১৬৪	৫,১৩৪,২৪৬
বোম্বাই ...	৪৮৮,৯৯৮	৮১৯,২০৪	১,৬৭৫,২০০
মোট ...	১১,৭৪৯,২৯৪	১৭,২৯৭,২৮০	১৫,৯৫৫,০০৬
১৮১৫-১৬			
বাংলা ...	৭,৫৬৬,৪৩৯	১১,৩১২,৮৯৬	৯,৮৩৩,০৬২
মাদ্রাজ ...	৩,৬০৯,৬৬৮	৫,১০৬,১০৭	৫,২৮৯,৪৭৬
বোম্বাই ...	৪৬৭,৭৭৭	৮১৮,৮১৬	১,৯৩৭,৪৩০
মোট ...	১১,৬৪৩,৮৮৪	১৭,২৩৭,৮১৯	১৭,০৫৯,৯৬৮
১৮১৬-১৭			
বাংলা ...	৭,৮৭৫,৬৪৭	১১,৮৫৬,৯৫৩	১০,২০০,৩০৩
মাদ্রাজ ...	৩,৮২৬,১০৭	৫,৩৬০,২২০	৫,২০১,৩৯৯
বোম্বাই ...	৪৯৮,১০২	৮৬০,৪০৫	১,৯০২,৪৬০
মোট ...	১২,১৯৯,৮৫৬	১৮,০৭৭,৫৭৮	১৭,৩০৪,১৬২

	ভূমি-রাজস্ব	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়
১৮১৭-১৮	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
বাংলা ...	৭,৬৩৯,১৫৪	১১,৬৯২,০৬৮	১০,৬৮৫,১৫৪
মাদ্রাজ ...	৩,৮৫৬,৪৩৩	৫,৩৮১,৩০৭	৫,৪৭৫,২৫৪
বোম্বাই ...	৮৬৮,০৪৭	১,৩০২,৪৪৫	১,৮৮৫,৭৮৬
মোট ...	১২,৩৬[illegible],৬৩৪	১৮,৩৭৫,৮২০	১৮,০৪৬,১৯৪
১৮১৮-১৯			
বাংলা ...	৮,৫৪৮,১৩৮	১২,৪৩৭,৬৮৫	১১,৯২৫,৩৪৯
মাদ্রাজ ...	৩,৭৯৯,৪১০	৫,৩৬১,৪৩২	৫,৯৭৯,০৪৫
বোম্বাই ...	১,১৪৩,০৪১	১,৬৬ ০২০০	২,৪৯২,১৯৩
মোট ...	১৩,৪৯০,৫৮৯	১৯,৪৫৯ ০১৭	২০,৩৯৬,৫৮৭
১৮১৯-২০			
বাংলা ...	৮,১৬৩,৯১৯	১২,২৪৫,৫২৬	১১,৫৯৮,৪১৯
মাদ্রাজ ...	৩,৭৯১,৯৩১	৫,৪ ৭,০০৪	৫,৬৯৪,৮৪৪
বোম্বাই ...	১,০৭৮,১৬৪	১,৫৭৭,৯৩২	২,৩৯৫,৮৪৪
মোট ...	১৩,০৩৪,০১৪	১৯,২৩০,৪৬২	১৯,৬৮৯,১০৭
১৮২০-২১			
বাংলা ...	৮,১৩৯,৪১৫	১৩,৫৪৭,৪২৩	১১,২৮৭,৩৯৭
মাদ্রাজ ...	৩,৭৩৮,৪৬০	৫,৪০৩,৫০৬	৫,৫৭২,৪৮৯
বোম্বাই ...	১,৮১৮,৩১৪	২,৪০১,৩১২	৩,১৯৭,৩৬৬
মোট ...	১৩,৬৯৬,১৮৯	২১,৩৫২,২৪১	২০,০৫৭,২৫২
১৮২১-২২			
বাংলা ...	৮,২৫৮,৯০৩	১৩,৩৯০,৩৩৯	১০,৮৪১,১০৩
মাদ্রাজ ...	৩,৭০৮,৪০৪	৫,৫৫৭,০২৯	৫,৪০৫,৫৯২
বোম্বাই ...	১,৭৬১,৯৯০	২,৮৫৫,৭৪০	৩,৬০৯,৮৯৪
মোট ...	১৩,৭২৯,২১৭	২১,৮০৩,১০৮	১৯,৮৫৬,৪৮৯

		ভূমি-রাজস্ব	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়
১৮২২-২৩		পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
বাংলা	...	৮,২৬১,৮৪৩	১৪,৩১২,০৪৪	১০,৭৪৬,৩০১
মাদ্রাজ	...	৩,৭৬৯,৩৬৯	৫,৫৮৫,২১০	৫,০৭২,৯৯২
বোম্বাই	...	১,৫৫১,৫৯২	৩,২৭৪,৪৪৭	৪,২৬৪,৪৪৮
মোট	...	১৩,৫৮২,৮০৪	২৩, ৭১,৭০১	২০,০৮৩,৭৪১
১৮২৩-২৪				
বাংলা	...	৮,২১১,২৫১	১২,৯৯২,০৬৯	১১,৩৯৭,০২৪
মাদ্রাজ	...	৩,৭৪১,১০০	৫,৪৯৮,৭৬৫	৬,২২৮,৮২৩
বোম্বাই	...	১,৬০৭,০৮৮	২,৭৮৯,৫৫০	৩,২২৮,১৫০
মোট	...	১৩,৫৫৯,৪৩৯	২১,২৮০,৩৮৪	২০,৮৫৩,৯৯৭
১৮২৪-২৫				
বাংলা	...	৮,০৮১,৪৬২	১৩,৫২৪,২২৩	১৩,৫০৯,৯১০
মাদ্রাজ	..	৩,৭৬৫,২১২	৫,৪৪০,৭৪৩	৫,৭১৪,৮৪৮
বোম্বাই	...	১,২০৮,৭৩৫	১,৭৮৫,২১৭	৩,২৭৯,৩৯৮
মোট	...	১৩,০৫৫,৪০৯	২০,৭৫০,১৮৩	২২,৫০৪,১৫৬
১৮২৫-২৬				
বাংলা	...	৮,১৩৩,৬২৫	১৩,১৫১,০৮০	১৪,৪৫৬,১৬৪
মাদ্রাজ	...	৩,৯৭৮,৬৮২	৫,৭১৪,৯১৫	৫,৭০৪,৮২৯
বোম্বাই	...	১,৬২৭,২৩৭	২,২৬২,৩৯৩	৪,০০৭,০২০
মোট	...	১৩,৭৩৯,৫৪৪	২১,১২৮,৩৮৮	২৪,১৬৮,০১৩
১৮২৬-২৭				
বাংলা	...	৮,৩৫৫,৮০০	১৪,৮১২,৮৩৩	১৩,৯০৪,৩২২
মাদ্রাজ	...	৩,৬৬৯,৩১২	৫,৯৮১,৬৮১	৫,৪৩২,৫৬২
বোম্বাই	...	১,৮৭৩,৪২৭	২,৫৮৮,৯৮৩	৩,৯৭৫,৪১১
মোট	...	১৩,৮৯৮,৫৩৯	২২,৫৮৩,৪৯৭	২৩,৩১২,২৯৫

	ভূমি-রাজস্ব	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়
১৮২৭-২৮	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
বাংলা ...	৮,৩৩১,৬০৪	১৪,৯৭৩,১১০	১৪ ০১২,০৬৩
মাদ্রাজ ...	৩,৬০৫ ২১৬	৫,৩৪৭,৮২৮	৬,০০৭,৫৯৭
বোম্বাই ...	১,৮১৭,৮৭৩	২,৫৪২,৩২৫	৪,০৩৩,৪৭৭
মোট ...	১৩,৭৫৪,৭০৩	২২,৮৬৩,২৬৩	২৪,০৫৩,৮৩৭
১৮২৮-২৯			
বাংলা ...	৮,২০০,৭৭৯	১৪,৮৩৩,৮৪০	১২,৫৬৩,৫৫০
মাদ্রাজ ...	৩,৬৪৯,০১২	৫,৫৭৫,০৪৯	৫,৫০২,২২৪
বোম্বাই ...	১,৭২২,৩৩৫	২,৩৩১,৮০২	৩,৬৫২,৭৮৬
মোট ...	১৩ ৫৭২,১২৬	২২,৭৪০,৬৯১	২১,৭১৮,৫৬০
১৮২৯-৩০			
বাংলা ...	৮,১৯৭,৫৬৩	১৩,৮৫৮,১৭৮	১১,৭১০,৮৭০
মাদ্রাজ ...	৩,৫২২,১০০	৫,৪১৫,৫৮৭	৫,২৫৬,৬৪৭
বোম্বাই ...	১,৫৮৫,৪৩২	২,৪২১,৪৪৩	৩,৬০০,৮৪১
মোট ...	১৩,৩০৫,০৯৫	২১,৬৯৫,২০৮	২০,৫৬৮,৩৫৮
১৮৩০-৩১			
বাংলা ...	৮,২২৮,১৬১	১৪,১১৯,৯১৪	১১,৫৩২,৩৯৮
মাদ্রাজ ...	৩,৪৬০,৩২৯	৫,৩৫৮,২৬০	৫,১০৭,০২০
বোম্বাই ...	১,৬৫০,০৬১	২,৫৪১,১৩৬	৩,৫৯৪,৪৭২
মোট ...	১৩,৩৩৮,৫৫১	২২,০১৯,৩১০	২০,২৩৩,৮৯০
১৮৩১-৩২			
বাংলা ...	৬,৯৪২,৩২৪	১১,৭৪৮.৭৫৭	১৩,৪৬৪,৫২০
মাদ্রাজ ...	৩,২৫২,১ ৭	৪,৪৭২,১৩৭	২,১৬৭,৫৭৪
বোম্বাই ...	১,৩৯৫,৮৯১	২,০৯৬,৩৪৩	১,৪১৬,০৭৯
মোট ...	১১,৫৯০,৩৩২	১৮,৩১৭,২৩৭	১৭,০৪৮,১৭৩

		ভূমি-রাজস্ব	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়
১৮৩২-১৮৩৩		পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
বাংলা	...	৭,০৯৯,২৪৯	১২,২৪৪,৫২৩	১০,৫৩৯,৫২৭
মাদ্রাজ	...	২,৯৪০,৭০৩	৪,১০৮,০৬১	৪,৩১২,৪৫২
বোম্বাই	...	১,৪৪১,৯৮৬	২,১২৫,৩৪০	২,৬৬২,৭৪১
মোট	...	১১,৪৮১,৯৩৮	১৮,৪৭৭,৯২৪	১৭,৫১৪,৭২০
১৮৩৩-৩৪	...			
বাংলা	...	৬,৬৩৭,৯৬১	১১,৬১৬,৯৫৪	৯,৮৮১,৯২৭
মাদ্রাজ	...	৩,১৭৬,৭০৮	৪,৩৫৮,২০৭	৪,৩৮২,৩৬৮
বোম্বাই	...	১,৬২৯,৫৮০	২,২৯২,২০৭	২,৬৬০,০৩৭
মোট	...	১১,৪৪৪,২৪৯	১৮,২৬৭,৩৬৮	১৬,৯২৪,৩০২
১৮৩৪-৩৫	...			
বাংলা	...	৩,২৩৪,৩৩৬	১৫,২৯০,৪১৪	৮,৪৭০,৪৭২
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সমূহ	...	৪,০১৮,৩৪৪	৪,৮৯৯,২৭৪	১,৫৯৪,০২৭
মাদ্রাজ	...	৩,২৫৬,৮৫৫	৪ ৪৮০,০২৫	৪,১২৮,৭৫৩
বোম্বাই	...	১,৫৪৪,১৮৩	২,১৮৬,৯৩৪	২,৫৯১,২৪৪
মোট	...	১২,০৫৩,৭১৮	২৬,৮৫৬,৬৪৭	১৬,৬৮৪,৪৯৬
১৮৩৫-৩৬				
বাংলা	...	৩,৩০৪,২৯৪	৮,২৮৬,২৮৭	৭,৯৪২,৫০১
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সমূহ	...	৪,২১৭,৯৮১	৪,৮৩৮,১৩৩	১,৬৪০,৪৭৮
মাদ্রাজ	...	৩,২৯৭,৬০২	৪,৫৯৯,২৬১	৩,৮৩৯,৭৫৮
বোম্বাই	...	১,৭১৯,৮৯৫	২,৪২৪,৪৪৪	২,৫৭২,০৬৭
মোট	...	১২,৫৩৯,৭৭২	২০,১৭৮,১২৫	১৫,৯৯৪,৮০৪

	ভূমি-রাজস্ব	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়
১৮৩৬-৩৭	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
বাংলা			
(আবগারী শুল্ক সহ)···	৩,৫৭৫,০৫৯	৮,৬১৮,৪৭০	৮,৪৫৫,২৮৭
উত্তর-পশ্চিম			
প্রদেশ সমূহ ···	৪,৪৭৮,৪১১	৫,০৫৬,৪৮৯	১,৭৩৫,৪১৯
মাদ্রাজ ···	৩,১৬১,৪৯০	৪,৬১৮,৩০৯	৪,১৭২,০৮৪
বোম্বাই ···	১,৮৪২,৭৫৯	২,৭০৫,৮৬২	২,৯৯৯,৮৭০
মোট ···	১৩,০৫৭,৭২৫	২০,৯৯৯,১৩০	১৭,৩৬৩,৩৬৮
১৮৩৭-৩৮			
বাংলা			
(আবগারী শুল্ক সহ)···	৩,৬১৫,৯০৫	৯,০৮১,০১৪	৮,৫৩৬,৪২৩
উত্তর-পশ্চিম			
প্রদেশ সমূহ ···	৩,৭৬৫,৯৭৩	৪,৩৬৯,৩৫১	১,৮০৭,২০৯
মাদ্রাজ ···	৩,৪৩১,২৭০	৪,৮১৯,৮৯০	৪,২৯৫,০৩৬
বোম্বাই ···	১,৮৫৮,৫২৫	২,৫৮৮,৫৬৫	২,৯১৪,৮৫৭
মোট ···	১২,৬৭১,৭৪৩	২০,৮৫৮,৮২০	১৭,৫৫৩,৫২৫

জাতিকে ভারতীয় সাম্রাজ্য গঠনে সাহায্য করেছিল। সমস্ত উচ্চাশাপূর্ণ যুদ্ধ এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অন্তর্ভুক্তির ব্যয়ভার বঙ্গদেশ বহন করেছে। এই বৎসরগুলিতে মাদ্রাজ ও বোম্বাই নিজেদের প্রশাসনের মোট ব্যয়ও দেয়নি। ভারতবর্ষ অধিকারের জন্য গ্রেটবৃটেন কোন খরচ দেয়নি।

লর্ড ওয়েলেসলীর ভারত ত্যাগের পর আর্থিক উদ্বৃত্ত পুনঃস্থাপিত হয় এবং ১৮১০ থেকে ১৮১৪-এর মধ্যে ভারতবর্ষের শান্তিপ্রিয় শাসকবৃন্দ বাৎসরিক ব্যয় এককোটি ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ডের সামান্য বেশীতে নামিয়ে এনে বিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ডের উদ্বৃত্ত দেখান। ডিরেক্টরগণ এতে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু মারকুইস অব হেষ্টিংস-এর রণংদেহি প্রশাসনে এই উদ্বৃত্ত বিলীন হয়ে যায়। ১৮১৮-তে মারাঠা যুদ্ধ সমাপ্তির পর আবার ঘাটতি দেখা দিল। ১৮২২-এ বিশ লক্ষ পাউণ্ড উদ্বৃত্ত দেখিয়ে লর্ড হেষ্টিংস ডিরেক্টরগণের কোপ এড়িয়ে যান। বোম্বাই নিজেদের ব্যয় কখনোই বহন করেনি। পেশোয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির

পাঁচ বৎসর পর বোম্বাই দশ লক্ষ পাউণ্ড ঘাটতি উপস্থাপিত করে। আর বঙ্গদেশ ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড উদ্বৃত্ত দেখায়। সুতরাং, কঠোর সত্যের খাতিরে বলা যেতে পারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বঙ্গদেশ যে সম্পদ জুগিয়েছিল, লর্ড ওয়েলেসলীর বিজয়ের মত লর্ড হেষ্টিংসের বিজয়সমূহেরও ব্যয় সেই সম্পদ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছিল।

লর্ড আমহার্স্টের বর্মার যুদ্ধে আবার ভারতের আর্থিক বিপর্যয় ঘটে এবং ১৮২৪ থেকে ১৮২৭ পর্যন্ত ক্রমাগত ঘাটতি দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের বিস্তার ও ভূমিকর সম্পর্কে কড়াকড়ির ফলে এই সময় ভারতীয় রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দু-কোটি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এই বৎসরগুলিতে ব্যয়ের পরিমাণ দু-কোটি তিরিশ বা দু-কোটি চল্লিশ লক্ষে উঠে গিয়েছিল।

তখনই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক প্রবর্তিত শান্তি, ব্যয়সঙ্কোচ ও সংস্কারের নীতির লক্ষণীয় ফলাফল প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। একমাত্র আর্থিক সংস্কারক হিসেবেও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতে প্রেরিত সমস্ত বৃটিশ প্রশাসকগণের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম। কারণ ভারতে আর্থিক সংস্কার বলতে করের যে উৎসগুলি খতিয়ে দেখা হয়নি তার অনুসন্ধান বোঝায় না, বোঝায় ব্যয়সঙ্কোচ। সর্বত্রই ভূমিকরের পরিমাণ হ্রাস করা হয়েছিল এবং তা ছয় বৎসরের (১৮২৫ থেকে ১৮৩১) মধ্যে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড থেকে এক কোটি পনেরো লক্ষ পাউণ্ডে নেমে এসেছিল। কিন্তু ব্যয় হ্রাস এই ক্ষতিটাকে বেশ ভাল করেই পুষিয়ে দিয়েছিল। ১৮১৮-এ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যখন ভারতে পৌছুলেন তখন মোট ব্যয়ের পরিমাণ দু-কোটি চল্লিশ পাউণ্ড। ঘাটতি ছিল দশ লক্ষেরও বেশী। ১৮৩৫-এ তিনি যখন ভারত ত্যাগ করেন তখন মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল এককোটি ষাট লক্ষ পাউণ্ড, উদ্বৃত্ত চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড।

তাঁর মতন প্রশাসকগণ যদি সবসময়েই তাঁর উত্তরসূরী হতেন তাহলে সেটা ভারতের পক্ষে সুখের বিষয় হত। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতিটি ব্যয় সঙ্কোচ সুবিধাভোগী শ্রেণীকে আঘাত করে এবং একটা হৈচৈ-এর সৃষ্টি করে থাকে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রকাশ্য অভিযোগ করা হয়েছিল কোম্পানির শাসনে কোন গভর্ণর জেনারেলকেই সেভাবে অভিযুক্ত করা হয়নি। ভারতীয়দের স্বার্থ দেখবার জন্য বৃটিশ শাসকবর্গ সাহসভরে দেশবাসীর রোষের সম্মুখীন হবেন এটা মানবচরিত্র বিরোধী। বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় ব্যয়বৃদ্ধির জন্য একটা অবিরাম চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, পক্ষান্তরে ব্যয়সঙ্কোচের স্বপক্ষে কেউই নেই। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের আমল থেকে ব্যয় ও সরকারী ঋণের পরিমাণ বিপুলভাবে

বেড়ে গিয়েছে। যারা প্রয়োজন অনুসারেই ব্যয় সঙ্কোচের স্বপক্ষে, সেই জনসাধারণের হাতে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কিছুটা শাসন কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়া ভিন্ন এই ক্রমবর্ধমান অনাচারের কোন সম্ভাব্য প্রতিকার নেই। যাঁরা ব্যয় করেন তাঁদের হাতেই যদি অর্থ সংক্রান্ত সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব থাকে, তা হলে ব্যয় স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। যাঁরা কর দিয়ে থাকেন তাঁদের হাতে যদি কিছুটা কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়া যায়, তা হলে ব্যয় স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়। জগতে সর্বত্রই এই নিয়ম এবং ভারতবর্ষে তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

ওপরে বলা হয়েছে যে ভারতের দৌলত থেকেই ভারতে সমস্ত যুদ্ধ ও বেসামরিক প্রশাসনের খরচ বহন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে এই সমস্ত খরচ দিয়েও 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত ছেচল্লিশ বৎসরে ভারতবর্ষ একটা মোটা উদ্বৃত্ত উপস্থাপিত করেছে।

ওপরে যে পরিসংখ্যানটি দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাবে যে চৌদ্দ বছর যেমন ঘাটতি ছিল তেমনি বত্রিশ বছর উদ্বৃত্ত ছিল। সব মিলিয়ে যেমন ঘাটতির পরিমাণ ছিল এক কোটি সত্তর লক্ষ, তেমনি উদ্বৃত্তেরও পরিমাণ ছিল চার কোটি নব্বুই লক্ষ। কাজেই ভারতীয় প্রশাসনের নীট আর্থিক ফল হল ছেচল্লিশ বৎসরে উদ্বৃত্ত তিন কোটি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু ভারতবর্ষে এই টাকা রাখা যায়নি, সেচ বা অন্যান্য উন্নয়নের কাজেও লাগানো হয়নি। কোম্পানির শেয়ারের অংশীদারদের লভ্যাংশ মেটাবার জন্য সেই টাকা অবিরাম কর হিসেবে ইংলণ্ডে চলে গেছে। যেহেতু ভারতবর্ষ থেকে প্রবাহিত অর্থ লভ্যাংশ মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, কাজেই বর্ধিত ঋণ ঠিক হল—একে বলা হল ভারতের সরকারী ঋণ (Public Debt)। যাঁরা সুদের টাকা যোগাবেন, সেই করদাতাদের বোঝা হল আরও বড়। ভারতের অর্থনীতির করুণ ইতিহাসে এটাই হল সর্বাপেক্ষা বিষাদময় কাহিনী।

১৭৯২-তে সুদ সমেত ভারতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল সত্তর লক্ষের সামান্য বেশী। ১৭৯৯-এ এটাই বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো এক কোটিতে। লর্ড ওয়েলেস্‌লীর যুদ্ধের ফলস্বরূপ ১৮০৫-এ ঐ ঋণের পরিমাণ হল প্রায় দু-কোটি দশ লক্ষ আর ১৮০৭-এ দু-কোটি সত্তর লক্ষ। বহু বৎসর ধরে এই অঙ্কেই তা স্থির ছিল, কিন্তু ১৮২৯-এ ঋণ বেড়ে, গিয়ে দাঁড়ালো তিন কোটি। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের কল্যাণজনক শাসন ঋণের পরিমাণ হ্রাসকে প্রভাবিত করেছিল এবং ১৮৩৬-এর ৩০শে এপ্রিল ঋণের পরিমাণ ছিল দু-কোটি সত্তর লক্ষ।[২]

দুই জাতির মধ্যে একটা সুষম ব্যবস্থাধীনে ভারত নিজেদের প্রশাসনের ব্যয়

বহন করতে পারতো, আর ইংলণ্ড সাম্রাজ্য গঠনের জন্য কোম্পানিকে অর্থ দিতে পারতো—যে সাম্রাজ্য ইংলণ্ডের বাণিজ্য ও ক্ষমতার দিক থেকে এতখানি লাভজনক এবং তার যে সন্তানরা প্রাচ্যে কর্মজীবনের সন্ধানরত তাদের পক্ষে এতখানি সুবিধাজনক। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে যদি দুটি জাতিই লাভবান হত, তা হলে দুটি জাতিই ব্যয়ভার বহন করতে পারত—ভারত ভারতের প্রশাসনিক ব্যয় বহন করত, ইংলণ্ড 'হোম চার্জ' দিত। কিন্তু ভারতে বৃটিশ শাসনের সূচনা থেকেই একটা ভিন্ন নীতি অনুসৃত হয়েছিল। ফল, ভারত থেকে অবিরাম আর্থিক নিকাশ ঘটেছে। বছরের পর বছর তার পরিমাণ বেড়েছে আর একটা অধ্যবসায়ী শান্তিপ্রিয় ও একদা উন্নতিশীল জাতিকে দরিদ্রতর করেছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা যে সময়ের কথা বলছি সেই পুরনো দিনেই চিন্তাশীল ইংরেজগণ এই পরিণাম পূর্বেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

১৮৩৮-এ মণ্টগোমারি মার্টিন লিখেছিলেন, "বৃটিশ ভারতের পক্ষে ৩,০০০,০০০ পাউণ্ডের বাৎসরিক নিকাশ ১২ শতাংশ হারে (চলতি ভারতীয় হার) চক্রবৃদ্ধি সুদে ত্রিশ বৎসরে ৭২৩, ৯৯৭, ৯১৭ স্টার্লিং পাউণ্ডের মতন বিপুল অঙ্কে, অথবা, নিম্নহারে যথা পঞ্চাশ বৎসরের জন্য ২,০০০,০০০ পাউণ্ড ৮,৪০০,০০০,০০০ স্টার্লিং পাউণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছে! এমনকি ইংলণ্ডের পক্ষেও এরকম নিরন্তর পুঞ্জীভূত নিকাশ তাকে অবিলম্বেই দরিদ্র করে তুলত। তা হলে, এর পরিণতি ভারতের পক্ষে কতখানি কঠোর হতে পারে—যে ভারতে একজন মজুরের পারিশ্রমিক হল দিনে দুই পেনি থেকে তিন পেনি?"

"অর্ধ শতাব্দী ধরে আমরা বছরে বিশ থেকে ত্রিশ, কখনো বা চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড ভারতবর্ষ থেকে নিকাশ করে নিয়ে চলেছি। অর্থ গ্রেট বৃটেনে পাঠানো হয়েছে ব্যবসায়িক ফাটকাবাজির ঘাটতি মেটাবার জন্য, ঋণ-সুদ দেবার জন্য, 'হোম এস্টাব্লিশ্মেণ্ট' রাখবার জন্য এবং যাঁরা হিন্দুস্তানে জীবন কাটিয়েছেন তাঁদের সঞ্চিত অর্থ ইংলণ্ডের মাটিতে লগ্নীর জন্য। ভারতবর্ষের মত একটা সুদূর দেশ থেকে বছরে ত্রিশ বা চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ডের নিরন্তর নিকাশ—যা কোনদিন কোনভাবেই ফেরৎ যায় না—তার কুফল পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া মানুষের উদ্ভাবনীশক্তিতে সম্ভব বলে মনে করি না।"[৩]

এই বাৎসরিক আর্থিক নিকাশ সম্বন্ধে যত কথা লেখা ও বলা হয়েছে তার সবটা উদ্ধৃত করতে গেলে একটা পুরো গ্রন্থই ভরে যাবে। সমস্ত উচ্চ চাকুরী থেকে ভারতীয়দের বহিষ্কার করে সেই আর্থিক নিকাশকে আরও ফাঁপিয়ে তোলা হয়েছিল। কাজেই, বাংলা ও মাদ্রাজ, উত্তর ভারত ও বোম্বাই ভারতের এই

চারটি প্রদেশে যে চারজন বিশিষ্ট প্রশাসক কাজ করেছিলেন তাঁদের মতামত নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকছি।

তিন-এর দশকে বাংলার প্রশাসকগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন ঐতিহাসিক নামধারী মাননীয় জন শোর। ভারত সম্পর্কে তাঁর চিন্তাশীল রচনায় তিনি বিশদ ও স্বচ্ছভাবে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

"আমি যখন প্রথম এদেশে পদার্পণ করি তারপর থেকে সতেরো বৎসরের বেশী সময় কেটে গেছে। কিন্তু আমি এখানে পৌঁছবার পর এবং কলকাতায় বছর খানেক থাকবার সময় ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় ভারতবাসীদের ওপর বর্ষিত আশীর্বাদ সম্পর্কে সেদিনের ইংরেজ জনমানসে যে স্থির, স্বচ্ছন্দ ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সে কথা আমি পরিষ্কার স্মরণ করতে পারছি। আমরা যে দেশী সরকারকে উৎখাত করেছি তাদের তুলনায় আমাদের উৎকর্ষ, আমাদের প্রবর্তিত বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের চমৎকার ব্যবস্থা, আমাদের আত্মসংযম, দেশবাসীর কল্যাণের জন্য আমাদের উৎকণ্ঠা—সংক্ষেপে আমাদের সর্বপ্রকার গুণাবলী প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে এত বিস্তারিতভাবে আলোচিত যে তার বিরোধিতা করা প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণের সামিল ছিল। গ্রামের ভিতরে যিনি বহু বৎসর কাটিয়েছেন এমন জনৈক ব্যক্তির কাছে বিপরীত প্রকৃতির কিছু ইঙ্গিত ও প্রমাণ প্রায়শই শুনেছি বলে স্মরণ হচ্ছে। কিন্তু অবিলম্বেই যে ঝড় তোলা হয়েছিল এবং প্রচলিত বিশ্বাসের সত্যাসত্য অনুসন্ধানের ঝুঁকি নিতে পারতেন এমন জনৈক দুর্ভাগা ব্যক্তিবিশেষের মস্তকে বজ্র যে বর্ষিত হয়েছিল, সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসী ব্যক্তিকেও কাহিল করে ফেলার পক্ষে তা ছিল যথেষ্ট।"

"এই ভাবেই ভারতে বৃটিশ প্রশাসনের নীতি ও রীতি সম্পর্কে আমি ক্রমশ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ি। এই কাজে অগ্রসর হয়ে সরকার ও আমাদের জনসাধারণের ধারণা অনুধাবন করতে আমার কোন অসুবিধেই হয়নি। এর অন্যথা হলেই বরং অবাক হতাম। ইংরেজদের মূল নীতি ছিল নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধার বিনিময়ে সমগ্র ভারতীয় জাতিকে সর্বপ্রকারে গোলামে পরিণত করা। যতদূর সম্ভব উচ্চ পরিমাণে তাদের ওপর কর চাপানো হয়েছে। পরপর যে প্রদেশগুলি আমাদের অধিকারে এসেছে সেগুলির প্রত্যেকটিকেই ক্রমশ অধিক পরিমাণে শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে। আর আমাদের গর্ব ভারতীয় শাসকগণ যে রাজস্ব আদায় করতেন আমরা তার কতবেশী রাজস্ব আদায় করছি। সমস্ত সম্মান, মর্যাদা, অথবা যে পদগ্রহণের জন্য নিম্নতম যোগ্যতার ইংরেজকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করাতে হয় সেই পদ থেকেও ভারতীয়গণ বঞ্চিত।"[৪]

ভারতবর্ষ থেকে সম্পদ নিকাশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে শোর অন্যত্র লিখেছেন, "ভারতের সুখশান্তির দিন চলে গেছে। একদা ভারতের যে সম্পদ ছিল তার একটা বিরাট অংশই বাইরে চলে গেছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সুবিধার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বার্থকে যেখানে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে সেই অপশাসনের হীন ব্যবস্থায় ভারতের সমস্ত শক্তিকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে।"[৫]

জন সুলিভ্যান ভারতে গিয়েছিলেন ১৮০৪-এ। মহীশূরের রেসিডেন্ট, কোয়েম্বাটুর-এর কালেকটর, মাদ্রাজ বোর্ডের সভ্য ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের সভ্য—এইসব দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকবার পর ১৮৪১-এ তিনি সে দেশ ছেড়ে চলে আসেন। ১৮৩৩-এ কোম্পানির সনদ নতুন করে বলবৎ করবার উপলক্ষে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং এদেশে সমস্ত উচ্চ চাকুরী থেকে ভারতীয়দের বাদ দেওয়া সম্বন্ধে তিনি দরদ দিয়ে বলেছিলেন।

"৫০৩। বৃটিশ সরকারের অধীনে কাজ করতে এদেশীয়রা বর্তমানে কি কি অসুবিধা বোধ করেন ?

"সমস্ত দায়িত্বশীল ও সবেতন পদ এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গের শাসনে তারা দেশের যে সব বেসামরিক ও সামরিক পদ লাভ করতেন তার সবকিছু থেকে তাদের বাদ দেওয়া।"

"৫০৯।...বৃটিশ সরকারের অধীনে দেশী ব্যক্তিগণ যেসব ব্যবস্থা সব সময়েই ভোগ করেছেন তাতে কি দেশী সরকারের অধীনে যে সব পদ লাভের অধিকার তাদের ছিল বলে তাঁরা মনে করতেন, সেই সব পদের একচেটিয়া অধিকার হারাবার ক্ষতি, সামগ্রিকভাবে না হলেও, বহুলাংশে পুষিয়ে দিচ্ছে না ?

"আমি বলব এই বাদ পড়ার ক্ষতি কিছুতেই পূরণ করতে পারে না।"[৬]

বিশ বৎসর পরে, ১৮৫৩-এ কোম্পানির সনদ যখন আবার নতুন করে বলবৎ করবার জন্য উপস্থাপিত হয় তখন ঐ সাক্ষীকেই আবার জেরা করা হয়েছিল। ঐ সময় তিনি আরও জোরালোভাবে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

"৪৮৬৬। আপনি কি মনে করেন যে তাদের (ভারতীয়দের) এমন ঐতিহ্য আছে যে ঐতিহ্যানুযায়ী পূর্বে দেশী রাজন্যবর্গের আমলে জনসংখ্যার আর্থিক অবস্থা বর্তমান অবস্থা থেকে অনেক ভাল ছিল ?

"সাধারণভাবে বলতে গেলে আমি মনে করি ইতিহাস বলছে যে তাই ছিল। ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায় বহু পুরনো যুগ থেকেই তারা চূড়ান্ত সমৃদ্ধির মধ্যে বাস করেছে।"

"৪৮৬৭। বর্তমানে আমরা যুদ্ধবিগ্রহে যে অর্থ ও জীবন অপচয় করি

তারাতো যুদ্ধবিগ্রহে তার চেয়ে অনেক বেশী অর্থ ও জীবন বিসর্জন দিয়েছে। বিশেষত দেখা যাচ্ছে যে রাজ্য সীমানার বাইরে না গিয়ে তারা রাজ্যের অভ্যন্তরেই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে এই জাতির উন্নততর আর্থিক অবস্থা ও খাল খনন, সেচ ও জলাশয়ের জন্য অর্থ বিন্যাসের সামর্থ্যের কি কারণ আপনি দেখাতে পারেন ?

"আমাদের একটা ব্যয়সাপেক্ষ উপাদান আছে যার থেকে তারা মুক্ত ছিল। সেটা হল ইয়োরোপীয় উপাদান—বেসামরিক ও সামরিক। রাজস্বের একটা বিরাট অংশকেই তা গ্রাস করছে। সেই কারণেই আমাদের শাসন ব্যবস্থা এত বেশী ব্যয়সাপেক্ষ। আমার মনে হয় সেটাই একটা বড় কারণ।"

যখন জন সুলিভ্যানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে সাম্রাজ্যের সামরিক শাসন বৃটিশের হাতে রেখে বৃটিশ এলাকায় তিনি দেশী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন কি না, তখনো তিনি তাঁর মতামতের যুক্তিসংগত উপসংহার থেকে বিচ্যুত হন নি।

"৪৮৯০। ন্যায়বিচারের নীতির খাতিরে আপনি কি বেশ কিছু বৃটিশ এলাকা দেশীয় রাজন্যদের ফিরিয়ে দেবেন ?

"হ্যাঁ।"

"কারণ কি আমরা ওগুলো জবর দখল করেছি বা অন্য উপায়ে দখল করেছি এবং আমাদের ন্যায্য অধিকার বা স্বত্ব নেই বলেন ?

"ন্যায়-নীতি ও আর্থিক মিতব্যয়িতার খাতিরেই আমি একাজ করতাম।"[৭]

জন সুলিভ্যান যতটা অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁর সমসাময়িকগণের মধ্যে দু-একজনই মাত্র ততদূর গিয়েছিলেন। নিজেদের ব্যাপার সংক্রান্ত শাসনের অধিকার থেকে ভারতীয়দের সামগ্রিক বহিষ্কারের অবিচারের কথা কিন্তু তাঁদের অনেকেই জানতেন এবং বুঝতেন।

এই গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে উত্তর ভারতের ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্তে হোল্ট ম্যাকেঞ্জি-র বিশিষ্ট কার্যাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৩০-এ ভারতের রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের কার্যবিবরণীতে নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলি তিনি নথীভুক্ত করে গেছেন। ১৮৩৩-এ হাউস অব কমন্স-এর সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে এই কার্যবিবরণীটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

"যাঁরা জনকল্যাণের সর্বোচ্চ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত এমন কি তাঁরাও জনসাধারণকে কার্যত যে অবজ্ঞার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন তার চেয়ে আশ্চর্যজনক আর কিছু হতে পারে না। কারণ আদিমতম কাল থেকে পৃথিবীতে এমন কোন সরকারের দ্বিতীয় নজীর সম্ভবত নেই, যা কিনা দেশের বেসামরিক প্রশাসনের

মাধ্যমে এমন চরম একনায়কতন্ত্রের নীতিকে চালিয়ে যাচ্ছেন, যদি অবশ্য এই প্রশাসনকে বেসামরিক আখ্যা দেওয়া যায়, মেজাজে যা একান্তই সামরিক। অধিকন্তু এই প্রশাসন সমর দপ্তরের পরিচালনা থেকে দেশী সিপাহীদের যতটা দূরে সরিয়ে রেখেছে—নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারের পরিচালনা থেকে জনসাধারণকে তার চেয়ে অনেক বেশী দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সমস্ত কার্যে—আইন রচনা সংক্রান্ত ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রয়োগ থেকে আরম্ভ করে নিম্নতম সরকারী কর্মচারী নিয়োগ পর্যন্ত একই নীতি পরিব্যাপ্ত।······জনসাধারণের কাজের প্রতিটি খুঁটিনাটিতে সবসময়েই হস্তক্ষেপ করতে আমরা একবার যদি সরকারী কর্মচারীদের আমল দিই বা তার প্রয়োজন মনে করি, তবে কোন আইনরচনার সুযোগ নিয়ে তাদের শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব এ চিন্তা নিরর্থক। দুর্ভাগ্যবশত আমরা বিপরীত নীতি অনুযায়ী কাজ করেছি। প্রতিটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছি, যে লোকায়ত প্রতিষ্ঠানগুলি আছে সেগুলি অবহেলিত হয়েছে, যেখানে নেই সেখানে নতুন করে গঠন করবার কোন প্রচেষ্টাই হয় নি।"৮

কিন্তু ১৮৩২ এ হাউস অব কমন্স-এর সিলেক্ট কমিটিতে যিনি সব চেয়ে নির্ভরযোগ্যতার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তিনি হলেন স্যর জন ম্যালকম। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য গঠনকারীরূপে মুনরো ও এলফিনস্টোন এবং উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের সর্বাপেক্ষা দক্ষ ও সহানুভূতিশীল শাসকবর্গের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত। সাফল্য ও বীরত্ব দেখিয়ে দুটি মারাঠা যুদ্ধে তিনি নিজেকে লক্ষণীয় করে তোলেন। সৌজন্য ও সদাশয়তায় তিনি ভারতীয় সৈনিকবর্গ ও বেসামরিক লোকদের বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। পঁচিশ বৎসরেরও অধিককাল প্রশংসনীয় ভাবে চাকুরী করার পর ১৮২৭-এ তিনি বোম্বাই-এর গভর্ণরের মত উচ্চপদে এলফিনস্টোনের স্থলাভিষিক্ত হন। কাজেই যখন ১৮৩২-এ হাউস অব কমন্স সমক্ষে তাঁকে জেরা করা হয় তখন বৃটিশ রাজত্বে ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে জ্ঞান ও নির্ভরযোগ্যতার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তাঁর সময়ের বা পরবর্তীকালের দু-একজন ইংরেজই সে সমকক্ষতা অর্জন করেছিলেন, আর, কেউই তা কোনদিন অতিক্রম করতে পারেন নি।

"২৭৮। আপনার মতে কি দেশী রাজন্যবর্গের অপশাসনের বিকল্প হিসেবে আমাদের সরকার সংস্থাপন জনসংখ্যার কৃষক ও বণিকশ্রেণীর অংশগুলির উন্নততর সমৃদ্ধির কারণ হয়েছিল ?

"ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ সম্পর্কে আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না, বরং আমার অভিজ্ঞতায় যতদূর সম্ভব ততটাই বলব। আমার মনে হয় না এই

পরিবর্তনে বহু দেশীয় রাজ্যের বণিক, ধনী বা কৃষক শ্রেণী লাভবান হয়েছেন বা হতে পারতেন, যদিও অন্যদের ক্ষেত্রে তা হয়ে থাকতে পারে। ১৮০৩-এ বর্তমান ডিউক অব ওয়েলিংটনের সঙ্গে দক্ষিণ মারাঠা জেলাগুলিতে গিয়ে যা দেখেছিলাম তার চেয়ে উন্নততর কৃষি, জমির সমস্ত প্রকার উৎপাদনের এত প্রাচুর্য এবং বণিক সম্পদ প্রত্যক্ষ করা আজ পর্যন্ত আমার কখনো ঘটেনি। এখানে বিশেষ করে কৃষ্ণা নদী বরাবর অঞ্চলের উল্লেখ করছি। পেশোয়াদের রাজধানী পুণা একটা সমৃদ্ধ ও উন্নতিশীল শহর ছিল। শুষ্ক ও অনুর্বর জমিতে যতটা সম্ভব দাক্ষিণাত্যে ততটাই চাষ হত।……

"মালোয়া সম্পর্কে বলতে পারি…সে অঞ্চল অধিকার এবং বেসামরিক, সামরিক ও রাজনৈতিক প্রশাসন পরিচালনার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে সরকারী নথীপত্র থেকে যতটা সম্ভব এবং অন্যান্য উৎস থেকে সে দেশ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের পর্যাপ্ত সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। পুরোপুরি এই ধারণার বশবর্তী হয়েই কাজে নেমেছিলাম যে ব্যবসাবাণিজ্যের চলন নেই এবং ঋণ-সঞ্চালন ব্যবস্থাও সেখানে থাকতে পারে না। আমি দেখে অবাক হলাম যে রাজপুতানা, বুন্দেলখণ্ড ও হিন্দুস্তান [উত্তর ভারত] তথা গুজরাটের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসাদার ও ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে চিঠিপত্রে উজ্জয়িনী ও অন্যান্য শহরে যেখানে সাহুকার বা চরিত্রবান ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যাঙ্কারেরা ও ঋণ-সঞ্চালন ব্যবস্থা চমৎকারভাবে বিকশিত হয়ে উঠছিল— সে সব জায়গায় বিরাট অঙ্কের আর্থিক লেনদেন অনবরতই চলত। ঐ প্রদেশের ভিতর দিয়ে কেবল বিপুল অর্থের মাল চলাচলই করত না, অধিকন্তু যে বীমা অফিসগুলি ভারতের ঐ অংশের সর্বত্রই বর্তমান এবং প্রধান প্রধান ধনী ব্যক্তিগণ যার সঙ্গে জড়িত, বিপদের সময় দেয় কিস্তির পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেই বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি কখনোই কারবার গুটিয়ে দেয় নি।

…আমার বিশ্বাস হয় না যে আমাদের প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তন ব্যবসায়ী ও কৃষক শ্রেণীর সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিকতর সহযোগিতা করেছে। পূর্বতন রাজন্যবর্গ বা রাজ্য-প্রধানদের বিচক্ষণ শাসন যতটা সহযোগিতা করেছিল ততটা তো কিছুতেই নয়।…

"দক্ষিণ মারাঠা জেলাগুলির সমৃদ্ধির কথা আমি পূর্বেই বলেছি। সে সম্পর্কে নির্দ্বিধায় আমাকে বলতেই হবে যে আমার দেখা ভারতের যে কোন অঞ্চল অপেক্ষা কৃষ্ণানদীর তীরবর্তী পটবর্দ্ধন পরিবার ও অন্যান্য রাজ্যপ্রধানদের অধীনস্থ অঞ্চল কৃষি ও বাণিজ্যে অধিকতর সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। এ কথার উল্লেখ করছি

শাসনব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য, সময় বিশেষে শোষণ চললেও যা সাধারণভাবে অনুগ্র ও পিতৃতুল্য, ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে ; সমস্ত কৃষিকার্য সম্পর্কে হিন্দুদের গভীর জ্ঞান ও প্রগাঢ় অনুরাগ ; শাসনসংক্রান্ত বহুবিষয়ে, বিশেষ করে শহর ও গ্রামের সমৃদ্ধি সাধনে তাদের গভীরতর উপলব্ধি বা নিদেন পক্ষে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর সুষ্ঠুপ্রথা ; ধনী ব্যক্তিদের ও মূলধন লগ্নীকরণের প্রতি উৎসাহ দান ; এবং সর্বোপরি নিজেদের জায়গীরে অধিষ্ঠিত জায়গীরদারগণ ও সেই প্রদেশ-গুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে প্রদেশগুলি মর্যাদাবান ব্যক্তিরাই শাসন করেন, সেখানেই তাঁদের জন্ম ও মৃত্যু ঘটে এবং পুত্র বা নিকট আত্মীয়ই তাঁদের পদের উত্তরাধিকারী হয়। এই ব্যক্তিগণ যদি স্বেচ্ছাচারী উপায়ে অর্থ শোষণ করে থাকেন, তবুও তাঁদের ব্যয় ও প্রাপ্তি সবই নিজেদের অঞ্চলবিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যে সকল কারণে সমৃদ্ধির উন্নতি ঘটে তার শীর্ষে হল গ্রাম ও দেশী প্রতিষ্ঠান তথা সমস্ত শ্রেণীর লোকেদের জীবিকার প্রতি অপরিবর্তনীয় সমর্থন যা কিনা আমাদের ব্যবস্থা যতটুকু অনুমোদন করে তার বহু উর্ধ্বে ”৯

স্যার জন ম্যালকম ও অন্যান্য বিশিষ্ট সাক্ষীগণ এইরূপে যে অনাচারের প্রতি সিলেক্ট কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তার মধ্যে প্রধানত ছিল স্বদেশে সমস্ত উচ্চ চাকুরী হতে ভারতীয়দের বঞ্চিত রাখা এবং বছরের পর বছর ভারতবর্ষ থেকে ভারতীয় রাজস্বের বিরাট অংশ বাইরে পাঠানো। কয়েক বছর আগে বিশপ হেবার যে পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সেটাই ছিল স্বাভাবিক প্রতিকার, অর্থাৎ নিজেদের ব্যাপার সংক্রান্ত প্রশাসনে ভারতীয়দের অধিক সংখ্যায় নিয়োগ এবং ভারতেই ভারতীয় রাজস্ব ব্যয় করা। প্রথম সমস্যা মুনরো, এলফিনস্টোন ও বেন্টিঙ্ক এরই মধ্যে কিছুটা লাঘব করেছিলেন এবং ১৮৩৩-এ কোম্পানির সনদ নতুন করে চালু করবার সময় বৃটিশ পার্লামেন্ট জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়গণকে সমস্ত চাকুরীর ক্ষেত্রে মনোনীত হবার যোগ্য বলে ঘোষণা ক'রে একটি বিখ্যাত ধারা বলবৎ করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এই ধারাটির উল্লেখ করা হবে। দ্বিতীয় প্রশ্নে পার্লামেন্ট উপশমকর কিছুই দিতে পারেন নি। পরন্তু, ১৮৩৪-এর এপ্রিল থেকে যদিও তাঁরা কোম্পানির বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তবুও তাঁরা ভারতীয় রাজস্ব থেকে ১০½ শতাংশ হারে কোম্পানির লভ্যাংশের সুদ মেটাবার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। এ কথা আগেই বলা হয়েছে। ভারতের প্রতি এটা ছিল একটা অবিচার। ১৮৫৮-তে (ভারতীয়) সাম্রাজ্য যখন কোম্পানির হাত থেকে রাজমুকুটের অধীনে এল তখন আর একজন বিশিষ্ট ইংরেজ পুনর্বার এর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন।

২১তম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে বোম্বাই-এর ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্তে স্যর জর্জ উইনগেট আপন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। একটা জঘন্য ব্যবস্থার মধ্যে তিনি কাজ করেছিলেন, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ করুণা ও বিবেচনার সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করেন ও তা সফল করে তোলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর তিনি ভারতীয়দের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। ভারত সম্পর্কে পরিপক্ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে, সরকার কর্তৃক সম্মানিত হয়ে এবং সাধারণত বোম্বাই-এর রাজস্ব বন্দোবস্তের জনকরূপে পরিচিতি লাভ করে তিনি স্বদেশে ফিরে যান। কিন্তু ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক তাঁর অধীর উৎকণ্ঠা ও বেদনার কারণ হয়ে ওঠে। যখন সাম্রাজ্যের শাসনভার রাজমুকুটের অধীনে আসে, তখন নবপ্রবর্তিত ব্যবস্থায় ভারতের প্রতি সুবিচারপূর্ণ ও নিরপেক্ষ আচরণের জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি আবেদন করেন।

"সুতরাং যখন ভারতীয়দের কথা না ভেবে কেবলমাত্র আমাদের স্বার্থের জন্যই ভারত শাসন করেছি, তখন সেই শাসনের ব্যয়ভার বহন করবার জন্য একটি কপর্দকও না দিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের দৃষ্টিতে আমরা স্পষ্টই দোষী প্রমাণিত হই। বৃটিশ স্বার্থ যে মাত্রায় আমাদের ভারতীয় নীতি স্থির করে দিয়েছে, সেই মাত্রানুযায়ী আমাদের দেয় অংশ বিপুল বা সামান্যই হোক যথাযথভাবে তা শোধ করা উচিত ছিল। কিন্তু এ-কাজটি কখনোই করা হয় নি এবং বর্তমানে যে বিপুল ঋণ আমাদের প্রতিকূলে জমে উঠছে তা শোধ করতে বহু বৎসর লাগবে। ইংলণ্ড শক্তিশালী আর ভারত তার পদানত। সবলের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করা দুর্বলের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।"

"ভারতের পরিস্থিতির ওপর এর অর্থনৈতিক প্রভাব প্রসঙ্গে বলা যায় যে গ্রেট বৃটেনকে যে নজরানা প্রদান করা হয় আমাদের বর্তমান নীতিতে সেটাই হল সন্দেহাতীতভাবে সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় বিষয়। যে দেশ থেকে রাজস্ব আহৃত হয় সেই দেশেই তা ব্যয় করা এবং একদেশ থেকে রাজস্ব আহরণ করা ও অন্য দেশে তা ব্যয় করা ফলাফলের দিক থেকে দুটোর মধ্যে বিরাট ফারাক। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে জনসাধারণের কাছ থেকে অবাধে আহৃত কর সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত লোকেদের দিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের ব্যয়ের মারফৎ-ই আবার সেই কর কারিগরী শ্রেণীর কাছে ফিরে আসে। তাতে ভিন্ন রকম বণ্টন ঘটে, কিন্তু জাতীয় আয়ের কোন অপচয় হয় না। সভ্যতায় প্রাগ্রসর দেশগুলিতে, যেখানে যান্ত্রিক আবিষ্কার ও প্রাকৃতিক শক্তির যথাযথ ব্যবহার মানুষের উৎপাদন শক্তিকে প্রসারিত করে, সে সব দেশে জনসাধারণের ওপর বলতে গেলে কোন রকম চাপ

না দিয়েই বিপুল পরিমাণে কর ধার্য করা যায়। কিন্তু যে দেশ থেকে কর আহৃত হয়, যখন সে দেশে আর তা ব্যয়িত হয় না তখন ঘটনাটা ভিন্নতর হয়ে দাঁড়ায়। এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একশ্রেণীর নাগরিকের হাত থেকে অন্য শ্রেণীর নাগরিকের কাছে জাতীয় আয়ের অংশ বিশেষের হস্তান্তরই ঘটে না, বরং কর-পীড়িত দেশ থেকে আহৃত সমগ্র অর্থেরই চরম অপচয় ও বিলুপ্তি ঘটে। জাতীয় উৎপাদনের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে বলা যায় যে ভিন্ন দেশে অর্থ পাঠানো এবং সমুদ্রে অর্থ নিক্ষেপ করা একই ব্যাপার, কারণ যে দেশে অর্থ পাঠানো হল সেই দেশ থেকে সেই অর্থের কোন অংশ কোন ভাবেই কর-পীড়িত দেশে আর ফিরে আসবে না।"

"ন্যায় বিচারের মানদণ্ডেই বিবেচনা করা হোক, কিংবা আমাদের প্রকৃত স্বার্থের খাতিরেই দেখা হোক, ভারতীয় কর মানবতা, সাধারণ বিচার বুদ্ধি ও ধনবিজ্ঞানের স্বীকৃত নীতির পরিপন্থী হিসেবে প্রতিভাত হবে। সুতরাং ভবিষ্যতে ভারত সরকারের সেই সব 'হোমচার্জ' পরিশোধের ব্যবস্থা রাখাই হবে সুবুদ্ধির পরিচায়ক যা প্রকৃতপক্ষে রাজকীয় কোষাগারে জমা কর থেকে দেওয়া হয়। দেখা যাবে যে এই 'চার্জ'গুলি হল ঈস্ট ইণ্ডিয়া স্টকের বার্ষিক লভ্যাংশ, 'হোম ডেট (Home Debt)-এর ওপর সুদ, কর্মচারীদের বেতন, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দফ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অট্টালিকাসমূহ চালু রাখবার খরচ, স্বদেশে থাকাকালীন ভারতের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের সভ্যগণের ছুটি ও অবসরকালীন বেতন, ভারতে চাকুরীরত বৃটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে জড়িত এদেশের সমস্ত রকমের 'চার্জ', এবং ভারতে ও ভারত থেকে বৃটিশ সেনাবাহিনী নিয়ে আসা ও যাওয়া বাবদ খরচের অংশ বিশেষ।"

"যদি ভারত এই নিষ্ঠুর করভার থেকে মুক্তি পেত, এবং ভারতে আহৃত সমস্ত রাজস্ব যদি ভারতেই ব্যয় হত, তা হলে সে দেশের রাজস্ব এমন স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করত যে সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই।"[২০]

এই আবেদন বৃথাই করা হয়েছিল। যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসন লাভ করেন তখন হোম চার্জ ছিল ত্রিশ লক্ষ, আর যখন সেই মহতী সম্রাজ্ঞী লোকান্তরিত হন তখন তা এক কোটি ষাট লক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশের সম্পদ থেকে এই বিপুল আর্থিক নিকাশ জগতের সমৃদ্ধতম দেশকেও দরিদ্র করে তুলবে। এই নিকাশ ভারতকে দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত করেছে। এত ঘন ঘন, বিস্তৃত ও মারাত্মক দুর্ভিক্ষ ভারতের অথবা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনোই ঘটেনি।

১। ১৭৯২-এর পর থেকে মোট রাজস্ব প্রভৃতির সরকারী বিবরণ। ১৮৫৫-এর ২২শে জুন হাউস অব কমন্স কর্তৃক ছাপাবার আদেশ প্রাপ্ত।

২। সঠিক অঙ্ক হল ২৬,৯৪৭,০০০ পাউণ্ড। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রভৃতির ভূমিরাজস্ব ও বণ্টনের বার্ষিক হিসেবে। ১২ই আগস্ট, ১৮৪২-এ হাউস অব কমন্সের আদেশানুযায়ী মুদ্রিত।

৩। Montgomery Martin, *Eastern India*, London, 1838, Introduction to vols. i and iii.

৪। Honourable F. J. Shore, *Notes on Indian Affairs*, London, 1837, Vol. ii, p. 516.

৫। ঐ, p. 28.

৬। Minutes of Evidence taken before the Select Committee, 1832, Vol. i, pp. 65 and 66.

৭। Third Report of the Select Committee, 1853, pp. 19 and 20.

৮। Holt Mackenzie's Minute, dated 1st October, 1830, para 67.

৯। Minutes of Evidence taken before the Select Committee, and etc 1832, vol. VI, pp. 30 and 31.

১০। Major Wingate, *Our Financial Relations with India*, London, 1859, pp. 56-64.

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ – ১৮৩৭-এর দুর্ভিক্ষ

১৮৩৩-এ কোম্পানির সনদ নতুন করে বলবৎ করবার সময় যে আর্থিক বন্দোবস্তগুলি হয়েছিল গত অধ্যায়ে তা বিবৃত হয়েছে। কিন্তু ঐ একই এ্যাক্টে অন্যান্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অনুবিধি রচিত হয়েছিল যা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

১৮০২ ও ১৮০৩-এ উত্তর ভারতে লর্ড ওয়েলেসলির রাজ্যজয় ও সংযোজনের ফলে বঙ্গ প্রদেশ আকারে বড় হয়ে গিয়েছিল। এই উত্তরাঞ্চলকে বঙ্গ প্রদেশের বাইরে এনে একটা পৃথক প্রদেশ গঠন করা হয়েছিল। কাজেই এই সময় থেকে ভারতে তিনটির পরিবর্তে চারটি প্রদেশ ছিল। গত অধ্যায়ে রাজস্ব ও ব্যয়ের যে সারণিটি দেওয়া হয়েছে তাতে এই সময় থেকে 'উত্তর ভারত'-কে একটি ভিন্ন প্রদেশ হিসাবে দেখানো হয়েছে।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল থেকে গভর্ণর জেনারেলগণ সরকারী ভাবে ছিলেন 'বঙ্গের গভর্ণর জেনারেল', তাঁদের ছিল সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা। এই এ্যাক্টের বলে ১৮৩৪-এ ঐ একই পদাধিকারী ব্যক্তি ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হলেন। কাজেই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কই ছিলেন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল। এই সময় পর্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশই নিজের জন্য পৃথক প্রবিধান তৈরী করেছিল। সমগ্র ভারতে প্রযুজ্য এ্যাক্ট এখন গভর্ণর জেনারেল কাউন্সিলে পাশ করাবার ক্ষমতা অর্জন করলেন। এতদিন পর্যন্ত কাউন্সিলে গভর্ণর জেনারেল ছাড়াও চারজন সদস্য ছিলেন। একজন পঞ্চম সদস্যের নিযুক্তির ফলে তা আরও শক্তিশালী হল। এই পঞ্চম সদস্য 'লিগ্যাল মেম্বার' রূপে পরিচিত এবং মেকলেকেই প্রথম 'লিগ্যাল মেম্বার' হিসেবে ভারতে পাঠানো হল। ভারতের জন্য আইনের খসরা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আইন কমিশনারগণকে নিয়োগ করবার ক্ষমতাও গভর্ণর জেনারেলের ছিল এবং আইন কমিশনারদের সভাপতি হিসেবে মেকলে ভারতের বিখ্যাত 'পেনাল কোড'-এর খসড়া তৈরী করেন। পঁচিশ বৎসর পর তা আইনে পরিণত হয়।

ভারতে ইয়োরোপীয়দের বসবাসের ওপর সমস্ত বাধা-নিষেধ দূর করা হয়। কলকাতার পুরনো বিশপের পদ ছাড়াও মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে বিশপের পদ সৃষ্টি

হয়। কোম্পানির ডিরেক্টরগণ কর্তৃক মনোনীত ভারতীয় সিবিল সার্ভিস প্রার্থীদের জন্য ভারত যাত্রার পূর্বে হেইলিবেরি কলেজে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত হয়। ১৭৮৪-র পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট অনুযায়ী সম্রাট্ কর্তৃক মনোনীত কমিশনারগণের কোম্পানির শাসন নিয়ন্ত্রণের যে অধিকার ছিল তা বলবৎ থাকে।

কোম্পানির যোগ্যতম কর্মচারিগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত ভারত শাসন করা অসম্ভব এবং মুনরো, এলফিনস্টোন ও বেণ্টিঙ্ক দায়িত্বশীল বিচার বিভাগীয় পদে শিক্ষিত ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে সে কথা বলা হয়েছে। এই উদার নীতিই এ্যাক্টের একটি বিখ্যাত ধারায় এখন জোরাল ভাবে ঘোষণা করা হল। ধারাটি হল:

"এবং এটা বিধিবদ্ধ হোক যে উক্ত অঞ্চলের কোন দেশীয় ব্যক্তি কিংবা সেখানে বসবাসকারী ও ঐ দেশ জাত হিজ ম্যাজেষ্টির কোন প্রজা কেবলমাত্র তার ধর্ম, জন্মভূমি, বংশ, বর্ণ বা এর যে কোন একটির জন্য কোম্পানির অধীন কোন স্থান, পদ বা চাকুরী গ্রহণে অযোগ্য হবেন না।"

এই এ্যাক্ট যখন পাশ হয় মেকলে তখন হাউস অব কমন্সে উপস্থিত। এই ধারাটির ওপর তাঁর বিখ্যাত ভাষণের উদ্ধৃতি বহুবারই দেওয়া হয়েছে এবং আবার দেওয়া হচ্ছে:

"বিলে একটি অংশ আছে যার ওপর, অন্যত্র যে সব আইন পাশ হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা বলবার জন্য দুর্নিবার অনুপ্রেরণা অনুভব করছি। আমি সেই বিজ্ঞ, বদান্য, উদার ধারাটির পরোক্ষ উল্লেখ করছি যা বিধিবদ্ধ করেছে যে আমাদের ভারতীয় সাম্রাজ্যের যে কোন দেশীয় ব্যক্তিই বর্ণ, বংশ বা ধর্মীয় কারণে পদাধিকার লাভে অনুপযুক্ত হবেন না। স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তিগণ কৌতুকচ্ছলে প্রদত্ত সমস্ত ডাকনামের মধ্যে যেটাকে সব চাইতে খারাপ ডাকনাম বলে মনে করেন সেই নামে পরিচিত হবার ঝুঁকি নিয়ে—দার্শনিক রূপে খ্যাত হবার ঝুঁকি নিয়ে—আমাকে বলতেই হবে যে, যে-বিলে এই ধারাটি আছে সেই বিলটি যাঁরা রচনা করতে সাহায্য করেছিলেন আমিও তাঁদের একজন ছিলাম—এই গর্ব আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত করে যাব।...

"বার্ণিয়ার বলেছেন যে, হীন অত্যাচারী, যাদের আমরা ভারতে দেখেছি, তারা যখন কোন বিশিষ্ট প্রজার ক্ষমতা ও দৃঢ়তা সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়তেন এবং তবুও তাকে হত্যা করার সাহস পেতেন না তখন প্রতিদিন তাকে একমাত্রা পোস্ত দেওয়া হত। পোস্ত হল আফিম থেকে প্রস্তুত দ্রব্য বিশেষ। এর ফলে কয়েক মাসের

মধ্যেই সেই হতভাগ্যের দৈহিক ও মানসিক সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে যেত আর সে তাতে আসক্ত হয়ে পড়ত। এইভাবে তাকে একটা অক্ষম জড়বুদ্ধিতে পরিণত করাই ছিল হীন অত্যাচারীদের রীতি। চোরাগোপ্তার থেকেও বীভৎস এই ঘৃণ্য অপকৌশল যাঁরা প্রয়োগ করতেন তাঁদের পক্ষেই সেটা শোভা পেত। ইংরেজ জাতির কাছে এটা কোন আদর্শ হতে পারে না। আমাদের শাসনে বশীভূত করবার অতি সাধারণ উদ্দেশ্যে ঈশ্বর যাদের ভার আমাদের ওপর অর্পণ করেছেন সেই মহান জাতিকে হতবুদ্ধি ও চলচ্ছক্তিহীন করে রাখবার জন্য সমগ্র সমাজের ওপর পোস্ত প্রয়োগে আমরা কখনোই সম্মতি দেব না। সে ক্ষমতার কি মূল্য আছে যার ভিত্তি হল পাপ, অজ্ঞতা আর দৈন্য,—শাসক হিসেবে শাসিতের প্রতি যে সব কর্তব্য পালনে আমরা বাধ্য, যে ক্ষমতা আমরা কেবলমাত্র সেই সব পবিত্রতম কর্তব্য লঙ্ঘন করেই ধরে রাখি—সাধারণের তুলনায় অনেক বেশী উঁচু রাজনৈতিক উদারতা ও জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত জাতি হিসেবে যে কর্তব্য তিন হাজার বছরের অত্যাচার ও পুরোহিততন্ত্রের অপকৌশলে অপক্লিষ্ট একটি জাতির প্রতি পালনে আমরা বাধ্য? আমরা স্বাধীন, আমার সভ্য, এর কোন মূল্য নেই যদি আমরা মানব জাতির একটি অংশের সমপরিমাণ স্বাধীনতা ও সভ্যতাকে ঈর্ষা করি। যাতে আমরা তাদের বশ্য করে রাখতে পারি এজন্যই কি ভারতীয়দের অজ্ঞ করে রাখব? কিংবা আমরা কি মনে করি যে তাদের উচ্চাভিলাষ জাগিয়ে না তুলেই তাদের জ্ঞানদান করতে পারব? অথবা কোন বৈধ নির্গমন পথের ব্যবস্থা না করেই তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে চাই? কে এই প্রশ্নগুলির যে কোনটির হ্যাঁ-বোধক উত্তর দেবেন? তবুও যাঁরা মনে করেন যে উচ্চ সরকারী পদ থেকে দেশীয় ব্যক্তিদের সরিয়ে রাখা কর্তব্য তাঁরা প্রত্যেকেই একটি প্রশ্নের হ্যাঁ-বোধক উত্তর নিশ্চয়ই দেবেন। ভয়-ডর আমার নেই। কর্তব্যের পথ আমাদের সামনে সিধে। আর বিজ্ঞতা, জাতীয় সমৃদ্ধি ও জাতীয় সম্মানের পথও এটাই।

"আমাদের ভারতীয় সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ ঘন আঁধারে আচ্ছন্ন। ইতিহাসে যার কোন নজির নেই এবং যা নিজেই একটি ভিন্নতর শ্রেণীর রাজনৈতিক ঘটনা তার অদৃষ্টে কি সঞ্চিত আছে সে সম্পর্কে কিছু অনুমান করাও দুঃসাধ্য। যে নিয়ম এর ক্ষয় বা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে তা এখনও আমাদের অজানা। এমন হতে পারে যতদিন আমাদের ব্যবস্থাকে তারা উত্তীর্ণ হয়ে না যাবে, ততদিন আমাদের ব্যবস্থাধীনে ভারতীয় জনমানসের প্রসার ঘটবে; সুশাসনের দ্বারা অধিকতর সুষ্ঠু প্রসাশনের উপযোগী করে আমরা আমাদের প্রজাদের শিক্ষিত করে তুলতে পারি; ইয়োরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে তারা ভবিষ্যতে ইয়োরোপীয়

বিধিব্যবস্থার দাবী তুলতে পারে। এ রকম দিন কোনদিন আসবে কিনা জানিনা। কিন্তু আমি তাকে বাধা দেবার কিংবা ঠেকিয়ে রাখবার কোন প্রচেষ্টাই করব না। যখনি সে দিন আসুক না কেন, ইংরেজদের ইতিহাসে সেটাই হবে সর্বাপেক্ষা গৌরবের দিন। একটা মহান জাতিকে দাসত্ব ও কুসংস্কারের গভীরতম তলে নিমজ্জিত অবস্থায় আবিষ্কার করে তাদের এমনভাবে শাসন করা হল যে নাগরিকের সমস্ত অধিকারের তারা অভিলাষী ও উপযুক্ত হয়ে উঠল—এককভাবে আমরাই সে গৌরবের অধিকারী হতে পারি। রাজদণ্ড আমাদের হাত থেকে খসে যেতে পারে। অভাবনীয় দুর্ঘটনা আমাদের নীতির বিজ্ঞতম পরিকল্পনাকে তচ্‌নচ্‌ করে দিতে পারে। আমাদের সামরিক বাহিনীর বিজয় ব্যাহত হতে পারে। কিন্তু এমন বিজয়ও আছে যা কোন অঘটন থেকে অনুসরিত নয়। এমন সাম্রাজ্য আছে যা পতনের সমস্ত স্বাভাবিক কারণ থেকে মুক্ত। সেই বিজয় হল বর্বরতার বিরুদ্ধে বিচার-বুদ্ধির শান্তিপূর্ণ বিজয়। আর সে সাম্রাজ্য হল আমাদের বিদ্যা, ন্যায়-পরায়ণতা, আমাদের সাহিত্য ও বিধানতন্ত্রের অবিনশ্বর সাম্রাজ্য।"[১]

উপরোক্ত ভাষণে আলো-আঁধারের ছায়াটা যেন কিছুটা গভীর হয়েই পড়েছে। মেকলের সমস্ত বক্তৃতা ও রচনাতেই সেটা দেখা যায়। মুঘল সম্রাটদের যখন তিনি "হীন অত্যাচারী" বলে বর্ণনা করেছেন এবং "তিন হাজার বছরের অত্যাচার ও পুরোহিততন্ত্রের অপকৌশল" ও "দাসত্ব ও কুসংস্কারের গভীরতম তল"-এর কথা বলেছেন, তখন ইংলণ্ডের সংকীর্ণ সীমানার বাইরের একটি জাতির আচার ব্যবহার ও কৃতিত্বের মূল্যায়ন সম্পর্কে একজন ইংরেজের স্বাভাবিক অজ্ঞতা নিয়েই কথা বলেছেন।

যে নতুন নীতিটিকে মেকলে এতটা জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন নিঃসন্দেহে সেটি হল সেই নীতি যা ১৮৩৩-এর ইংলণ্ড, অর্থাৎ যে ইংরেজগণ সবেমাত্র রিফর্ম এ্যাক্ট পাশ করিয়েছিলেন তাঁরা, যে নীতি ভারতেও প্রবর্তিত ও অনুসৃত হোক বলে চেয়েছিলেন। সেদিনের ইংরেজদের কাছে একচেটিয়া অধিকার লাভ ও বর্জন অরুচিকর ছিল। যাঁরা সবেমাত্র একটি জাতিকে নাগরাধিকার দিয়েছিলেন নিজেদের দেশেই সমস্ত উচ্চপদ থেকে সেই জাতিকে বঞ্চিত করে রাখা তাঁদের কাছে ছিল ক্ষতিকারক। সমস্ত আগ্রহশীল সংস্কারক ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ লোক অধীনস্থ জাতির প্রতি ন্যায়বিচারকেই সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন। যে ধারাটি আমরা ওপরে উদ্ধৃত করেছি সেটি সে যুগের মানসিকতারই পরিণতি—বৃটিশ জাতি ভারতের জন্য যে নীতি চেয়েছিলেন তারই বাস্তবরূপ।

তারপর যে সত্তর বৎসর কেটে গেছে এই সময়টাতেও যদি সেই পরিণত ও উদার নীতি নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসৃত হত তা হলে সেটাও ভারতের পক্ষে সুখের কারণ হত। যদি প্রশাসনে ভারতীয়দের একটা যথোপযুক্ত অংশে প্রবেশাধিকার দেওয়া হত, তাহলে ইংলণ্ডের শাসন আজ আরও জনপ্রিয়, আরও সফল হয়ে উঠত। আর বাণিজ্য ও শিল্পকে ফলবতী করবার জন্য যদি ভারতীয় রাজস্বের একটা বড় অংশ ভারতীয়দের কাছেই ফিরে আসত তবে তাদের আর্থিক অবস্থা আরও ভাল হতে পারত। কিন্তু যে দেশে মতামত ব্যক্ত করবার কোন অধিকার জনসাধারণের নেই, একচেটিয়া অধিকার সেদেশে কায়েম হবেই ; এবং সত্তর বছর ধরে মেকলে যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন সেই "বিজ্ঞ, বদান্য ও উদার ধারাটি" প্রকৃতপক্ষে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

অর্ধশতাব্দীকাল পরে ভারতের জনৈক ভাইসরয় লিখেছিলেন, "এই এ্যাক্ট পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার প্রকৃতপক্ষে ধারাটির কার্যকারিতা এড়িয়ে যাবার জন্য পন্থা নির্ণয় করতে আরম্ভ করেছিলেন। ঐ এ্যাক্ট অনুসারে প্রত্যেক দেশীয় ব্যক্তিই, যদি কভেনেণ্টেড্ সার্ভিসের জন্য পূর্বে সংরক্ষিত পদে সরকারী চাকুরী লাভ করেন তবে উন্নতির স্বাভাবিক পথে সেই চাকুরীর উচ্চতম পদ লাভ করবার আশা ও দাবী তিনি করতে পারেন। এই এ্যাক্টের ধারাগুলি ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত দেশীয় সম্প্রদায় পড়ে দেখেছেন এবং হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। সরকার কর্মরত দেশীয়দের উচ্চাশা পূর্ণ করতে অপারগ হয়েও, সেই শিক্ষিত দেশীয় সম্প্রদায়ের উন্নতিতে উৎসাহ দিচ্ছেন। আমরা সবাই জানি এই দাবী ও আশাগুলো কখনই পূর্ণ হতে পারে না বা হবে না। আমাদের একটা বেছে নিতে হবে—তাদের বাধা দেওয়া কিংবা ঠেকানো এবং আমরা সর্বাপেক্ষা জটিল পথটাই বেছে নিয়েছি। দেশীয়দের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ইংলণ্ডে যেটা পরিচালিত হয় তার প্রয়োগ এবং সম্প্রতি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা কমিয়ে দেওয়া এ সমস্তই হল এ্যাক্টটিকে নস্যাৎ করবার জন্য সুচিন্তিত ও পরিষ্কার কৌশল। আমি নিজের ওপর বিশ্বাস রেখেই লিখছি—কাজেই বলতে আমার দ্বিধা নেই যে এই মুহূর্তে ইংলণ্ড ও ভারত উভয় সরকারই এই অভিযোগের সন্তোষজনক উত্তর দিতে অপারগ যে তাঁরা মুখে যে প্রতিজ্ঞার কথা বলেছেন কার্যক্ষেত্রে তা ভাঙ্গবার জন্য তাঁদের ক্ষমতায় যত উপায় আছে তার সবই অবলম্বন করেছেন।"[২]

হাউস অব কমন্স যে ধারাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, বৃটিশ জাতি যা জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন তা যে এভাবে এড়িয়ে যাওয়া হবে, ১৮৩৩ এ

যখন এ্যাক্টটি পাশ হয় তখন সেকথা বোঝা যায়নি। পরন্তু, তখন ভারতে শিক্ষা প্রসার ও বংশ, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে নিজেদের দেশে উচ্চতর পদে শিক্ষিত ভারতীয়দের বর্ধিত সংখ্যায় গ্রহণ করাটাই ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। পূর্বে একথা বলা হয়েছে। ইংরেজরা ন্যায়পরায়ণ হতে চেয়েছিলেন। আর, এক ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ জাতির সাম্রাজ্য শক্তির অধীনে প্রগতি ও স্বায়ত্তশাসনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার আনন্দে ভারতীয়গণ দিন গুণছিলেন।

এর চার বৎসর পর ১৮৩৭-এ মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভারতের ইতিহাসে এমন একটি তারিখ দেখানোও সম্ভবপর নয় যে তারিখে ইংলণ্ডের শাসন অধিকতর সহানুভূতিশীল ও সদাশয় ছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে উচ্চতর সম্মান ও গভীরতর রাজভক্তির সাড়া জাগাতে পেরেছিল। লর্ড ওয়েলেসলী, লর্ড হেস্টিংস ও লর্ড আমহার্স্টের যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং দেশে শান্তি বজায় ছিল। বেসামরিক শাসনের মারাত্মক ভুলগুলি বহুল পরিমাণে শোধরানো হয়েছিল। নিজেদের ব্যাপারে প্রশাসনের ক্ষেত্রে কিছুটা অংশ গ্রহণের জন্য ভারতীয়গণকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। মাদ্রাজে মুনরো, বোম্বাইয়ে এলফিনস্টোন ও বঙ্গদেশে বেণ্টিঙ্ক-এর প্রশাসনের স্মৃতি তখনো লোকের মনে উজ্জ্বল ছিল। ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের নীতি গৃহীত হয়েছিল। নির্বিচার ব্যয়ও কমানো হয়েছিল। এবং ভারতীয় বাজেটে উদ্বৃত্ত দেখানো হল। নিষ্ঠুর এবং নিপীড়নমূলক ভূমি-রাজস্ব আদায় হ্রাস করা হল এবং উত্তর ভারতে বার্ড ও বোম্বেতে উইনগেট অধিকতর বিবেচনাপ্রসূত দীর্ঘস্থায়ী ভূমি-বন্দোবস্ত-নীতি প্রতিষ্ঠিত করলেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর ব্যবসায়ীরূপে থাকল না, সে অধিষ্ঠিত হল শাসকরূপে। বৃটিশ পার্লামেণ্ট জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়দের এ দেশের উচ্চপদগুলিতে আসীন করতে প্রতিশ্রুত হল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে এসে বসলেন একজন তরুণী রাণী এবং যে সব উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা একজন সদয়া রমণীর পক্ষে প্রাচ্যের মানস জগতকে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব তাই তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন ভারত-বাসীর মনে।

শুধু শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যগত সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রেও এটি একটি গৌরবময় যুগ। যে উদার মানসিকতা সাহিত্যের অঙ্গীভূত, মেকলে তাই যেন ভারতবর্ষে প্রবর্তন করেছিলেন। হোরেস হেম্যান উইলসন ছিলেন বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ এবং পরবর্তীকালে তিনি একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকরূপে পরিচিত হন। এলফিনস্টোন ছিলেন বিদ্বান্ ব্যক্তি এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিস্ট্রি অব

ইণ্ডিয়া' তখন প্রকাশিত হওয়ার মুখে। ব্রিগ্‌স্ তাঁর ভারতীয় ভূমিকরের উপর মহান গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন এবং 'ফেরিস্তা'র বিখ্যাত অনুবাদ কার্যেও তিনি নিযুক্ত ছিলেন। কর্নেল টড লিখলেন রাজস্থানের ইতিহাস। তাঁর রচনায় রাজপুতদের প্রতি যে সহানুভূতি তিনি দেখিয়েছেন, তাতে মনে হয় তিনি যেন স্বয়ং একজন রাজপুত এবং যে কোন উপন্যাসের চেয়ে এটি অধিকতর রোমহর্ষক এবং চিত্তাকর্ষক। গ্রাণ্ট ডাফ্-এর লেখা 'হিস্ট্রি অব মারাঠাস্' চিরদিনই মূল্যবান হয়ে থাকবে। ভারতবর্ষে এর চেয়ে উচ্চতর সাহিত্য চর্চা ও প্রতিভা আর কোন প্রজন্মের ইংরেজগণ দেখাতে পারেন নি এবং আর কখনও তাঁরা ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি এর চেয়ে বেশী সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে পারেন নি। তৎকালান ভারতবর্ষের কোন কোন শাসক এবং প্রশাসক ভারতবাসীদের প্রতি যে শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং তাদের গুণ ও যোগ্যতার যে মর্যাদা দিতেন তা উপলব্ধি না করলে ১৮৩১ এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টারী কমিটির সম্মুখে তাঁরা যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তার পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়।

বোম্বাইতে যাঁর রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্যকলাপের কথা পূর্ব অধ্যায়ে সমালোচিত হয়েছে সেই চ্যাপলিন বলেছেন "আমি স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পর্কে সাধারণত ভাল ধারণা পোষণ করি এবং আমার মতে পৃথিবীর যে কোন দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে তুলনা করলে তারা কোন মতেই হীন বলে প্রতিপন্ন হবে না।"

"আপনি আপনার নিজের দেশবাসীদের যতখানি বিশ্বাস করেন, ভারতবাসীদের কি ততখানি বিশ্বাস করেন?" এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল মাদ্রাজের সিভিল সারভিস-এর জন সুলিভ্যানকে। তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন "হ্যাঁ, যদি তারা সমান ব্যবহার পায়।"

এ ছাড়া, জেমস সাদারল্যাণ্ড, যিনি কয়েক বৎসর 'বেঙ্গল হরকরা' নামক কলকাতার একটি ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক নিযুক্ত ছিলেন, শিক্ষিত ভারতবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন, "তারা পৃথিবীর যে কোন জাতির মতই বিশ্বাসযোগ্য।"[১]

এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের মনোভাব জনসাধারণের মধ্যে আন্তরিক সাড়া জাগাল। ভারতীয় সমাজের নেতৃবৃন্দ, ভারতের সমাজ ও ধর্ম সংস্কারকগণ, এবং কলকাতার হিন্দু কলেজে শিক্ষিত বিশিষ্ট ছাত্রগণ ইংরেজী সাহিত্য ও চিন্তাধারার প্রতি আন্তরিকভাবে অনুরক্ত হল বৃটিশ চরিত্র ও শাসনের প্রতি তাঁদের আস্থা দৃঢ়মূল হল। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনিই ভারতে ব্রাহ্ম সমাজ বা ভারতের থেইষ্টিক চার্চের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সময়ের

সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত রকম সংস্কার সাধনেই তিনি সহায়তা করেছেন। নিষ্ঠুর সতীদাহপ্রথা নিবারণে তাঁর আন্তরিক সমর্থন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সানন্দেই গ্রহণ করেছিলেন। এরপর রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে এলেন এবং হাউস অব কমন্‌স-এ যখন লর্ড উইলিয়মের বিরুদ্ধে পেশ করা একটি পত্র নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল, সেই সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত বৃটিশ পার্লামেন্ট মেনে নিয়েছেন দেখে তিনি সন্তুষ্ট হন। ইংরেজী স্কুল ও কলেজ থেকে পাশ করা হাজার হাজার ভারতীয় তরুণ রাজা রামমোহন রায় যেগুলিতে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন সেই সংস্কারমূলক মনোভাবকে গ্রহণ করে নিল, ইংরেজী সাহিত্য ও চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হল, বৃটিশ শাসননীতি এবং বৃটিশ চরিত্রে তাদের বিশ্বাস জন্মাল।[৭]

ইংলণ্ডের এই উদার ও বিশ্বাসজনক নীতির ফলে, রাণী ভিক্টোরিয়া যখন বৃটিশ সাম্রাজের সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন তাঁর ভারতীয় প্রজাবৃন্দের মধ্যে একটি গভীর, বিস্তৃত এবং ঐকান্তিক আনুগত্য পরিলক্ষিত হল। যদি এই উদার ও বিশ্বাসপূর্ণ নীতি তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকত, তা হলে তা ইংলণ্ড এবং ভারত উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলের হতো। কারণ বৃটিশ জাতি আজ পর্যন্ত যে কটি দেশের শাসনভার হাতে নিয়েছেন তাদের মধ্যে ভারত সাম্রাজ্যের শাসন হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন। জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে এবং তাদের সহযোগিতা না পেলে এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

ভারত শাসন করবার পক্ষে যে বিস্তর বাধাবিপত্তি রয়েছে তা রাণী যে বৎসর সিংহাসনে আরোহণ করলেন সেই বৎসরই প্রকাশ পেল। লর্ড ওয়েলসলীর যুদ্ধের পরেই বোম্বাইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এবং উত্তর ভারতে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বোম্বাইতে এই দুর্ভিক্ষ নতুন ভাবে দেখা দিল ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে এবং দুর্ভাগ্য-জনক ও পীড়নমূলক ভূমি-বন্দোবস্তের ফলে মাদ্রাজ ১৮০৭, ১৮২৩ ও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ কবলিত হল। এই ক্লেশদায়ক ভূমি-বন্দোবস্তের নীতি উত্তর ভারতেও চালু ছিল এবং বর্তমানে, মহারাণীর সাম্রাজ্য শাসনকালের প্রথম বৎসরেই, এই শতাব্দীর ব্যাপকতম ও তীব্রতম দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সেই উত্তর ভারত প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল। রবার্ট মার্টিন বার্ড-এর নতুন বন্দোবস্ত-নীতি তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। মানুষ সম্বলহীন এবং ঋণে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টির ফলে এক সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

জন লরেন্স, যিনি পরবর্তীকালে লর্ড লরেন্স নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তিনি বলেছেন, "হোডল এবং পালোয়াল পরগনার ওপর দিয়ে যে জনশূন্যতা বিস্তার লাভ

করেছে, এমনটি আমি আমার জীবনে আর দেখিনি।" বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা যে কত তা কেউ গুণে দেখেনি। রাস্তা এবং নদীগুলো থেকে মৃতদেহ সরাবার জন্য কানপুরে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল, ফতেপুর এবং আগ্রাতেও সেই একই পথ অনুসৃত হয়েছিল। নগণ্য গ্রামগুলোতে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। তাদের কথা কেউ জানে না, কেউ তাকিয়েও দেখে নি। মৃতদেহগুলো পথের ধারে পড়ে থাকত; তাদের কেউ কবরও দিত না, বা দাহও করত না এবং শেষ পর্যন্ত শবদেহগুলি বন্যজন্তুর আহার্যে পরিণত হতো।

এই ভাবে, দেশময় দারিদ্র্য ও দুর্দশার গুরুত্ব এবং এ দেশ শাসন করতে হলে যে সব বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে তার আভাস প্রারম্ভেই পাওয়া গিয়েছিল। রাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে ভারতবর্ষের বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাঁর শাসনকালেই পাঞ্জাব ও সিন্ধু, অযোধ্যা ও মধ্যপ্রদেশ, বার্মা ও বেলুচিস্তান-এর অন্তর্ভুক্তির ফলে ভারত সাম্রাজ্য অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁর আমলেই এই বিস্তৃত মহাদেশে রেলপথের প্রসার ঘটে এবং ডাক ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। তাঁর রাজত্বকালেই দেশের বিভিন্ন প্রদেশে প্রধান বিচারালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শহরের সম্প্রসারণ ঘটে এবং দেশের বহু পতিত জমি উদ্ধার করে কৃষির কাজে লাগাবার ব্যবস্থা হয়। তাঁর শাসনকালেই বিধান পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং পৌরসভার সৃষ্টি হয়। তাঁর আমলেই শহরে ইংরেজী এবং গ্রামে দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রসার ঘটে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধিত হয় নি। নিজেদের জন্য শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরামর্শদানের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের কোন অধিকার ভারতবাসীদের দেওয়া হয় নি। এবং এ যুগে জনসাধারণের বাস্তব অবস্থারও কোন উন্নতি ঘটে নি। অথবা এ কথা বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত সভ্য দেশ থেকে যে দুর্ভিক্ষ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছিল, সেই দুর্ভিক্ষই এই দেশে বারবার এসে দেখা দিয়েছে এবং তার রূপ ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষের কবল থেকে এ দেশের অধিবাসীদের রক্ষা করবার কোন ব্যবস্থাই তাঁরা (অর্থাৎ বৃটিশ শাসকগণ) করতে পারেন নি। কোন দেশের জনসাধারণকে স্বায়ত্তশাসন এবং (শাসন ব্যাপারে) প্রতিনিধিত্বের কিছুমাত্র অধিকার না দিয়ে তাদের স্বার্থে সে দেশকে শাসন করা সম্ভব নয়, এটাই ইতিহাসের শিক্ষা এবং ভারতে বৃটিশ শাসনের ইতিহাস এই শিক্ষারই পুনরুক্তি করেছে।

১। Macaulay's Speeches. উপরোক্ত বক্তৃতাটি ১০ জুলাই ১৮৩৩-এ পার্লামেণ্টে প্রদত্ত হয়েছিল। ট্রেভলিয়ন তাঁর *Life of Lord Macaulay*-তে লিখেছেন......"বিরল

উপস্থিতিতে ; এমন এক পরিস্থিতি যা কিনা তাঁদের বিস্মিত করবে যাঁরা জানেন না যে বুধবারে বিষয় সূচীতে ভারতীয় প্রশ্ন থাকায় হোর্টেনসিউস-এর প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং সিসেরো দিলেও, হাউসে কোরাম হওয়া শক্ত। সে যাই হোক না কেন, শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লর্ড জন রাসেল, পীল ও কোনেল, এবং অন্যান্য পার্লামেণ্টারী রীতিনীতিতে পোক্ত ব্যক্তিরা। গভর্ণমেণ্ট প্রতিটি আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রেই, মূল নীতিকে রক্ষা করে, কেবল ছোটখাটো রদ-বদল করেই বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করলো ; পার্লামেণ্ট এবং দেশের সার্বিক অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যবস্থাগুলি আইনে পরিণত হলো।

২। Lord Lytton's Confidential Minute of 1878, দাদাভাই নোরজীর *Poverty and un-British Rule in India*, London, 1901, pp. 317 and 318. —থেকে উদ্ধৃত। "আইনটিকে বিপর্যস্ত করার কাজ এমনভাবেই কার্যকরী ও সম্পূর্ণ করা হয়েছিল যে অসামরিক, সামরিক, পূর্তবিভাগ, পুলিশ, চিকিৎসা, শিক্ষা, ডাক, তার, বন এবং অন্যান্য বিভাগগুলির উচ্চ পদগুলি আজও প্রায় তেমনি ভাবেই ইয়োরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত, যেমন ছিল ১৮৩৩-এর "ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট" প্রবর্তনের সময়। ১৮৯২-এ উপস্থাপিত পার্লামেণ্টের একটি হিসেবে দেখা যায় যে ১০০ পাউণ্ড বা তদতিরিক্ত (১ পাউণ্ড ১০ টাকার সমতুল্য ধরে) বাৎসরিক মাহিনা যুক্ত পদগুলির জন্য ইয়োরোপীয়দের মাহিনা ও অবসরকালীন ভাতা হিসাবে দেওয়া ১ কোটি ৫০ লক্ষ, ইয়োরোশিয়ানদের ১০ লক্ষ, এবং মাত্র ৩৫ লক্ষ দেওয়া হয় ভারতীয়দের যাঁরা সাধারণত নিম্নতর পদগুলিতে কাজ করেন।

৩। চ্যাপলিন, সুলিভ্যান এবং সাদারল্যাণ্ডের ১৮৩১ ও ১৮৩২-এ প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে।

৪। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুন হাউস অব লর্ডসের সিলেক্ট কমিটির সামনে স্যার চার্লস ট্রেভিলিয়ন যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছেন, "কলকাতার শিক্ষিত দেশীয়দের যে-ইংরেজী আমি বলতে শুনেছি, কি বাক্যগঠনের দিক থেকে কি উচ্চারণের দিক থেকে, এ রকম শুদ্ধ ইংরেজী আমি আর কখনও শুনিনি। আমরা নিজেদের মধ্য যে ইংরেজী বলে থাকি, তাঁরা তার থেকেও শুদ্ধ ইংরেজী বলে থাকেন কারণ তাঁরা এই ভাষা নিয়েছেন শুদ্ধতম আদর্শ থেকে। 'স্পেকটেটরে'র ভাষা যা ইংলণ্ডেও বলা হয় না, তাই তাঁরা বলে থাকেন। বিদেশী ভাষা শিখবার যে উল্লেখযোগ্য সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন, তা ভারতবর্ষে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে একটি আশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি।"

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাণী সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় যাঁরা স্কুল ও কলেজে পড়তেন, আমি শৈশবে তাঁদের মধ্যেই প্রতিপালিত হয়েছি। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ইংরেজী সাহিত্য, চিন্তাধারা ও চরিত্রকে তাঁরা সর্বাপেক্ষা বেশী হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের আনুগত্যও ছিল সর্বাধিক। এটা তাঁরা অনুভব করতেন এবং দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতেন। বেণ্টিঙ্ক, এলফিনস্টোন এবং মুনরোর যুগের কথা তাঁদের মনে ছিল ; মেকলে ট্রেভলিয়ন এবং মেটকাফকে তাঁরা দেখেছিলন, এবং ইংরেজী তথ্যের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁদের বিশ্বাসের অঙ্গীভূত ছিল। ভারতীয়দের দুটো প্রজন্মকে আমি দেখেছি—এঁদের মধ একদল হলেন আমার সমসাময়িক, ষষ্ঠ দশকে যাঁরা স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছিলেন ; অপর দল আমার বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাঁরা নবম দশকে শিক্ষিত ও প্রতিপালিত হয়েছিলেন,—এবং আমি

স্বীকার করছি যে শেষোক্ত দলের মধ্য আমি এই বিশ্বাসের হ্রাস লক্ষ্য করেছি। তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে বৃটিশগণ তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালন করেননি, বৃটিশগণ যে ক্রমাগত একচ্ছত্র ভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে যাচ্ছিলেন, তার বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, কিছু পরিমাণে স্বায়ত্ত-শাসন এবং শাসনব্যবস্থায় কিছুটা অংশ তাঁরা নিতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরা যে এরূপ দাবী করবেন মেকলে তা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা কি অন্যায় করছিলেন? অথবা একটি উদার প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা না করে এবং একশত বৎসর পূর্বে ওয়ারেন হেস্টিংস্ যে নিরঙ্কুশ শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন তাকে বজায় রাখবার চেষ্টা করে বৃটিশ সরকার কি নিবুর্দ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিলেন?

নির্ঘণ্ট